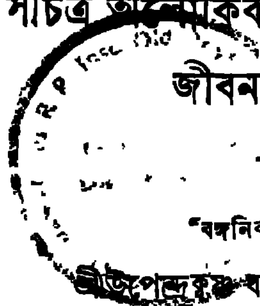
লেফ্‌টেন্যাণ্ট

সুরেশ বিশ্বাস।

(সচিত্র অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ অত্যাশ্চর্য্য

জীবনকাহিনী।)



"বঙ্গনিবাসী" সম্পাদক

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত।

[প্রথম সংস্করণ।]

শ্রীব্রজহরি দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২৫/২ গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ইলিশিয়ম্ প্রেসে শ্রীহরিচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

৬৫/২ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩০৬।

 [মূল্য ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

বীর, কবি বা সাধু সদাশয়গণ সর্ব্বদেশে সমাদৃত। তাঁহারা চলিয়া যান, সংসার তাঁহাদের কার্ত্তিকাহিনী বুকে করিয়া রাখে। বুকে করিয়া আপনি ধন্য হয়; কেন-না মাটীর পৃথিবীতে অমর সন্তানের জন্ম, মহা গৌরবের কথা।

শুধু গৌরবেব কথা নহে,—পরম প্রয়োজনীয়; পৃথিবীর শান্তিতৃপ্তি উন্নতি উৎসাহের অনন্ত উৎস। এই অভাবকঠিন মলিন মর্ত্ত্যের অনন্ত পথের অনন্ত যাত্রীসম্প্রদায় যখনই পৃথিবীর দিগন্তপ্রসারী ধূলিরাশির মধ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়, তখনই ইতিহাস বা জীবন-চরিত সেই ধূলি জঞ্জাল সরাইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলে, ইঁহারা কেমন শান্তিসরিতে পৃথিবীর ধূলিরাশি সরাইয়াছেন,—ইঁহারা কেমন ধূলিরাশি সরাইয়া অচল অটল মহিমা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ইঁহারাও পৃথিবীতে দুই দিনের জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিহাস জীবনচরিতে তাঁহাদিগকে চিবদিনের করিবাছে। এমন চিরসঙ্গী পাইলে, এমন দুর্ভাগ্য কে আছে সে, আপনাকে নিতান্ত নিঃসহায় মনে করে।

এখন একটি কথা, এমন সৌভাগ্যবান্ কয় জন,—যাঁহারা অনন্তকাল অসংখ্য অশান্ত লোকের হৃদয়ে শান্তিদান করিতে পারেন—যাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী অবসন্ন প্রাণে উৎসাহের অনলশিখা জ্বালাইয়া দেয়।

এই হতভাগ্য দেশে বর্ত্তমানকালে সেরূপ জীবনী অধিক নাই বটে, কিন্তু বিরল বলিযাই দুই একটি যাহা দেখিতে পাই, তাহাই অধিক আদরের ধন। দরিদ্রের সম্বল বহুমূল্য না হইলেও সমধিক প্রিয়।

এক জন কপর্দ্দক শূন্য নিতান্ত নিঃসম্বল বঙ্গবাসী, যাঁহার পরিধানে দ্বিতীয় বস্ত্রমাত্র ছিল না—বিদেশে অপরিচিত মণ্ডলীর মধ্যে আপন অসাধারণ ক্ষমতাগুণে কিরূপে সৈনিক জীবনে গণ্যমান্য হইয়াছেন, যাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্বে ব্রেজিলবাসী মুগ্ধ—শৌর্য্যবীর্য্যে যিনি জগতের বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয়;—যাঁহার কার্য্যে মেকলে প্রমুখ বাঙালীবিদ্বেষীর বাঙালীর ভীরুতাপবাদ অমূলক অতীত কাহিনীর মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। টাইম্‌সের ন্যায় রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মুখপত্রও যাঁহাব উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—যে দেশে একই সময়ে সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, জগদীশ বসু ও অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মিতে পারে, সে জাতিকে অবজ্ঞা করা যাইতে পারে না, সেই বঙ্গগৌরব সুরেশচন্দ্রের বিস্তৃত জীবনী বঙ্গবাসী মাত্রেরই সমাদরের সামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই।



লেফ্‌টেনাণ্ট সুরেশ বিশ্বাস।

সূচীপত্র।

অবতরণিকা।

সূচীপত্র।

নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদ।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

অবতরণিকা।

বঙ্গ ও বঙ্গবাসী।

অনন্ত রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি পৃথিবীর অক্ষয় শস্যভাণ্ডার; বঙ্গভূমি তাঁহার পরম আদরের পরমাসুন্দরী তনয়া। পুণ্যবতী মাতার আদরিণী কন্যা শোভাময়ী, শান্তিময়ী, স্নেহময়ী, অন্নপূর্ণাস্বরূপিণী। বঙ্গের সৌন্দর্য্যগৌরব ভীষণতায় নহে, এখানে প্রকৃতিদেবীর সহাস্যোজ্জ্বল স্নিগ্ধমাধুরী মহিমা—অপরূপ রূপমাধুরী। সমুন্নত পর্ব্বতশিরে সুশোভন বৃক্ষরাজি বঙ্গের শোভা সম্পত্তি নহে; পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া প্রবল স্রোতস্বতী এখানে উদ্দামগতিতে প্রবাহিতা নহে, ঘনপত্রপল্লবাচ্ছাদিত ভীষণ অধিত্যকা প্রদেশও এখানে নাই; কিন্তু শস্যশ্যামলা [illegible] হাস্যময়ী সমতলভূমি—উদার, পবিত্র, মোহন, সরল সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। পাষা[illegible]জা প্রবল প্রবাহিণী বঙ্গভূমিতে আসিয়া ধীর মন্থর গতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বক্রগতিতে ক্রীড়া করিতেছে। বঙ্গে অগণ্য সুখশান্তিপূর্ণ নগরী। নগরী অসংখ্য সরল, সহাস্য, শান্তিপ্রাণ নরনারীপূর্ণ, গৃহে গৃহে তাহাদের আনন্দ উৎসব—প্রতি উৎসবে প্রেমভক্তি শত ধারায় উৎসারিত। সে প্রেমতরঙ্গমালা অশান্ত নহে অথচ বিপুল বিশাল বেগবতী নদী-

বনী। সমগ্র মানব বৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাস। জগতে তাহার তুলনা নাই। স্নেহ শান্তিধারা সহস্রমুখিনী হইয়া অজস্র ধারায় সেই বিশাল প্রেমসমুদ্রে মিশিয়াছে। গভীরতায় উহা অসীম, বিচিত্রতায় অনন্ত, আস্বাদনে অনন্ত আবেশ—আবেশে পরমতৃপ্তি। এই দুঃখ দারিদ্রপূর্ণ মলিন মর্ত্যধামের সকল জঞ্জাল তাহাতে ভাসিয়া যায়।

এই বিচিত্র মোহিনী মাধুরীর লীলাস্থলে স্থানে স্থানে যে, ভীষণ সৌন্দর্য্যের অঙ্গপাত নাই, তাহা নহে,—থাকিলেও সৌন্দর্য্যসাগরে তাহা ভাসিয়া গিয়াছে। পতিতপাবনী গঙ্গা-ধারায়, ব্রহ্মপুত্রের পুণ্যপ্রবাহে এবং অসংখ্য উপনদী ও শাখা-নদীর সংস্পর্শে বঙ্গ সদাই সরসশ্যামলা। অতীতকালের কত কীর্ত্তিকাহিনী সেই পবিত্র ধারার অণু পরমাণুতে মিশাইয়া রহিয়াছে। আর পুণ্যপ্রবাহ ভাগীরথীর সেই তারিণী জননী-মূর্ত্তি—অপরে কে তাঁহার স্বরূপ বুঝে। অন্যে জননীকে সামান্যা স্ত্রীজাতি মাত্রই দেখে, কিন্তু সন্তান কতক বুঝে, কি স্নেহশীতলা সর্ব্বাপদ্‌নাশিনী সর্ব্বভয়বারিণী জননী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গভূমি অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে বিরাজিতা, খনিজ সম্পদেও তিনি দরিদ্রা নহেন। ষড়ঋতু পর্য্যায়ক্রমে বিবিধ উপহার লইয়া দেবীর পূজা করিয়া থাকে। এই ধনজন-পূর্ণ বিশাল বিচিত্র প্রদেশের জল বায়ুও বিচিত্র; কিন্তু সাধা-রণতঃ সরস বা সদার্দ্র। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী বলিয়াই যে, এরূপ তাহা নহে; প্রকৃতির দুর্ভেদ্য নিয়মবশে বিশাল সমুদ্রগর্ভ হইতে এই প্রদেশ উত্থিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে উর্ব্বরতা ও আর্দ্রতার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানবিদ্ বলেন, অতি পূর্ব্বে

অতীতের দুর্ভেদ্য তমসাচ্ছাদিত গহ্বরে অনন্তকালের বিরাট জঠর অন্বেষণ করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, এক্ষণে পৃথিবীর মানচিত্রে যে স্থান বঙ্গচিত্রে সুশোভিত, এক সময় সেই সুখভূমি, প্রকৃতির বিশাল জলময়ী মূর্ত্তির কুক্ষিগর্ভে ছিল। অনন্ত সাক্ষী হিমালয়ের তটভূমিতে তাহার তরঙ্গাভিঘাত হইত। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন আর্য্য জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা তখন মধ্য-আসিয়ার বিস্তৃত অধিত্যকায় সুখে পশুচারণ করিত, আর অগ্নি প্রভৃতি বিশ্বশাসিনী বিভিন্ন শক্তিকে সরল বিশ্বাসে উন্মুক্ত প্রাণে উপাসনা করিয়া সঙ্গীততরঙ্গে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিত। হিমালয়ের অত্যুচ্চ পাষাণ গাত্রে আজিও শঙ্খ ও বিবিধ সামুদ্রজীবের কঙ্কালচিহ্ন রহিয়াছে। তাহাতে নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ হয়, এক সময়ে তথায় বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গাভিঘাত হইত। এক সময়ে তথায় বজ্রসার কঠোর প্রকৃতির সহিত তরঙ্গ রঙ্গময়ী বিশাল জলময়ী প্রকৃতির নিত্য সংঘর্ষ হইত। ক্রমে বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে। কালচক্রে নিয়তির আবর্ত্তনে বিশাল সাগর গর্ভ হইতে এই রূপরসগন্ধস্পর্শময়ী অগণ্য মানবের আবাসভূমি বঙ্গ গঠিত, সজ্জিত ও শোভিত হইয়াছে। সেই অবিরত সংঘর্ষ-ফলে বা প্রাকৃতিক নিয়মবশে কেমন করিয়া সলিল হইতে প্রদেশ জন্মিল, বিজ্ঞানে সেই জটিল রহস্য—প্রকৃতির লীলা বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ মাত্র করিলাম।

বঙ্গভূমি অগণ্য মানবের বাসস্থান হইয়া অবধি ইহার জল বায়ু আপনার দুর্ব্বলকর প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রাচীন আর্য্যগণ যখন তাঁহাদের বিজয়িনী গতিতে উত্তর-ভারত অতিক্রম

করিয়া এই পরম রমণীয় প্রদেশের প্রান্তে পদার্পণ করিলেন, ঐতিহাসিক বলেন, তখন উহা অসংখ্য কৃষ্ণকায় জাতির বাসস্থান ছিল। তাহারা সভ্যতা সম্পর্কমাত্রশূন্য, আকৃতিগত পার্থক্য ব্যতীত শিক্ষা সংস্কারে তাহারা পশু কি মানব, বুঝিবার বিশেষ উপায় ছিল না। জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের, আর্য্যদিগের সহিত এই কৃষ্ণকায় বর্ব্বরদিগের সংঘর্ষে সেই আদিম অধিবাসীরা পরাভূত হইলে উহাদের কতকগুলি সেই নবাগত আর্য্যজাতির বশ্যতা স্বীকার করিল। কিয়দংশ বা আপনাদের বন্যজীবনের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নিকটবর্ত্তী দুর্ভেদ্য দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশের বনজঙ্গলে আশ্রয় লইল। ইতিহাসে অবগত হওয়া যায়, এই আদিম অধিবাসীর মধ্যে যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা বিজয়ী আর্য্যজাতির দাস ও সেবকরূপে আত্ম সমর্পণ করিল। এইরূপে আর্য্যজাতির সহিত তাহাদের দাস্য নিয়ন্ত্রিত হইল। যাহা হউক, এ স্থলে এই সকল প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় আমাদের বিশেষ আবশ্যক নাই।

আর্য্যগণ এই প্রদেশে আসিয়া দেখিলেন, ভূমি উর্ব্বরা, জল বায়ু মৃদু ও সরস। ক্রমে স্থানীয় প্রকৃতি এই বীজয়ী আর্য্যবীরদিগের উপর আপনার দুর্জ্জয় প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। অনায়াসে প্রচুর শস্য উৎপাদিত হইতে লাগিল; প্রকৃতির মাধুরীতে অন্তর কোমল ও মৃদু করিয়া তুলিল; তাঁহারা ক্রমশঃ অবিরত কার্য্যোদ্যোগের মহামহিমা অন্নাধিক বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। ক্রমে আলস্যের বশীভূত হইলেন। তখন সেই দীর্ঘ নিশ্চিন্ত অবসরে কার্য্যপ্রবণ শান্তিময় জীবনে চিরশান্তির কথা— ধর্ম্মান্দোলনের প্রাদুর্ভাব ঘটিতে লাগিল। সেই ধর্ম্ম-তত্ত্বালোচনায়

ফলে একে একে শরীরের বল ও সমর রঙ্গের আনন্দ নৃত্য অন্তর্হিত হইয়া আসিতে লাগিল। এই আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আরও মনে হয়, অনায়াসে বা অল্পায়াসে প্রচুর শস্য সম্পদ্ লাভই যদি জাতীয় বলবীর্য্য অবসানের প্রধান বা একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে গ্রীস ও ইটালির নিকট এক কালে প্রায় সমগ্র পৃথিবীবাসী কেন মস্তক অবনত করিয়াছিল। উর্ব্বরতায় গ্রীস ও ইটালি অতুল্য। আজ না জানি কোন্ দুর্ভেদ্য নিয়তিবশে সেই প্রচণ্ড দুর্জ্জয় জাতির বীরদর্পের অবসান হইয়াছে, কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যখন য়ুনানী ও রোমকগণ জগতীতলে বীরগৌরবে যশঃ সৌরভে পৃথিবী পূর্ণ করিয়াছিল, তখন কি তথাকার ভূমি উর্ব্বরা ছিল না? এখনও স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র বিজ্ঞানের বিহারভূমি ইউনাইটেড ষ্টেটস্। স্থানে স্থানে ভূমি যে রূপ উর্ব্বরা অথচ সেই সেই প্রদেশ যে রূপ কর্ম্মপ্রাণ বীরজাতির বাসভূমি, তাহাতে কেমন করিয়া বলি, উর্ব্বরতাই বীরগর্ব্ব অবসানের প্রধান কারণ! অন্নপূর্ণার সন্তান হইলেই কি অসুরনাশিনী শ্যামামূর্ত্তি বিস্মৃত হইতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা, বায়ুর আর্দ্রতা—ভূমি সজলা, সমুদ্রগর্ভ হইতে অনুচ্চ। তাহা হইলে উচ্চ স্থানের অধিবাসীরাই পৃথিবীর প্রধান জাতি হইত। আর ইংলণ্ডের ন্যায় সজল বায়ুসেবিত দেশবাসি-গণের বিশাল সাম্রাজ্যে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করেন না, শুনিতে পাইতাম না। নিয়তির দুর্ভেদ্য রহস্য, প্রকৃতির বিচিত্র লীলাপট উত্তোলন করিয়া জাতীয় অধঃপতনের বিশাল মর্ম্মান্তিক ইতিহাস এস্থলে আমাদের আলোচ্য নহে। প্রসঙ্গক্রমে প্রধানতঃ এই মাত্র বলিতেছি—স্থানীয় প্রকৃতিক্রমে অদৃষ্টচক্রে নিয়তিবশে

একটী বিজয়ী বীরজাতির চিত্তবৃত্তি বঙ্গে আসিয়া বিভিন্ন পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা স্থানীয় প্রকৃতির বিশ্ববিজয়ী বিজয়-নিশান।

বঙ্গের বিস্তৃত বিশস্ত পুরাবৃত্ত নাই, সুতরাং প্রাচীনকালের বীরত্ব গৌরবও নাই। যাহা আছে, তাহা মেকলে প্রমুখ লিপি-কুশল ঐতিহাসিকের অমূলক কল্পনা এবং ভারত আকাশের প্রচণ্ড ধূমকেতু মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের রচনা। তবে প্রকৃত ইতি-হাস কোথায় পাইব? বহুকাল পরপদদলিত ইতিবৃত্তহীন জাতির ইতিবৃত্ত কোথায়? এতকাল পরাধীন, অত্যাচারিত ও পরপদ-দলিত হইয়াও যাহারা সরল পবিত্র প্রফুল্ল হৃদয় লইয়া জীবিত রহিয়াছে, তাহাদের ইতিহাস কি রূপ। কোন্ অপূর্ব্ব জীবনী-শক্তিতে তাহারা প্রাচীন হইয়াও নবীন হৃদয়—শত বিঘ্ন বিপদ পাতেও সদাই উৎফুল্ল—গৃহে গৃহে আনন্দ কোলাহল—হৃদয়ের কোমলতা কিছুতেই ঘুচে না; গৌরব ভ্রষ্ট হইয়াও গৌরবহীন নহে!

সেই বীরদর্প মৃদুতায় পরিণত হইয়াছে বটে, তাহা বলিয়া বঙ্গভূমি অধুনাও বীরশূন্যা নহে। ইংরাজ ঐতিহাসিক মেকলের তীব্রোক্তি বাঙ্গালী দাসের জাতি; শঠতা, মিথ্যাবাদিতা, ভীরুতা প্রভৃতি যত কিছু নীচতা থাকিতে পারে, বাঙ্গালী জীবন কেবল তাহাতেই গঠিত। আজ বলিয়া নহে চিরকাল। একটী জাতীয় চরিত্রে এতগুলি কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া তিনি আপনার হৃদ-য়ের দুর্ব্বহ ভার লাঘব করিলেন বলিয়া তাহা ইতিহাস নামে পরিচিত হইবে না। উহা সদাশয় ইংরাজজাতির উপযুক্ত নহে। অথবা ঘাতকের নিকট সুষমাময়ী রমণী বা সহাস্য সুন্দর বালকের সৌন্দর্য্য দেখিবার অবসর কোথায়!

আর এক জাতীয় কলঙ্ক—অশীতিপর বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের বিনা যুদ্ধে পলায়ন। সপ্তদশসংখ্যক যবন অশ্বারোহী আসিয়া রাজপুরীতে প্রবেশ করিল আর বঙ্গেশ্বর অদৃষ্টের অবশ্যম্ভাবী পরাজয় স্থিরনিশ্চয় করিয়া অন্তঃপুরের গুপ্তপথ দিয়া পলায়ন করিলেন। শত্রুদিগকে বাধা দিবার কেহ রহিল না, কেহ বাধা দিল না। এইরূপে বঙ্গের স্বর্ণসিংহাসন বিজাতীয় ম্লেচ্ছের করতলগত হইল। বঙ্গ সৌভাগ্যরবি চিরকালের জন্ম অস্তমিত হইল। সপ্তদশ মাত্র অশ্বারোহী দ্বারা একটী সুবিশাল সাম্রাজ্য অধিকৃত হইল, এই অপূর্ব্ব উপন্যাসে কল্পনার নবীন লীলা থাকিতে পারে. কিন্তু মনস্বী ব্যক্তি তাহা ইতিহাস বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না। বিশেষতঃ সেই হিন্দু স্বাধীনতার সময় যবনজাতির প্রতি যেরূপ বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছিল, তাহাতে রাজা পলায়ন করিলেই রাজ্যবাসী পর্য্যন্ত বাধা মাত্র না দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইবে, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। হইতে পারে, ভীমার্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ছদ্মবেশে বা কোন মোহনমন্ত্রবশে জরাসন্ধপুরীপ্রবেশের ন্যায় সেই সপ্তদশ সংখ্যক অশ্বারোহীও রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিল! হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় কোন পরম যোগী বিশ্বহিতৈষী বৃথা রক্তপাত নিবৃত্তির জন্য পলায়নের পরামর্শ দিয়াছিলেন! ছলনায় হউক, আর প্রকৃত ভক্তিপাত্র বলিয়া অচল ভক্তিবশেই হউক, রাজা পলায়ন করিলেন। হইতে পারে, সমস্ত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া যবন যখন পুরী প্রবেশ করিয়াছে, রাজ্যরক্ষা ও আত্মরক্ষার আর উপায় নাই, তখন পলায়ন কি জগতের ইতিহাসে একটী অসাধারণ ছুরপনেয় কলঙ্ক কাহিনী! বিশেষতঃ বিশ্বাসঘাতকতার বলে, সপ্তদশজন মাত্র অশ্বারোহী যদি

অবাধে পুরী প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহাকে সপ্তদশ অশ্বারোহীতে দেশজয় বলে না। নিদ্রিত বা অন্ধ, হস্তপদবদ্ধ মহাবীরের গলদেশে ফাঁসি লাগাইবার জন্য সপ্তদশ কেন, একজন অশ্বারোহী হইলেই যথেষ্ট।

এই স্থলে আবার সেই কথা। যখন বিশ্বাসঘাতকতায় বঙ্গ-গৌরব নষ্ট হইয়াছে, তখন বাঙ্গালীজাতি যে বিশ্বাসঘাতক তাহাতে আর সন্দেহ কি? যুক্তি অপূর্ব্ব, হৃদয়গ্রাহিণীও বটে॥ বিশ্বাসঘাতকতায় বঙ্গ বিজিত হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহা বলিয়া বিশ্বাসঘাতকতা ইহাদিগের চরিত্র নহে। বিশাল পৃথিবীতে এমন কোন্ স্বর্গভূমি আছে, যেখানে বিশ্বাসঘাতকতা নাই,—যে দেশের ইতিহাসের অধ্যায় এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় কলঙ্কিত নহে? তাহা বলিয়া কোন মূর্খ বলিবে, সেই সেই জাতি বিশ্বাস-ঘাতক। মানবজাতি মধ্যে সর্ব্বত্র সদসৎব্যক্তি আছে, বৈচিত্র্যের জন্য বুঝি চিরকালই থাকিবে।

স্বীকার করিলাম, কেবল সপ্তদশসংখ্যক যবন বীরদ্বারা বঙ্গদেশ বিজিত হইয়াছে, কিন্তু আফগানদিগকে তাহার অর্দ্ধ ভাগ মাত্র জয় করিতে এক শতাব্দীরও অধিক অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। কত সহস্র বীর অজস্রধারে শোণিত বিসর্জ্জন করিয়া আংশিক বিজয় লাভে অধিকারী হয়। মুসলমান-দিগের পূর্ণ সৌভাগ্যের সময় বঙ্গের স্থানে স্থানে স্বাধীন নরপতি ছিলেন, তাঁহাদের সৈন্য সমস্তই বাঙ্গালী। এখন একটী সন্দেহ, হয়ত তাঁহারা বড় বড় জমীদার ছিলেন। পশ্চিম ভারত হইতে সিপাহী আনিয়া রাজ্য করিতেন। তখন পশ্চিম হইতে সিপাহী আমদানী হইত না—বঙ্গের পাইক বিখ্যাত ছিল। পলাশীর

যুদ্ধেও তাহারা অসাধারণ বীরবিক্রম প্রদর্শন করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বঙ্গের বীরত্ব প্রকাশে আর কাজ কি? একটী দ্বারবান রাখিতে হইলে, তাহাও পশ্চিম হইতে আনাইতে হয়। ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, এখন পশ্চিম ভারতীয় দ্বারবান রাখা ফরাসীদেশের সুইস দ্বারবান রাখার ন্যায় একটা রীতি দাঁড়াইয়াছে।

সে যাহা হউক, মুসলমান রাজত্বে অধিকাংশ বঙ্গবাসী যখন কোন না কোন শান্তিময় উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিত, তখনও কিয়দংশ বাঙ্গালী ব্যায়ামাদি বিবিধ সামরিক ক্রীড়া কৌশলে সময়াতিপাত করিত। সময়ে সময়ে সেই সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে এমন এক এক জন অসাধারণ সামরিক পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্ব দেশে সর্ব্বকালে প্রকৃত বীরত্ব গৌরবে বরণীয়। মোগলদিগের পূর্ণ প্রতাপের সময়েও বঙ্গে যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্য ছিলেন। যে সকল অমর বীরগাথা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, তিনি যে একাকীই সেই প্রভূত যশের একমাত্র অধিকারী, তাহা নহে। প্রতাপের অনুচর পার্শ্বচর সহকারীরাও যে এক এক জন অসাধারণ সমরকুশল বীরপদবাচ্য ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অনেকেও এক এক জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতাপ। নেপোলিয়নের ন্যায় রণবীর পৃথিবীর মধ্যে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সহকারী মধ্যেও অনেক ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন ছিল। বর্ত্তমানের দিকে অগ্রসর হইলেও আরও শত সহস্র উদাহরণ পাওয়া যাইবে, বাঙ্গালায় সাহসিকতা বা বীরবিক্রম অন্তর্হিত হয় নাই। তবে সুবিধা থাকিলে শক্তির পরিচালনা থাকিলে তাহা সমধিক বিকাশ পাইতে পারিত।

যাহা হউক, এই সম্বন্ধে এ স্থলে অধিক বিস্তারের আবশ্যকতা নাই। বঙ্গগরিমা প্রচারও ইহার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, গর্ব্ব ও গৌরব দুইটি স্বতন্ত্র! আত্ম গর্ব্ব দূষিত হইলেও আত্মগৌরব সমাদরের সামগ্রী।

বিদেশীয় বিবেচক ব্যক্তিগণ যে বাঙ্গালীকে একেবারেই বুঝেন না, তাহা নহে। মতভেদ অন্তর করে মতস্ক ধারণায় অক্ষম। বিদ্বান্ ও মূর্খ, ধীর ও হঠকারী, সাধু ও অসাধু সকল জাতির মধ্যেই আছে। সম্প্রতি ষ্টীভেন্স নামে কোন সাহেব অযাচিত কৃপাবশে বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনায় আপনার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং নিশ্চিন্ত নির্ব্বাক না থাকিতে পারিয়া তদুত্তরে মান্তবর ওল্ডহাম সাহেব যে, মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার মর্ম্মার্থ লিপিবদ্ধ করিয়া এই জটিল অপ্রীতিকর সমস্যার উপসংহার করিব।

"ষ্টীভেন্স সাহেব বাঙ্গালী জাতির চরিত্রে যে সকল কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন, স্বযাচিত কোন কার্য্যে সম্পূর্ণ অক্ষমতাই তন্মধ্যে প্রধান। কি রূপ শৌর্য্যবীর্য্যের কথা ষ্টীভেন্স সাহেবের লক্ষ্য, তাহা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। কিন্তু এ স্থলে তাঁহার সহিত শ্রীমান সাহেবের মত একবার তুলনা করিয়া দেখা যাউক। আমি সময়াভাবে সেই পুস্তক হইতে অবিকল উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, কিন্তু শ্রীমান বোধ হয় এই মর্ম্মে বলিয়াছেন যে, বীরত্ব শব্দে যদি স্ত্রীজাতির প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন এবং তাহাদিগের রক্ষার জন্য কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার, এমন কি প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন বুঝায়, তাহা হইলে ভারতবাসিগণের য়ুরোপীয়দিগের নিকট বড় কিছুই শিখিবার নাই। শ্রীমান সাহেব বঙ্গদেশে যতকাল

ছিলেন, ষ্টীভেন্স সাহেব তাঁহার তুলনায় অত্যল্প কাল মাত্র অবস্থিতি করেন। কর্ণেল শ্লীমান মধ্যভারতে অবস্থানকালে এই বিষয় লিখিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী বা মধ্যভারতবাসী সম্বন্ধে তিনি যাহা যাহা লিখিয়াছিলেন, উভয়ই জ্বলন্ত সত্য। সকল দেশের অধিবাসীদিগকেই সহজেই শঠ বা অবিশ্বাসী বলিয়া অভিযোগ আনা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর ভীরুতা ও কাপুরুষতার অপবাদ, আমার বোধ হয়, মেকলের অলীক উপন্যাসের উপর স্থাপিত। যখন বিভিন্ন সময়ে সঙ্কটময় সকল স্থানেই বঙ্গবাসীর সাহসিকতার আমাদের অনেকের জীবনরক্ষা হইয়াছে, তখন আর সেই অসত্য অভিযোগ শোভা পায় না।

ডিকেন্স সাহেব বর্ণিত কতিপয় নাগরিক কেরাণী জীবনের ইতিহাস সমগ্র ইংরাজ জাতির মনুষ্যত্বের ইতিহাস বলিলে যে রূপ শুনায় এবং তাহা যেরূপ বিশ্বাসযোগ্য, মেকলে সাহেব বর্ণিত বাঙ্গালী চরিত্রও তদ্রূপ। মেকলে সাহেব তাঁহার লেখার উপকরণ, কতকগুলি কেরাণী ও নিষ্কর্ম্মা বাঙ্গালীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সামরিক বিভাগে প্রবেশ অনিচ্ছাই বোধ হয়, তাঁহার এই ধারণার মূল। বাঙ্গালীর শীর্ণ অবয়ব যে, তাহার সাহসের অন্তরায়, তাহার কোন আভাস আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আনিতে পারি না। বাঙ্গালীর শীর্ণকায় বরং ম্যালেরিয়ার দুর্দ্ধর্ষ প্রকোপেরই পরিচায়ক—সাহস অভাবের কারণ নহে। বাঙ্গালীর ইউনিফরম পরিবার ও সামরিক শৃঙ্খলার ভিতর বাঁধা থাকিবার অনিচ্ছাই মেকলের মতের মূল। সর্ব্ব বিষয়ে প্রশ্নপ্রবণতা ও সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য, বাঙ্গালী জীবনের বিশেষত্ব। যদি সামরিক বিভাগে বাঙ্গালীকে কোন স্বাধীন কার্য্যের সম্পূর্ণ

স্বাধীনতা দেওয়া হইত, তাহা হইলে সহস্র সহস্র বাঙ্গালী—এই ভীরু বাঙ্গালীর মধ্য হইতেও ছুটিয়া আসিত, লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তির সম্মুখীন হইত। মরণের ভয়ে তাহারা পলাইয়া আসিত না। এখনও যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, সামরিক বিভাগে কোন স্বাধীন কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়াও তাহারা ডাক্তার বা কমিসরিয়েট কোন কর্ম্মচারী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পশ্চাৎপদ হয় না।

মেকলের যেখানেই অনন্ত জীবন্ত বিমোহন চিত্র সেইখানেই প্রায় অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা। বাঙ্গালীর চরিত্র বর্ণনা কালে ঐতিহাসিক হইয়াও তিনি ভুলিয়াছিলেন, যে সকল সেনা লইয়া বিখ্যাত ইংরাজবীর ক্লাইব পলাশীর বঙ্গবিজয়ী সমরাঙ্গনে হতভাগ্য সিরাজকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই এই শীর্ণকায় ভীরু স্বভাব বাঙ্গালী। দুর্ভাগ্যের বিষয়, হাবড়ার সেতু পার হইবার সময় ষ্টীভেন্স সাহেব ইতিহাসের সত্য বিস্মৃত হইয়া ঘৃণার দৃষ্টিতে এবং আপনার বিষময়ী কল্পনাবলে সেই বাঙ্গালীজাতি সম্বন্ধে এক নূতন উপন্যাসের সৃষ্টি করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাতে নূতনত্ব নাই মেকলের পুনরুক্তিমাত্র। আমার স্মরণ হয়, তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত বয়ন যুদ্ধের পরিণাম অনুসারে আইরিস সৈনিকদিগের কাপুরুষতা সম্বন্ধেও প্রবন্ধ বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু সেই স্থলেও তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন, আইরিস অশ্বারোহীদল সেই সমরক্ষেত্রে কি রূপ অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল এবং আইরিস পদাতিকগণ কি রূপ অসামান্য রণপাণ্ডিত্যে পরিচালিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিকের নিকট অধিক দিনের কথা নহে, তিনি আরও বিস্মৃত হইয়াছিলেন,

লেসলিযুদ্ধের শিক্ষিত কৃতকর্ম্মা সৈন্যদল এবং প্রসিদ্ধ ত্রিংশবর্ষ-ব্যাপী মহাসমরের সমর পারদর্শী স্বজাতীয় বীরপুঙ্গবগণ ডন্‌বারের প্রসিদ্ধ সমরাঙ্গনে ক্রমওয়েলের ক্ষুধাক্লিষ্ট সৈন্য সম্প্রদায়ের নিকট অপমানিত হইয়া কি রূপ ভাবে পলায়ন করিয়াছিল।"

অপক্ষপাতী ইংরাজবর্ণিত এইরূপ পরিচয়ের পরেও বাঙ্গালীর সাহসিকতা সম্বন্ধে পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রবন্ধ বিস্তারের আবশ্যকতা নাই। এ স্থলে আমরা এই মাত্র উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব যে, বাহুবলে বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ না হইলেও আদর্শ মনুষ্যোচিত গুণগ্রামে তাহারা হীন নহে। "শারীরিক বলেই অদ্যাপি পৃথিবী শাসিত হইতেছে বটে কিন্তু শারীরিক বল পশুর গুণ। মনুষ্য অদ্যাপি অনেকাংশে পশুপ্রকৃতি সম্পন্ন, সেই জন্য আজিও শারীরিক বলের এতটা প্রাদুর্ভাব। তবে বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে সকল উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করা চাই।"



লেফ্‌টেন্যাণ্ট

সুরেশ বিশ্বাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আনুসঙ্গিক কথা।

কোন জাতির সভ্যতার পরিমাণ করিতে হইলে, স্বতই মনে উদয় হয়, সভ্যতার পরিমাণদণ্ড কোথায়? জ্ঞানগৌরবে, ধনাধিক্যে না বীরবিক্রমে অথবা এইগুলির সমবায়ে? শারীরিক বলে না মানসিক গুণে? বিশাল জগতে যতগুলি জটিল সমস্যা আছে, ইহাও তন্মধ্যে একটি। তবে অনেকেই হয়ত অস্বীকার করিবেন না, শারীরিক বল মানবের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি হইলেও সভ্যতার সহিত উহার তত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই, উহা সভ্যতাবৃদ্ধির কোন উপায় বা উপকরণ হইতে পারে কিন্তু সভ্যতা নহে। সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশু ও মহাবল দুর্দান্ত বর্ব্বর বন্যজাতিকে সভ্য বলা যায় না।

তবে কি মানসিক গুণে অথবা উভয়ের সমবায়ে? যদি মানসিক গুণকেই সভ্যতা বলে, তবে সে গুলি কি এবং কি রূপেই বা তাহার প্রকাশ? উত্তরে বলা যাইতে পারে, মানবের মানসিক গুণ অসংখ্য;—শিল্পবিজ্ঞানে, কৃষিবাণিজ্যে, সাহিত্যদর্শনে এবং সর্ব্বোপরি সাংসারিক ও ধর্ম্মজীবনে তাহার বিকাশ। কোন জাতি সভ্যতা সোপানে কতদূর অগ্রসর বুঝিতে হইলে, তাঁহাদের শিল্প-বিজ্ঞানাদিই আলোচ্য হইয়া থাকে। এক্ষণে আর একটি জিজ্ঞাস্য, শারীরিক বল এই সভ্যতাবৃদ্ধি বা সভ্যতা লাভের কত দূর উপযোগী, কেনই বা আবশ্যক?

প্রত্যেক কার্য্যই শক্তিসাধ্য। বিদ্যানুশীলন করিতে হইবে, তাহাতেও শক্তির প্রয়োজন। বিপদ্‌পাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তাহাতেও শক্তির প্রয়োজন, অপরকে রক্ষা বা সংহার করিতে হইবে, তাহাতেও শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু শারীরিক বলের সহিত মানসিক বলের কতটা সম্পর্ক? মহাবল হইলেই মনস্বী হইতে হইবে অথবা শারীর বলে শ্রেষ্ঠ না হইলে যে, মনস্বী হইতে পারে না, তাহা ত বোধ হয় না। ইংরাজ জাতি আজি নবীন সভ্যতার অগ্রণী। বীরবর নেলশন সেই বীরজাতির ক্ষণজন্মা বীরপুরুষ। বাল্যে ও কৈশোরে তিনি দুর্ব্বল ছিলেন; বীরবিক্রমে যখন তিনি শীর্ষস্থানীয়, তখনও শারীরবলে বলীয়ান নহেন। যে ক্লাইব ভারতে ব্রিটিস রাজ্যের ভিত্তি সংস্থাপিত করেন, বিখ্যাত ঐতিহাসিক ম্যালিসন যাঁহাকে নেপোলিয়নের সহিত তুলনা করিয়াছেন, শারীরবলে তিনিও অসাধারণ ছিলেন না। যে বিখ্যাত ভ্রমণকারী আফ্রিকার নিবিড় অরণ্যানী ও মরুপ্রান্ত এবং আমেরিকার বিশাল তুষারময় ক্ষেত্র ভেদ

করিয়া জ্ঞানানুরাগ ও অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তিনিও যে একজন সবল বঙ্গবাসীর তুল্য বলশালী ছিলেন, তাহা নহে। এইরূপ ইতিহাসের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে অসংখ্য উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দেখান যাইতে পারে, কত ক্লাইব মহাবল না হইয়াও স্বদেশীয় সাম্রাজ্য সুবিস্তৃত করিয়াছেন,—কত ম্যাট্‌সিনি স্বদেশানুরাগে উদ্দীপিত হইয়া জননীর বন্ধনশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়াছেন,—কত বেলযোনি দুর্গম দেশ-দেশান্তে মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের ভগ্নাবশেষ নগরী হইতে প্রাচীন দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিতেছেন। কত ..ল ব্যক্তির মনস্বিতায় লৌহবর্ম্ম ও সমুদ্র আজি ইংরাজ জাতির বাহন, তাড়িততার তাঁহাদের দূত।

এইরূপ শত শত উদাহরণে দেখা যাইতেছে, মানস বিকাশের জন্য সিংহবিক্রমের আবশ্যকতা নাই। সিংহবিক্রমের আবশ্যকতা তখন, যখন কোন দুর্ব্বল প্রাণীর সংহার করিতে হইবে। আত্ম রক্ষার্থ বা আত্মকর্ত্তব্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যও সময়ে সময়ে উহার বিশেষ প্রয়োজন। প্রবল যখন দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতেছে, সেই অত্যাচার নিবারণের জন্য ইহা মানসিক গুণ, এবং অত্যাচার-নিবারণ শক্তিসাপেক্ষ। যখনই কোন মানসিক গুণের নিষ্পত্তির জন্য কার্য্যপ্রবৃত্তি—তখনই অল্লাধিক শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন। সেই শক্তি বা শারীর বল তখনই সভ্যতার সাধন স্বরূপ। শিল্প বাণিজ্য বা দর্শনবিজ্ঞান সর্ব্বত্রই এইরূপ। কিন্তু শারীর বলে বলী হইয়া শিল্প বিজ্ঞানাদির উন্নত সোপানে অধিরূঢ় হইয়াও নির্জ্জিত বা বিজিত জাতির মৃত ও জীবিতাবশেষদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার বর্ব্বরতারই পরিচায়ক, বীরত্বের নহে।

বীরত্বও সভ্যতার অঙ্গ। সুতরাং বলা যাইতে পারে, শারীর বল যে স্থলে মানসিক গুণের সহকারী নহে—তথায় উহা সভ্যতার অঙ্গ বা অবলম্বন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মানস বিকাশেই সভ্যতা-বিকাশ ;—শারীর বল উহার পক্ষে ততক্ষণই প্রয়োজন, কার্য্যানুষ্ঠানের জন্ত যতক্ষণ তাহা সহকার থাকে। রক্তধারায় পৃথিবী ভাসাইলে সভ্যতার যে অধিক অঙ্কুরোদ্গম হয়, সেবিশ্বাস আমাদের নাই।

মানস গুণই যখন সভ্যতা, তখন দেখা যাউক, সভ্যতা-লোকিত জগতের ইতিহাসে বঙ্গের স্থান কোথায় ? বঙ্গবাসীর এমন কি মানসিক গুণ আছে, যাহাতে তাহারা জগতের কোন শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে ?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন জাতির সভ্যতার পরিমাণ করিতে হইলে সাধারণতঃ সেই দেশের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প-বিজ্ঞান, এবং সর্ব্বোপরি সাংসারিক ও ধর্ম্ম জীবন আলোচ্য হইয়া পড়ে। কৃষিকার্য্যে বঙ্গের প্রকৃতি এমনই অনুকূল যে, অল্লায়াসেই প্রচুর শস্য জন্মে, এবং কিরূপ প্রণালীতে তাহা উৎপাদিত হইতে পারে, বঙ্গের কৃষক সম্প্রদায় নিরক্ষর হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাহা-দের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে।

'শিল্প বা বাণিজ্য আদর্শ সভ্যতা বা মানবজনোচিত উচ্চ গুণাবলীর মধ্যে গণনীয় নহে। তবে শিল্প সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, ঢাকার মস্‌লিন, কৃষ্ণনগরের মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রকৃ-তির অনুকৃতি, মেদিনীপুর অঞ্চলের তসর ও গরদ, বীরভূম অঞ্চলের লৌহের গঠন, দিনাজপুর অঞ্চলের প্রাচীন গৃহাদির ভগ্নাবশেষ উচ্চ শিল্পের পরিচায়ক ; তবে শিল্প ও বাণিজ্য পরস্পর এক সূত্রে

গাথা, যেন এক বৃন্তে দুইটী ফুল। স্বাধীনতায় বিমল বিভা ব্যতীত তাহা কোনক্রমেই স্ফূর্ত্তি পাইতে বা বিকশিত হইতে পারে না। এক্ষণে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, এখনই যেন স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে, হিন্দু স্বাধীনতার সময়েই ইহার শিল্প বাণিজ্য কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল? তদুত্তরে আমরা এই মাত্র বলিব, সভ্যতা প্লাবিত বর্ত্তমান যুগের শিল্প বাণিজ্য বিজ্ঞানোন্নতি আধুনিক সভ্যজাতিদিগের চিরন্তন সম্পত্তি নহে। অন্যান্য দেশে কালে যাহা ঘটিয়াছে বঙ্গের ভাগ্যেও যে, তাহা কোনক্রমেই ঘটিত না, কোন্ যুক্তিবলে তাহা স্বীকার করিব? প্রাচীন কবির বর্ণনায় পুরাতন নগরীর ভগ্নাবশেষে, এবং প্রস্তর লিপিতে বঙ্গ সভ্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে, সেই প্রাচীন কালেও তাহারা বৃক্ষের বল্কল পরিত না, অপক্ক ও অস্পৃশ্য আহারে রসনা পরিতৃপ্ত করিত না, যথেচ্ছবিহারী পশুর ন্যায় স্বজাতি বা হীনজাতির নিধন সাধন করিয়া আপনার পশু প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে নাই। শিল্প বাণিজ্য যে লক্ষ্মীলাভের প্রধান উপায়, তাহা বঙ্গবাসীরা সেই প্রাচীন কালেও বুঝিত। কিন্তু ইহাও তাহাদের প্রাণে গাঁথা ছিল, শিল্প বাণিজ্য সম্পদ্ বৃদ্ধির প্রধান সাধন, কিন্তু সম্পদ্ সভ্যতা নহে। আর বিজ্ঞানে! চারিদিকেই ধুয়া—বিজ্ঞানে বঙ্গ বা ভারতবাসী চিরকালই হীন। বিজ্ঞান বলিতে তাঁহারা কি বুঝেন, বলিতে পারি না। সমুদ্রবক্ষে স্বচ্ছন্দে বিহারোপযোগী বাষ্পীয় পোত, দ্রুতগামী বাষ্পীয় যান, ও তাড়িত বার্ত্তাদি দেখিয়া যদও তাঁহারা বঙ্গবাসীকে বিজ্ঞানান্ধ বলেন, তাহা হইলে আমরা বলিব, তাঁহাদের প্রাচীন রোম বিজ্ঞানান্ধ ছিল; শুধু প্রাচীন রোম বা গ্রীস কেন, দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্বে জগতের সকল

জাতিই বিজ্ঞানান্ধ ছিল, কিন্তু কোন্ মোহন মন্ত্রবলে সেই সকল অন্ধ জাতির সন্তানদিগের দিব্য চক্ষু ফুটিল? বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে অথবা কালবশে? অথবা এই সকল তত্ত্ব কতকগুলি জাতির হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবার আবশ্যক হইয়াছিল বলিয়া! প্রকৃতিদেবীর যে দুর্ভেদ্য রহস্য জালের মধ্যে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর তীক্ষ্ণ নখর ও দংষ্ট্রা থাকে, বাবুই পক্ষীর কুলায় নির্ম্মাণের জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ বীবরে অপূর্ব্ব কৌশল সেতুবন্ধন সামর্থ্য জন্মে, দূর দেশান্তে গমনাগমন ও অবস্থানের জন্য বিশেষ আবশ্যক স্থলে সেইরূপ ঐ সকল তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আমরা আবার বলিব, এই সকল বিজ্ঞানোন্নতি বর্ত্তমান সভ্যজাতিদিগের চিরন্তন সম্পত্তি নহে, বঙ্গের ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকিলে এ দেশেও উহা অপরিজ্ঞাত থাকিত না?

যে বিজ্ঞান বলে প্রতীচ্য জাতি আজি প্রাচ্য জাতিদিগের উপর আপনাদের দুর্দ্ধর্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, যে বিজ্ঞান বলে বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যালয় সকলই দেবালয় শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র, অপরিজ্ঞাত ভূখণ্ডেও উন্নতির পতাকা উড়িতেছে, যে বিজ্ঞানবলে, তাড়িতে, বারুদে— সর্ব্বসংহারিণী শক্তির অবতারণা, বঙ্গে বিজ্ঞানদেবীর সেই মোহিনী ও সংহারিণী মূর্ত্তি বিকসিত হয় নাই। বিজ্ঞান এখানে ভিন্ন পথে চলিয়াছে। এখানে দেবীর তারিণী শান্তিময়ী মূর্ত্তি। বঙ্গের বিজ্ঞান—অর্থতত্ত্ব নহে—শিল্প সম্পদ্ নহে—সমুদ্রে বক্ষে সচ্ছন্দে বিহারের উপায় নহে—লোক ক্ষয়কর প্রভাব প্রকাশ নহে। বঙ্গের বিজ্ঞান—পরমার্থ বিজ্ঞান—বঙ্গের বিজ্ঞান সংসার ধর্ম্ম বিজ্ঞান—বঙ্গের বিজ্ঞান সুখশান্তি বিজ্ঞান। সংসারে, সমাজে—জীবনে কিরূপ মানব বৃত্তির উৎকর্ষ

ও পরম শান্তিলাভ ঘটে, তাহাই চরম লক্ষ্য। ধর্ম্ম ইহার পত্তন ভূমি—ঐহিক সুখভোগ ইহার পার্শ্ব স্তম্ভ। জাতীয় সাহিত্যে সেই মর্ম্মকাহিনী পরিব্যক্ত। মেঘমেদুর অম্বরে, কোকিলকূজিত কুঞ্জকুটীরে সেই প্রেমগীতি; গৃহে গৃহে দেবালয়ে তাহার নিত্য-লীলা। বঙ্গবাসীর জীবন, প্রবাসে প্রিয়জনের স্মৃতি। শত কর্ত্তব্যের মধ্যেও সেই স্মৃতি সর্ব্বদা জাগরূক। সুখ সম্মিলনের জন্য বাসর প্রতীক্ষা অপেক্ষাও বুঝি তাহা সুমধুর! বিরহ ব্যতীত মিলনের সুখ কোথায়। তাই বুঝি অসংখ্য অতুল্য গীতিকাব্য-গীতিকাব্যে বিরহ সঙ্গীতের পূর্ণ বিকাশ।

বঙ্গের বিশেষ সম্পত্তি পারিবারিক ব্যবহার—হৃদয়ের পূর্ণ প্রকাশ। দয়া, মায়া, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রণয়ে হৃদয়ের প্রেম নির্ঝরিণী শত ধারায় উৎসারিত। আচার ব্যবহার রীতি নীতি—সকলই প্রেমময়, পবিত্রতাময়। অসংখ্য আত্মীয় কুটুম্ব লইয়া তাহাদের সংসার—সংসারের সুখশান্তিই তাহাদের জীবনের চরম-লক্ষ্য। সেই সুখ, বিলাসবাসনার চরিতার্থতায় নহে। সেই সুখ দয়ার বিকাশে, মমতা প্রকাশেও সেই সুখ, প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে—জগৎ ভুলিয়া প্রেমের সাধনায়। মলিন মর্ত্ত্যের নীচতা হীনতা আপনার অসীম প্রভাবেও সে স্থলে কঠোর আধিপত্য প্রকাশ করিতে পারে না। বলিরাজের যজ্ঞে বামনদেব ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণচ্ছলে যেরূপ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, বঙ্গের ভক্তি এবং প্রীতিবাৎসল্য প্রণয়ও সেইরূপ আপনার ক্ষুদ্রকায়ায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অধিকার করিয়া বসে।

বঙ্গের আত্মীয় কুটুম্ব অসংখ্য। মমতার এত বৈচিত্র্য পৃথিবীর আর কুত্রাপি নাই। তাই তাহাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার। সেই

জন্যই বুঝি অতিথি দেবতা। সেই জন্যই বুঝি বিশ্ব প্রেম বিরল মানবের ক্ষুদ্র প্রেমের ভাণ্ডার বিশ্ব বিস্তারিত করিতে যাইলে বিলুপ্ত হইবারই অধিক সম্ভাবনা। অথবা দরিদ্রের সম্বল বলিয়া সমধিক আদরের সামগ্রী।

বিশ্ব প্রেম বিরল হইলেও বুঝি বঙ্গেই তাহার পূর্ণ বিকাশ। মানব কেন, পশু পক্ষীতে সে প্রেম বিস্তারিত। যে দেশে চৈতন্য-দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিজয় নিশান, বিশ্বপ্রেম সে স্থলে না থাকিলে আর কোথায় থাকিবে? বিদেশী বিধর্ম্মীকে প্রাণ খুলিয়া আলিঙ্গন করিতে জগতে কয় জন পারিয়াছে। খৃষ্টীয় মিশনরিদিগকে মধ্যে মধ্যে এইরূপ প্রেমের অভিনয় করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু অবিলম্বেই তাঁহাদের প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

আর ধর্ম্ম-জীবন। ধর্ম্মাচরণ জীবনের একটী পৃথক্ কার্য্য নহে। ধর্ম্ম লইয়াই জীবন—ধর্ম্মের জন্যই জীবন। জন্মগ্রহণ হইতে শ্মশান সৎকারের যবনিকাপাত পর্য্যন্ত—আদ্যোপান্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্ক গর্ভাঙ্ক। তাই বলিতেছি, তাহাদের জীবনটাই ধর্ম্ম লইয়া। সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে মধ্যে মধ্যে তাহাতে করুণ বা কঠোর ছায়াপাত হয়, কিন্তু বীভৎস দৃশ্য প্রায়ই দেখিতে হয় না। প্রাণের গান একই সুরে বলিতেছি, হৃদয় ভরিয়া ভাল বাস, মন খুলিয়া বিমল হাস, আর জীবন ভরিয়া কর্ত্তব্য কর। বঙ্গ প্রেমময়, কোমলতাময়, মানব জনোচিত সহৃদয়জনপূর্ণ আনন্দ-ময় শান্তিনিকেতন। পৃথিবীর আজিও এতদূর সভ্যতা হয় নাই যে, আপনার পশু প্রকৃতির দুরন্ত পরিচয় না দিয়া এই সুখশান্তি বিকাশ দেখিয়া মোহিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নবদ্বীপ ও নবদ্বীপবাসী।

বঙ্গের যে সকল বিভাগ বীরকীর্ত্তির বিমল গৌরবে বরণীয়, তন্মধ্যে নবদ্বীপের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। নবদ্বীপের নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গেই কত তেজোগর্ব্বের কথা, কত সাধনা-সিদ্ধির সুমহতী কাহিনী, কত পুণ্যপবিত্রতা-পাণ্ডিত্যের প্রকাশ, স্মরণে আইসে। আর মনে পড়ে, নদীয়ার সেই পূর্ণ শশধর গোরাচাঁদের কাঙাল বেশের অতুল মহিমা। বঙ্গের যাহা সার সম্পত্তি নবদ্বীপেই তাহার পূর্ণ প্রকাশ। আমরা একে একে সংক্ষেপে সেই আলোচনাই করিব।

এখন আর সে নবদ্বীপ নাই। অতীত গৌরব হ্রাসের সহিত ভাগিরথীর পুণ্যগর্ভে তাহার অধিকাংশই অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন ভাগিরথীর পশ্চিম দিকে নূতন নবদ্বীপ।

রাজধানীর নামানুসারে যেমন কোন কোন স্থলে সেই প্রদেশের নামকরণ হইয়া থাকে, নবদ্বীপ সম্বন্ধেও সেইরূপ। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব নরহরি দাস বলেন,

"নয়দ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় একগ্রাম।
যথা কোন রাজধানী স্থান।
যদ্যপি অনেক তথা হয় এক নাম।

কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টীয় ৭।৮ম শতাব্দীতে নবদ্বীপ সমুদ্র তীর হইতে মানববাসভূমিরূপে পরিণত হয়। পরে সেনবংশীয়দিগের রাজত্ব সময়ে কি বীরত্বগৌরবে, কি শিক্ষা সভ্যতায় বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। তদবধি বীরত্ব গৌরবে না হউক, পুণ্য-পাণ্ডিত্যে নবদ্বীপ আজিও গৌরবভ্রষ্ট হয় নাই, সেনবংশীয় বা পালবংশীয় রাজাদিগের সময়ে নবদ্বীপের কিরূপ শোভা সম্পত্তি ছিল, আমরা এস্থলে সে কথার উল্লেখ করিয়া পূর্ব্ব স্মৃতির তীব্র তাড়না সহ্য করিতে চাহি না। মুসলমানদিগের প্রবল অত্যাচারের সময়েও নবদ্বীপের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহারই একটু আভাস দিতেছি। কবি জয়ানন্দ বলেন,

"নানাচিত্রে ধাতু বিচিত্র নগরী, নানা জাতি বৈসে তথা।
চূর্ণে বিলেপিত, দেউল, দেহারা, নানাবর্ণ বৃক্ষলতা॥
জয় জয় ধন্য, নদীয়া নগরী, অলকনন্দার কূলে।
কমলাভাষিণী ক্রীড়া করে তথি, রাজিত বকুলমালে॥
প্রতি গৃহোপরি বিচিত্র কলস, চঞ্চল পতাকা উড়ে।
পূর্ব্বে যেন ছিল, অযোধ্যানগরী, বিজুরী ছটকি পড়ে॥
নাট পাঠশাল দীঘী সরোবর কূপ তড়াগ শোভন।
মঠ মণ্ডপ সুচিত্রিত চত্বর কুন্দতুলসী আরোপণ॥
প্রতি দ্বারে শোভে অতি বিচিত্র কপাট।
প্রতি গলি নৃত্য-গীত আনন্দিত, প্রতি ঘরে বেদ পাঠ॥
দ্বিজরূপ ধরি দেবতা গন্ধর্ব্ব জন্ম লভিলা নবদ্বীপে।
হইয়া দ্বিজনারী, ইন্দ্র বিদ্যাধরী, সঙ্গীত গঙ্গা সমীপে॥
স্বর্গ ছাড়ি যত গন্ধর্ব্বমণ্ডলী জন্মিল বৈদ্য বনিতা।
দেব ঋষি মুনি দ্বিজ রূপ ধরি অধ্যয়ন শ্রুতি

গোধূলি সময়ে মৃদঙ্গ করতাল শঙ্খধ্বনি প্রতি ঘরে।
শ্বেতচামর ময়ূরপাখা হাতে, চন্দ্রাতপ শোভা করে॥
ইষ্টক রচিত প্রাচীর প্রাঙ্গণ সুচিত্রিত গৃহ দ্বারে।
হিঙ্গুল হরিতাল কাঁচা চাল চৌখণ্ডী চৌকাট সারে॥
শাল রসাল বিশাল স্তম্ভরাজিত চন্দ্রার্কতিলকে।
ময়ূর শুক সারস পারাবত সিংহ হংস শাবকে॥
খাটপাট সিংহাসন আসন চৌখড়ি ময়ূর পাখা।
বিচিত্র চামর চন্দ্রাতপ প্রতি ঘরে সুন্দর শাখা॥
ডাবর বাটা গুবাক সংপুট দর্পণ রসবাটিকা।
তাম্রহাণ্ডি রসপিত্তল কলস বারাণসী ত্রিপদিকা॥
শঙ্খ বাটাবাটি সর্ব্বাঙ্গ থাল রসময় রসথুরি।
তিরোহুত গাড়ু তাম্রমুখী মণ্ডল শীতল পিত্তল ঝারি॥
ট্যার গাটাকড়ি হিরণ্যমাদুলী কেয়ুর কঙ্কণ নূপুরে।
হেমকিয়াপাতা বিক্রম মুকুতা কাশ্মীর দেশের খুরে॥
স্তবকসুর পানবাটা কাঞ্চিদেশের বিচিত্র বেলি।
পাটনেত ভোট সকলাতকম্বল শ্রীরামখানিজমকা।
ভোভোট্টদেশের ইন্দ্র নীলমণি লক্ষ্মীবিলাস তারকা।
লিখিতে না পারি যত দাস দাসী প্রেমের মন্দিরে খাটে।
যে যে দ্রব্য সব ভুবনদুর্লভ বিকায় নদীয়ার হাটে॥

নবদ্বীপের সেই সুখশান্তির সময়ে মুসলমান অত্যাচারে এখানকার পণ্ডিতমণ্ডলী, ও সাধারণের ধনমান নিতান্ত বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। কবি বলেন,—

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥

নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘরদ্বার লোটে তার লৌহপাশে বান্ধে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিয়া মিথ্যাবাদ।
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে।
নিশ্চিন্ত না থাকিহ প্রমাদ হবে পাছে॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হবে রাজা!
গন্ধর্ব্বে লিখন আছে বর্ণময় প্রজা॥
এই মিথ্যাকথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল॥
বিশারদ সুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
সবংশে উৎকল গেল ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥”

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় নবদ্বীপের সীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল, ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গলে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

"রাজ্যের উত্তরসীমা মুর্শিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগিরথী খাদ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্বসীমা ধূলাপুর বড়গঙ্গা পার॥"

নবদ্বীপ বঙ্গের বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান স্থান। শুধু বিদ্যাচর্চ্চা বা শাস্ত্রালোচনা নহে—বিদ্যাদানের বিখ্যাত স্থান। পৃথিবীর আর কোন দেশে এরূপ বিদ্যাদান প্রথা ছিল বলিয়া ত বোধ হয় না। বিদ্যার্থী আসিলে তাহাকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইত না। অধ্যাপক মণ্ডলী ধনাঢ্য ছিলেন না, কিন্তু আপনাদের আহার্য্যের অংশ হইতেও শিক্ষার্থীকে আহার করাইয়া শিক্ষাদান করিতেন এবং শিক্ষার্থীও পিতৃনির্ব্বিশেষে অধ্যাপককে প্রীতিভক্তি করিতেন।

নবদ্বীপের বিভব বিস্তারের কথা আলোচনা করিতে হই-লেই এখানকার পাণ্ডিত্য প্রভাবের কথা আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। এই কামকলুষময় পৃথিবীর মধ্যে ভোগবিলা-সিতা হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকিয়া জ্ঞানচর্চ্চা ও ঈশ্বরচিন্তায় চিত্ত সমর্পণ করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত রঘুনাথ বিদ্যাদানের জন্য ব্যাকুল হইয়া যখন বৃক্ষাদিকেই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন, তখন তিনি মনে করেন নাই, সেই ব্যাকুলতার ফলে বঙ্গদেশ ন্যায়চর্চ্চার প্রাধান্যের অমৃত ফল উপভোগ করিবে? আর মথুরানাথ, সেই পার্থিব সুখভোগস্পৃহাহীন শিক্ষাগুরুর আদর্শ কোথায়? বিদ্যা-দান ও ছাত্রপালনই তাঁহার জীবনের এক মাত্র ব্রত। গৃহে অন্ন

ব্যতীত আহারের উপকরণ নাই; রামনাথ বলিলেন, উপকরণের অভাব কি। সরল প্রাণের অকপট উচ্ছ্বাসে বলিলেন, সম্মুখের তিন্তিড়ি বৃক্ষ থাকিতে আমাদের অভাব কি? ভোগবিলাস বর্জ্জিত, সদা সন্তুষ্ট সে সকল পরম পণ্ডিত ধর্ম্মজীবন মহাত্মাগণ আজ কোথায়?

কিন্তু নবদ্বীপের প্রধান গৌরব, নদীয়ার পূর্ণ শশধর শ্রীচৈতন্যদেব। একদিকে মুসলমানের দারুণ অত্যাচার, অন্য দিকে অনাচার, ব্যভিচার এবং ধর্ম্মহীন শুষ্ক তর্ক বা বেদান্ত-বাদের বিকৃতি বিভীষিকা। ধর্ম্মবিপ্লবের সন্ধিস্থলে, ধর্ম্মাচরণের সেই ঘোর প্রতিকূলতার মধ্যেও শ্রীচৈতন্যদেব করুণ প্রেমের প্রবাহ প্রবাহিত করিলেন। প্রথম প্রথম তাহাতেও যে নানা রূপ অত্যাচার উৎপীড়ন ঘটে নাই তাহা নহে; কিন্তু সেই সঙ্কীর্ত্তনের তরঙ্গে দেশের কঠোরকলুষতা কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে! সেই নির্ম্মল, মনোমোহন, উন্মাদন প্রেমপ্রবাহে মুসলমানদিগের কঠোরতা পর্য্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছিল। নবদ্বীপ আবার নূতন শোভায় নবীন মাধুরীতে ভরিয়া উঠিল।

শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ অবতার বা পূর্ণব্রহ্ম এ স্থলে আমরা সে কথার সমালোচনা করিব না। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতেছি, তিনি অসাধারণ প্রেমিক ও ভাবুক রূপে অবতীর্ণ হইয়া, সর্ব্ব জীবে দয়া, সর্ব্ব দেবে পূজা, সর্ব্বভূতে প্রীতি ও প্রেমভক্তি বা যে বিশ্বপ্রেম দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব, অসাধারণ, অননুকরণসাধ্য। তাঁহার অপূর্ব্ব মাধুরীময় প্রেমধর্ম্মে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ ছিল না, হিন্দু মুসলমানের দ্বেষাদ্বেষ ছিল না, পণ্ডিত মূর্খের পার্থক্য ছিল না, পাপী তাপী ধনী নির্ধন

সকলেই সেই প্রেমময়ের প্রেমসুধাপানে তুল্য অধিকারী। এখন শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব একটা বীভৎস ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু চৈতন্যদেব স্বয়ং সেই ভেদজ্ঞান বিদূরণের জন্য কি রূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে তাহার একটু আভাস দিব। শ্রীচৈতন্যদেব এক দিন বলিলেন,

"প্রকৃতি স্বরূপে নৃত্য হইবে আমার।" চৈতন্যদেব প্রকৃতিবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

চৈতন্যদেব যখন প্রকৃতিবেশে নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার ভক্তগণও তাঁহাকে চিনিতে পারিল না;

তখন——

কেহ নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
হেন অতি অলক্ষিত বেশ মনোহর॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু প্রভুর বড়াই।
তাঁর পাছে প্রভু আর কোন চিহ্ন নাই॥
অতএব সবে চিনিলেন প্রভু এই।
বেশে কেহ লখিতে না পারে প্রভু সেই॥
সিন্ধু হইতে প্রত্যক্ষ কি হইল কমলা।
রঘুসিংহ গৃহিণী কি জানকী আইলা॥
কিবা মহালক্ষ্মী কিবা আইলা পার্ব্বতী।
কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্ত্তি সতী॥
কিবা ভাগীরথী কিবা রূপবতী দয়া।
কিবা সেই মহেশমোহিনী মহামায়া॥
এই মত অন্যোহন্যে সর্ব্ব জনে জনে।
চিনিয়া প্রভুরে আপনা সেই মানে॥

আজন্ম ধরিয়া প্রভু দেখিল যাহারা।
তথাপি দেখিতে নারে তিলার্দ্ধেক তারা॥

চৈতন্ত তখন নাচিতে নাচিতে ভক্ত সকলকে আপনার স্তব পড়িতে বলিলেন। আর নিজে—

ভাবাবেশে কখন বা অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী যেন সবে বুঝেন প্রকাশে॥
ঢুলিয়া ঢুলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে।
সাক্ষাতে রেবতী যেন কাদম্বরী পানে॥
সর্ব্বশক্তি স্বরূপা নাচেন বিশ্বম্ভর।
কেহ নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর॥
মোর স্তব পড় বলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
জননী আবেশ বুঝিলেন সর্ব্বজনে।
সেইরূপে সবে স্তুতি পড়ে প্রভু শুনে॥
কেহ পড়ে লক্ষ্মীস্তব কেহ চণ্ডী স্তুতি।
সবে স্তুতি পড়েন যাহার যেন মতি॥
"জয় জয় জগত-জননী মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া॥
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটীশ্বরি।
তুমি যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ অবতরি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে তোমার মহিমা।
বলিতে না পারে, অন্তে কে দিবেক সীমা॥
জগত-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব্বশক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ণুভক্তি॥
যত বিদ্যা—সকল তোমার মূর্ত্তিভেদ।

'সর্ব্ব প্রকৃতির শক্তি তুমি' কহে বেদ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিপূর্ণ তুমি মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা॥
তুমি ত্রিজগত-হেতু গুণত্রয়ময়ী।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে, জানে কোই॥
সর্ব্বাশ্রয়া তুমি সর্ব্ব জীবের বসতি।
তুমি আদ্যা অধিকারা পরমা প্রকৃতি॥
জগত আধার তুমি দ্বিতীয়-রহিতা।
মহী রূপে তুমি সর্ব্ব-জীব-পালয়িতা॥
জলরূপে তুমি সর্ব্ব জীবের জীবন।
তোমা' স্মরিলে খণ্ডে অশেষ-বন্ধন॥
সাধুজন গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি॥
তুমি সে করাহ ত্রিজগতে সৃষ্টি-স্থিতি।
তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি॥
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র উদয়া।
রাখহ জননি, চরণের দিয়া ছায়া॥
তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার।
তুমি না রাখিলে মাতা। কে রাখিবে আর॥
সভার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত জীবেরে মাতা! কর নিজ দাস।
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্ব-ভূতবুদ্ধি।
তোমা' স্মরিলে সর্ব্ব মন্ত্রাদির শুদ্ধি॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং বলিতেছেন, বিষ্ণু ও শক্তিতে প্রভেদ নাই। একই শক্তি বিবিধরূপে প্রকাশ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপের আর এক জন উজ্জ্বলরত্ন। ইহাঁরা ভবানীর বরপুত্র ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর। বঙ্গ-ভাষার তান্নমহল নির্ম্মাতা ভারতচন্দ্র এই সভার শোভা বৃদ্ধি করিতেন। এই সকল সুখসম্পদের কথার মধ্যে নদীয়ার বিশ্বাসবংশের মহত্ত্ব ও আত্মসমর্পণের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। কুক্ষণে নদীয়ায় নীলের আবাদ হইয়াছিল, বাঙ্গালীর রক্তে নীলের ভূমির উর্ব্বরতা সাধিত না হইলেও অজস্র রক্তপাতে ভারতের ইতিহাস রঞ্জিত রহিয়াছে। নীলকরগণ নদীয়ায় নীলের আবাদ উপলক্ষে নিদারুণ অত্যাচার অনাচার করিত, রাজকর্ম্মচারিগণ সকলেই তাহাদের সুহৃদ্ সহায় কিন্তু নদীয়ার বিশ্বাসবংশ ধনবলে বলী না হইলেও প্রবল পরাক্রম নিষ্ঠুরপ্রকৃতি, নীলকরদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। নীলকরগণ নদীয়ায় যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, জগতের ইতিহাসে সেরূপ নৃশংসতা নিতান্ত বিরল। ইংলণ্ডের রাজ্যে সুসভ্য ইংরাজ জাতীয় হইয়া তাহারা যেরূপ বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়াছে, সাধু প্রকৃতি ইংরাজগণ সেই কথা স্মরণ করিয়া তাহা-দিগকে আপনাদের স্বজাতীয় বলিতে কুণ্ঠিত হন। সে যাহা হউক, বিশ্বাস বংশ সেই দারুণ নিষ্ঠুরতার প্রতিকূলতাচরণ করিতে গিয়া অনেকে গৃহ দ্বার শূন্য হইয়াছেন, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া-ছেন, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তথাপি সেই দানবোচিত দুর্বৃত্ততার প্রতিকূলতাচরণে পরাঙ্মুখ হন নাই। বিনাপরাধে গৃহ লুণ্ঠন, গৃহ দাহ, প্রাণ সংহার এমন কি অসহায়া গর্ভিণী

রমণীকে পদাঘাতে নিপাতিত বা সতীত্বনাশ করিতে দেখিয়া কোন্ মানব সন্তান নীরব নিস্পন্দ থাকিতে পারেন? বিশ্বাসবংশের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং ধন প্রাণদানে অবশেষে ইহার প্রতি বিধানের তুমুল আন্দোলন উঠে। এবং সদাশয় ইডেন এবং সুপ্রসিদ্ধ লং সাহেব প্রভৃতির সহায়তায় সেই অমানুষিক নৃশংস আচরণের তিরোধান ঘটে।

এখন নানাকারণে নবদ্বীপ শ্রীভ্রষ্ট, অধিবাসিগুলি ম্যালেরিয়ার প্রপীড়িত; তথাপি শান্তিপুর কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের গোপগণ এখনও লাঠির খেলায় অনেক বীরের বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে। বোদে ও বিশে ডাকাতের অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী এখন উপন্যাস রূপে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এখনও মতিয়ারির রামদাস বাবুর বল বিক্রম, বাহুবলের একটী সামান্য উদাহরণরূপে লক্ষ করা যাইতে পারে।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নাথপুরের বিশ্বাস।

নদীয়ার রাজধানী কৃষ্ণনগরের ৭ ক্রোশ পশ্চিমে ইচ্ছামতী নদীতীরে নাথপুর নামে একটী পল্লীগ্রাম আছে। তথাকার বিশ্বাসবংশ ধন গৌরবে না হউক, বহুকাল হইতে নদীয়া অঞ্চলে বিশেষ মান্যগণ্য। এই প্রাচীন সম্ভ্রান্তবংশ অতুল ধনাধিপতি নহে, বড়লোক বলিয়া একটী অসামান্য অহঙ্কারে গর্ব্বিত নহে, কিন্তু সমগ্র নদীয়া অঞ্চলে জনসাধারণের নিকট তাঁহারা সুপরিচিত। তাঁহাদের খ্যাতি, ভদ্রোচিত আচার ব্যবহার ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণের সমাবেশে সুতরাং সহজে বিলুপ্ত হইবার নহে। তাহা দুদিনের অস্থায়ী খ্যাতি নহে যে, নিমেষে ফুরাইবে।

১৮৬১ খৃঃ অব্দে সুরেশচন্দ্র এই সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস। গিরিশ বাবু বিশেষ ধনাঢ্য ছিলেন না। তিনি গবর্ণমেণ্ট আপিসে সামান্য বেতনের কার্য্য করিতেন। যখন গোরাচাঁদের প্রেমের তরঙ্গে "শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়" সেই সময় হইতেই বিশ্বাসবংশ এই শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসক। গিরিশ বাবু কোম্পানীর কর্ম্ম করিতেন; সুখশান্তিময় স্বগ্রামে অবস্থান তাঁহার ভাগ্যে অধিক দিন ঘটিয়া

উঠিত না। পরিবারগণ স্বদেশেই থাকিত। স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন লইয়া কর্ম্মস্থলে প্রবাস তখনকার রীতি ছিল না। সুতরাং সেকালের পল্লীগ্রামগুলিও শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই। অর্থোপার্জ্জনের জন্য যিনি যেখানেই কর্ম্ম করুন না কেন, সেখানে কেবল উপার্জ্জনের জন্যই অবস্থান করিতেন কিন্তু সর্ব্বদাই মনে জাগিত, সেই প্রিয় জন্মভূমি, যে স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে স্থানে তাঁহার প্রিয় পরিজনবর্গ ও পূর্ব্বপুরুষগণের চরণরেণু বা কীর্ত্তিকাহিনী বর্ত্তমান, যেখানে কপট আত্মীয়তায় অপরকে ভুলাইয়া আত্মীয়বৎ করিবার আবশ্যক হয় না। আর সেই প্রবাসের পর প্রিয় পরিজনের মিলন বড়ই সুমধুর ছিল। তখন স্নেহ মমতা মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রবাসের দীর্ঘদিন যামিনীর সুখ দুঃখময়ী স্মৃতি দূরীভূত করিত। নগরের বিলাস বিভ্রম তখন জনসমাজের হৃদয় এতদূর কলুষিত করে নাই। সে কাল গিয়াছে!

গিরিশচন্দ্রের দুই পুত্র ও তিন কন্যা; সুরেশচন্দ্রই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র; সুরেশচন্দ্রের বয়স এই ৩৮ বৎসর মাত্র কিন্তু তিনি যেরূপ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, যেরূপ বিপদ অতিক্রম করিয়াছেন এবং এক্ষণে যেরূপ গৌরবে গৌরবান্বিত, তাহা অসামান্য, অসাধারণ এবং প্রকৃত বীরোচিত।

সকল দেশের সর্ব্ব সময়েই মনস্বীব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, বালক ভবিষ্যতে কিরূপ ব্যক্তি হইবে, প্রথম হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। সুরেশচন্দ্রের জীবনেও তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত। বাল্যকাল হইতেই সুরেশচন্দ্র ভয় কাহাকে বলে জানিত না। প্রসিদ্ধ ইংরাজবীর নেল্‌সন সাহেব বাল্যকালে

পাখীরবাসা ভাঙ্গিতে বাহির হইলে স্নেহময়ী জননী ভয় দেখাইলে যেমন বলিয়াছিলেন, "ভয় কি মা।" সুরেশচন্দ্রও তদ্রূপ বাল্য-কালে সঙ্কটময় ঘটনাতেও আভাস দিয়াছেন, ভয় কাহাকে বলে! নির্ব্বুদ্ধিতাবশে নহে, প্রকৃতিবশে। তিনি জানিতেন, অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করিলে হস্ত পুড়িয়া যায় কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও আবশ্যক বোধ হইলে তাহাতে বিমুখ হইতেন না।

সুরেশচন্দ্র বাল্যে বড়ই চঞ্চল ছিলেন, যখন যেদিকে যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইত, সহজে তাহা হইতে বিরত হইতেন না। প্রবল ব্যক্তির বাধায় অগত্যা নিবৃত্ত হইতে হই-লেও বিষম ক্রোধে ও অভিমানে তখন বালক সুরেশের চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত। কিন্তু সদ্‌ব্যবহারে বালক আবার তেমনই বশীভূত। শাসনে যাহা দুঃসাধ্য, একটু সহাস্য মুখে একটী মিষ্ট কথায় বালক সুরেশচন্দ্র একেবারে শিষ্ট শান্ত, নিতান্ত আজ্ঞাবহ।

সুরেশচন্দ্রের সমবয়স্কদিগের পক্ষে যাহা দুঃসাধ্য বা অসম্ভব সুরেশচন্দ্রের নিকট তাহা নহে। এইরূপে প্রায় প্রতিদিনই বালক সর্ব্বাঙ্গে অল্লাধিক আঘাত পাইত। আজ উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া গিয়াছে, আজ কাটিয়াছে, এইরূপ ক্ষত বিক্ষত হওয়া তাঁহার বাল্য জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনা। কিন্তু তজ্জন্য বালক-সুলভ ক্রন্দন শুনা যায় নাই। লাগিয়াছে লাগুক, কাটিয়াছে কাটুক; অত্যুচ্চ হইতে লম্ফ প্রদান, অতিরিক্ত দৌড় ও বৃক্ষারোহণ এ সকল হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

কতকগুলি ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, তাহারা প্রভুত্ব করিতেই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহারা আজ্ঞাবাহক

নহে। সুরেশচন্দ্রের বাল্যকাল আলোচনা করিয়াও সেই রূপ বোধ হয়, তিনি প্রভুত্ব করিতেই জন্মিয়াছেন, অধীনতা করিতে নহে। বাল্যকালে তিনি কোন সঙ্গী সহচরকে খুঁজিয়া বেড়াইতেন না, কিন্তু দলে দলে সমবয়স্ক বালক আসিয়া সুরেশচন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হইত, এবং তাঁহাকে আপনাদের "পাণ্ডা" মনে করিত।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাল্য ঘটনা

বালকের অস্ফুট জীবনে ভবিষ্যৎ জীবনের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। বালকের হাসি কান্না ও খেলা ধূলার মধ্যে যে বিশেষত্বটুকু থাকে, তাহা সকল সময়ে সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না বটে কিন্তু বিশেষ প্রতিকূলতা না ঘটিলে কালে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ছায়া দেখিয়া কায়া নির্ণয় সহজ ব্যাপার নহে।

সুরেশচন্দ্রের সেই সুকুমার শৈশবে যে বিশেষত্বের আভাস পাওয়া যায়, একণে তাহা পরিস্ফুট বা পরিব্যক্ত কিন্তু বালকের সেই অস্থিরতা, অসাধারণ দুঃসাহস ও সহগুণ তখন কয়জনের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছিল যে, সেই বালসুলভ প্রকৃতির গূঢ় বিকাশেই বর্ত্তমান পরিণত।—বীজের অভ্যন্তরে যেরূপ গুপ্ত অগোচর অন্তর্শক্তি নিহিত থাকে, মনুষ্য প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেও তাহার সুস্পষ্ট আভাস পরিলক্ষিত হয়।

বাল্যকাল হইতেই সুরেশচন্দ্রের জীবনে লক্ষিত হইবে, তিনি অকুতোভয় এবং অপূর্ব্ব সহনশীল; প্রত্যেক ঘটনায় তাহা অরাধিক পরিব্যক্ত। বালকের অগ্নিশিখা দর্শনে আনন্দোচ্ছ্বাস

বিচিত্র ঘটনা না হইলেও সুরেশচন্দ্রের তাহাতে একটু অসাধারণত্ব ছিল। এবং বালক সাধারণের লোহিতোজ্জ্বল অগ্নি বা দীপশিখা দর্শনে যে আনন্দ তাহা বালসুলভ হইলেও সম্ভবতঃ উহার একটী বিশেষ কারণ আছে। অনেকে অনুমান করেন, এই আনন্দের মূলে সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা বর্ত্তমান। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য বালক সেই আকর্ষণে মোহিত বা বিদগ্ধ হইতে পশ্চাৎপদ নহে; কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধগণও কি সৌন্দর্য্যের প্রদীপ্ত শিখায় বহ্নিমুখে পতঙ্গ পতনের ন্যায় স্বেচ্ছায় দগ্ধাবশেষ না হইয়া বিরত হইতে পারেন?

যাহা হউক, সুরেশচন্দ্রও অগ্নির সহিত ক্রীড়ায় একান্ত আগ্রহ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। স্নেহময়ী জননী সদাই শঙ্কিতা, অবাধ্য অবোধ সন্তান আগুন লইয়া কখন কি করিয়া বসে! কিরূপে অগ্নি বা দীপশিখার উপর সন্তানের ভয় জন্মাইয়া দিতে পারেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, অবশেষে স্থির করিলেন, আগুনের তাপ লাগিলে বালক হয়ত আর আগুনের নিকট যাইবে না; এইরূপে তিনি আগুনের উপর সন্তানের ভয় জন্মাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে অত্যাবশ্যক গৃহকর্ম্ম করিতে হইবে, দুশীল সুরেশ সঙ্গে থাকিলে তাহা কোনমতেই হইবার নহে, অথচ গৃহে এমন কেহ নাই, যাহার নিকট রাখিয়া মার প্রাণ স্থির থাকিতে পারে। অন্ধকার গৃহে বালককে একাকীই বা কিরূপে রাখা যায়; আবার প্রজ্বলিত দীপালোকেই বা কোন প্রাণে রাখিয়া যাইতে পারেন। তখন কেরোসিন ল্যাম্পের এত প্রাদুর্ভাব হয় নাই এবং এরূপ সম্পত্তিশালীর গৃহও

নহে যে, গৃহে ঝাড় লণ্ঠন জ্বলিবে। তখন ঘটনাক্রমে সুরেশ-চন্দ্রের মাতা স্থির করিলেন, আগুনের উপর ভর জন্মাইয়া তিনি গৃহকার্য্যে যাইবেন। গৃহের এক কোণে সেই "সনাতন" দীপ জ্বলিতেছিল। সন্তানকে কোলে লইয়া সুরেশ চন্দ্রের মাতা সেই দীপের দিকে অগ্রসর হইলেন, সুকুমার শিশুর সেই কোমল কর-পল্লবগুলি নাচাইতে নাচাইতে সেই দীপশিখার নিকট ধরিলেন। মার কোলে নির্ভয় বালক হস্ত আরও বাড়াইয়া দিল। হস্তে বিলক্ষণ লাগিল, কিন্তু বালকের রোদন বা চক্ষুকোণে অশ্রু বিন্দুমাত্র নাই। মা মনে করিয়াছিলেন, সামান্ত উত্তাপ লাগি-লেই বালক কাঁদিয়া উঠিবে বা হস্ত সরাইয়া লইবে, কিন্তু তাঁহার সে বালক নহে। বালক অগ্নিতে হস্ত বাড়াইয়া রাখিয়া হাসে নাই বটে, কিন্তু তাহার মুখে যন্ত্রণার কোনরূপ চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। কাতরতার পরিবর্ত্তে কেবল মাত্র অপূর্ব্ব নীরবতা, কিন্তু মার প্রাণ তখন কত কাঁদিয়াছিল, কে বলিবে? সন্তানের অদ্ভুত সহগুণ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া সেই অবধি তাঁহার শাসন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভীষণ অগ্নিময় সমর-ক্ষেত্রে সুরেশচন্দ্র যে নির্ভয়ে অগ্নিক্রীড়া করিবেন, এই সামান্ত ঘটনাতেই যেন তাহার সূচনা।

সুরেশচন্দ্রের বয়স যখন দুই বৎসর মাত্র তখন হইতেই তাঁহার নির্ভীকতা ও দুঃসাহসের অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। দুই বৎসরের শিশু একাকী খেলা করিতেছে, অকস্মাৎ নিকট-বর্ত্তী প্রাচীর গাত্রে একটী "মৈ" এরদিকে বালকের দৃষ্টি পড়িল, বালক উহার নিকটবর্ত্তী হইল, একে একে উহার সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিল; উহা ভূমিতল হইতে ২০ ফুট উচ্চ। বালক উচ্চে উঠিয়া

একবার নিম্নে যেন নিক্ষেপ করে, আর অতুল আনন্দে সেই কচি কচি হাত দুখানি নাচাইয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে করতালি দিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অর্থহীন আনন্দ সঙ্গীত। বালকের চীৎকারে সুরেশ-চন্দ্রের মাতা ও আত্মীয় স্বজন সেইস্থানে আসিয়া পড়িল। বাল-কের কাণ্ড দেখিয়া সকলেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। একটু অসাবধান, ভারবৈষম্য বা দুর্ম্মতি ঘটিলেই ভগবান যে কি দুর্ঘট-নাই ঘটাইবেন, সকলে সেই আশঙ্কা করিতেছেন। ২০ ফুট উচ্চ হইতে সেই দুই বৎসরের শিশু ভূমিতলে পড়িলে আর কি তাহাকে পাওয়া যাইবে! এদিকে আত্মীয় স্বজনকে দেখিয়া বালকের আনন্দ বাড়িয়া উঠিল; হর্ষোৎফুল্ল বালক সুকুমার গ্রীবা বাঁকাইয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে করতালি দিতে লাগিল। সক-লেই ভীত—বিপদের আর বিলম্ব নাই। এইবার হয়ত পড়িল কেহ যে সেই "মৈ"এ উঠিয়া বালককে নামাইয়া আনিবে, তাহাও একরূপ অসম্ভব। কেন না হয়ত উঠিতে গেলেই সিড়ি সামান্য নড়িবে। সেই সামান্য কম্পনে সুরেশের পদস্খলন হইতে পারে; অথবা কাহাকেও উঠিতে দেখিলে উন্মত্ত সুরেশ তাহাকে দেখিয়া লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে কি না, কে বলিতে পারে! সুরেশ-চন্দ্রের জননী সন্তানকে যতই স্থির হইয়া বসিতে বলিতেছেন সুবোধ শিশুর সঙ্গীতভঙ্গী ও চীৎকার ততই বাড়িতেছে। ভয় দেখাইয়া বা ভৎর্সনা করিয়া সুরেশকে কোনরূপ প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা বৃথা বুঝিয়া তখন তিনি স্নেহকাতরবাক্যে সুরেশকে ক্ষণেকের জন্য শান্ত হইতে অনুনয় করিলেন। ক্লান্তিবশেই হউক, অথবা মাতার কাতরতাতেই হউক, সুরেশচন্দ্র স্থির হইয়া বসিল। তখন কয়েক ব্যক্তি সেই "মৈ"খানি দৃঢ়রূপে ধরিয়া রহিল, যেন

কম্পিত বা বিচলিত না হয়। এবং একজন ধীরে ধীরে উহাতে উঠিয়া সুরেশচন্দ্রকে নামাইয়া আনিল। তখন সুরেশচন্দ্রের মাতা যেন হারানিধি পাইয়া বালককে কোলে লইলেন। এবং ব্যাকুল আগ্রহ ও আবেশভরে কতই চুম্বন করিলেন। মার প্রাণের ব্যাকুলতা কে বর্ণনা করিবে! বিশেষতঃ সুরেশচন্দ্রের ন্যায় শান্তশিষ্ট শিশুর জননীর সদাই ভাবনা, খেলার ছলে বালক কখন কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসে!



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিড়াল বিরোধ।

দুই বৎসর বয়সে সুরেশচন্দ্র আর একবার যে বিভ্রাট বাধা-ইয়া বসিয়া ছিলেন, আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিব। এই বিভ্রাট বিড়ালের সহিত বিরোধে ঘটিয়াছিল। পল্লীগ্রামের বিড়ালগুলি নাগরিক বিড়ালের ন্যায় নিতান্ত শান্তশিষ্ট নহে। স্থল বিশেষে তাহাদের বন্যপ্রকৃতির অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত সহরের বিড়ালগুলির একমাত্র শিকার ইন্দুর; আবার সহরের ইন্দুর এত বড় থাকে যে সময়ে সময়ে সেই শিকারের আশাও ছাড়িতে হয়। সুতরাং সহরের বিড়ালগুলি শিকারের অভাবে ক্রমশঃ আপনাদের হিংস্র স্বভাব কতকটা ভুলিয়া যায়। কিন্তু পল্লীগ্রামের মুক্ত পথে বিবিধ পক্ষী, শশক, কাঠ বিড়াল প্রভৃতি অগণ্য শিকারে থাকাতে তাহাদের শিকার বৃত্তির রীতিমত পরিচালনা হইয়া থাকে। কেন যে, বিড়ালদিগকে "বাঘের মাসী" বলে, ইহাদিগের শীকার প্রণালী দেখিলে অনেক সময়ে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

একবার আমরা পল্লীগ্রামে একটী কুকুর ও বিড়ালের "দ্বৈরথ যুদ্ধ" দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। ক্ষুদ্রকায় বিড়ালের সেই

তর্জ্জন গর্জ্জন ও অপূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকৃতই সুকৌশলসম্পন্ন কুকুরটী প্রথমে যেন কৌতুকচ্ছলে একটী বিড়ালকে আক্রমণ করিল। কিন্তু যখন চীৎকার ও গর্জ্জন করিতে করিতে পূর্ণ বিক্রমে সেই ক্ষুদ্রকায় তীক্ষ্ণ-নখর-দশন বিড়ালের উপর আপতিত হইল, তখন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার লেজ গুটাইয়া হটিতে হইল। কিয়ৎপরে আবার পূর্ণবলে যেমন আক্রমণ, অমনি বিড়ালের নখরাঘাতে পশ্চাদ্‌বর্ত্তন। আমরা কৌতূহলী হইয়া সেই বিষম বিরোধ দেখিতে ছিলাম; কেহ কেহ বিবাদ নিষ্পত্তির জন্ম উভয়কেই নিবৃত্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন; কিন্তু আমরা কৌতূহলী হইয়া তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলাম, এই উদ্যোগ হইতে বিরত হউন, যুদ্ধকাণ্ডটাই দেখা যাক্। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল সেই সমবেত দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে সেই তর্জ্জন গর্জ্জন লম্ফন কুণ্ডলন চলিতে লাগিল। অবশেষে কুকুরের মুখ ও গ্রীবাদেশ ক্ষত বিক্ষত হইলে সে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। বিড়ালটী তখন পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর পশ্চাদনুসরণ করিল না বটে, কিন্তু বিজয় লাভে লাঙ্গুল ফুলাইয়া বিজয়নাদ করিতে করিতে অপূর্ব্ব গৌরবভরে আপন বিজয়ানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

যাহা হউক, একদিন একটি প্রকাণ্ড বিড়াল একটী বিল্ব-বৃক্ষে উঠিয়া একটি কাঠবিড়াল শিকার করিয়া ভূমিতলে আনয়ন করে। কাঠবিড়ালীর ক্ষীণপ্রাণ তখনও শেষ হয় নাই বটে, কিন্তু তখন গ্রীবাদেশে রক্তধারা,জীবনমাত্র অবশিষ্ট আছে। বিড়ালটী লাঙ্গুল কুণ্ডলিত করিয়া উহার বক্ষে বসিয়া আছে এবং উহার সামান্ত শরীর সঞ্চালনাদি দেখিলেই তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে তাহার পরিশেষ করিতেছে। বিড়ালটা যখন এইরূপে

আপনার মধ্যাহ্ন-আহার সংগ্রহ করিয়া ক্ষীণপ্রাণ দুর্ব্বল কাঠ-বিড়ালের উপর বসিয়া আপনার দারুণ হিংস্র ও বন্ত প্রকৃতির পূর্ণ পরিচয় দিতেছিল, দুই বৎসরের অবোধ শিশু সুরেশচন্দ্রের তখন ঘটনাক্রমে সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। অশান্ত বালক কাঠ-বিড়ালী লইবার জন্ত অগ্রসর হইল। বালক জানে না, বিজয়ী বীর আপনার বিজয়াধিকার বিনা বাধায় পরিত্যাগ করিবে না। বালক যেমন সেই রক্তাক্ত কলেবর কাঠবিড়াল লইতে হস্ত প্রসারণ করিল, বিড়ালটী অমনই তাহাকেই আক্রমণ করিল। এই বিড়ালটীর সহিত সুরেশের বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। সুরেশ-চন্দ্র আপনার আহারের কিয়দংশ প্রত্যহই বিড়ালটীকে উপ-হার দিত।

কিন্তু বিড়ালের আবার কৃতজ্ঞতা। সে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সুরেশকে আক্রমণ করিল। সুকুমার শিশু, দূঃ—দূঃ বলিয়া বিডালটাকে তাড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বালকের কথায় বিড়াল কর্ণপাত করিল না। বালকের চিরাভ্যস্ত দূঃ—দূঃ উপেক্ষা করিয়া সেই কোমল করপল্লব দুইখানি ক্ষত বিক্ষত করিল, বালকও সেই রক্তাক্ত হস্তেই সাধ্যমত বাধা দিতে ছিল। কিন্তু সাধারণ বালকের ন্তায় চীৎকার বা ক্রন্দন না করিয়া সুরেশচন্দ্র আপনার সঙ্কল্প ও কর্ত্তব্য সাধনে বিরত হয় নাই। সেই দারুণ নখর প্রহার অজ্ঞ বালকে সহ্য করিতে পারিত না। সুরেশচন্দ্রের জীবন যেরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে আরও কিয়ৎক্ষণ সেইরূপ আঘাত প্রতিঘাত চলিলে যে কি ঘটিত, স্মরণ করিলেও আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে একজন সেই সময়ে ঘটনাস্থলে

উপস্থিত হইয়া বালকের জীবন রক্ষা করে। যে সুরেশচন্দ্রের শৌর্য্যবীর্য্যে আজ ভীরু কাপুরুষ বঙ্গবাসীর নাম স্বদেশে বিদেশে সম্মানিত, ভীষণ ধূমাচ্ছন্ন বজ্রনাদী কামানের ক্রীড়া-স্থলে যিনি বিপুল বিক্রমে বিহার করিতেছেন, ঘটনাবশে একটী সামান্য বিড়ালের নখরাঘাতে তাঁহার জীবন অকালে ফুরাইতে বসিয়াছিল। সুরেশচন্দ্র সেই দারুণ প্রহারে কয়েক মাস শয্যা-গত ছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার জীবনাশাও ছিল না, কিন্তু জননী ও জন্মভূমির সৌভাগ্যক্রমে বহুকষ্টে তিনি সুস্থ হইয়া ছিলেন।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বালকের প্রকৃতি।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুরেশচন্দ্রের শৈশবপ্রকৃতি পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট হইতে লাগিল। নিতান্ত শিশুকালের সেই অস্থিরতা ও নির্ভীকতা এখন সমধিক বিকশিত হইয়াছে। ইতিহাস পাঠকদিগের অবিদিত নাই, সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব স্থাপয়িতা শিবাজী, দাদাজীর মুখের দিকে সতৃষ্ণনয়নে অতুল আগ্রহভরে কি রূপে ভারতকথা শুনিতেন, এবং সেই অতুল বীরকাহিনী কি রূপে বালকের ভবিষ্য জীবন গঠিত করিয়াছিল। আমাদের সুরেশচন্দ্রও সেইরূপ বিবিধ বীরবিক্রম, দুর্গাধিকার, দেশবিজয় বা রণরঙ্গকাহিনী শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। বালক পুস্তক স্পর্শ করিবে না, শ্লেট ধরিবে না, কিন্তু মহাভারত বা রামায়ণের বীরত্ব ইতিহাস পরমাগ্রহে শ্রবণ করিবে। শুধু শ্রবণ নহে, অর্জ্জুনের অপূর্ব্ব বীরকীর্ত্তি, ভীষ্মের ভীষণ প্রতিজ্ঞা, রামচন্দ্রের দুর্জ্জয়শক্র রাবণসংহার প্রভৃতি বালকের মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা থাকিত। শত্রু সাগরের মধ্যে বিবিধ প্রতিকূল ঘটনায় যখন তাঁহাদের বীরত্ব কাহিনী শ্রবণ বা স্মরণ করিত, বালকের হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিত; চক্ষুতে অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশিত হইত। কেবল পৌরাণিকী বীরকাহিনী যে,সুরেশচন্দ্রের প্রীতি-

বিধান করিত তাহা নহে, কি স্বদেশের, কি বিদেশের প্রাচীন বা বর্ত্তমানকালের যে কোন বীরকীর্ত্তি শুনিতে তাঁহার অসীম আগ্রহ, অপার তৃপ্তি। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়, লিওনিডাসের স্বদেশ রক্ষা, সিজার ও হানিবলের বীরবিক্রম, আলফ্রেড ও হেরাল্ড, ব্রুস ও ওয়ালেস, নেপোলিয়ন অথবা ওয়াসিংটনের শৌর্য্যবীর্য্য শ্রবণে বালকের হৃদয় নাচিয়া উঠিত।

ইংরাজী শিক্ষা তখন ভারতে এতদূর প্রসারিত হয় নাই। এখন যেমন জেলায় জেলায় বহুসংখ্যক কলেজ স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, তখন তাহা ছিল না। সমগ্র বঙ্গে তিনটী মাত্র উচ্চ-শিক্ষার স্থান ছিল; হুগলী কলেজ, হিন্দুকলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজ। সুতরাং এই সকল কলেজে নানা স্থান হইতে ছাত্রবৃন্দ আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত। বালক সুরেশচন্দ্র এই সকল কলে-জের ছাত্রদিগের সহবাস বড় ভালবাসিতেন। তাহারা কলেজে কি শিক্ষা পাইল, সুরেশচন্দ্রের তাহা শুনিতে বা শিখিতে অভি-লাষ নহে। সুরেশচন্দ্র তাহাদের অবসরমত অসীম আগ্রহতায় শুনিতে চায়, বীরকাহিনী। কি রূপে কোন্ দেশে কোন্ বীর-পুরুষ অপূর্ব্ব বীরত্বে আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখি য়াছেন।

শিবাজীর ন্যায় সুরেশচন্দ্রেরও বালকের দল ছিল। তবে ইহাদের কার্য্য বাগানের ফলমূল লুণ্ঠন, পক্ষীশাবক সংগ্রহ এবং ইচ্ছামতী তীরে 'বাঙালীর মৃগয়া' 'মাছধরা'। সহচর অনুচর-দিগের মধ্যে সুরেশচন্দ্রের অসীম প্রভাব; তাঁহার তর্জ্জনী তাড়নে সকলে ভটস্থ। এইরূপে বাল্যকালেও তিনি আপন সম্প্রদায়ের নেতা বা অধিনায়ক ছিলেন।

বালকসুলভ ছুটাছুটি বা বিবিধ উপদ্রবে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে সুরেশচন্দ্র বিজ্ঞের ন্যায় সতরঞ্চ লইয়া বসিতেন। হয়ত খেলিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই ; কিন্তু আপনিই উভয় পক্ষের সতরঞ্চ বাহিনী সাজাইয়া স্বেচ্ছামত একটী জয় পরাজয়ের ব্যবস্থা করিয়া লইতেন। এইরূপে বাল্যের প্রতি সামান্য ঘটনাতেও তাঁহার ভবিষ্য জীবনের অনুকূল ছায়াপাত দেখিতে পাওয়া যায়।

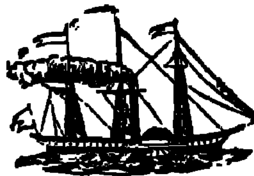
ছয় সাত বৎসরের বালক সতরঞ্চ খেলার যে বিশেষ কিছু বুঝিত তাহা নহে, তথাপি ঐতিহাসিক বা জীবনচরিত লেখকগণ এই সকল সামান্য ঘটনার মূলে যাহাই দেখুন না কেন, জনসাধারণ বুঝিত, সুরেশচন্দ্রের ন্যায় অশান্ত, অশিষ্ট, দুর্ব্বিনীত, দুষ্ট বালক বুঝি আর নাই। কিন্তু সুরেশচন্দ্রের মাতা এক দিনের জন্যও মনে করেন নাই, আমার সুরেশ প্রকৃত দুষ্ট বা অশিষ্ট। পুত্রের বিপদাশঙ্কায় তিনি সর্ব্বদাই সশঙ্ক ছিলেন বটে, কিন্তু একবারের জন্যও সুরেশকে নিতান্ত দুষ্ট স্বভাবের বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি যে অন্তর্যামিনী।

সতরঞ্চ খেলা সম্বন্ধে আমাদিগের দেশে একটী কৌতূহলজনক কিম্বদন্তী আছে। লঙ্কাধিপতি রাবণ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, দেবলোক তাঁহার দুর্ব্বার বিক্রমে সন্ত্রস্ত। স্বয়ং চণ্ডীদেবী রক্ষপুরীর রক্ষয়িত্রী। এইরূপে দৈববলে বলী ও প্রচণ্ড পরাক্রম বিনা যুদ্ধে তাঁহার চিত্তের অবসাদ ঘটে ; হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতেন না। পতিব্রতা বুদ্ধিমতী মন্দোদরী স্বামীর অন্তরের গতি বুঝিয়া স্থির করিলেন, এমন একটী উপায় করিতে হইবে, যাহাতে স্বামীর সমরপিপাসা কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি হয়। সেই চেষ্টার ফলেই সতরঞ্চ ক্রীড়া। এই চতুরঙ্গসেনাসমন্বিত সতরঞ্চ ক্রীড়ায় চিত্তবিনোদন

৫

আছে, কিন্তু অগণ্য পতি পুত্র হীনা রমণীর হৃদয়ভেদী রোদন রোল নাই। রক্তরমণীর এই পরম হিতকর অনুষ্ঠান এক্ষণে কর্ম্মহীন বঙ্গবাসীর কর্ম্মসাধনা দাঁড়াইয়াছে।

সে যাহা হউক অল্প দিবসে গিরিশ বাবু কলিকাতায় একখানি বাড়ী ক্রয় করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসেন। সুরেশচন্দ্রকে কলিকাতার বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিন্তু মস্তিষ্ক পরিচালনা অপেক্ষা শরীর পরিচালনার দিকেই সুরেশ চন্দ্রের আন্তরিক অনুরাগ; কলিকাতায় অবস্থানকালে নানা লোকের নিকট বিবিধ বীরকাহিনী শুনিবারও বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছিল। অন্তরের অন্তরতম কক্ষে সেই সকল বীরবিক্রম অঙ্কিত হইতে লাগিল। তখন ক্রীড়াস্থলে আপন সঙ্গী সেনা লইয়া সুরেশচন্দ্র মধ্যে মধ্যে সমরাভিনয় করিতে লাগিলেন। বালকেরা দল বাঁধিয়া বাহির হইয়া দুইদলে বিভক্ত হইত। বৃক্ষ বা কোন মৃত্তিকাস্তূপ তাহাদের দুর্গ হইত এবং সেই দুর্গাধিকার উপলক্ষে উভয় দলে সমরাভিনয় হইত। যেরূপ নেপোলিয়ন গোলার পরিবর্ত্তে বরফখণ্ড লইয়া বাল্যখেলা খেলিতেন, আমাদের সুরেশচন্দ্রও তদ্রূপ এখানকার অনায়াস লব্ধ মৃত্তিকার গোলায় সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতেন।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সর্প ও সুরেশ।

এইবার আমরা যে ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, সহস্রের মধ্যে একজনও একরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারে কি না সন্দেহ! বিশেষতঃ সেই একাদশ বৎসর মাত্র বয়সে তাহার সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের উদাহরণ নিতান্ত বিরল।

সুরেশ কলিকাতা হইতে স্বদেশে ফিরিয়াছেন। স্বদেশের মুক্ত বায়ুতে বিমুক্ত হৃদয়ে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাইতেছেন। নগরের নির্জ্জীবতা বা বিলাসিতা বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। তিনি সেই বাল্যের সদা চঞ্চল, অসমসাহসী অকুতোভয় নাথপুরের সুরেশচন্দ্রই আছেন। একদিন পক্ষীর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া একটা আম্রবৃক্ষের উপর কতকগুলি পক্ষীর বাসায় সুরেশচন্দ্রের দৃষ্টি পড়িল। আর বিলম্ব কেন? সুরেশচন্দ্র বৃক্ষে উঠিলেন। বৃক্ষে উঠিবেন, তাহাতে আবার সাবধানতা বা ভয় কি? একমাত্রপতনের আশঙ্কা,—সুরেশচন্দ্রের হৃদয়ে তাহার স্থান নাই। এখন ত ১১ বৎসর বয়স হইয়াছে।

সুরেশচন্দ্র পক্ষী নীড়ের নিকট হস্ত প্রসারণ করিবেন, এমন সময়ে অদূরে কিঞ্চিৎ নিম্নে একটা বিকট শব্দ শুনিতে পাইলেন।

শব্দানুসারে যাহা দেখিলেন, তাহাতে বালক কেন, যুবকের হৃদয়ও কম্পিত ও ভীত হইয়া পড়ে। সুরেশচন্দ্র দেখিলেন, একটী প্রকাণ্ড সর্প বৃক্ষ কোটর হইতে বাহির হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সর্প এক একবার ফুলিতেছে, আর স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে। তাহার চক্ষু দুইটী যেন জ্বলিতেছে। সুরেশচন্দ্র দেখিলেন, নামিবার উপায় নাই, নামিতে হইলে তাহার মুখ অতিক্রম না করিয়া অবতরণ করিবার উপায় নাই। অন্য কেহ হইলে সেই অভাবনীয় বিষম বিপদ্‌পাতে বিহ্বল বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। সুরেশচন্দ্র সে উপকরণে গঠিত নহেন। ক্ষণেকের মধ্যে তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। সে স্থান হইতে লম্ফ প্রদান করিলে জীবন সমধিক বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহাও বুঝিতে বাকি রহিল না। সুরেশচন্দ্র অবিলম্বে শাখান্তরে সর্প হইতে একটু দূরে সরিয়া গেলেন। কিন্তু নামিবার উপায় নাই। এদিকে সর্পটী দেখিল, শিকার সরিয়া যায়। গর্জ্জন করিতে করিতে তীরবেগে সুরেশচন্দ্রের উপর আক্রমণ করিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই লক্ষ্য ব্যর্থ হইল; নিকটবর্ত্তী একটি প্রশাখায় তাহার প্রতিরোধ ঘটিল। নিমেষের মধ্যে সুরেশচন্দ্র বুঝিলেন, জীবন রক্ষার অন্য উপায় নাই; ভয়বিহ্বল হইয়া প্রাণ হারাইলে কি হইবে! নিমেষের মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া প্রথম লক্ষ্য হইতে ফণা তুলিবার পূর্ব্বেই, একাদশ বৎসরের বালক বামহস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে উহার ফণা ধরিল। বিপদ বুঝিয়া বল বুদ্ধিও যেন পরিবর্দ্ধিত হইল। সর্প তখন ফুলিতেঃফুলিতে বজ্র-পাশে বালকের হস্ত বেষ্টন করিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র তাহাতে

ভীত বা কাতর নহেন। বিশেষতঃ সৌভাগ্যক্রমে সঙ্গে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরি ছিল। নিমেষ মধ্যে দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা ধরিয়া দন্ত দ্বারা উহা খুলিয়া ফেলিলেন। নিমেষ মধ্যে সেই ছুরিকা আপনার দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টির নিম্নে সর্পের গ্রীবাদেশে বসাইয়া দিলেন; নিমেষ মধ্যে উহা বিখণ্ডিত করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে অসীম সাহসে অতুল্য কার্য্যতৎপরতায় একাদশ বৎসরের বালক আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিল।

শত্রু নিপাত হইল। সুরেশচন্দ্র এইবার আপনার অভীষ্ট সাধনে অগ্রসর। এইরূপে আত্মরক্ষা করা অন্যের অসাধ্য এবং অন্য কেহ হইলে আর কালবিলম্ব না করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিত, কিন্তু সুরেশচন্দ্রের তখন ভয়ের কারণ গিয়াছে, সুতরাং সঙ্কল্প সাধন কেনই বা অবশিষ্ট থাকে; তখন তিনি পক্ষীশাবক ধরিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুইটী সুন্দর পক্ষীশাবক সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সেই আপনার অপূর্ব্ব বিজয় নিশান, রক্তাক্তদেহ কর্ত্তিত মুণ্ড সেই সর্পটীকেও সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সুরেশচন্দ্রের পিতা মাতা ও আত্মীয় মণ্ডলী সেই বিজয়লব্ধ অপূর্ব্ব ধন সম্পত্তি দেখিয়া প্রথমে শিহরিয়া উঠিলেন, পরে আদ্যোপান্ত সমুদয় শুনিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। পিতা মাতার প্রাণে তখন যেরূপ হর্ষ বিষাদ ও বিস্ময়ের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহার বর্ণনা নির্জ্জীব লেখনী মুখের সাধ্যাতীত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আর এক বিপদ

বঙ্গে অস্ত্র আইনের কল্যাণে ভারতবাসী বা ভারতগবর্ণমেণ্টের যতদূর উপকার হউক আর নাই হউক, ইংরাজ রাজ্যে শৃগাল কুক্কুরাদির কিছু প্রতাপ প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। এক একটী ক্ষিপ্ত শৃগাল বা কুকুর অন্ততঃ ১০।১২টী প্রাণী সংহার না করিয়া মারা পড়ে না। এবং তাহার বিক্রমে কিয়ৎকাল গ্রামের লোক সদাই সশঙ্ক থাকে। এইরূপ বিপদ্‌পাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনাও লজ্জার বিষয় এবং সাহায্য প্রার্থনায় হয়ত অনেকে সাহসী হয় না এবং সাহায্য প্রার্থনা করিলেও স্থান বিশেষে প্রার্থনা পূরণের পূর্ব্বেই কতকগুলি প্রাণীকে অকালে শৃগাল কুকুরের মুখে জীবন হারাইতে হয়।

সুরেশচন্দ্র নাথপুরের বাটী গিয়াছেন। গ্রামে ক্ষিপ্ত কুক্কুর ভয়ে লোকে সদাই শঙ্কিত, কখন কাহার ভাগ্যে কি দুর্ঘটনা ঘটে। তখন পাস্তুর প্রণালী প্রচলিত হয় নাই এবং দরিদ্র নাথপুরবাসিগণের এরূপ অবস্থাও ছিল না যে, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্য প্যারিস পর্য্যন্ত যাইয়া পাস্তুরের প্রস্তুত ঔষধাদি সেবন করে। সুতরাং ভগবানের নাম করিয়া সামান্য দেশীয় প্রলেপা-

দির উপরই নির্ভর করিতে হইত। সে যাহা হউক, শৃগাল কুকুরের ভয়ে বাটি আসিয়া গৃহকোণে বসিয়া থাকা সুরেশ চন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু বিষমভয়ে সঙ্গীসঙ্গচরগণও সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিত না।" সুরেশচন্দ্রকে একাকী সন্ধ্যা সমীরণ সেবন করিতে যাইতে হইত। গ্রামের প্রান্তভাগের একটা পথ ধরিয়া চলিতেছেন, এমন সময়ে একটী ক্ষিপ্ত কুকুর তাঁহার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে দেখিলেন। তিনি একাকী, হস্তে যষ্টি পর্য্যন্ত নাই, নিকটে লোকালয় নাই; এমন কি বৃক্ষ পর্য্যন্ত নাই। সুরেশচন্দ্র অগত্যা সেই পথ ধরিয়া ধূলি উড়াইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। কুকুরও দ্রুতবেগে তাঁহার অনুসরণ করিল। মধ্যে মধ্যে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, কুকুরটী জিহ্বা বাহির করিয়া লক্ লক্ করিতে করিতে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। তিনিও ছুটেন, কুকুরও ক্রমশঃ তাহার অনুসরণে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। ছুটিতে ছুটিতে বালক ক্লান্ত হইয়া পড়িল; আর দৌড়াইতে পারে না। এইবার কুকুরের মুখে পড়িতে হইল; আর অব্যাহতি নাই। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি সুরেশচন্দ্র সেই দারুণ বিপদ্‌কালেও ভয়বিহ্বল না হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। সুরেশচন্দ্র আর দৌড়াইতে পারিলেন না, কুকুরটী আসিয়া পড়িল, আর দুই চারিপদ মাত্র অগ্রসর হইয়া আসিলেই তীক্ষ্ণ দশন নখরে বালকের সুকুমার শরীর ক্ষত বিক্ষত করে। সুরেশচন্দ্র কলিকাতা অবস্থান কালে "জোড়া পায়ে লাথি" অভ্যাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কিছুদিন কলিকাতায় উহার বড়ই প্রচলন হয়। সুরেশচন্দ্র সহসা দাঁড়াইলেন এবং কাল বিলম্ব না করিয়া পূর্ণ শক্তিতে কুকুরটীকে জুতাশুদ্ধ "জোড়া

পায়ের লাথি” মারিলেন। বিষম বেগে আসিতে আসিতে আক-স্মিক প্রহারে কুকুরটী পথিপার্শ্বস্থ নালায় গড়াইয়া পড়িল। সুরেশচন্দ্র ইত্যবসরে একখানি ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া কুকুরটী উঠিতে না উঠিতে উহার মস্তকে প্রহার করিলেন। সেই অব্যর্থ সন্ধানেই কুকুরটীকে আর মাথা তুলিতে হইল না, পথি পার্শ্বস্থ সেই নালায় গড়াইতে গড়াইতে সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে একাদশবর্ষীয় বালকের দ্বারা নাথপুর গ্রামের সাময়িক শঙ্কা বিদূরিত হইল। সেই সঙ্কটকালে একাদশবর্ষ মাত্র বয়সে যিনি নাথপুরের একটী বিষম আশঙ্কা বিদূরিত করেন, পরিণত বয়সে তাহার দ্বারা যে নাথপুরের গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।



নবম পরিচ্ছেদ।

শিকার ও সুরেশ।

শিকারের ন্যায় প্রিয় বিষয় ইংরাজের নিকট আর কিছুই নাই। শিকারে ইংরাজ জাতি সময় সময় প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। ইংরাজদের দেশে যেরূপ শিকার প্রচলিত, ভারতবর্ষে তাহা নাই, কারণ ভারতের সহিত ইংলণ্ডের অনেক পার্থক্য। ইংলণ্ডে যখনই শিকারের আয়োজন হয় তখনই বহুতর কুকুরকে সেই দলের একটী প্রধান অঙ্গরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। শিকারীগণও সকলে তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করিয়া বিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হয়েন। কেবল পক্ষী শিকারের সময় তাঁহারা অশ্ব বা কুকুর ব্যবহার না করিয়া সকলে কেবলমাত্র এক একটী বন্দুক সঙ্গে করিয়া শিকারে রওনা হয়েন। ভারতবর্ষে ইংরাজগণ শিকারে বহির্গত হইলে সাধারণতঃ হস্তিপৃষ্ঠে গভীর জঙ্গলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। সঙ্গে অসংখ্য লোক যায়, ইহারা জঙ্গলের একদিকে থাকিয়া বন্যজন্তুদিগকে তাড়াইতে থাকে, সাহেবেরা হস্তিপৃষ্ঠে এক একস্থানে দণ্ডায়মান রহেন। বন্যজন্তুগণ তাড়া পাইয়া সেইদিকে ছুটিয়া আসিলে গুলি করিতে থাকেন। ইংলণ্ডে হিংস্রজন্তু একণে একেবারে

নাই; ভারতবর্ষের জঙ্গল সকল বরাহ, বন্যমহিষ, নেকড়েবাঘ, ভল্লুক, ব্যাঘ্র, হস্তিতে পূর্ণ। এ দেশে যেখানে বন্যপশু একেবারে নাই, কেবল সেইখানেই ইংরাজগণ পদব্রজে শিকারে যাইয়া থাকেন। তবে দেশীয় শিকারীগণ হস্তী প্রভৃতি কোথায় পাইবে, তাহারা তীর ধনুক বা বন্দুক লইয়া অবাধে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া থাকে; তাহাদের প্রাণে বন্যজন্তুর ভয় একবারেই নাই। জঙ্গলই তাহাদের ঘর বাড়ী, জঙ্গলের পশুই তাহাদের জীবিকা। জলে স্থলে, রাত্র দিন, সর্ব্বদা তাহারা নানা প্রকার বিপদে বেষ্টিত, কিন্তু তাহারা এ সকলের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃষ্টিপাত করে না। বন্যপশুচর্ম্ম, বনজাত নানা দ্রব্য, তাহারা গভীর বনে সংগ্রহ করিয়া নিকটস্থ সহরে আনিয়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সময় সময় কেহ কেহ বাঙ্গালিজাতিকে যে কাপুরুষ আখ্যা দিয়া থাকেন, সত্যই এই সকল লোককে কখনই সে আখ্যায় আখ্যায়িত করা যাইতে পারে না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে নদীয়া জেলার স্থানে স্থানে নীলকুঠি থাকায় অনেক ইংরেজ এই জেলায় বাস করিতেন। ইঁহারা প্রায়ই অশ্বপৃষ্ঠে বিস্তৃত ময়দানে ও কৃষক-দিগের শস্যশূন্য ক্ষেত্রে বরাহ, শৃগাল প্রভৃতি শিকার করিবার জন্য স্বদেশের ন্যায় বহু সংখ্যক কুক্কুর সমভিব্যাহারে শিকারে আসিতেন। ইঁহাদের সকলের হস্তেই এক একটী বড় বড় বর্শা রহিত, বরাহ বা শৃগাল ইহাদের কুক্কুর কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া দীর্ঘ ঘাস বা ক্ষুদ্র ঝোপ হইতে নির্গত হইলে ইঁহারা বর্শা হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকিতেন। সুবিধা পাইলেই কেহ না কেহ বর্শাদ্বারা হতভাগ্য বরাহকে বিদ্ধ করিয়া

ফেলিতেন। এরূপ শিকার এখনও ইংরাজগণ সময় সময় করিয়া থাকেন। এদেশ হইতে বহু দূ'র বিদেশে ভিন্ন জাতি-দিগের মধ্যে নির্ব্বাষিতরূপে বাস করিয়া ইহাঁরা সময় সময় এই-রূপ শিকারে কালযাপন করিয়া কতকটা নির্ব্বাষণের ক্লেশ অপনোদন করিয়া থাকেন।

যখন সুরেশ নাগপুরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক দিন তিন জন সাহেব গ্রামের নিকট শিকারার্থে অশ্বারোহণে আসিলেন। সঙ্গে অসংখ্য কুক্কুর, উহারা একটা অতি হিংস্র বৃহৎ বন্ত বরাহের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে। বরাহ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলাইতেছে; শিকারীগণ কোনমতেই তাহাকে বর্ষা বিদ্ধ করিতে পারিতেছেন না। প্রায় সন্ধ্যা হয়, শিকারীগণ হতাশ হইয়া অন্ধকার জন্ত শিকার পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনের অভিপ্রায় করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাদের দৃষ্টি নিকটস্থ বাঁশ-ঝোপেব মধ্যে ববাহের প্রতি পতিত হইল। অমনি বন্দুকের আওয়াজে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, কুকুরগণ ডাকিয়া উঠিল, চারিদিকে যেন এক ঘোর আলোড়ন উপস্থিত হইল; কিন্তু বরাহ আহত হইল না, তবে বন্দু'কের শব্দে সে ভীত হইয়া বাঁশঝোপ পরিত্যাগ করিয়া ছুটিল। সম্মুখে বিস্তৃত মাঠ, ভীত ও বিপন্ন বরাহ এক্ষণে সেই মাঠ দিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া চলিল; শিকারীগণও সঙ্গে সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিলেন, বরাহের পশ্চাতে কুকুরগণ মহা চীৎকার করিতে করিতে ধাবিত হইল।

যেদিকে বরাহ ছুটিয়াছে, সেইদিক হইতে এমত সময়ে তিনটী বালক গ্রামের দিকে আসিতেছিল, ইহাদের একটী সুরেশ। বালকগণ মাছ ধরিতে গ্রাম হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে

গিয়াছিল, এক্ষণে ছিপ স্কন্ধে গৃহে ফিরিতেছিল। হটাৎ নিকটে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বালকগণ বালসুলভ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সেইদিকে ছুটিয়া আসিল। সাহেবেরা তাহাদিগকে দেখিলেন, ক্রোধান্ধ বরাহ যে এখনই তাহাদের খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে তাহা তাঁহারা বুঝিলেন। তাঁহারা হস্ত নাড়িয়া, চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে পলাইতে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু বালকগণ তাঁহারা কি বলিতেছেন বুঝিতে পারিল না। প্রথমে বরাহের প্রতি সুরেশেরই দৃষ্টি পড়িল। তিনি তখন তাঁহাদের বিপদ বুঝিলেন, কিন্তু ভয় কখনও সুরেশের হৃদয়ে স্থান পাইত না। এক্ষণে উন্মত্ত বরাহ দেখিয়া ভয় পাওয়া দূরে থাকুক, সুরেশের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইল। তিনি যে বরাহ শিকার দেখিতে পাইবেন ইহা ভাবিয়া আনন্দে বিভোর হইলেন, তিনি পলাইবেন না, তাঁহার হৃদয়ে ভয় নাই, তবে তিনি সঙ্গীদ্বয়কে পলাইতে বলিয়া নিজে ছিপহস্তে বরাহের দিকে অগ্রসর হইলেন। দেখিতে দেখিতে মুখে গ্যাঁজলা তুলিতে তুলিতে ভীষণশব্দ করিতে করিতে বরাহ সুরেশের নিকটস্থ হইল। বরাহের পশ্চাতেই কুকুরগণ, তৎপশ্চাতেই সাহেবগণ বন্দুকহস্তে প্রস্তুত। তাঁহারা তখনও সুরেশকে পলাইতে চীৎকার করিয়া অনুরোধ করিতেছেন; পাছে গুলি সুরেশের গায় লাগে এই ভয়ে তাঁহারা বন্দুক ছুড়িতে পারিতেছেন না। অথচ বালককে রক্ষা করিবারও আর উপায় নাই, বরাহ আসিয়া সুরেশের উপর পড়িল। তাহার মুখ হইতে নির্গত গ্যাঁজলায় সুরেশের সর্ব্বাঙ্গ আপ্লুত হইল; তাহার চক্ষু হইতে বালকের প্রতি যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; সে তাহার প্রথম দন্তে বালকের দেহ খণ্ড খণ্ড করিবার জন্য মস্তক অবনত করিল;

আর এক মুহূর্ত। সেই এক মুহূর্তে কেবল একজনের নহে, শত সহস্র লোকের অদৃষ্ট-লিখনি স্থির হইয়া গেল। এই বালকের মৃত্যু বা জীবনের সহিত সহস্র লোকের জীবন সংমিশ্রিত ছিল। সুরেশও সেই সময়ে বুঝিলেন যে আর এক মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার জীবন নাট্যের শেষ মীমাংসা হইয়া যাইবে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণ টলিল না, তিনি ভীত হইলেন না, বরং হৃদয়ে একরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

পর মুহূর্ত্তে সুরেশ হস্তস্থ বংশ নির্ম্মিত ছিপ দ্বারা বরাহের মস্তকে সবলে আঘাত করিলেন, বরাহ সেই গুরুতর আঘাতে স্তম্ভিত হইয়া উল্টাইয়া পড়িল। সে পুনরায় উঠিবার পূর্ব্বেই কুকুরগণ আসিয়া তাহাকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া দংশনে দংশনে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। একদিকে কুকুরকে আক্রমণ করিতে গেলে, আর তিনদিক হইতে কুকুরগণ তাহাকে দংশন করিতে থাকে। এদিকে সুরেশও ছিপদ্বারা বৃষ্টিধারার ন্যায় ক্রমাগত বরাহকে প্রহার করিতেছেন,—বরাহ প্রকৃতই নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পলাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সে কোনমতে পলাইতে পারিতেছে না। এদিকে সাহেবেরাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে গুলি চালাইবার আর উপায় নাই,—বন্দুক ছুড়িলে কুকুরের গায় লাগে। বরাহের অঙ্গের এমন স্থান নাই যেখানে একটা না একটা কুকুর কামড়াইয়া আছে, কাজেই সাহেবগণ বন্দুকের অপর পৃষ্ঠ দিয়া বরাহকে ক্রমাগত প্রহার করিতে লাগিলেন; এইরূপ প্রহারে অনতিবিলম্বে বরাহ পঞ্চত্ব লাভ করিল।

বরাহ বধ হইলে সাহেবেরা এই বীর বালকের প্রতি দৃষ্টি-

পাত করিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ বালক এপর্য্যন্ত দেখেন নাই;—তাঁহারা বালকের সাহসে ও প্রত্যুৎপন্নমতিতে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন,—তাঁহারা সুরেশকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় তাঁহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। রাত্রি হইয়া গিয়াছে, সুরেশের সঙ্গীগণ পলাইয়াছে, তাহাদের সঙ্গীর কি হইল তাহা তাহারা দেখে নাই, —সুরেশ যেমন তাহাদিগকে পলাইতে বলিয়াছিলেন, তাহারা তেমনই পলাইয়াছিল, এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করে নাই। রাত্রি হইয়াছে, চারিদিক অন্ধকারে ঘেরিয়াছে, পাড়াগাঁয়ের মাঠ,—রাস্তা নাই,—এরূপ অবস্থায় গ্রাম পর্য্যন্ত পৌঁছান সহজ নহে। সাহেবেরা সুরেশকে তাঁহাদের সঙ্গে কুঠিতে যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

সুরেশ নাম ধাম বলিলে, একজন সাহেব তাহা নিজ নোট-বুকে লিখিয়া লইলেন। নিজেরা সাহসী,—ইংরাজজাতির ন্যায় সাহসের আদর করিতে আর কেহ পারে না। যাহাতে বীরত্ব, যাহাতে তেজ, যাহাতে সৎসাহস,—ইংরাজগণ তাহাকেই প্রাণের সহিত ভালবাসেন, মান্যভক্তি করেন,—স্বভাবতই তাঁহাদের প্রাণ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা নীচতা, হীনতা, দুর্ব্বলতা, তোষামোদকারিতা প্রভৃতিকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করেন; ভারতবাসীকে যে তাঁহারা ঘৃণা করেন, তাহার কারণ ভারতবাসী হীন, নীচ, দুর্ব্বল তোষামোদকারী।

যেখানে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সেখান হইতে নাথপুর প্রায় একক্রোশ। অন্ধকার হইয়াছে, সুরেশ শিকারীগণকে পরিত্যাগ করিয়া যতশীঘ্র হয় গ্রামাভিমুখে গমনের চেষ্টা করি-

লেন,—কিন্তু সাহেবেরা কিছুতেই ছাড়েন না। একজন বলিলেন, "তুমি আমাদের সঙ্গে কুঠিতে চল। আজ রাত্রে সেখানে থাকিয়া কাল সকালে বাড়ী আসিও।"

সুরেশ উত্তর করিলেন, "আমার মা ও খুড়ো মশায় কি ভাবিবেন? আমি রাত্রে বাড়ী না ফিরিলে তাঁহারা পাগল হইবেন।"

সাহেব। সে জন্য কোন চিন্তা নাই। তাঁহারা যাহাতে খবর পান, তাহা আমরা করিব। তোমার আত্মীয়েরা যাহাতে ভাবিত না হন সে বিষয়ে আমরা দৃষ্টি রাখিব।

সুরেশ। আমার ক্ষুধা পাইয়াছে। আপনাদের বাড়ী খেলে আমার জাত যাবে।

সাহেবেরা হাসিয়া উঠিলেন,—বলিলেন, "বালক, তোমার জাতের এত ভাবনা? জাতের বিষয় তুমি কি জান?"

সুরেশ উত্তর করিলেন, "বোধ হয় জাতের বিষয় বেশী কিছু আমি বুঝি না, তবে সাহেবের বাড়ী খেলে যে জাত যায়, তাহা আমি জানি।"

সাহেব। তুমি এই নাথপুরেই সব সময় বাস কর?

সুরেশ। না, আমি সচরাচর কলিকাতায় বাস করি, আমি ভবানীপুরের লণ্ডন মিশন কলেজে পড়ি।

সাহেব। ওঃ, তবেত তুমি অর্দ্ধেক খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টানদের সঙ্গে যাহারা মিশে, তাহারা খ্রীষ্টান না হলেও পিরিলি হয়।

সুরেশ। আমি তা স্বীকার করি না। আমি খ্রীষ্টানের ছোঁয়া জল খাই না, এমন কি পানও খাই না।

সাহেব। তুমি তাহাদের সঙ্গে এক সঙ্গে উঠাবসা কর, তুমি

তাদের ছুঁয়ে থাক, তার পর না স্নান করেই জল খাও। স্কুলে তুমি কখন ত স্নান কর্ত্তে পার না।"

এ কথার জবাব সুরেশ করিতে পারিলেন না,—তিনি সাহেবদের সঙ্গে যাইতে স্বীকার করিলেন। ঠিক এমন সময়ে সেই দিকে অনেক আলো আসিতেছে দেখা গেল। সুরেশের সঙ্গীদিগের নিকট তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ আলো লইয়া সুরেশকে খুঁজিতে সেই দিকে আসিতেছিলেন। অপরদিক হইতে সাহেবদিগের চাকর ও লোকজনেরাও আলো লইয়া সাহেবদিগকে খুঁজিতে আসিতেছিল, কাজেই সুরেশের কুঠিতে যাওয়া হইল না, তবে তিনি পরদিনই যাইবেন স্বীকার করায় সাহেবেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া কুঠি চলিয়া গেলেন।



দশম পরিচ্ছেদ

মেমসাহেব ও পদ্ম।

বরাহ শিকার ঘটনা সুরেশের জীবনের একটী শুভ ব্যাপার; কারণ সেই দিন হইতে সুরেশ নাথপুরের নিকটস্থ ইংরাজ-সমাজে প্রবিষ্ট হইতে সক্ষম হইলেন। সে সময়ের ইংরেজগণ যে দেশীয়দিগের সহিত মেশামিশি করিতে ইচ্ছা করিতেন না, এ রূপ নহে, বরং দেশীয়গণই ইংরাজদিগের সহিত মেশামিশি করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হইতেন। তখন হিন্দুয়ানীর প্রতাপ এখন হইতে অনেক গুণ অধিক ছিল, সুতরাং ম্লেচ্ছ সাহেব-দিগের প্রতি লোকের কেমন একটা হৃদয়ের বিতৃষ্ণা ছিল। তখনকার নীলকুঠিয়াল সাহেবগণ তাঁহাদের নিজের কাজ ও ব্যবসার জন্ম দেশীয়দিগের সহিত মিশিয়া দেশীয়দিগের সামাজিক আচার ব্যবহার সকল সর্ব্বদাই বিশিষ্টরূপে বিদিত হইতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা কখনও দেশীয়গণের সহিত মেশামিশি করিতে পারিতেন না। উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বিরাজ করিত।

বরাহ শিকার দিবস হইতে সুরেশ প্রায় মধ্যে মধ্যে নাথ-পুরের নিকটস্থ নীলকুঠিতে গমনাগমন করিতেন। সাহেব

মেমগণ সকলেই তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন; কুঠির দেশীয় কর্ম্মচারিগণেরও তিনি বড় প্রিয় হইলেন। সকলেই তাঁহাকে বিশেষ যত্ন আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সরলভাব, তাঁহার নির্ভয়তা, নীচ ও হীন বিষয়মাত্রেই তাঁহার ঘৃণা,—পরোপকারে সর্ব্বদাই তাঁহার তৎপরতা, এই সকল গুণে সুরেশ দেখিতে দেখিতে নীলকুঠির সকলেরই একান্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন। তিনি এক দিন কুটিতে না আসিলে সাহেব মেমগণ সকলেই কেবল যে দুঃখিত হইতেন এমন নহে, সকলেই তাঁহার জন্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইতেন।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময়ে নীলকুঠির সাহেবেরা প্রায়ই মেম লইয়া বাস করিতেন না। মেমেরা দূর ইংলণ্ডে স্বামী বিহনে বিরহে দুঃখে কালাতিপাত করিতেন; সাহেবগণ সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বঙ্গদেশের গ্রামে দেশীয় কৃষক বেষ্টিত হইয়া নীলের চাষ করিতেন; সে সময়ে বিলাত হইতে মেম আনিবার সুবিধা ছিল না। আনিলেও রাখিবার সুবিধা হইত না। এই জন্ত আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে এ দেশে নীলকুঠিতে মেম প্রায় দেখিতে পাওয়া যাইত না।

তবে নাথপুর কুঠির সাহেবের মেম এ দেশে ছিলেন, তিনি বালক সুরেশকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতে লাগিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে সুরেশকে তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে ভালবাসিলেন; কারণ তাঁহার নিজের পুত্রও ঠিক সুরেশের এক বয়সী ছিলেন। তাঁহার সে পুত্রকে তিনি নিকটে রাখিতে পারেন নাই; সে বালক দূর বিলাতে লেখাপড়া করি-

তেছিলেন। সুরেশের ইংরাজ-প্রকৃতি-সুলভ অনেক গুণ দেখিয়া মেমসাহেব তাঁহাকে নিজ পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন। সুরেশও বড় আনন্দে ও সুখে নাথপুরে কালকাটাইতে লাগিলেন। সাহেব ও মেমসাহেবের নিকট সদা সর্ব্বদা থাকিয়া সুরেশ বেশ ইংরাজী বলিতে শিখিলেন; যদিও তাঁহার এখনও ইংরাজীভাষায় বিশেষ দখল জন্মে নাই, তবুও বোধ হয় সুরেশ যে রূপ সে সময়ে ইংরাজী বলিতেন, সুরেশের সমবয়সী বাঙ্গালীর ছেলে কেহ তেমন ইংরাজী বলিতে পারিতেন না।

এক দিন বৈকালে সুরেশ মেমসাহেবের সহিত একখানা টম্‌টম্ গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে বহির্গত হইলেন। মেমসাহেব প্রায়ই সুরেশকে সঙ্গে লইয়া এইরূপ বেড়াইতে যাইতেন। বিস্তৃত নীল'খেতের মধ্য দিয়া বাঁধা রাস্তা, মেমসাহেব এই রাস্তার উপর দিয়া গাড়ী করিয়া বেড়াইতেন, সুরেশ প্রায়ই সঙ্গে থাকিতেন। মেমসাহেব তাঁহাকে নানা জ্ঞানোপদেশ দিতে থাকিতেন; সুরেশও মেমসাহেবকে এ দেশের নানা গাছ, লতা, পাখীর নাম ও তাহাদের সম্বন্ধীয় নানা কথা বলিতেন। এই রূপ নানা কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা এক এক দিন এক এক দিকে বেড়াইতে যাইতেন। আজ মেমসাহেবের গাড়ী একটী অতি প্রাচীন পুষ্করিণীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বোধ হয় কোন সদাশয় ধনাঢ্য ব্যক্তি গ্রামের লোকের জলকষ্ট নিবারণের জন্য এই সুন্দর পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন; এক্ষণে অযত্নে ইহার আর পূর্ব্ব শোভা নাই, জলও আর বড় পরিষ্কার নাই, পুষ্করিণী প্রায় সেওলা ও জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে, তবে ইহার বক্ষ অতি সুন্দর ও অতি বৃহৎ পদ্মরাজিতে,

পূর্ণ। বোধ হয় এমন মনমুগ্ধকর পদ্ম আর কোন পুষ্করিণীতে কখনও ফুটিত না।

প্রায় সন্ধ্যা হয়। অস্তমিত সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ মেমসাহেবের বদনে পতিত হইয়া এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব করিয়াছে। সেই সূর্য্যের কিরণ বৃক্ষপত্রে পতিত হইয়া চারিদিক সুবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে। পাখীগুলি ডালে ডালে বসিয়া সন্ধ্যা সমাগমে প্রাণমন খুলিয়া গান ধরিয়াছে, দূরে কৃষকগণ স্ব স্ব গোপাল লইয়া গাইতে গাইতে গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে। সন্ধ্যার প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মেম সাহেব বিমুগ্ধ ও উৎফুল্লিত হইয়া গাড়ী হইতে সেই পুষ্করিণীর তীরে নীল নবদূর্ব্বাদল উপরে ধীরে ধীরে পদচারণ করিতে লাগিলেন,—সুরেশও তাঁহার পাশে পাশে চলিলেন। সুন্দর অপূর্ব্ব স্থান,—পুষ্করিণীর চারি পার্শ্বে রসাল অমৃত বৃক্ষ সকল সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে, সেই সকল আম্র বৃক্ষের ঘন পাতায় অস্তমিত সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া বৃক্ষগুলিকে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছে। সম্মুখে বিস্তৃত সরোবর পদ্মে পরিপূর্ণ, ছোট বড় নানা রঙ্গের নানা পদ্ম সমস্ত পুষ্করিণীটার হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফুটিয়া আছে। চিরকালই ইংরাজ মহিলা ফুলের বড়ই প্রয়াসিনী, ফুল দেখিলে, ফুল পাইলে মেমগণ হৃদয়ে যত আনন্দ উপলব্ধি করেন, হীরা মুক্তা জহরত পাইলে তত হন না। মেমসাহেব কতকগুলি পদ্ম সংগ্রহ করিবার জন্য মনে মনে বড়ই ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু কে এ সময়ে পুষ্করিণীতে নামিয়া পদ্ম আনিবে? সঙ্গে সহিশ পর্য্যন্ত নাই, নিকটে কোন লোককেই দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি পদ্মলাভে হতাশ হইলেন, মনে মনে মনের বাসনা সমাপ্ত করিলেন, সুরেশকে

কিছু বলিলেন না; সুরেশ বালক, সে তাঁহার অভিপ্রায় জানিলেও সে কি করিতে পারে?

কিন্তু বালক মেম সাহেবের হৃদয়ের ইচ্ছা বুঝিল। সে বুঝিল মেম সাহেব কয়েকটী পদ্ম পাইলে বড়ই প্রীতা হইবেন। যিনি তাঁহার জন্য এত করিয়া থাকেন, যিনি তাঁহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে ভালবাসেন, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না, ইহা কখনই হইতে পারে না বাল্যকাল হইতেই সুরেশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, একবার তাঁহার মনে কোন ইচ্ছা আসিলে তিনি তাহা কার্য্যে সম্পন্ন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। সুরেশ তৎক্ষণাৎ নিজ জামা ও জুতা খুলিলেন। মেমসাহেব তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিলেন। এ সময়ে এরূপ পুষ্করিণীতে নামিলে বিপদাশঙ্কা আছে ভাবিয়া মেম সাহেব সুরেশকে এরূপ কার্য্য হইতে বিরত করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সুরেশ কোন কাজ করিতে একবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে কেহই তাঁহাকে তাহা হইতে বিরত করিতে পারিত না। সহস্র বিপদের আশঙ্কা থাকিলেও সুরেশ তাহা হইতে বিরত হইতেন না। সুরেশ মেমসাহেবকে ভীত বা চিন্তিত হইতে নিষেধ করিয়া ছুটিয়া গিয়া পুষ্করিণীর জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি জল ঠেলিয়া যেখানে পদ্ম ফুটিয়া ছিল, সেই দিকে চলিলেন। পুষ্করিণীতে অধিক জল ছিল না, কাজেই সুরেশ সাঁতার দিয়া যাইতে পারিলেন না, হাঁটিয়া চলিলেন।

কিন্তু সুরেশ পদ্ম আনয়ন করা যত সহজ মনে করিয়াছিলেন, তত সহজ কার্য্য বলিয়া বোধ হইল না। সুরেশ কিছু দূর গিয়াই আর সহজে অগ্রসর হইতে পারিলেন না,—বোধ হইল যেন তিনি

ক্রমে ডুবিবার উপক্রম করিতেছেন, কি যেন তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিতেছে। মেমসাহেব ভীত হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্ম পুনঃ পুনঃ অনুরোধ, অনুনয়, অবশেষে আজ্ঞা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সুরেশ ফিরিলেন না,—কষ্টে,—বহু কষ্টে,তিনি পদ্মের নিকট পৌঁছিলেন ও কতকগুলি পদ্ম সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু তৎপরেই তিনি ফিরিবার জন্ম বিষম চেষ্টা করিয়াও ফিরিতে পারিলেন না, ক্রমে ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তখন মেমসাহেব ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,। তাঁহার চীৎকারে একজন কৃষক ছুটিয়া আসিল, সে আসিয়াই সুরেশের বিপদ বুঝিল। সে তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া আরও জন-কয়েককে ডাকিল। তখন তাহারা অনতিবিলম্বে একটা দড়ি সংগ্রহ করিয়া সুরেশের দিকে ফেলিয়া দিল; সুরেশও তৎক্ষণাৎ সেই দড়ি ধরিলেন ও কোমরে বাঁধিয়া দিলেন। তখন কৃষকগণ সকলে তাঁহাকে টানিয়া তীরে উঠাইল। দেখা গেল সুরেশের সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমে আবরিত হইয়া গিয়াছে। বহুবৎসর ধরিয়া এই পুষ্করিণীতে কর্দ্দম জমিতে ছিল। এত জমিয়াছিল যে কেহ আর সাহস করিয়া ইহাতে নামিত না। নামিলে দেখিতে দেখিতে সে কর্দ্দমে বসিয়া যাইত, আর উঠিবার তাহার সাধ্য থাকিত না। কৃষকগণ না আসিলে সুরেশেরও আজ ঠিক এই অবস্থা হইত। তাঁহার প্রাণরক্ষার কোন রূপ সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মৃত্যুমুখে পড়িয়াও সুরেশ পদ্ম ছাড়েন নাই, তিনি যখন পদ্ম সহ তীরে উঠিলেন তখন তাঁহার কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না।

মেম সাহেব অনতিবিলম্বে সুরেশকে গাড়িতে তুলিয়া

কুঠিতে আনিলেন। সেখানে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে কর্দ্দম ধৌত করিয়া দেওয়া হইল, এবং তাঁহাকে ঔষধি প্রদান করা হইল। শীঘ্রই সুরেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। তাঁহার বিপদের কথা সকলে শুনিল, সাহেবেরা অতিশয় প্রীত হইলেন। যত দিন পদ্মটী শুকাইয়া ঝরিয়া না পড়িয়া গিয়াছিল, ততদিন মেম সাহেব সেটীকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়া ছিলেন।

যে কয়মাস সুরেশ নাথপুরে ছিলেন, সে কয়মাস তাঁহার বড়ই সুখে কাটিয়া গিয়াছিল। এখানে পিতার ধমকানি ছিল না, পড়াশোনার বড় হাঙ্গামা ছিল না, বিশেষতঃ সাহেব মেমেরা বড়ই আদর যত্ন করিতেন। দিন রাত তিনি তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহাদের সহিত খেলা করিতেন, শিকারে যাইতেন। সাহেবদের সঙ্গে একত্রে আহার না করিলেও, তিনি অনেক দিন কুঠিতে আহারাদি করিয়াছিলেন, পূর্ব্বভাব তাঁহার ক্রমে দূর হইতেছিল।

অবশেষে সুরেশ নাথপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতার বালিগঞ্জে আসিলেন। মেম সাহেব এবং অন্যান্য সকলে অতিশয় বিষাদের সহিত তাঁহাকে বিদায় দিলেন। মেম সাহেব শীঘ্রই বিলাত যাইবেন, তিনি সুরেশকে সঙ্গে লইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু সুরেশ কিছুতেই যাইতে প্রস্তুত হইলেন না। যদি তিনি সে সময়ে তাঁহাদের সহিত যাইতেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তিনি ইয়োরোপে গিয়া যে ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন ও বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে ভুগিতে হইত না। তাহা হইলে তিনি অন্যভাবে শিক্ষিত হইয়া অন্যরূপ হইতেন। কোন সময়ে মানুষের অদৃষ্টচক্র কোনদিকে

ঘুরে তাহা কে বলিতে পারে? মেম সাহেব যে দিন সুরেশকে বিদায় দেন, সে দিন তিনিও ভাবেন নাই যে তাঁহারা ভিন্নভাবে ভিন্ন অবস্থায় তাঁহাদের সুরেশকে আবার এক দিন দেখিতে পাইবেন। সাহেব ও মেম সাহেব উভয়ই যাহাতে সুরেশের উপকার বা সাহায্য হয় এরূপ কিছু করিতে চাহিলেন,—কিন্তু সুরেশ পরের উপকার প্রার্থী নহেন, তিনি সাহেব ও মেমের নিকট বিদায় লইয়া বালিগঞ্জে আগমন করিলেন।



একাদশ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাবক্ষে।

এই সময়ে সুরেশ নৌকারোহণ ও দাঁড়টানিতে বড় ভালবাসিতেন। নাথপুর ইচ্ছামতীর তীরে অবস্থিত,—ইচ্ছামতী বাঙ্গালাদেশের একটী সুন্দর নদী,—যেখানে নদী আছে, সেখানে জেলে আছে, এবং যেখানে জেলে আছে, সেখানে জেলেডিঙ্গিও আছে। সুরেশ তাঁহার সঙ্গীদিগের সহিত প্রায়ই মধ্যে মধ্যে এই সকল জেলেডিঙ্গি চড়িয়া ইচ্ছামতীর স্বচ্ছবক্ষে দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে বহু দূরে চলিয়া যাইতেন। এরূপ নৌকাবিহারে সর্ব্বদাই বিপদের আশঙ্কা আছে,—বিশেষতঃ বালকগণের পক্ষে এরূপ নৌকারোহণে জলমগ্ন হওয়ার কোনই বিচিত্র নাই, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় নাথপুরে থাকিয়া সুরেশ বা তদনুসঙ্গীগণের কোনই বিপদ ঘটে নাই।

বালিগঞ্জে আসিয়া আর নৌকা চড়িতে না পারিয়া সুরেশের হৃদয় বড়ই বিষণ্ণ হইল। যেখানে সুরেশ বাস করিতেন সেখান হইতে গঙ্গা বহু দূরে; সেখান হইতে গঙ্গায় গিয়া নৌকা চড়া বা দাঁড়টানা সহজ কার্য্য নহে, তবে সুরেশ কোন কার্য্যেই পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না;—কিন্তু তাঁহার পিতা এরূপ

ধনী নহেন যে তাঁহাকে একখানা নৌকা কিনিয়া দেন; সহরের দাঁড়ী মাঝীগণ এরূপ নহে যে কেবল কথায় তাঁহাকে নৌকা চড়িতে দিবে। যাহা হউক তিনি অতি আয়াসে অবশেষে একটী "রোয়িং ক্লব" স্থাপনা করিলেন। কোন গতিকে একখানা নৌকাও সংগ্রহ হইল। তিনি তাঁহার সমবয়স্ক পল্লিস্থ অন্যান্য বালকগণকে লইয়া প্রত্যহ বৈকালে গঙ্গায় নৌকারোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এপ্রেল মাসের এক দিন আর চারিটী সমবয়স্ক বালক সমভিব্যাহারে সুরেশ নৌকা খুলিয়া গঙ্গাবক্ষে দাঁড় টানিয়া চলিলেন। গার্ডেনরিচের নিকট নৌকা পৌঁছিলে আকাশে একটু কাল মেঘ দেখা দিল, কিন্তু আকাশ তখনও বেশ পরিষ্কার, ঝড় বৃষ্টি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই;—রৌদ্র তখনও খুব প্রখর, তবে বাতাস একবারে নাই,—গরমও অসহ্য হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে সেই ক্ষুদ্র কাল মেঘ দেখিতে দেখিতে বড় হইল,—সূর্য্য ঢাকিয়া ফেলিল, আকাশ কাল মেঘে পূর্ণ হইয়া গেল,—দেখিতে দেখিতে বাতাস প্রবল হইল। অর্দ্ধ ঘণ্টা যাইতে না যাইতে গঙ্গাবক্ষে ঘোর রোলে প্রবল ঝটিকা উঠিল। বোধ হইল যেন সহসা ইন্দ্র বরুণ বায়ু প্রভৃতির মধ্যে সহসা গৃহবিবাদ ঘটিয়া সকলে সকলের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ধাবিত হইলেন। সুরেশের ক্ষুদ্র নৌকা এই প্রলয়ে পড়িয়া যায় যায় হইল।

সুরেশ ও তাঁহার সঙ্গীগণের কেহই আকাশের ভাবগতিক কখন কি রূপ থাকে তাহা জানিতেন না। এপ্রেল ও মে মাসে বাঙ্গালাদেশে কি রূপ সহসা ঝড় উঠে,—কিরূপে সামান্য মেঘ

আকাশের কোণে উঠিয়া দেখিতে দেখিতে ভয়াবহ ঝটিকায় পরিণত হয়, সুরেশ বা তাঁহার সঙ্গীগণ এ বিষয় একবারও চিন্তা করেন নাই। এক্ষণে সহসা গঙ্গাবক্ষে এই ঝড় উঠায় তাঁহারা মহা বিপন্ন হইলেন। অতি কষ্টে নৌকাকে জলমগ্ন হইতে প্রতিবন্ধকতা প্রদানে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সাধ্য কি যে এই ভয়াবহ ঝটিকায় নৌকা রক্ষা করেন; দেখিতে দেখিতে হাল ভাঙ্গিয়া গেল, তখন নৌকা লাটিমের ন্যায় তীর বেগে গঙ্গাবক্ষে ঘুরিতে আরম্ভ করিল, বালকগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কোনমতে নৌকাকে স্থির রাখিতে পারিল না। নৌকা ঘুরিতে ঘুরিতে একটা বয়ায় লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইল। সুরেশ ও তাঁহার সঙ্গীগণ সকলেই সঙ্গে সঙ্গে জলমগ্ন হইলেন।

সৌভাগ্যের বিষয় সকলেই সন্তরণে সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহারা ভাসিয়া উঠিয়া প্রাণপণে সন্তরণ দিয়া তীরাভিমুখে যাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; কিন্তু একে প্রবল স্রোত, তাহার উপর ঝড়বৃষ্টি, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ,—বালকগণের রক্ষা পাইবার কোন আশাই নাই। এই সময়ে সেই ঝটিকায় একখানি ষ্টিমার সেইখান দিয়া যাইতেছিল,—ষ্টিমারের লোকেরা বালকদিগের অবস্থা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ষ্টিমার থামাইয়া অতি কষ্টে সুরেশের সঙ্গীদিগের তিন জনকে ষ্টিমারে তুলিয়া লইলেন,—সুরেশ ও তাঁহার অপর সঙ্গী স্রোতবেগে এত দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন যে ষ্টিমারের লোকেরা তাঁহাদের দেখিতে পাইলেন না। সুরেশ ও তাঁহার সঙ্গী ভাসিয়া চলিলেন।

সঙ্গীকে ক্লান্ত দেখিয়া সুরেশ আপনার বিপদ ভুলিয়া

তাঁহাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কোন গতিকে প্রাণ বাঁচাইয়া ভাসিয়া চলিলেন ;—কিন্তু সেই ঝটিকা মধ্যে তাঁহারা উভয়ে বহুক্ষণ একত্রে থাকিতে পারিলেন না ;—সুরেশ ও তাঁহার সঙ্গী ঝটিকাবেগে দুই জন দুই দিকে গিয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার সঙ্গী ক্লান্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখে জলমগ্ন হইলেন। তিনিও ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—কিন্তু অতি কষ্টে তিনি নিজেকে কেবল জলের উপর ভাসাইয়া রাখিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

তিনি একখানি যায়মান জাহাজের পাশ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই জাহাজস্থ একজন নাবিক তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার বিপদ বুঝিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ একগাছা দড়ি তাঁহার দিকে ফেলিয়া দিল ;—সুরেশ দড়িটা দেখিতে পাইলেন ও তৎক্ষণাৎ অনেক কষ্টে দড়িটা ধরিলেন। কিন্তু তিনি নিতান্তই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ;—দড়ি বহিয়া জাহাজে উঠিতে গিয়া আবার জলে পতিত হইলেন। জাহাজের কাপ্তেন তাঁহাকে এইরূপে বিপন্ন দেখিয়া অনতিবিলম্বে জাহাজের জালিবোট নামাইয়া দিলেন ;—ততক্ষণে সুরেশ আরও বহু দূরে ভাসিয়া গিয়াছিলেন,—বহু কষ্টে নৌকাস্থ নাবিকগণ তাঁহাকে অর্দ্ধ মৃত অবস্থায় টানিয়া তুলিল। তিনি যখন জাহাজে নীত হইলেন, তখন তাঁহার একবারেই সংজ্ঞা ছিল না। জাহাজের ডাক্তারের বিশেষ যত্নে নানা রূপ চিকিৎসায় পর দিবস সুরেশের সংজ্ঞা হইল,—তখন জাহাজস্থ কাপ্তেন একখানি গাড়ী আনিয়া লোক সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার জনক জননী বিশেষ

উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইয়াছিলেন। কি রূপ আসন্ন মৃত্যু হইতে তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়াছে শুনিয়া তাঁহারা হর্ষ বিষাদে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতে সুরেশ পদে পদে মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা পাইয়া আসিতেছিলেন;—যেন পদে পদে ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন। দূর ব্রেজিলে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিবার জন্যই যেন তিনি প্রতি পদে পদে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন।



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।



ফিরিঙ্গির সহিত দ্বন্দ্ব।

প্রায়ই সুরেশ সঙ্গীদিগের সহিত বৈকালে ময়দানে ইডেন গার্ডেন, ঘোড়দৌড়ের স্থানে বেড়াইতে যাইতেন। এরূপ সময়ে প্রায়ই তাঁহাদের ইংরেজ বালকদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইত। একদিন ময়দানে তাঁহাপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ দুইটী ফিরিঙ্গি বালক তাঁহাদের নিগার প্রভৃতি বলিয়া টাট্টা বিদ্রূপ করিতেছিল, এমন কি শেষ তাঁহাদের শুয়ার পর্য্যন্ত বলিতেও ছাড়িল না। সুরেশের আর সহ্য হইল না, তিনিও ফিরিঙ্গিদ্বয়কে যাহা মুখে আসিল তাহা বলিয়া গালি দিলেন,—ফিরিঙ্গিদ্বয় সুরেশ কি ধাতুতে নির্ম্মিত তাহা জানিত না, তাঁহাকে ঘুসি মারিতে উদ্যত হইল, সুরেশ তখন আত্ম রক্ষা করিয়া ঘুষির প্রত্যুত্তরে তাহাদের একজনের নাসিকায় এমনই ঘুষি মারিলেন যে সে ঘুরিয়া পড়িল। তখন সেই দুইজন ফিরিঙ্গি একাকী সুরেশকে আক্রমণ করিল, ঘুসির উপর ঘুষি চলিতে লাগিল। শীঘ্রই ফিরিঙ্গিদ্বয় বুঝিল যে সুরেশ বয়কনিষ্ঠ হইলেও তাঁহাদের অপেক্ষা হীন বল নহে; এখন আর হটিবার উপায় নাই। তাহারা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু সুরেশ

এমনই ঘুষি বৃষ্টি করিতে লাগিলেন যে, শীঘ্রই ফিরিঙ্গিদ্বয় মৃতবৎ ভূমিসাৎ হইল। সুরেশ নীচমনা ছিলেন না,—তিনি তাহাদের উভয়কে তখন সযত্নে তুলিয়া উহাদের সহিত মিষ্ট কথা কহিয়া সেকহ্যাণ্ড করিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সুরেশের উচ্ছৃঙ্খলতা

সুরেশ লণ্ডন মিসন স্কুলের যে ভাল ছেলে ছিলেন তাহা বলা যায় না। পড়া শুনা করা অপেক্ষা দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতে পারিলে তিনি অধিক সুখী হইতেন। মাষ্টারগণ তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত রহিতেন। সুবিধা পাইলেই সুরেশ মাষ্টার মহাশয়দিগকে নানা প্রকারে জ্বালাতন করিতেন। স্কুলের যত দাঙ্গাবাজ ছেলের সুরেশ দলপতি, কেবল যে স্কুলের লোক তাঁহাদের ভয় করিত এরূপ নহে, স্কুলের নিকটস্থ দোকানদার ও অন্য লোকজনও তাঁদের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল। সুরেশ প্রত্যহ ৯৷৹ টার সময় নিয়মিতরূপ বাড়ী হইতে স্কুলে রওনা হইতেন, কিন্তু মাসের মধ্যে অন্ততঃ বিশদিন শিক্ষকগণ তাঁহার টিকি দেখিতে পাইত না। কলেজের নিকট একটা তাঁহাদের আড্ডা ছিল, দুই প্রহরে তাঁহারই ন্যায় অন্যান্য বালকগণ সকলে একত্রিত হইয়া সেইখানে তাস দাবা প্রভৃতি খেলিত, পড়া শুনার কাছ দিয়াও যাইত না। সুরেশ তাহাদের সকলের কর্ত্তা, দলপতি; যত রকম নষ্টামির সর্দ্দার।

সুরেশের এ ভাবে তাঁহার পিতা মাতা যে বিশেষ প্রাণে

বেদনা পাইতেন, তাহা বলা বাহুল্য। মায়ের নিকট তিনি বড়ই আদরের ছেলে ছিলেন, পারতপক্ষে তাঁহার স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে কিছু বলিতেন না, কিন্তু পিতা গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস কিরূপে চক্ষের উপর পুত্রকে অধঃপাতে যাইতে দিবেন, তিনি বুঝাইয়া, ধমকাইয়া, মারিয়াও পুত্রকে পড়া শোনায় মন দেও য়াইতে পারিলেন না। ইহাতে তাঁহার পিতার হৃদয়ে যে নিতান্তই কষ্ট হইবে, ইহা আর অধিক কথা কি?

সুরেশ গাধা ছেলে ছিলেন না। তিনি যে খুব বুদ্ধিমান তাহা তাঁহার শিক্ষকগণ বলিতেন; একটু যত্ন করিয়া লেখা পড়া করিলে তিনি যে পণ্ডিত হইতে পারেন, তাহা তাঁহার পিতা, আত্মীয় স্বজন, শিক্ষক প্রভৃতি সকলই জানিতেন, কিন্তু পড়া শোনা করিবার ছেলে সুরেশ নহেন, পড়ার নামে তাঁহার গায় জ্বর আসতি, স্কুলে বাড়ীতে সর্ব্বদাই তিনি কিছু না কিছু অকর্ম্ম করিতেন। দাঙ্গা হাঙ্গামা করিবেন, না পড়া শোনা করিবেন। মাষ্টারেরা হার মানিয়াছেন, তাঁহার পিতা তাঁহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না, বাটীর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পারিত না। এই সময়ে তাঁহার খুল্লতাত কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাসের সহিতই তাঁহার সম্প্রীতি ছিল, আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পারিত না। তিনিও কাহাকে দেখিতে পারিতেন না। সুরেশের পিতা এখন জীবিত আছেন; তিনি নাথপুরে থাকিয়া ধর্ম্মালোচনায় কালাতিপাত করেন, তাঁহার খুল্লতাত কৈলাস বাবুও জীবিত আছেন। তিনি এক্ষণে পেনসন লইয়া কড়েয়ার বাড়ীতে আছেন। সুরেশ এ পর্য্যন্ত বরাবরই কৈলাস বাবুর নিকট চিঠিপত্র লিখিয়া থাকেন।

এই সময়ে লণ্ডন মিশন কলেজের প্রিন্সিপাল আসটন সাহেব ছিলেন। তিনিও সুরেশকে ভাল করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র সুরেশ লাঞ্ছিত হইতেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। অবশেষে পিতা নিতান্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করায় সুরেশ পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে ভয়ে মধ্যে মধ্যে ৫।৭ দিন আর বাড়ী যাইতেন না। অনেক খ্রীষ্টান বালকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল, তিনি বাড়ী না গিয়া ইহাদের বাসায় আহারাদি করিয়া রাত কাটাইতেন। কাজেই খৃষ্টানের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বে যে ভাব ছিল, তাহা এক্ষণে আর ছিল না। তিনি এক্ষণে বিনা দ্বিধায় খ্রীষ্টানদিগের সহিত আহার বিহার করিতেন, হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার আস্থা ছিল না,— তিনি অন্ত বিষয়েও যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিলেন, ধর্ম্ম আচার ব্যবহার, আহার বিচার সকল বিষয়েই সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছিলেন। এই সময়ে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ এ দেশীয়গণকে খ্রীষ্টান করিবার জন্ত বিশেষ যত্ন করিতেন, সুরেশকেও খ্রীষ্টান করিবার জন্ত যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা এই স্থানে মিশনারী ও মিশন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

মিশনারী সাহেবদিগের দ্বারা দেশের যে উপকার হয় নাই, এ কথা আমরা বলি না, তবে বিলাতের লোকের বিশ্বাস যে যাহারা মিশনারী হইয়া এ দেশে আইসেন, তাঁহারা আত্মোৎসর্গ ও স্বার্থত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন মিশনারী সাহেবেরা এ দেশে বড়ই কষ্টে কালযাপন করেন। একথা যে সত্য নহে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এ দেশে মিশনারী সাহেবেরা অতি সুখে সচ্ছন্দেই কালাতিপাত করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টানদেশবাসীগণ মুক্ত হস্তে মিসনের জন্য অর্থ দিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিশ্বাস কুসংস্কারাবিষ্ট, অন্ধকারে মগ্ন, কাষ্ঠ-প্রস্তর-পূজক ভারতবাসীগণকে প্রকৃত সত্যধর্ম্ম প্রদানের জন্য মিশনারীগণ এ দেশে আসিয়া থাকেন, এই মহৎকার্য্য সাধনের জন্যই তাঁহারা অবারিতরূপে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার যে কিছুই হয় না, তাঁহাদের অর্থ যে কেবল অপব্যয় হয়, তাহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য আমরা প্রয়াস পাইব।

ইংরেজ সওদাগরগণের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ইংরেজ মিশনারী-গণ আসেন নাই। তাঁহারা এদেশে ব্যবসা করিতে আসিয়া যখন দুর্ব্বল বিলাসাশক্ত মোগল সম্রাটকে সরাইয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য স্থাপনা করিলেন, সেই সময়ে ইংরেজ মিশনারীগণও ভারতে আসিয়া দেখা দিলেন। পরের স্বাধী-নতা কাড়িয়া লইয়া কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজ্য বিস্তার করিতে স্বাধীনচেতা ইংরেজ জাতির প্রাণে বেদনা লাগে। ভারতে রাজ্য স্থাপনা হইল, ভারতবাসীর স্বাধীনতা হৃত হইল, একটা কিছু মহৎ উদ্দেশ্য না দেখাইলে, অন্ততঃ একটা কিছু সৎ উদ্দেশ্যের কথা মনকে না বলিলে, মহৎচেতা ইংরেজ জাতির প্রাণে বেদনা লাগে, তাহাই ভারতবাসীকে কুসংস্কার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ইংরেজ জাতি এদেশে মিশনারী পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের জন্য জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন, দলে দলে মিশনারী আসিলেন, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নগরে নগরে মিশন স্থাপনা হইল। স্থানে স্থানে

মিশনারী সাহেবদিগের বাসের জন্য রাজপ্রসাদ সদৃশ অট্টালিকা সকল নির্ম্মিত হইল। যাঁহারা ভারতবাসীকে উদ্ধার করিবার জন্য মিশনারী হইয়া আসিতে লাগিলেন,—তাহাদের স্বদেশীয়গণ তাহাদিগকে স্বার্থ ত্যাগের উজ্জ্বলতম আদর্শ মনে করিতে লাগিলেন। দূর ভারতে,—উষ্ণ প্রধান ভারতবর্ষে কৃষ্ণমূর্ত্তি বিধর্ম্মীদিগের মধ্যে বসবাসে না জানি এই সকল মহাত্মার কত কষ্ট হইবে; এই ভাবিয়া দেশের লোক যাহাতে তাঁহাদের কোন কষ্ট না হয় সে জন্য মুক্তহস্তে অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন। জগতের লোক বুঝিল যে, ইংরাজগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারত গ্রহণ করেন নাই,—ভারতবাসীকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহারা এ দেশে আসিয়াছেন,—ভারতের মঙ্গল সাধনই তাঁহাদের একমাত্র অভিপ্রায়।

প্রথমে তাঁহারা ভারতবাসীকে খ্রীষ্টান করা অপেক্ষা তাহাদিগকে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাহাদিগের কৃতজ্ঞতা পাইবার জন্য তাহাদের পীড়ায় ঔষধ দিতে থাকিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, ইংরাজী শিক্ষাবলে যখন তাহাদের সহস্র বৎসরব্যাপী কুসংস্কার, পুত্তলিকা পূজা, আচার ব্যবহার নষ্ট হইবে;—তখন খ্রীষ্টিয়ধর্ম্মে তাহাদিগকে দীক্ষিত করিতে আর অধিক ক্লেশ পাইতে হইবে না। এই জন্য তাঁহারা দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয়সংস্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে দেশ ইংরাজের হইয়াছে। রাজার সমস্ত কার্য্যই রাজভাষায় সম্পন্ন হয়, এরূপ স্থলে দেশের লোকের ইংরাজী না জানিলে উপার্জ্জন হয় না,—কোন কার্য্যই চলে না। কাজে কাজে দলে দলে এ দেশের বালকগণ মিশনারীদিগের

স্থাপিত স্কুল কলেজে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তখন ইংরাজী শিক্ষা করিবার আর দ্বিতীয় উপায় ছিল না। তখন গবর্ণমেণ্ট এখনকার মত দেশে শিক্ষা বিস্তারের কোনই বন্দোবস্ত করেন নাই। এখনকার মত তখন এদেশীয়গণ নিজেরাও কোন স্কুল কলেজ স্থাপন করেন নাই। এদেশের লেখা পড়ার ভার কাজে কাজেই একরূপ মিশনারীদিগের হস্তে পড়িল। পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত এইরূপে এদেশে প্রবিষ্ট হইল। দিন দিন সকল প্রকারে দেশের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। নানা লোভে পড়িয়া জাতি যাওয়া ভয় সত্বেও অনেকে খ্রীষ্টান হইল। এই সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় পেটের দায়েও অনেকে খ্রীষ্টান হইয়া পড়িল। ধর্ম্ম-বিশ্বাস অপেক্ষা এই সকল লোক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে খ্রীষ্টান হইয়া ছিল তাহার প্রমাণ যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে তাহারা অধিকাংশই নীচ জাতি ও দরিদ্র। মফস্বলস্থ অনেক খ্রীষ্টান অভিনিবেশ আমরা স্বয়ং দেখিয়াছি; এই সকল দেশীয় খ্রীষ্টান, আনড়ু, পেনড়ু গমেশ, প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া থাকা সত্বেও ইহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কিছুই অবগত নহে, ঘোর কুসংস্কারে নিমগ্ন ও অজ্ঞতায় পূর্ণ। ইহারা খ্রীষ্টান হইবার পূর্ব্বে যেরূপ কালী শিতলা প্রভৃতি হিন্দু দেব মূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম করিত, ঠিক সেইরূপ এখনও করে। যদি ইহাদের খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে কখনই এরূপ করিতে পারিত না। আমরা ইহাও শুনিয়াছি যে শিক্ষিত দিগের মধ্যে যাঁহারা খ্রীষ্টান হইয়াছেন, তাঁহারা এখন অনুতপ্ত। কেহ কেহ স্পষ্টই বলেন যে যখন তাঁহাদের সাংসারিক জ্ঞান ছিল না, তখন মিশনারীগণ তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া খ্রীষ্টান

করিয়াছিলেন। যত সংখ্যক খ্রীষ্টান করিতে পারা যায়, ততই মিশনারী সাহেবের আয় বৃদ্ধি হয়, এরূপ স্থলে মিশনারীগণ যে নানা কল কৌশলে এ দেশীয়দিগকে খ্রীষ্টান করিবার চেষ্টা পাইবেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এরূপে খ্রীষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া খ্রীষ্টান সমাজের কি লাভ বা উপকার হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। যখন যে দেশে যাহা তিনি করিতেছেন, তখন তাহাই ঘটিতেছে, মনুষ্যের তাহাতে হাত নাই। এক সময়ে এ দেশে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের খুব ধুয়া উঠিয়াছিল, অনেক লোক খ্রীষ্টান হইয়াছিল,—এক্ষণে সে ঢেউ একেবারে গিয়াছে,—এখন আর বড় কেহ খ্রীষ্টান হয় না। ভারতে প্রাচীন সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মেরই প্রতাপ দিন দিন বাড়িতেছে, এমন কি ইয়ো-রোপ ও আমেরিকার অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মের বিশিষ্ট আদর করিতেছেন। ইয়োরোপ ও আমেরিকা যে হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, এ আশা করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে হিন্দুগণ ইয়োরোপ বাসীগণকে হিন্দু করিতে চাহেন না। তাঁহারা নির্ব্বিবাদে তাঁহাদের নিজ ধর্ম্মে থাকিতে পারিলেই তাঁহারা বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েন।

যদিও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এদেশে আসিয়া আমাদিগের কথঞ্চিত ক্ষতি করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সে ক্ষতি এত সামান্য যে তাহাকে ক্ষতি বলিয়া গণ্য না করাও যাইতে পারে। কিন্তু এ কথাও বলিতে হইবে যে, খৃষ্টান মিশনারীদিগের দ্বারা আমাদের বিশেষ উপকার সাধন হইয়াছে। তাঁহারাই এদেশে শিক্ষা বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহারা এদেশে ঔষধি বিতরণ করিয়া সহস্র

।হস্র লোকের প্রাণদান করিয়াছেন। শত সহস্র প্রকারে ঊাহারা এদেশের উন্নতির চেষ্টা পাইয়াছেন। ভারতবাসী-।ণ তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ না থাকিলে অকৃতজ্ঞতার ।রাকাষ্ঠা প্রকাশ করা হইবে



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, সুরেশ খৃষ্টান হইয়াছেন। যিনি বাল্যকালে এত হিন্দু ছিলেন, যিনি নীলকুঠিতে সাহেবদিগের নিকট রাত্রি যাপন করিলে জাতি যাইবে মনে করিয়াছিলেন, তিনি কিরূপে অবশেষে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন, এক্ষণে আমরা তাহাই বলিব।

তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা দিন দিন এত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে তাঁহার প্রিয় খুল্লতাত কৈলাস বাবুও তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তিনিও মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কৈলাস বাবুর অপেক্ষা গিরিশ বাবু কড়া লোক ছিলেন; তিনি পুত্রের এইরূপ চরিত্রে বিশেষ ক্রোধান্ধ হইলেন, এক দিন সুরেশকে আগাগোড়া বেত লাগাইলেন;—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে থাকিয়া সুরেশের হিন্দুধর্ম্মে একেবারেই আস্থা ছিল না। মহাবৈষ্ণব গিরিশ বাবুর চক্ষে ইহা মহা পাতক বলিয়া প্রতীত হইল; তিনি পুত্রকে ভৎর্সনা করিয়া, প্রহার করিয়া নিরস্ত হইলেন না,—তাঁহাকে ত্যাজ্য পুত্র করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন।

উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল সুরেশ পিতার তাড়নায় ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। বালককাল হইতেই তিনি স্বাধীন চেতা, পরের অধীনে পরের করতলস্থ হইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; পিতার শাসন তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি আত্মীয় স্বজন এমন কি পিতাকেও ত্যাগ করিয়া সকলের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্ম ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কেবল এক জননী, তাঁহারই স্নেহ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সুরেশ এখনও গৃহ ত্যাগ করেন নাই। পিতা কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত বা প্রহারিত হইলে তাঁহার স্নেহময়ী জননীই তাঁহাকে কোল দিয়া তাঁহার হৃদয়ে শান্তিবারি প্রদান করিতেন।

একদিকে পিতা পুত্রকে ত্যজ্যপুত্র করিবার জন্ম ক্রমে হৃদয়কে দৃঢ় করিতেছেন, অপরদিকে পুত্রও গৃহ, আত্মীয় স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন; এরূপ গৃহবন্ধন আর কয়দিন রহে? একদিন পিতা পুত্রে মহা কলহ উপস্থিত হইল, পুত্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না; আর জীবন থাকিতে গৃহে ফিরিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া সুরেশ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বরাবর লণ্ডনমিশনস্থ তাঁহার খ্রীষ্টান বন্ধুদিগের নিকট গমন করিলেন। তাঁহাদের নিকট হৃদয় খুলিয়া সকল কথা, প্রাণের সমস্ত কথা, বলিলেন। তাঁহার যেরূপ মনের ভাব, বন্ধুগণও ঠিক সেই ভাব ব্যক্ত করিলেন। দুর্ব্বলতা কিছুই নহে, যাহার হৃদয়ে বল নাই, তাহার কিছুই নাই, কোন ক্রমেই আর তাঁহার অন্ততঃ উপস্থিত কিয়ৎদিন বাড়ী যাওয়া কর্ত্তব্য নহে,—তাঁহার বন্ধুগণ সকলেই তাঁহাকে এই পরামর্শ দিলেন। সুরেশের প্রাণে

তাঁহাদের কথা লাগিল, তিনিও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে সেই দিন হইতে তিনি আত্মীয়স্বজনের সহিত আর কোন সম্বন্ধই রাখিবেন না। তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে তাঁহাদের বাড়ীতে যতদিন তাঁহার ইচ্ছা তত দিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যৌবনে যুবকগণ ভবিষ্যৎ বিপদাপদের কথা একেবারেই ভাবেন না। যাঁহারা সুরেশকে এইরূপে আমন্ত্রণ করিলেন, তাঁহারা একবারও ভাবিলেন না যে তাঁহাদের জনক জননীগণ এ বন্দোবস্তে রাজি হইবেন কি না।

সুরেশ ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি জানিতেন যে তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ ধনী নহেন,—তাঁহাদের বা অন্য কাহারই গলগ্রহ হইয়া থাকা সুরেশের প্রকৃতিতে লেখে নাই,—স্বাধীনচেতা সুরেশ কাহারও ভারস্বরূপ হইয়া থাকিতে সম্মত নহেন। এই সকল কারণে সুরেশ লণ্ডন মিসনের প্রিন্সিপাল আসটন সাহেবকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। সুরেশ নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হওয়া স্বত্ত্বেও আসটন সাহেব সুরেশকে স্নেহ করিতেন। তিনি মিষ্টকথা কহিয়া তাঁহার প্রাণের শান্তির জন্য তাঁহাকে বাইবেল পড়িতে অনুরোধ করিলেন। সুরেশের তখনকার মানসিক অবস্থা বর্ণনার প্রয়াস পাওয়া বৃথা,—হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার জাতক্রোধ জন্মিয়াছে, কারণ তাঁহার আত্মীয়গণ হিন্দু। হিন্দু নাম থাকিলে পাছে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে পুনরায় গৃহে লইয়া যাইতে আইসেন, এই ভয়ে তিনি কালবিলম্ব না করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পড়িলেন। সুরেশ এখনও বালক বই নহেন, তবে তিনি এমনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে

মনে মনে স্থিরসঙ্কল্প করিলেন আর কখনও বাড়ী ফিরিবেন না। এখন তিনি খ্রীষ্টান, গৃহ শূন্য, অর্থ শূন্য, তিনি অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যে আত্ম পোষণ করিবেন,—এ ক্ষমতা তাঁহার হয় নাই,—তবুও এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মন টলিল না,—তিনি ভীত হইলেন না;—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতই কেন কষ্ট হউক না গৃহে কখনও ফিরিব না। তাঁহার খ্রীষ্টান হওয়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পিতা গিরিশ বাবু তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিলেন ও জীবনে আর তাঁহার মুখ দেখিবেন না শপথ করিলেন। সুরেশ গৃহ-শূন্য, অর্থ-শূন্য, কলিকাতার রাজপথে সহায় হীন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

আসটন সাহেব এই সময়ে নানা রূপে সুরেশকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি লণ্ডন মিশনকলেজে তাঁহাকে বাস করিতে দিয়াছিলেন;—সুরেশের ভোজন ও বাসের জন্য এক পয়সাও লাগিত না। ইচ্ছা করিলে তিনি লেখা পড়া শিখিয়া বিদ্বান্ হইয়া অন্যান্য দেশীয় খৃষ্টানদিগের ন্যায় ভবিষ্যতে সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন; কিন্তু সুরেশের স্বভাব সে রূপ ছিল না। লেখা পড়া করিবার জন্য তাঁহার জন্ম হয় নাই; অথচ তিনি পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিবার পাত্রও নহেন;—কাজেই তিনি কোন রূপ একটা চাকরী জোগাড়ের জন্য চারিদিকে নানা স্থানে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। নানা স্থানে চেষ্টা করিয়াও সুরেশ কোন চাকুরী জোগাড় করিতে পারিলেন না; একে তাঁহার বয়স অল্প, তাহার উপর লেখা পড়া কম, তাঁহাকে কে কি কার্য্য দিবে? তিনিই বা কি কার্য্য করিতে পারিবেন?

গবর্ণমেণ্ট আফিস, সওদাগরি আফিস, রেল আফিস, ডক, যেটি ;—যেখানে কোন চাকুরী পাইবার সম্ভাবনা আছে, সুরেশ সেই সেই খানেই গেলেন, কিন্তু কোথাও কিছু হইল না। লোকে তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি না করিয়া বরং তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। বিশেষতঃ তিনি খ্রীষ্টান হইয়াছেন শুনিয়া দেশীয় কেরাণীগণ তাঁহাকে নানা রূপে অপমানিত করিতেন। সুরেশ বাধ্য হইয়া এই সকল হাসি বিদ্রূপ সহ্য করিতেছিলেন ; উপায় নাই। একটা না একটা কোন কিছু না করিলে নয়।

তাঁহার চাকরীর বয়স নহে, তাঁহার পিতা বা আত্মীয় স্বজনের এ রূপ অবস্থা নহে যে তাঁহাকে এই অবস্থায় চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া কলিকাতার রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। উচ্ছৃঙ্খল না হইলে তাঁহার পিতা বা খুল্লতাত আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে আদর যত্ন করিতেন, তাঁহারও কর্ত্তব্য ছিল এ বয়সে এ রূপ করিয়া না বেড়াইয়া লেখা পড়ায় মন দিয়া বিদ্বান্ হইবার চেষ্টা করা। তিনি স্বইচ্ছায় সে সমস্ত নষ্ট করিয়া রাজপথে দাঁড়াইয়াছেন ;—স্বইচ্ছায় বিপদ্‌কে ডাকিয়া আনিয়াছেন,—তিনি ক্রোধে গৃহ ত্যাগ করিয়া স্নেহময়ী জননীর হৃদয়ে দারুণ আঘাত দিয়াছেন। পিতৃপুরুষের আদরের সনাতনধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ;—এ রূপ অবস্থায় তাঁহার ক্লেশ হইলে সে জন্য তিনি ব্যতীত অন্য কেহ দায়ী নহে।

যখন নিরাশার মেঘ সুরেশকে আবরিত করিতেছিল, যখন তিনি জীবনে হতাশ হইতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার জীবনের সেই ঘোর অমানিশার মধ্যে একটী আলোক দেখা দিল। তিনি স্পেন্সেস হোটেলে একটী সামান্য চাকরী পাইলেন। তাহাদের

ঘাটে ও রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহাকে থাকিতে হইত,—কোন সাহেবমেম আসিলে তিনি তাঁহাদিগকে স্পেন্সেস হোটেলে লইয়া আসিতেন। তাঁহাদের মালামাল রেল বা জাহাজ হইতে আনা বা রেলে বা জাহাজে পাঠাইয়া দেওয়া,—তাঁহাদিগকে কলিকাতার নানা দর্শনীয় স্থান দেখান,—সুরেশের ইহাই কার্য্য ছিল। সুরেশ শুদ্ধ করিয়া ইংরাজী বলিতে না জানিলেও বেশ তাড়াতাড়ি ইংরাজী বলিতে পারিতেন। যে সকল সাহেব মেমের সহিত তাঁহাকে কথা কহিতে হইত, তাঁহাদের অনেকেই বাঙ্গালা বা হিন্দী জানিতেন না, সুতরাং সুরেশ যে ইংরাজী জানিতেন তাহাতেই তাঁহার কাজ বেশ ভালরূপ চলিয়া যাইত। তিনি যে কাজে এই সময়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে অন্যত্র গিয়া অন্য রূপে জগতব্যাপী নাম করিতে পারিবেন, তাহা সে সময়ে কে ভাবিয়াছিল? তবে এ সময়ে এইরূপে সাহেবদের মধ্যে থাকিতে পাইয়া যে সাহেবদিগের আবভাবের তাঁহার বিশেষ বহুদর্শিতা জন্মিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই রূপে সুরেশ কিয়দ্দিবস স্পেন্সেস হোটেলে রহিলেন। কিন্তু বহু দিন এ চাকরী তাঁহার ভাল লাগিল না, এক কার্য্যে বহু দিন মনোনিবেশ করিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি প্রত্যহই গঙ্গার তীরে যাইতেন, প্রায়ই সাহেবদিগকে আনিতে বা তুলিয়া দিতে জাহাজে যাইতেন। এইরূপে জাহাজে যাওয়া আসায় তাঁহার প্রাণ বিলাত যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রাত্রি দিন শয়নে স্বপনে সর্ব্বদা তাঁহার একই চিন্তা, তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া যে কোন উপায়ে একবার বিলাত যাইবেনই যাইবেন,

তাহারই জন্য শত প্রকার উপায় উদ্ভাবন মনে মনে করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনটাই তাঁহার মনের বাসনা পূর্ণ করিবার পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইল না। এই রূপে মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, সুরেশের বিলাত ভ্রমণ ইচ্ছা পূর্ণ হইবার কোনই সম্ভাবনা হইল না। যে সকল সাহেব বিলাত হইতে এদেশে বেড়াইতে আসিতেন এবং যাঁহারা স্পেন্সেস হোটেলে বাস করায় সুরেশের সহিত সর্ব্বদাই কথা বার্ত্তা কহিতেন, সুরেশ তাঁহাদের অনেকের নিকট তাঁহার মনের বাসনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। সাহেবেরা তাঁহার কথায় কেবল মৃদু হাস্য করিতেন।

সুরেশ জানিতেন বিলাত যাইবার টাকার জন্য যদি তিনি তাঁহার আত্মীয় স্বজনের নিকট গমন করেন, তাহা হইলে তাহাতে কোনই ফল হইবে না, তাঁহারা এক পয়সাও দিবেন না। তাঁহাকে সকলেই ভুলিয়াছিল, কেবল ভুলেন নাই তাঁহার স্নেহময়ী জননী; কিন্তু তাঁহার হাতে টাকা নাই যে তিনি তাঁহাকে টাকা দিয়া তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ও উচ্চাভিলাস পূর্ণ করাইবেন! সুরেশের পিতার ভয়ে তিনি পুত্রের সহিত দেখা করিতেও সাহস করিতেন না। বাড়ীতে কেহ না থাকিলে তিনি সুরেশের কনিষ্ঠকে দিয়া সুরেশের প্রিয় আহারীয় দ্রব্য কখন কখন তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতেন। সুরেশের খুল্লতাতও মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, কিন্তু ইহাতে সুরেশের ভবিষ্যত জীবনের কোনই কিছু হইল না। সুরেশ তৃণের ন্যায় সংসার স্রোতস্বিনী বক্ষে ভাসিয়া চলিলেন।

সমুদ্র যাত্রা করিয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিব, ক্রমে এ ইচ্ছা সুরেশের মস্তিষ্কের সহিত যেন সংমিশ্রিত হইয়া গেল। তাঁহার প্রকৃতিতে সমুদ্র যাত্রা, সমুদ্রে সমুদ্রে নাবিকদিগের ন্যায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা, যেন সতসিদ্ধ বলিয়া তাঁহার নিকট বোধ হইতে লাগিল। ভ্রমণ বৃত্তান্তের নানা পুস্তক পাঠ করিয়া নানাদেশ ভ্রমণে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কোন গতিকে এদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য সুরেশ উন্মত্ত হইলেন।

এ সময়েও তিনি লণ্ডন মিশন কলেজে বসবাস করিতেছিলেন। আসটন সাহেবও সপরিবারে সেইস্থানে থাকিতেন। তিনি বরাবরই সুরেশকে স্নেহ করিতেন,—এক্ষণে সুরেশ খৃষ্টান হইয়া একরূপ তাঁহার পরিবার ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে বিশেষ আদর যত্ন করিতেন। অবসর মত একটু পড়াশোনা করিয়া সুরেশ আত্মোন্নতি করেন, আসটন সাহেব সর্ব্বদাই সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতেন। এখন যেরূপ চাকরীই সুরেশ করুন না কেন, লেখা পড়ার একটু উন্নতি করিলে যে ভবিষ্যতে ভাল হইতে পারে, আসটন সাহেব সর্ব্বদাই সুরেশকে এ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। সংসার হয় বিদ্যা নয় ধন না থাকিলে যে কেহই কাহাকে মানুষ বলিয়া গণ্য করে না, তাহা এ সংসারে আমরা কে না বুঝি? আসটন সাহেব ইহা জানিতেন, এবং তাহাই তিনি সুরেশকে লেখা পড়ায় অবসর মত মন দিতে বিশেষ জেদাজিদি করিতেন; কিন্তু তাঁহার সদুপদেশ বধির কর্ণে প্রদত্ত হইত, সুরেশের সহিত সরস্বতীর চির বিবাদ,—পড়া শোনা করিবার লোক তিনি

নহেন। কিরূপে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিবেন, ইহাই তাঁহার প্রাণের একান্ত আকাঙ্ক্ষা, সর্ব্বদা এই ইচ্ছাই তাঁহার মস্তিকে ঘূর্ণায়মান, পড়া শোনা করিবে কে? আসটন সাহেব ইহা জানিতেন, তবুও তিনি সুরেশকে ভাল বাসিতেন ও আদর যত্ন করিতেন। তিনি সুরেশকে কি ভাবে দেখিতেন, তাহা নিম্ন-লখিত পত্রখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। আসটন সাহেব সুরেশের ভাইকে এই পত্রখানি দিয়া ফাদার লাফোঁ সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন,—

"ইনি বাবু সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের ভ্রাতা। সুরেশ আমাদের ছাত্র এবং প্রায় ২১ বৎসর হইল খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। আমি তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতাম এবং আমাদের পরিবারে তিনি ছেলের মত" ছিলেন। কিন্তু কিয়দ্দিন পরে তাঁহার মন বড়ই চঞ্চল হইল। বিলাত দেখিবার জন্ম তিনি পাগল হইলেন। বি, আই ষ্টিমারের সহকারি ষ্টুয়ার্ড হইয়া তিনি বিলাত গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি আমার পিতা মাতার সঙ্গে দেখা করেন, তাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করেন। বিলাতে নানা কষ্ট পাইয়া অবশেষে তিনি জামরাক সাহেবের সারকাসে চাকরি পান; এবং শীঘ্রই তাঁহার দলে সিংহের সহিত খেলা করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে এই দলের সহিত তিনি ইয়োরোপের প্রায় সকল সহরে গিয়াছিলেন। এইরূপে নানা স্থানে ঘুরিয়া তিনি ব্রেজিলে উপস্থিত হন; এদেশে নানা চাকুরি করিয়া অবশেষে ব্রেজিল দেশীয় সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হয়েন। এক্ষণে উন্নতি লাভ করিয়া লেফ্‌টেনেণ্ট হইয়াছেন।

"তিনি কতকগুলি প্লাকার্ড ও সম্বাদ পত্র তাঁহার আত্মীয় দিগকে পাঠাইয়াছেন। আমার বোধ হয় এগুলি সব পর্টুগিজ ভাষায় লেখা। তাঁহার আত্মীয়গণ এগুলির অনুবাদ পাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছেন। আমার মনে হইল হয়ত আপনি বা ফাদারগণের মধ্যে অন্য কেহ পর্টুগিজ ভাষা পাঠ করিতে পারিবেন। বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুবাদ করিবার বোধ হয় আপনাদিগের সময় হইবে না। ইহাদের ভাবার্থ পাইলেই আমরা বিশেষ অনুগ্রহিত মনে করিব।"



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মে গমন।

যত সময় অতীত হইতে লাগিল, সুরেশের মন ততই কলিকাতা ত্যাগ করিবার জন্ম ব্যাকুল হইল। কলিকাতা ত্যাগ করিবার জন্ম তিনি এতই ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন যে এক দিন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কোংর আফিসে গিয়া রেঙ্গুনের একখানি ডেক টিকিট ক্রয় করিলেন। এত স্থান থাকিতে রেঙ্গুনে যাইবার জন্ম তিনি কেন ইচ্ছুক হইলেন, ইহার উত্তরে বলা যায় যে, বিলাত যাইবার কোন উপায় না দেখিয়া সুরেশ বর্ম্মায় যাওয়াই স্থির করিলেন। অল্প পয়সায় জাহাজে নূতন দেশে যাইতে ইচ্ছা করিলে রেঙ্গুনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত স্থান। যেখানেই হউক দেশ হইতে অন্তত্র গিয়া কোন কার্য্যকর্ম্ম করাই তাঁহার একান্ত বাসনা।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে ব্রহ্মদেশ এখনকার মত সভ্য বা ইংরাজ-রাজ্যের সুশৃঙ্খলা প্রাপ্ত হয় নাই। উপর ব্রহ্ম তখনও দেশীয় রাজার অধীন ছিল;—লোয়ার বর্ম্মা ইংরাজগণ দখল করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখনও সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। ইংরাজী জানা লোকেরও তখন ব্রহ্মদেশে বিশেষ অভাব ছিল; এই সকল কারণে সেখানে গেলে চাকুরী

সহজে মিলিবার সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া সুরেশ রেঙ্গুন যাত্রা করিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই সুরেশ নির্ব্বিঘ্নে রেঙ্গুনে আসিয়া পৌঁছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহার হস্তে সামান্য মাত্রই অর্থ ছিল;—যাহা ছিল কোন কাজ না মিলিলে তাহাতে বহু দিন চলিবার সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই সুরেশ মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, জাহাজ হইতে নামিয়াই কোন কাজের চেষ্টা করিবেন। নূতন স্থানে নূতন লোকের মধ্যে তিনি আসিলেন;—তিনি কাহাকে চিনেন না, কেহ তাঁহাকে চিনে না। যেখানে খুব সস্তায় থাকিতে পারা যায় প্রথমে তিনি সেইরূপ একটী বাসা খুঁজিতে বাহির হইলেন। কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে জাহাজ হইতে নামিয়া কিছু দূর যাইতে না যাইতে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত একটী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনি রেঙ্গুনে চাকুরী করিতেছিলেন। সুরেশের নিকট সকল শুনিয়া তিনি তাঁহাকে নিজ বাসায় লইয়া গেলেন। সুরেশের বাসার জন্য আর ভাবিতে হইল না। এক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে তিনি কোন কাজের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

যেখানে যেখানে চাকুরী পাইবার সম্ভাবনা, পর দিন হইতেই সুরেশ সেই সেই স্থানে গিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এখন রেঙ্গুন যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াছে, সুরেশ যখন গিয়াছিলেন, তখন সেরূপ ছিল না। এরূপ অপরিষ্কার সহর জগতের অন্যত্র কোন স্থান ছিল কি না বলা যায় না। তাহার উপর সহরের রাজপথে রাত্রে দলে দলে বদমাইসগণ ফিরিত;—কাহাকে একাকী নির্জ্জনে পাইলে আক্রমণ করিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত।

সুবিধা পাইলে খুন করিতেও তাহারা কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইত না। এই সকল দুর্ব্বৃত্ত মগগণ প্রায় লুটপাট করিয়া ধৃত হইত না। পুলিশ ইহাদের কিছুই করিতে পারিত না। এমন কি দিনের বেলায়ও ইহারা ইহাদের অস্ত্র দা হস্তে লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি-ঘুঁজিতে লুটের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিত, সুবিধা পাইলেই লোক-জনের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত। এরূপ বিপদসঙ্কুল সহর পৃথিবীর আর কুত্রাপি ছিল না; এত দুর্ব্বৃত্ত লোকও বোধ হয় অন্যত্র দেখা যাইত না। মগেরা চিরকালই লুটপাট করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ ক'রিত; যখন সুরেশ রেঙ্গুন গিয়াছিলেন, তখন এই স্থানের মগগণ পূর্ব্ব স্বভাব তখনও ভুলিতে পারে নাই।

সুরেশের বন্ধু তাঁহাকে এ সকল কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন,—কিন্তু ভয় কাহাকে বলে সুরেশ তাহা জানিতেন না, বন্ধুর কথায় যে তিনি বিশেষ কর্ণপাত করিয়া-ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। বিশেষতঃ তিনি গৃহে বসিয়া থাকিতে পারেন না, চাকুরীর চেষ্টায় তাঁহাকে সকল সময়েই সহরের সকল স্থানে যাইতে হইতেছে। বদমাইসের ভয় করিলে চাকুরীর চেষ্টা করা হয় না।



ষোড়শ পরিচ্ছেদ।



ডাকাতের সহিত যুদ্ধ।

একদিন সুরেশ রেঙ্গুনে নদীতে নৌকারোহণ করিতে গেলেন; সে সময়ে তিনি নৌকা চড়িতে বড়ই ভাল বাসিতেন। যদিও তাঁহার অর্থের সচ্ছলতা একেবারেই ছিল না, তবুও সুন্দর ইরাবতীনদীর স্বচ্ছজলে একবার নৌকারহণ না করিয়া তিনি নিরস্থ থাকিতে পারিলেন না। কিছু দিয়া একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ভাড়া করিয়া তিনি বহুক্ষণ ইরাবতী নদীতে নৌকা চড়িয়া বেড়াইলেন। ক্রমে ফিরিয়া ঘাটে আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল, তখন তিনি নৌকা হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। নৌকার দাঁড় টানিয়া তিনি ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে পদব্রজে যাইবার সময় তাঁহার শরীরে মৃদু মধুর বাতাস লাগায় তাঁহার প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে রেঙ্গুনের রাস্তায় যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তিনি তাহা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, এমন কি তাঁহার হস্তে একটী যষ্টিও নাই; তবে কলিকাতায় বাল্যকাল হইতে তিনি একগাছি ছোট রুল সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন, এখানেও এটী ছাড়িয়া তিনি কখন কোন স্থানে

যাইতেন না। অদ্যও তাঁহার সঙ্গে তাঁহার চির সহচর রুল-গাছটী ছিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আকাশে তারকারাজি একে একে ফুটিয়া উঠিয়াছে, চন্দ্র না উঠিলেও রাস্তা একেবারে অন্ধকার হয় নাই, মধ্যে মধ্যে কোন কোন দোকান হইতে আলো পড়িয়া রাস্তা আলোকিত করিয়াছে। সন্ধ্যার পর রেঙ্গুনের রাস্তায় বড় লোক চলাচল করে না; সুরেশ দুই দশ জন দরিদ্র মগকে গৃহে ফিরিতে দেখিতে পাইলেন। বাঙ্গালা দেশের শ্রমজীবিগণ যেরূপ সমস্ত দিনের পর গৃহে ফিরিবার সময় গলা ছাড়িয়া গান করে, মগেরা তাহা করে না। সুরেশ যাহাদিগকে দেখিলেন, তাহারা নীরবে গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। তিনিও নীরবে বাসার দিকে যাইতে ছিলেন, নানা চিন্তায় তাঁহার মন ব্যাকুলিত। একবার ঘোর হতাশ আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতেছে, আবার পর মুহূর্ত্তেই আশায় মন প্রাণ পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। যাহা হইয়া গিয়াছে, যাহা হইবে, এই সকল ভাবিতে ভাবিতে সুরেশ বাসার দিকে আসিতেছিলেন।

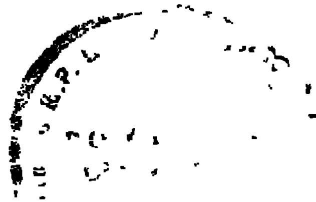
সহসা একটা শব্দে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন কি তাঁহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। সেটা নিকটস্থ প্রাচীরে গিয়া লাগায় সুরেশ শব্দে বুঝিলেন, সেখানি দা, দূর হইতে কে ছুড়িয়াছে। তিনি দাঁড়াইলেন, গলিটী ভাল করিয়া দেখিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর একখানি দা তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। কেবল অদৃষ্টবলে এই শানিত দা দুখানা তাঁহার গায়ে লাগিল না; লাগিলে তিনি হত না হইলেও বেগুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তিনি অন্ধকারে দুই ব্যক্তিকে অস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, কিন্তু আর সময় নাই। তিনি দেখিলেন যে, ঐ দুই ব্যক্তি তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। তখন তাঁহার বন্ধুর কথা মনে পড়িল, রেঙ্গুনের রাস্তায় যে নানা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা তিনি এখন বুঝিলেন। আর তাঁহার জীবনের যে আশা নাই, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। যম যে তাঁহাকে মৃত্যুর জন্যই রেঙ্গুনে আনিয়াছেন, তাহাও তিনি ভাবিলেন; কিন্তু মরিতে তিনি ভীত নহেন। ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। যদি মরিতে হয়, বীরের ন্যায় মরিব, মনে মনে ইহা স্থির করিয়া তিনি সদৃঢ়রূপে রুল ধরিলেন।

মগ দুজন তাঁহার নিকটস্থ হইল। একটা বাঙ্গালী বালককে আক্রমণ করিয়া লুটিয়া লওয়া অতি সহজ কার্য্য ভাবিয়া তাহারা কেবলমাত্র একজন সুরেশকে ধরিতে আসিল। অমনি সুরেশ এমনই বজ্রমুষ্টিতে রুলদ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন যে সে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া পড়িল। তখন অপর মগ একটু থমকাইয়া পড়িল, কিন্তু সুরেশ তাহার রুল দ্বারা তাহাকে প্রহার করিবার পূর্ব্বেই সে আসিয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিল,—হ্যাঁচকা টান মারিয়া তাঁহার হস্ত হইতে রুল কাড়িয়া লইল। তখন সুরেশ তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, দুইজনে ঘোর মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই সেই অন্ধকারময় রাজপথে পড়িয়া গিয়া উভয়েই উভয়কে পরাজিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু সুরেশ দেখিলেন মগ তাঁহাপেক্ষা বলবান,—আর কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই সে তাঁহার অস্থি চূর্ণ করিয়া দিবে, সে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সবলে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু ভগবান তাঁহার সহায়;

সে দিন তাঁহার মৃত্যুদিবস নহে। তিনি যখন প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন, ঠিক সেই সময়ে সেই রাস্তায় অনেক আলো দেখিতে পাওয়া গেল, লোকেরও কোলাহল শ্রুত হইল, অমনি স্থরেশ ডাকাত ডাকাত বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। যাহারা আসিতেছিলেন, তাহারা বরযাত্রী। তাঁহার চীৎকারে তাহারা সত্বর সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দস্যু তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার সঙ্গীকে টানিয়া লইয়া অন্ধকারে একটা গলির ভিতর অন্তর্দ্ধান হইল। স্থরেশ তাঁহার মুক্তিদাতাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।





সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অগ্নি হইতে স্ত্রীলোক রক্ষা।

কয়েক দিন ধরিয়া প্রত্যহ সুরেশ রেঙ্গুনের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি আফিস সকলে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, যাঁহার হস্তে কোন চাকুরি প্রদানের ক্ষমতা আছে, তাঁহারই সহিত দেখা করিলেন, কিন্তু চাকুরি পাওয়া দূরে থাকুক, চাকরি পাইবার যে কোন রূপ আশা আছে, এরূপও বোধ হইল না; তখন তিনি নিতান্ত হতাশ হইয়া প্যাগডা সজ্জিত রেঙ্গুন নগর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া কাজকর্ম্মের চেষ্টা করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার পূর্ণ শনির দশা, সহস্র চেষ্টা করিয়াও তিনি কোন বিষয়েই কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না।

যে দিন রাত্রে তিনি রেঙ্গুন হইতে রওনা হইবেন, সেই দিন সন্ধ্যার সময় তিনি রেঙ্গুনের রাজপথে একবার শেষ বেড়াইতে বাহির হইলেন।—তিনি কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে তাহার কর্ণে মনুষ্য কোলাহল প্রবেশ করিল,—তিনি একটু অগ্রসর হইয়া বুঝিলেন নিকটে আগুণ লাগিয়াছে। সুরেশ এরূপ কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র ছিলেন না। "আগুণ আগুণ" চীৎকার শুনিয়াই তিনি দৌড়াইয়া সেই

দিকে গেলেন। দেখিলেন একটি বাড়ীতে আগুণ লাগিয়াছে, সেই সময়ের প্রবল বাতাসে আগুণ ক্রমে ভয়ানক প্রবল হইয়া উঠিতেছে, নিকটস্থ দুই একটী বাড়ীতেও লাগিয়াছে। হাজার হাজার লোক সেই খানে জমিয়াছে, কিন্তু জন কয়েক ব্যতীত অপর সকলে দাঁড়াইয়া কেবল তামাসা দেখিতেছে। যাহারা জল লইয়া আসিয়া আগুণ নিবাইবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহারা শত চেষ্টাতেও আগুণকে নির্ব্বাপিত করিতে পারিতেছিল না। বাতাসের সহায়তা পাইয়া আগুণ ভয়াবহ ভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল। সুরেশ নিকটে গিয়া যাহারা আগুণ নিবাইবার চেষ্টা করিতেছিল, যথাসাধ্য তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের শত চেষ্টায় আগুণ নিবিল না,—একের পর অন্য বাটী গ্রাস করিতে লাগিল।

সহসা সেই মহা কোলাহল ভেদ করিয়া একটী রমণীর আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। সকলে চমকিত হইয়া বাড়ীর দিকে চাহিল, দেখিল এক যুবতী সেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত বাটীর ত্রিতলস্থ গবাক্ষে অগ্নি ও ধূমের মধ্যে দণ্ডায়মানা, তাহার চক্ষু বিস্ফারিত, হস্ত প্রসারিত, বদন আকাশের দিকে উত্তোলিত। দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় ভয়ে যুবতীর চক্ষু বিস্ফারিত, রক্ষা পাইবার আশায় হস্ত প্রসারিত ও ভগবানের প্রতি দৃষ্টির জন্য বদন আকাশের দিকে উত্তোলিত। এ দৃশ্য দেখিয়া জনতায় সহস্র সহস্র লোকের হৃদয়ে বিশেষ বেদনা লাগিল সত্য, কিন্তু কেহই সেই রমণীকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত হইল না। এক্ষণে সমস্ত বাটীটীকে অগ্নি যেরূপ গ্রাস করিয়াছিল তাহাতে এই রমণীকে

উদ্ধার করিবার চেষ্টা আর আপনার প্রাণ বলি দেওয়া একই কথা। সেই সহস্র সহস্র লোকের চক্ষের সম্মুখে যুবতীকে অগ্নিতে ঘেরিল, আর রক্ষা পাইবার কোন আশা নাই। দর্শকগণ ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া এই ভয়াবহ লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিতে লাগিল, কাহারও মুখ হইতে একটী শব্দও বাহির হইল না।

এইরূপে এই রমণী চক্ষের উপর অগ্নিতে ভস্মীভূত হইবে, সুরেশের প্রাণে ইহা সহিল না। ইহাকে রক্ষা করিবার জন্ত তিনি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং তখনই অমনি চীৎকার করিয়া নিকটস্থ লোকজনকে একখানা মই আনিতে বলিলেন। জনতাস্থ সকলেই রমণীর জন্ত বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্ত যে চেষ্টা হইবে ইহাতে তাহাদের সকলের হৃদয়ই উৎফুল্ল হইল। কয়েকজন ছুটিয়া গিয়া একটা মই আনিল। তখন সুরেশ এক কলসি জল নিজের মাথায় ঢালিয়া চক্ষের নিমিষে মই বাহিয়া অগ্নি পরিবেষ্টিত সেই গবাক্ষের নিকট উঠিলেন। জনতাস্থ লোকেরা তাঁহার অসীম সাহস দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল; স্পন্দিত হৃদয়ে তাঁহার অভূতপূর্ব্ব সাহসিক কার্য্য দেখিতে লাগিল।

লম্ফ দিয়া সুরেশ অগ্নিময় গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। রমণী তখনও সেইরূপ ভাবে সেই খানে দণ্ডায়মানা, বোধ হয় তাঁহার সংজ্ঞা নাই, তাঁহার চারিদিকে মহারোলে অগ্নি জ্বলিতেছে, ধূমে গৃহ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে সুরেশ বা রমণী কাহারই প্রাণ রক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু রমণী নীরব, নিস্তব্ধ, কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্তায় দণ্ডায়মান। তাঁহার

কেশদাম আলুলায়িত, অর্দ্ধদগ্ধ। তাঁহার বস্ত্র উন্মুক্ত, তাঁহার হস্ত প্রসারিত, তাঁহার আত্মরক্ষা করিবার জন্ত তাঁহার নিজের আর কোন ক্ষমতাই নাই। তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সুরেশ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা বুঝিলেন;—তিনি একবার ফিরিয়া গবাক্ষের দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন ধূ ধূ করিয়া গবাক্ষ জলিতেছে,—সে পথে বহির্গত হইয়া যাইবার আর উপায় নাই।—তিনি ব্যাকুলে গৃহের চারিদিকে চাহিলেন,—কোন দিক দিয়া বাহির হইবার উপায় নাই;—অগ্নি ঘোর রোলে চারিদিক ঘেরিয়াছে। তখন সুরেশ অনন্যোপায় হইয়া সবলে সেই গবাক্ষে পদাঘাত করিলেন;—ভীম পদাঘাতে সেই অর্দ্ধ দগ্ধ গবাক্ষ মহাশব্দে খসিয়া নীচে গিয়া পড়িল। তিনি নিমেষ মধ্যে রমণীকে ক্রোড়ে তুলিলেন, নিমেষ মধ্যে ভগ্ন গবাক্ষমুখে আসিলেন,—কিন্তু একি সর্ব্বনাশ। জানালার সঙ্গে সঙ্গে আঘাত লাগিয়া মই ও নিম্নে পতিত হইয়াছে।

তিনি চীৎকার করিয়া নিম্নস্থ লোকদিগকে আবার প্রাচীরে মই লাগাইতে বলিলেন। গোলযোগে ও লোকের কোলাহলে প্রথমে তাঁহার কথা কেহ শুনিতে পাইল না।—তিনি তখন মহা চীৎকার করিতে লাগিলেন। যখন নিম্নস্থ লোকেরা তাঁহাকে দেখিল ও তাঁহার কথা বুঝিল, তখন তাহারা তৎক্ষণাৎ মই লাগাইয়া দিল এবং ৮।১০ জনে সবলে সেই মই চাপিয়া রাখিল। সুরেশ অতি কষ্টে রমণীকে ক্রোড়ে লইয়া মই অবলম্বনে ক্রমে নিম্নের দিকে আসিতে লাগিলেন। যখন অর্দ্ধেক নামিয়াছেন তখন সহসা মই ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি রমণী সহ নিম্নে পড়িলেন। কিন্তু নিম্নস্থ লোকেরা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাদের উভয়-

কেই ধরিল ;—নতুবা উভয়েই গুরুতর আঘাত পাইতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সুরেশ নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল ;—তিনি মূৰ্চ্ছিত হইলেন। বলা বাহুল্য তিনি অৰ্দ্ধ দগ্ধ হইয়াছিলেন ;—বিশেষতঃ ধূমে তাঁহার প্রায় শ্বাসরোধ হইয়া আসিয়াছিল। তিনি নিম্নে পৌঁছিলে তাঁহার যে কি হইল, তাহা আর তাঁহার জ্ঞান নাই। যখন তাঁহার সংজ্ঞা হইল, তখন তিনি দেখিলেন যে তিনি তাঁহার বন্ধুর বাড়ীতে শায়িত আছেন ;—যে রমণীকে তিনি উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনি ও তাঁহার আত্মীয়গণ বিশেষ যত্নে তাঁহ'র শুশ্রূষা করিতেছেন। তিনি শুনিলেন যে তাঁহার পকেটে একখানা কাগজে তাঁহার বন্ধুর ঠিকানা দেখিয়া লোকেরা তাঁহাকে সেইখানে লইয়া আসিয়াছিল, নতুবা হয়ত তাঁহাকে অপরিচিতের আলয়ে যাইতে হইত।

রমণীর শুশ্রূষায় কয়েকদিনের মধ্যেই সুরেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন ;—কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে রমণী তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি এ ভালবাসার প্রতিদান করিতে অক্ষম,—তিনি রমণীর হৃদয়ে যে বেদনা দিলেন তাহাতে তিনি নিজেও হৃদয়ে বিশেষ বেদনা পাইলেন ; কিন্তু উপায় নাই। তিনি যথা সম্ভব শীঘ্র রেঙ্গুন ত্যাগ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া তাহারই সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

-:o:-

মান্দ্রাজ যাত্রা।

রেঙ্গুন হইতে সুরেশ কলিকাতায় ফিরিলেন না। রেঙ্গুনে মান্দ্রাজীর সংখ্যাই অধিক; এমন কি রেঙ্গুনের রাজপথে মগ অপেক্ষা মান্দ্রাজী বারবণিতা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি রেঙ্গুনে থাকা কালীন অনেক মান্দ্রাজীর সহিত পরিচিতও হইয়াছিলেন, এই সকল কারণে তাঁহার একবার মান্দ্রাজ দেখিবার ইচ্ছা হইল। মান্দ্রাজকে সকলই "অন্ধকারাবৃত দেশ" বলিত,—তখনও মান্দ্রাজে উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই; কাজেই সুরেশ মনে মনে ভাবিলেন, সম্ভবতঃ মান্দ্রাজে চেষ্টা করিলে তিনি কোন না কোন চাকুরি যোগাড় করিতে পারিবেন। এই সকল ভাবিয়া তিনি একটু সুস্থ হইয়া উঠিবা মাত্রই মান্দ্রাজের একখানি ডেক টিকিট কিনিয়া জাহাজে উঠিলেন।

কয়েকদিন পরে তিনি মান্দ্রাজে পৌঁছিলেন। এ সেই সহর যে সহরে ভারত সাম্রাজ্য স্থাপয়িতা ক্লাইভ প্রথমে কেরাণীর কার্য্য করিয়া পরে সৈনিক কার্য্যে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যেখানে তিনি নিজ জীবনে বিরক্ত হইয়া গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন!

আজ হতাশ সাগরে ভাসিতে ভাসিতে সুরেশও সেই প্রাচীন ইংরেজ অভিনিবেশ মান্দ্রাজ সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এ সহরেও তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত, কেহ তাঁহাকে চিনে না, তিনিও কাহাকে চিনেন না। যাহা হউক তিনি দিন কয়েক এখানে বাস করিবার জন্ত একটী অতি সস্তায় বাসা স্থির করিয়া লইলেন। সহরের অতি জঘন্ত পল্লিতে এই বাসস্থান মিলিল এবং যে ক্ষুদ্র গৃহে তিনি বাস করিতে লাগিলেন, সেখানে শূকরও থাকিতে লজ্জাবোধ করিত। কিন্তু সুরেশের স্তায় কষ্টসহিষ্ণু বোধ হয় আর জগতে কেহ ছিল না, তিনি সহস্র কষ্টেও ব্যথিত হইতেন না।

মান্দ্রাজে থাকিবার জন্ত কোন প্রলোভন সুরেশের ছিল না; মান্দ্রাজে দেখিবার মত কিছুই নাই; তবে যদি কোন চাকুরী মিলে এই আশায় তিনি মান্দ্রাসের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি আপিসে ঘুরিলেন, কিন্তু রেঙ্গুনে তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছিল, এখানেও তাহাই হইল; কোথায়ও কোন চাকুরী মিলিল না। বিশেষতঃ তিনি এদেশের ভাষা তামিল ও তেলুগু একেবারে জানিতেন না। এ ভাষা যে তিনি মাসেক দুইমাসে শিখিতে সক্ষম হইবেন, এ সম্ভাবনাও একেবারে ছিল না; কাজেই এখানে কোন কাজ পাইবার সম্ভাবনা তাঁহার নাই তাহা তিনি বুঝিলেন। তবে খ্রীষ্টান পরিবারে কোন চাকুরী জুটিলেও জুটিতেও পারে, এই আশায় তিনি কয়েক দিন মান্দ্রাজে থাকিয়া সেই চেষ্টাই করিতে লাগিলেন।

বাল্যকাল হইতেই তিনি অতিশয় সহিষ্ণু, তাঁহার এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার বলেই তিনি এক্ষণে জগতে এরূপ

খ্যাতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সেই সহিষ্ণুতার বলে তিনি মাল্লাজের প্রতি খ্রীষ্টান পরিবারের দ্বারে উপস্থিত হইয়া যে কোন কাজ করিতে প্রস্তুত বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু কোথায়ও কোন কাজ জুটিল না। তিনি এমন কি একটী বাড়ীও দেখিতে বাদ রাখিলেন না; মাল্লাজে যত খ্রীষ্টান পরিবার ছিল, তাহার প্রত্যেকের নিকট গেলেন, কিন্তু কোথায়ও কিছু হইল না। তিনি ক্রমে হতাশ হইতে লাগিলেন, তাঁহার নিকট যে কয়টী মাত্র টাকা ছিল তাহাও ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। শেষ কয়েক আনা মাত্র অবশিষ্ট আছে,—এই কয়টী পয়সা ব্যয় হইয়া গেলে তাঁহাকে এই বিদেশে অনাহারে রাজপথের ধারে পড়িয়া মরিতে হইবে। কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার তাঁহার আর উপায় নাই, তাঁহার জাহাজ ভাড়া নাই; খাটিয়া কোন চাকুরী করিয়া জাহাজ ভাড়া সংগ্রহ করিতে না পারিলে তাঁহার আর দেশে ফিরিবার উপায় নাই! তিনি কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অস্থ মনে সমুদ্রের তীরে আসিলেন। সম্মুখে নীল সমুদ্র ফেনমালায় ভূষিত হইয়া পর্ব্বতাকার তরঙ্গে গড়াইতে গড়াইতে বেলাভূমে আসিয়া পড়িতেছে;—সুরেশ জীবনে হতাশ হইয়াছেন, সমুদ্রের এই ভীম ভাব তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইলে তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "জীবনে আর প্রয়োজন কি? এত কষ্ট পাইয়া কষ্টের জীবন রাখায় লাভ কি? এই ত সম্মুখে সমুদ্র নাচিতেছে। লাফাইয়া ইহার সুশীতল গর্ভে পতিত হইলেই ত সকল জ্বালা জুড়ায়?" কতবার তিনি এই ভাব মন হইতে দূর করিলেন, তিনি সমু-

দ্রের নিকট হইতে দূরে গমন করিলেন, কিন্তু আবার সেই ভাব মনে আসিল, আবার কে যেন তাঁহাকে সমুদ্রের নিকট আনিল। তিনি প্রাণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। প্রাণের ভিতর কে যেন তাঁহাকে বলিতেছিল, "সুরেশ, মরিও না। তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।"

এইরূপ নানা চিন্তায় উৎপীড়িত হইয়া সুরেশ ধীরে ধীরে হতাশ পদে সমুদ্র তীরে পদচারণ করিতে ছিলেন। তাঁহার সাহেবী পোষাক পরিধান ছিল, কিন্তু সে পরিচ্ছদের অবস্থা এমনই হইয়াছে যে, তাহা দেখিলেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে। তাঁহার পাদুকা ছিন্ন, সার্ট ময়লা, কোট ছেঁড়া, পেণ্টুলেনে তালি দেওয়া, তাঁহার সোলা হ্যাট্ ধূলায় ধূলায় কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহার চেহারা ও বেশ দেখিলে অপরিচিত লোকে যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে কোন কাজ দিবে বা তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিবে, এরূপ কোন সম্ভাবনা ছিল না।

সমুদ্রতীরে সাহেবের ছেলেমেয়েগণ নাচিয়া নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল,—তাহাদের দেখিয়া সুরেশের নাথপুরের কথা মনে পড়িল। কত সুখে বাল্যকালে তিনি নাথপুরে খেলা করিয়া বেড়াইতেন,—আর আজ বিদেশ বিভূমে মান্দ্রাজ উপকূলে তাঁহার কি দুর্দ্দশা! সহসা তাঁহার জননীর স্নেহমাখা মুখ মনে উদিত হইল। না জানি তাঁহার এইরূপ নিরুদ্দেশে তিনি কত কষ্টে কাল কাটাইতেছেন! না জানি তিনি কত কাঁদিতেছেন, কত কষ্ট পাইতেছেন! হায়, তিনি দূর মান্দ্রাজে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত;—তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না! এই

সকল চিন্তায় সুরেশ উন্মত্ত প্রায় হইলেন। হয়তঃ তিনি আত্ম-হত্যা করিতেন; এইরূপ সময় সহসা তাঁহার দৃষ্টি এক ব্যক্তির প্রতি পড়িল;—অমনি তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি এই ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে ব্যগ্র হইলেন।

ইনি একটি বৃদ্ধ ফিরিঙ্গি সাহেব। ইহাঁর সমস্ত কেশ ও লম্বমান শ্মশ্রু শ্বেত হইয়া গিয়াছে। অতি সৌম্যভাব, দেখিলে ভক্তি হয়। দেখিলেই বোধ হয় যেন ইনি শান্তির ক্রোড়ে বিরাজ লাভ করিতেছেন। সুরেশ ইহাঁকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে মস্তকস্থ টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিলেন। সাহেব তাঁহাকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমি কি তোমার কোন সাহায্য করিতে পারি?" সুরেশ বলিলেন, "আমি বিদেশী।"

সাহেব। তোমার চেহারা দেখিয়া তা স্পষ্ট বুঝা যায়। মাদ্রাজে কি জন্ত আসিয়াছ?

সুরেশ। কোন চাকুরি পাইবার আশায় এখানে আসিয়া-ছিলাম, কিন্তু যদিও আমি সর্ব্বত্র চেষ্টা করিয়াছি, তবুও কোথাও কিছু যোগাড় করিতে পারি নাই।

সাহেব। সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। চাকুরী পাওয়া এখন বড়ই কঠিন। আমি বৃদ্ধ হইয়া কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছি, আমি যে তোমাকে কোন সাহায্য করিতে পারিব এরূপ বোধ হয় না।

সুরেশ। মহাশয়! আমি প্রায় অনাহারে আছি; আমার নিকট যে অর্থ আছে, তাহাতে কাল আমি একখানি রুটী কিনিতেও সক্ষম হইব না।

সাহেব। তুমি দেশে যাও না কেন ?

সুরেশ। আমার দেশ কলিকাতা।

সাহেব। কলিকাতা ছেড়ে মান্দ্রাজে এলে কেন ?

সুরেশ। আমি কলিকাতায় স্পেন্সেস হোটেলে চাকুরী করিতাম। সেখান হইতে রেঙ্গুনে যাই। সেখানে কোন চাকুরী জোগাড় করিতে না পারিয়া মান্দ্রাজে আসি। এখানেও কিছুই জোগাড় করিতে পারিতেছি না।

সাহেব। এখানে যে কেহ তোমার সাহায্য করিবে এমত বোধ হয় না।

সুরেশ। তা আমি বুঝিয়াছি। এক্ষণে আমাকে অনাহারে মরিতে হইবে!

সাহেব। কতদূর লেখা পড়া করিয়াছ ?

সুরেশ। লণ্ডন মিশন কলেজে কয় বৎসর লেখা পড়া করিয়াছি। কিছু কিছু ইংরাজী ও বাঙ্গলা জানি।

সাহেব। তুমি কি খ্রীষ্টান ?

সুরেশ। হাঁ মহাশয়! আসটন সাহেব আমাকে খ্রীষ্টান করেন।

বৃদ্ধসাহেব কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। তাঁহারা উভয়েই কথা কহিতে কহিতে চলিতেছিলেন। যদিও সুরেশ সাহেবকে আরও অনেক কথা বলিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু মনের সে ইচ্ছা মনেই রাখিলেন, সাহেবকে বিরক্ত করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন না। বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সাহেব বলিলেন, "তুমি কি কাজ করিতে পার, মনে কর ?"

সুরেশ। যাতে আমি বাড়ী ফিরে যাবার ভাড়া সংগ্রহ

করিতে পারি, আর প্রত্যহ এক মুঠা খেতে পাই, সেই কাজই আমি করিতে সক্ষম।

সাহেব। বেড়াইবার সখ মিটেছে ? বাড়ীর চেয়ে স্থান নেই।

আবার সাহেব বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন ;—পরে সুরেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি দুটী ছেলেকে দেখ্‌তে শুন্‌তে পারো ? আমি উপস্থিত তোমাকে অন্য কোন কাজ দিতে পারি না। অন্য কোন কাজ হাতে নাই। আমি তোমাকে চিনিনা, কাজেই আমি তোমার জন্য অন্যত্র অনুরোধ করিতে পারি না। দিন কতক গেলে তোমাকে দেখিলে শুনিলে হয়ত তোমাকে আমি অন্য কোন ভাল কাজ যোগাড় করিয়া দিতে পারিব।

সুরেশ। মহাশয়! আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, এরূপ ক্ষমতা আমার নাই।

সুরেশ সাহেবের সহিত তাঁহার বাড়ী গমন করিলেন। সেই দিন হইতে তিনি বৃদ্ধ সাহেবের দুটী ক্ষুদ্র পৌত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন। সুরেশ শীঘ্রই সকলের প্রিয় হইতে পারিতেন ; এখানেও অতি শীঘ্র তিনি সাহেব ও মেমদিগের প্রিয়পাত্র হইলেন।

এই পরিবারে সুরেশ কয়েক মাস রহিলেন। যখন তাঁহার কলিকাতা যাইবার ভাড়া ও সেখানে গিয়া কিছু দিন থাকিবার খরচ সংগ্রহ হইল, তখন তিনি বৃদ্ধ সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় চলিলেন।

ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সুরেশ কোন পাকা চাকুরী জোগাড় করিতে পারিলেন না। যখন যাহা জুটিতে লাগিল, তখন তাহাই করিতে লাগিলেন; এবং সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র চেষ্টায় রহিলেন। তাঁহার সময় তখন মন্দ,—তিনি শত চেষ্টায়ও কোন ভাল চাকুরী পাইলেন না। তবে তাঁহার অনাহারের কষ্ট ছিল না। আসটন সাহেব তাঁহাকে সর্ব্বদা অবাধে লণ্ডন মিশন বোর্ডিংয়ে বাস করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি ইচ্ছা-মত সেইখানে বাস করিতে ও ভোজন করিতে পাইতেন, এ বিষয়ের জন্য তাঁহার কোন চিন্তা ছিল না। তবে ভোজন ও বাসের সংস্থান হইলেও লোকে নিজ খরচের জন্য দুই চারি টাকা চাহে, সুরেশের এক্ষণে তাহারই অভাব।

মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি একদিন বাটীতে যখন তাঁহার পিতা ও খুল্লতাত ও অন্যান্য পুরুষগণ অনুপস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার জননী কাহাকে কিছু না বলিয়া তাঁহাকে কয়েকটী টাকা দিলেন। তিনি তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি-

বার জন্ত অনুরোধ করিলেন, বলিলেন যতদিন না কোন চাকুরি হয়, মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত দেখা করিলে তিনি তাঁহাকে কিছু কিছু টাকা দিবেন, কিন্তু সুরেশের জননীর সহিত সাক্ষাৎ প্রায়ই ঘটিত না।

এক্ষণে সুরেশের স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সংসারের বিপদাপদের অপেক্ষা স্বভাবকে নরম করিবার আর উৎকৃষ্টতর যন্ত্র কিছুই নাই। সংসার সমুদ্রের মহাতরঙ্গে পতিত হইয়া সুরেশেরও ঔদ্ধত্য লোপ পাইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে লেখা পড়ার উন্নতি না করিলে সংসারে বড় হইবার কোন আশা নাই। এক্ষণে পড়া শোনা করিবার জন্ত তাঁহার যথেষ্ট সময় ছিল, কিন্তু পুস্তকে বহুক্ষণ মনোনিবেশ করিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া তিনি বুঝিলেন, একটু লেখা পড়ার উন্নতি করা একান্ত আবশ্তক,—তাহাই এক্ষণে তিনি সময় পাইলেই কোন না কোন পুস্তক পাঠ করিতেন। তিনি উপন্তাসের বড় প্রিয় ছিলেন না, যে সকল পুস্তকে নূতন নূতন দেশের বর্ণনা আছে, নূতন নূতন শিখিবার বিষয় আছে, তিনি সেই সকল পুস্তকই পাঠ করিতেন।

এইরূপে ক্রমে তাঁহার লেখা পড়ার উন্নতি হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার জীবনের একমাত্র আশা এখনও দূর হয় নাই, এখনও তিনি দিন রাত বিলাত যাইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকেন, মনে মনে এ সম্বন্ধে কত গড়েন ভাঙ্গেন, ইহার জন্ত কত লোকের নিকট গমন করেন, কিন্তু কোন স্থানেই কিছু করিতে পারেন না। তিনি তাঁহার আশা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভা-

থনাই দেখিলেন না। সময় পাইলেই তিনি গঙ্গার তীরে জেটিতে জেটিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সুবিধা হইলেই সেলার্সহোমে গিয়া জাহাজি গোরাদিগকে একটু সুরা পান করাইয়া তাহাদের মুখে সমুদ্রের কথা, বিপদ আপদের কথা, নানা দেশের কথা শুনিতেন। যতই তিনি এই সকল শুনিতেন, ততই তাঁহার বিলাত দেখিবার জন্য মন পাগল হইয়া উঠিত। যদি জাহাজের গোরা হইয়াও বিলাত যাইতে হয়, তাহাও যাই-বেন,—যেন তেন উপায়ে যাওয়াই চাই। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল কার্য্যের জাহাজ আছে, সেই সকল স্থানে গমন করিয়া নিজ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন,—কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণ-পাত করিলেন না। তিনি যাঁহাদের নিকট গেলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার কথা শুনিয়া মৃদু হাস্য করিলেন, কেহ কেহ বা বিরক্ত হইয়া রূঢ় ভাবে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু সুরেশ তবুও আশা ছাড়িলেন না; সুরেশ হতাশ হইবার পাত্র ছিলেন না।



বিংশতি পরিচ্ছেদ।

স্বদেশকে বিদায়।

এইরূপে দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গেল, সুরেশের আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা সেই রূপ সুদূর পরাহতই রহিল। যখন এইরূপে হতাশ চিত্তে কলিকাতার রাজপথে তিনি ফিরিতেছিলেন, সেই সময়ে এক দিন তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে বি, এস্, এন, কোংর একখানি জাহাজের কাপ্তেন সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কাপ্তেন সাহেবের জাহাজ সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছে, মাল নাবান, মাল বোঝাই করা, জাহাজ রঙ্গ করা প্রভৃতিতে জাহাজ প্রায় মাসাধিকের উপর কলিকাতায় থাকিবে। কাপ্তেন সাহেব নিতান্ত দয়াবান্ ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন ;—ভারতবাসীর প্রতি বিন্দুমাত্র তাঁহার বিদ্বেষ ভাব ছিল না। তাঁহার নিকট তিনিও যেরূপ মানুষ, সুরেশও সেইরূপ মানুষ ;—বিশেষতঃ সুরেশ তাঁহার স্বদেশীয় ভাষায় তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে পারেন ইহাতে তিনি সুরেশের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন। যদি তাঁহা দ্বারা সুরেশের কোন উপকার হয়, তাহা তিনি আনন্দের সহিত করিবেন বলিয়া তিনি সুরেশকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বিদায় হইলেন।

সুরেশ কাপ্তেন সাহেবের জাহাজের নাম ও ঠিকানা জানিয়া লইয়াছিলেন; সেইদিন হইতে তিনি প্রত্যহ জাহাজে গিয়া কাপ্তেন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। এইরূপ যাওয়া আশার উভয়ে বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিল, সাহেব পুত্র নির্ব্বিশেষে সুরেশকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। প্রথমে সুরেশ কাপ্তেনসাহেবকে নিজের মনের কথা কিছুই প্রকাশ করেন নাই; পরে এক দিন তিনি নিজের সমস্ত অবস্থা জানাইয়া প্রাণের ইচ্ছা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। এত অল্প বয়সে যে তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করেন, এ প্রস্তাবে সাহেব অনুমোদন করিলেন না। পরে সুরেশের অনুনয় বিনয়ে তিনি সুরেশকে লণ্ডনে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। তিনি সুরেশকে তাঁহার জাহাজের আসিষ্টাণ্ট ষ্টুয়ার্ডের পদে নিযুক্ত করিলেন।

কয়েক দিন পরেই জাহাজ কলিকাতা ছাড়িয়া বঙ্গোপসাগরের দিকে চলিল। বালক সুরেশ;—কারণ তখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসরের ঊর্দ্ধ নহে,—ব্যাকুল নেত্রে জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া একবার শেষ কলিকাতা দেখিয়া লইলেন। জাহাজ ছাড়িয়া যাইতেছে দেখিবার জন্য অনেক লোক গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়াছে;—কিন্তু তাহাদের মধ্যে সুরেশের আপনার বলিবার কেহই ছিল না। তিনি যে জন্মের মত স্বদেশ, স্বজন, জনক জননী সকল পরিত্যাগ করিয়া দূর বিদেশে প্রস্থান করিতেছেন, তাহা কেহ জানিল না; দেখিল না, কেহ তাঁহার জন্য এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিল না!

সে সময়ে সুরেশের প্রাণের যে কি অবস্থা তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। তিনি কোথা যাইতেছেন, কি করিবেন, তাহার

স্থিরতা নাই। তিনি দূর বিদেশে বিদেশীর মধ্যে যাইতেছেন, তাঁহার অদৃষ্টে কি আছে তাহা কে বলিতে পারে! স্নেহময়ী জননীকে কাঁদাইয়া তিনি চিরদিনের জন্য চলিলেন, ইহাতে তাঁহার হৃদয় ছিন্ন হইতে লাগিল! তিনি কতবার ভাবিলেন,—এখনও সময় আছে, কাপ্তেন সাহেবকে বলিয়া ডেঙ্গায় নামিয়া পড়ি;—আর বিলাত দেখিয়া কাজ নাই। কিন্তু তৎক্ষণাৎ হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে শমিত করিলেন;—চক্ষের জল চক্ষে মুছিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জন্মভূমির নিকট হইতে চিরদিনেরজন্য বিদায় লইলেন।

এ রূপ ভাবে ডেকের উপর দাঁড়াইয়া তিনি জন্মভূমিকে যে শেষ দেখা দেখিবেন এক্ষণে সুরেশের সে অবস্থাও নাই। তিনি জাহাজে চাকুরী লইয়াছেন, জাহাজের চাকর,—তাঁহার শত কার্য্য করিবার আছে,—তিনি এরূপ ভাবে থাকিলে চলিবে কেন? জাহাজের কাপ্তেন ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণই বা তাঁহাকে ইহা করিতে দিবেন কেন? রুমালে মুখ মুছিয়া হৃদয়ের বেদনা হৃদয়ে লুকাইয়া সুরেশ জাহাজের যে স্থানে তাঁহাকে কাজ করিতে হইবে সেইস্থানে গমন করিলেন।



একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

সমুদ্র যাত্রা।

যে জাহাজে সুরেশ চাকুরী লইয়া চলিলেন সেই জাহাজে অনেক সাহেব মেম যাইতেছিলেন। সাহেবদিগের মধ্যে কতক-গুলি সওদাগর, কতকগুলি চাকুরে, মেমদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বামী সমভিব্যাহারে দেশে যাইতেছিলেন, কেহ কেহ বা স্বাস্থ্যের জন্য, কেহ কেহ বা দেশ বেড়াইবার জন্য চলিয়াছেন।

জাহাজের নাবিকদিগের মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজ; জন-কয়েক দেশী খালাসী আছে। সুরেশ কোনমতেই এই সকল লোকের সহিত মিশিতে পারেন না; যে সকল ইংরেজ নাবিক ছিল, সুরেশ প্রথম প্রথম তাহাদের সহিতও মিশিতে পারিলেন না। তিনি আসিষ্টাণ্ট ষ্টুয়ার্ডের পদ পাইয়াছেন, ইহাতে তাহারা সন্তুষ্ট নহে, তবে তিনি কাপ্তেন সাহেবের প্রিয়পাত্র, কাপ্তেনের ভয়ে কেহ তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে সাহস পাইত না। কাহারও সহিত মিশিতে না পারিয়া, কাহারও সহিত কথা কহিতে না পাইয়া, বহুসংখ্যক লোক জাহাজে থাকা সত্বেও

তিনি যেন একাকী, এরূপ অবস্থায় সুরেশ বড়ই কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তিনি এরূপে দেশ ছাড়িয়া আসিয়া ভাল করেন নাই, মনে মনে ইহা ভাবিয়া সময় সময় অনুতপ্ত হইলেন; কিন্তু তিনি প্রথমে তাঁহার জীবন যেরূপ দুঃখময় ভাবিয়াছিলেন, কয়েক দিন পরে দেখিলেন প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। আরোহীদিগের নিকট তাঁহার চাকুরীর খাতিরে নানা কার্য্যের জন্য যাইতে হইত। আরোহীদিগের পরিচর্য্যা করাই তাঁহার চাকুরীর প্রধান কার্য্য। কাজেই প্রায়ই তাঁহাকে তাঁহাদের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে হইত। অনেক আরোহী তাঁহাকে সর্ব্বোতভাবে চাকরের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, প্রায়ই তাঁহার সহিত কথা কহিতেন না; কিন্তু অনেকে তাঁহার বয়স অল্প, পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, হাবভাব ভদ্রলোকের ন্যায়, তাঁহার ইংরাজি কথা ইংরাজের ন্যায় দেখিয়া তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেন; কয়েকজন মেমও তাঁহার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। মেমেরা তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে উৎসুক হইতেন; এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াও বিশেষ আমোদ লাভ করিতেন। সাহেব দিগের মধ্যেও অনেকে তাঁহাকে দেশীয় বলিয়া ঘৃণা করিতেন না। যদিও তাঁহারা সুরেশকে সদ্বংশজাত বলিয়া জানিতেন না, তাঁহাকে খালাসী খানসামার জাতি মনে করিতেন, তবুও তাঁহাকে নিতান্ত চাকরের ন্যায় ব্যবহার করিতেন না। সুরেশ প্রথমে জাহাজে কয়দিন যেরূপ মানসিক ক্লেশ বোধ করিয়াছিলেন, পরে তদপরিবর্ত্তে বরং বিশেষ আমোদে ও সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এতদিনে তাঁহার জীবনের আশা মিটিতে চলিল। তিনি ক্রমেই লণ্ডনের নিকটস্থ হইতেছেন। যে বিলাত দেখিবার জন্ত তিনি কয়বৎসর উন্মাদের স্তায় কলিকাতার রাজপথে ঘুরিতেছিলেন, সেই বিলাত আর কয়েকদিনের মধ্যে তিনি দেখিতে পাইবেন! সেই বিলাতের রাজপথে তিনি বেড়াইতে পারিবেন। এ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া তাঁহার প্রাণ মন উৎফুল্লিত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি ভাবিলেন জাহাজস্থ সাহেব মেমগণ যখন তাঁহাকে এত যত্ন করিলেন, তাঁহারা যখন তাঁহার সহিত এত সদ্ব্যবহার করিলেন, তখন তিনি অনায়াসেই বিলাতে একটা চাকুরী জোগাড় করিতে পারিবেন। হয়ত কোন সদাশয় ইংরাজ তাঁহার ভবিষ্যত উন্নতির পথ উদ্ঘাটিত করিয়া দিবার জন্ত তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতেও পারেন। এই সকল সুখের চিন্তায় সুরেশ বড়ই সুখে দিন কাটাইতেছিলেন। তাঁহার সহকর্ম্মচারিগণ এবং নাবিকগণ প্রথমে তাঁহার সহিত ভাল ব্যবহার না করিলেও পরে তাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়া সকলেই তাঁহাকে আদর যত্ন করিতেন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত সকলেই চেষ্টা পাইতেন। ইংরাজ নাবিকগণের স্তায় মন খোলা লোক সংসারে আর নাই, ইহারা সকলের সঙ্গেই মিশামিশি করিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। সুরেশ ইহাদের সহিত জাহাজে প্রকৃতই বড় সুখে ছিলেন।

জাহাজে পথে কোন বাধা বিপত্তি ঘটিল না। ক্রমে নিরাপদে জাহাজ লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইল। আরোহীগণ স্বদেশে পৌঁছিয়া কালবিলম্ব না করিয়া সকলে ব্যগ্র হইয়া জাহাজ হইতে

নামিয়া স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন। সুরেশ জাহাজের উপর দাঁড়াইয়া জগতের শ্রেষ্ঠ সহর লণ্ডন নগরের দিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন।



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

লণ্ডনে।

জাহাজ টেম্‌সনদীর তীরস্থ লণ্ডন মহানগরী পার্শ্বে আসিয়া লাগিল। আরোহীগণ নিজ নিজ মালামাল লইয়া ব্যস্ত হইলেন। নাবিকগণ জাহাজ নঙ্গর করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কস্‌টম আফিসের কর্ম্মচারীগণ আসিয়া সকলের বাক্স পেঁটারা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। যে সকল দ্রব্য মাশুল ব্যতীত বিলাতে লইয়া যাওয়া যায় না, নাবিকগণ বা আরোহীগণ কেহ লুকাইয়া তাহা আনিয়াছে কি না, ইহাঁরা তাহাই দেখিতে লাগিলেন। জাহাজের উপর হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, চারিদিকেই লোক ছুটাছুটি করিতেছে।

আরোহীগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনেরা জাহাজের উপর আসিয়াছেন,—চারিদিকেই হস্ত আলোড়ন, সকলেরই হাসি মুখ। বহু দিন পরে হয়ত স্বামী স্ত্রীকে দেখিতেছেন, জননী পুত্র কন্যার মুখ চুম্বন করিতেছেন, পিতা পুত্রকে ক্রোড়ে লইতেছেন,—এই দৃশ্য সুরেশ জাহাজের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার কন্তেমার ও [illegible]নাথপুরের বাড়ীর কথা মনে হইতেছিল, স্নেহময়ী জননীর মুখ

মনে পড়িতেছিল ;—আর কি কখন মায়ের সহিত দেখা হইবে, আর কি কখনও দেশে ফিরিতে পারিবেন না!

সম্মুখে সুরেশ যে দৃশ্য দেখিতেছিলেন, তেমন তিনি স্বপ্নেও কখনও উপলব্ধি করেন নাই। যে সাহেবদের ভারতবাসী দেবলোকবাসী দেবতা মনে করিয়া থাকে ;—এখানে সেই সাহেবদিগের ছড়াছড়ি। মুটে সাহেব, গাড়োয়ান সাহেব,—চাকর নকর সকলই সাহেব,—যত দূর দৃষ্টি চলে তত দূর সাদা মুখ,—কাল লোক একটীও নজরে আইসে না। লণ্ডন সহরই বা কি ভয়ানক ব্যাপার,—বর্ণনা হয় না। হাজার হাজার সাহেব রাজপথে ছুটিতেছেন,—পদ্মফুলকে লজ্জা দিয়া মেমেরা নানা সাজে যাইতেছেন,—কত গাড়ী, কত ঘোড়া,—কত জাহাজ, কত নৌকা;—সুরেশ ভারতের প্রধান সহর কলিকাতাবাসী,—কিন্তু লণ্ডন দেখিয়া তাঁহার কলিকাতাকে নগণ্য সামান্য গ্রাম বলিয়া প্রতীতি জন্মিল।—তিনি কোন্ দিকে কি দেখিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল ;—তিনি হতভম্বের ন্যায় এক স্থানে দাঁড়াইয়া এক দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কেহ তাঁহাকে দেখিতেছিল না,—কেহ তাঁহার সম্বাদ লইতেছিল না ;—আরোহীগণ ব্যগ্রভাবে মালামাল লইয়া আত্মীয় স্বজন বেষ্টিত হইয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া যাইতেছিলেন। নাবিকগণ জাহাজকে সুদৃঢ়রূপে নঙ্গরবদ্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত ছিল ; সুরেশের সম্বাদ লইবার তাহাদের অবসর ছিল না। জাহাজ বন্দরে আসিয়াছে, হিসাবপত্র সমস্তই জাহাজ-স্বামীকে দিতে হইবে, সেই সকল কাগজপত্র লইয়া কাপ্তেন সাহেব ব্যস্ত ;—

তাঁহারও সুরেশের সম্বাদ লইবার অবসর নাই। এই জনাকীর্ণ জাহাজের উপর সুরেশ মনে করিতেছিলেন, তাঁহাপেক্ষা একাকী বোধ হয় জগতে আর কেহ নাই; তাঁহার বোধ হইল এ সংসারে তাঁহাপেক্ষা দুঃখীও বোধ হয় আর কেহ নাই। তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল।

এই সময়ে কে তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তস্থাপন করিল। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন, দেখিলেন আরোহীদিগের মধ্যস্থ একটী মেম। ইনি প্রৌঢ় বয়স্থা;—স্বামী সন্ধানে ভারতে গিয়া ভারতের সহরে সহরে ফিরিয়াও সফল মনোরথ হইতে পারেন নাই, যৌবন প্রায় অতীত, অর্থও তত নাই, এরূপ অবস্থায় স্বামী লাভ বড় সহজ নহে; এক্ষণে তিনি গৃহে ফিরিতেছেন। জাহাজে তিনি আত্মীয় স্বজন বর্জ্জিত, বালক সুরেশকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে জাহাজ হইতে যাইবার সময় সুরেশকে দুই একটী মিষ্টকথা না বলিয়া যাইতে পারিলেন না।

যখন জাহাজ হইতে আরোহীগণ সমস্ত চলিয়া গেলেন,—গোলমাল কতক দূর হইল,—তখন কাপ্তেন সাহেব সুরেশকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুরেশ নিকটে আসিয়া অভিবাদন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কি করিতে চাও? আবার যে চাকুরীতে আসিয়াছ সেই চাকুরীতে জাহাজে যাইতে চাও;—না লণ্ডনে থাকিতে চাও?"

সুরেশ বলিলেন, "আমি এখনও কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। কি করিব এখনও ভাবিবার সময় পাই নাই।"

কাপ্তেন। "বেশ, তেবে চিত্তে যা ভাল বিবেচনা কর, ঠিক কর। তবে আমার দ্বারা যেটুকু হয় আমি সর্ব্বদাই তোমার

জন্য করিতে প্রস্তুত আছি। যত দিন জাহাজ এখানে আছে, তত দিন তুমি জাহাজে থাকিতে পার;—জাহাজ প্রায় তিন সপ্তাহ এখানে থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে তুমি লণ্ডনের সকলই দেখিয়া লইতে পার।"

সুরেশ। "মহাশয়! আপনাকে কি রূপে ধন্যবাদ প্রদান করিব জানি না। আমার পিতা যাহা কখন আমার জন্য করেন নাই। আপনি আমার জন্য তাহা করিয়াছেন। যত দিন দেহে জীবন থাকিবে তত দিন আমি আপনার নিকট কেনা হইয়া রহিলাম।

কাপ্তেন সাহেব উচ্চ হাস্য করিয়া সস্নেহে সুরেশের পৃষ্ঠে করাঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "তোমার ধন্যবাদ আমি চাই না। তোমার ভাল হইলেই আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইব। ভবিষ্যতে তোমার ভাল হইয়াছে শুনিলে আমি প্রকৃতই সুখী হইব। যদি আমার পরামর্শ শোন, তবে এখন তুমি তোমার মাহিনার টাকা লইও না। এখন তুমি জাহাজে থাকিবে, সুতরাং তোমার এক পয়সাও খরচ লাগিবে না। যখন আমরা এখান থেকে চলিয়া যাইব, যখন তুমি একাকী লণ্ডনে পড়িবে, যখন তোমাকে লণ্ডনে বাস করিতে হইবে, তখন তোমার অনেক টাকার দরকার হইবে। যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়া নিজের নিকট রাখিতে পার, তাহাই ভাল;—কারণ এ সহরে এক গাছি ঘাস পর্য্যন্তও বিনা মূল্যে পাইবে না।"

কাপ্তেন সাহেবের সস্নেহ উপদেশে সুরেশের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া গেল,—তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না;—তাঁহার দুই চক্ষু হইতে দরবিগলিতধারে নয়নাশ্রু বহিতে

লাগিল। কাপ্তেন সাহেব বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, আজীবন জলে জলে নাবিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঘুরিতেছিলেন;—কিন্তু তাঁহার প্রাণ ছিল, সংসার-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের কঠোর আঘাতেও তাঁহার হৃদয় কঠিন হয় নাই। সুরেশের চক্ষে জল দেখিয়া বৃদ্ধ কাপ্তেনের চক্ষুদ্বয়ও জলে পূর্ণ হইয়া আসিল।

কাপ্তেন সাহেব সুরেশকে বিদায় দিয়া জাহাজ-স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্থান করিলেন। সুরেশকে তখন জাহাজের বোসেন সাহেব সঙ্গে লইয়া লণ্ডন সহর দেখাইতে বহির্গত হই-লেন। লণ্ডন নগরীতে পদস্থাপন করিয়া সুরেশ সকল মানসিক কষ্ট ভুলিয়া গেলেন। এত দিন পরে তাঁহার জীবনের সাধ পূর্ণ হইল! বাল্যকাল হইতে শয়নে স্বপনে তিনি যে আশাকে হৃদয়ে হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, এত দিনে সে আশা পূর্ণ হইল!



ত্রয়বিংশ পরিচ্ছেদ।

লণ্ডনে প্রথম রাত্রি।

সুরেশ যাহা দেখিলেন স্বপ্নে কখনও তাহা তিনি ভাবেন নাই। কি বিস্তৃত সহর, কি মনুষ্যের জনতা! কত গাড়ী ঘোড়া! এরূপ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা তিনি কখন দেখেন নাই,—এরূপ মনমুগ্ধকর সুসজ্জিত দোকান যে কখন কোথায়ও আছে, তাহা তিনি কখনও মনে ভাবেন নাই। চারিদিকেই সাহেব মেমের ভিড়, সকলেই যেন মহা ব্যস্ত, সকলেই যেন কি গুরুতর কার্য্যে ধাবমান; দেখিলে বোধ হয় যেন এদেশে বুঝি কেহ বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে পায় না। এত সাহেব মেমও সুরেশ একত্রে কখন দেখেন নাই। এখানে সাহেব ভিক্ষুক টুপি হস্তে তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে, সাহেব কোচম্যান তাঁহাকে গাড়ী ভাড়া লইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে! তিনি বাঙ্গালী, এখানে যে ভারতবর্ষের ন্যায় সাহেবগণ দেশীয় বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিতেছেন না, বরং সকলেই তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছেন, এ সমস্তই সুরেশের নিকট নূতন, অভূতপূর্ব্ব; তিনি রাজপথে চলিবেন কি? প্রতি-পদেই তিনি আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন।

যে দিকে চাহেন সেই দিকেই চক্ষু থাকে, আর কোনদিকেই ফিরিতে চাহে না। তিনি একটা গ্যাসের স্তম্ভে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাকুলভাবে চাহিয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গী পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আহ্বান করায়ও তিনি অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। তাঁহার সঙ্গী বোসেন সাহেব কয় দিন মাত্র স্থলে বাস করিবার অবসর পাইয়াছেন, তিনি এ কয়দিন আমোদ প্রমোদ করিতে ব্যাকুল, এরূপে একস্থানে দাঁড়াইয়া সময় নষ্ট ক[illegible] ও তিনি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। তিনি জেদাজিদি করিয়া [illegible] মদের লইয়া চলিলেন। [illegible]হারা জোঁকের

বোসেন সাহেব সুরেশকে লণ্ডনের বিখ্যাত [illegible]ার নিকট এক
লইয়া গেলেন। লণ্ডন সহরের দরিদ্রগণের [illegible]ড় না।
এও, ইহার ন্যায় অপরিষ্কার স্থান [illegible]াসিয়া কতকটা ভীত
লণ্ডনের যত বদমাইস প্রভৃতির ই[illegible]ার ব্যবহার তাঁহার নিকট
পদে পদে মদের দোকান! রাস্তায় মাতাল—কিন্তু উপায়
এখানে যেরূপ দরিদ্র দেখিতে পাওয়া যায় সেরূ[illegible]ার ছিল না।
আর কুত্রাপি আছে কি না বলা যায় না। যেম[illegible]তাঁহাকে কি
প্রবল প্রতাপে এখানে রাজত্ব করে, পাপও সেইরূপ[illegible]ন বয়স
আকারে ঘোর প্রতাপে এখানে বিরাজিত। অনাহারে প্রপীড়িত বালক বালিকাগণ পথিপার্শ্বস্থ নর্দ্দামায় কুকুর শূকরের ন্যায় খেলা করিতেছে। অনাহারে ও অতি পরিশ্রমে কঙ্কালাবশিষ্টা কত শত স্ত্রীলোক হতাশের মেঘে আবরিত হইয়া শূন্য মনে মধ্যে মধ্যে ঘুরিতেছে। কার্য্যের অভাবে কার্য্যান্বেষী শ্রমজীবিগণ পথের পাশে মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া কথোপ-

কথন করিতেছে,—প্রত্যেক মদের দোকান হইতে হাস্যধ্বনি, কলহের রব—ঘোর কোলাহল শ্রুত হইতেছে।

সুরেশ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভীত হইলেন। লণ্ডনের আর একটি ভাল দৃশ্য আছে যে তাহা তখন তাঁহার মনে হইল না। যে যেখানকার লোক সে সেইখানে যায়। বোসেন জাহাজী গোরা মাত্র, ভদ্র সমাজের ধার তিনি ধারেন না। যেখানে
—র আলাপ পরিচয়, সুরেশকে তিনি সেইস্থানে লইয়া গেলেন।
স্বপভাবে সুরেশ কয়েকদিন ধরিয়া লণ্ডন সহর দেখিয়া
সুরেশ যা যেখানে যাহা দেখিবার ছিল সমস্ত দেখিলেন,
নাই! কি বিস্ম রাস্তা ঘাটও কতকটা চিনিলেন। তিনি
ঘোড়া। এরূপ সু-হাজ হইতে সহর দেখিতে বাহির হইতেন,
নাই,—এরূপ মনমুগ্ধ— ফিরিবার সময় হইত না, সহরেই কোন
আছে, তাহা তিনি স্বপ্নে ...ছেন। সন্ধ্যার পর জাহাজে ফিরিয়া
সাহেব মেমের যাপন করিতেন। এইরূপে কয়দিন কাটিয়া গেল,
যেন কি শু-জ লণ্ডনে দুই একদিন মাত্র আছে,—এখন একটা
এদেশে যু যোগাড় করিলে নহে। তাঁহার বন্ধু জাহাজের বোসেন
সাহেব ব তাঁহার জন্য একটা বাসা ঠিক করিয়া দিলেন। বাসা
খুব সস্তায় বন্দোবস্ত হইল বটে, কিন্তু তিনি যে ঘরটি পাইলেন, সেটা একটা ক্ষুদ্র বাক্স বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একটি বৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকায় এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রাচীর, তাহার উপর কাগজ মারা। বহুকালের ধূলি ও নানাবিধ দ্রব্য লাগিয়া এই কাগজ অভূতপূর্ব্ব আকার ধারণ করিয়াছে। গৃহে একখানা ভাঙ্গা চেয়ার ও ভাঙ্গা টেবিল আছে, এক পাশে একটা অর্দ্ধ ছিন্ন গদিও আছে।

বাড়ীতে অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ বাস করে, সকলেই পাপের শেষ স্তরে অবতীর্ণ হইয়াও যেন সন্তুষ্ট নহে। সকল প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাপকার্য্যেই যেন তাহাদের বিপুল আনন্দ। পুরুষদিগকে দেখিলে ভয় হয়, মারামারি ও দাঙ্গা হাঙ্গামা করা ও সুবিধা পাইলেই মদ খাওয়াই যেন তাহাদের কার্য্য। লাল মুখ মদে মদে যেন আরও লাল হইয়াছে। সকলেরই মুখের কোন না কোন স্থান কাটা, দাঙ্গা হাঙ্গামের চিহ্ন। পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকগণও ঘোর সুরাশক্ত, মদ পাইলে আর কিছুই চাহে না। একটু মদের জন্য না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই। ইহারা জোঁকের ন্যায় পুরুষদিগকে ধরিয়া আছে। যতক্ষণ যাহার নিকট এক কপর্দ্দকও থাকে, ততক্ষণ ইহারা তাহাকে ছাড়ে না।

সুরেশ এই সকল নর নারীর মধ্যে আসিয়া কতকটা ভীত হইলেন। ইহাদের স্বভাব, প্রকৃতি, আচার ব্যবহার তাঁহার নিকট অতি বীভৎস ও ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইল;—কিন্তু উপায় নাই। ভাল স্থানে বাস করিবার উপযুক্ত অর্থ তাঁহার ছিল না। প্রথম রাত্রিবাসেই সুরেশ বুঝিলেন যে এ স্থানে তাঁহাকে কি রূপ জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। তাঁহার তখন বয়স ১৭ বৎসর মাত্র, তিনি বাঙ্গালী;—তিনি যে এই সকল মাতাল জঘন্য প্রকৃতির সাহেব মেমদিগের সহিত বাস করিতে পারিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার সাহসের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তিনি যে একেবারে পুণ্যাত্মা বা সুনীতির আদর্শ ছিলেন এ রূপ নহে;—একটু আধটু কখন কখনও মদও খাইতেন, কিন্তু এই সকল নর নারীর অশ্লীল বচন, বীভৎস কার্য্য, লোমহর্ষণ ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল;—হৃদয় হৃদয়ে

যেন বসিয়া গেল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, যাহাই অদৃষ্টে থাকুক, এ রূপ স্থানে থাকা হইবে না। কাল প্রাতেই অন্যত্র আর একটা বাসা করিতে হইবে।

নানা চিন্তায় তিনি একেবারেই কিছু আহার করিতে পারিলেন না;—শুইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে শুইয়া সুরেশ আকাশ পাতাল নানা ভাবনা ভাবিতেছেন,—এ রূপ সময়ে সহসা তাঁহার বোধ হইল যেন ঘরটী আরও গাঢ়তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তাঁহার বোধ হইল যেন আর এক জন কে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। বিদেশ, বিভূমি,—সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন প্রকৃতির লোক মধ্যে তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন। কি রূপ ভয়ানক লোক এই বাটীতে বাস করে তাহাও তিনি দেখিয়াছেন,—তাঁহার কপালে বড় বড় ঘাম দেখা দিল; কি এক রূপ অভাবনীয় ভীতি ধীরে ধীরে যেন তাঁহার দেহে ব্যাপ্ত হইল,—এরূপ ভয়ের ভাব তাঁহার হৃদয়ে কখনও আসে নাই। কে তাঁহার গৃহে এত রাত্রে প্রবেশ করিল? কি উদ্দেশ্যে সে আসিয়াছে? সম্ভবমত তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার নিকট যাহা কিছু আছে তাহাই লওয়া ইহার উদ্দেশ্য;—এই রূপ ভাব সুরেশের মনে আসিবা মাত্র সুরেশ হৃদয় হইতে ভয়ের ভাব দূরীভূত করিলেন,—মরিতে তিনি কখনই ভীত ছিলেন না। যদি মরিতে হয় তবে শৃগাল কুকুরের ন্যায় মরিব না;—লড়িয়া মরিব,—এই ভাবিয়া সুরেশ আপনার পকেটে যে বড় ছোরা ছিল তাহাই ধীরে ধীরে বাহির করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। ভাবিলেন যেই হউক না কেন, তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি সহজে তাহাকে ছাড়িবেন না।

তাঁহার বোধ হইল একটী লম্বা ছায়ামূর্ত্তি তাঁহার বিছানার চারি দিকে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে পদচারণ করিতেছে। সে যে কে তাহা তিনি কিছুই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন না। অন্ধকারে কিছুই ভাল দেখা যাইতেছিল না। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তিনি গলার শব্দ করিলেন। তাঁহার বোধ হইল অমনি যেন সেই মূর্ত্তি বাতাসে মিলিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিয়া গৃহের চারিদিক বিশেষ করিয়া দেখিলেন,—কাহাকেও কোথায়ও দেখিতে পাইলেন না। তখন পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিলেন, দেখিলেন গৃহে কেহই নাই। শয়নের পূর্ব্বে তিনি যে রূপ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এক্ষণেও সেইরূপ দ্বার রুদ্ধ আছে। তবে এ কে ?: এ কি ভূত ? সুরেশ ভূত বিশ্বাস করিতেন না। ভূতের কথা মনে হইয়া মনে মনে হাসিলেন।

তিনি আবার শয়ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। রাত্রে আর কোন কিছুই ঘটিল না। অতি প্রত্যুষে উঠিয়াই তিনি একটা ভাল বাসা ও কোন কাজের চেষ্টায় বহির্গত হইলেন। সমস্ত দিন নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন কিন্তু কোন কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। যেখানে হাজার হাজার সাহেব মেম প্রত্যহ চাকুরীর জন্য হাহাকার করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেখানে বিদেশী বাঙ্গালী বালক সুরেশ যে চাকুরী পাইবেন এ রূপ আশা করাই উন্মত্ততা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি বাসায় ফিরিলেন। তৃষ্ণার্ত্তও হইয়াছিলেন। একটু সুরা পান করিলে দেহে ও মনে বল পাইবেন ভাবিয়া তিনি যেখানে মদ বিক্রয় হয়

সেইখানে উপস্থিত হইলেন। শত শত সাহেব মেম মদ খাইতে-ছিলেন ;—কালো সুরেশকে দেখিয়া অনেকে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া কোন এক অদ্ভুত দেশের অদ্ভুত লোক ভাবিয়া দেখিতে লাগিল। দুই জন মেম এক স্থানে বসিয়া মদ খাইতে-ছিলেন তাঁহারা আসিয়া সুরেশের সহিত আলাপ করিলেন ;—তাঁহারা তাঁহাদের সহিত সুরেশকে সুরাপান করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সুরেশ তাহাদের উপরোধ অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না ; তাহাদের সহিত গৃহের এক পার্শ্বে একটী টেবিলের পার্শ্বে বসিয়া সুরাপান আরম্ভ করিলেন।

শীঘ্রই সে বোতল শেষ হইল,—তখন সুরেশ আর এক বোতল হুকুম করিলেন,—পরে আরও এক বোতল আসিল। বলা বাহুল্য তখন সুরেশ ঘোর মাতাল হইয়া পড়িয়াছিলেন ;—মেমদ্বয়ও তদনুরূপ,—তিন জনে কতই নৃত্য, কতই গীত,—কতই চীৎকার হইল ;—শেষ রমণীদ্বয় আরও এক বোতল মদ সঙ্গে লইয়া সুরেশকে টানিতে টানিতে তাহারা যে গৃহে বাস করিত সেইখানে লইয়া গেল।

তাহার পর কি হইল সুরেশের মনে নাই। পর দিন প্রায় দুই প্রহরের সময় তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল ;—তখনও তাঁহার পূর্ণ মাত্রায় নেশা। তিনি মাথা তুলিতে পারিতেছেন না ;—মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। দেখিলেন পার্শ্বে অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় মেম দ্বয় পড়িয়া আছে ;—গৃহের দ্রব্যাদি লণ্ডভণ্ড, মাতলামির চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারও অধঃপতনের শেষ হইয়া গিয়াছে।

তিনি রমণীদ্বয়কে জাগরিত করিবার জন্য তাহাদের অধরে চুম্বন করিলেন, তাহারাও চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিল। আবার মদ আসিল,—সে দিনও সেইরূপ কাটিল। আবার মদ আসিল, তাহার পর দিনও সেইরূপে কাটিল,—এ বিপদে সুরেশকে রক্ষা করিবার কেহ ছিল না। তাঁহাকে সদুপদেশ দেন এমন কেহ আত্মীয় ছিল না। কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহার যাহা কিছু অর্থ ছিল সমস্ত নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন সেই রমণীদ্বয় তাঁহার নিকট আর এক পয়সাও নাই দেখিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অর্থ-শূন্য অবস্থায় সুরেশ লণ্ডনের রাজপথে দাঁড়াইলেন।

যখন তাঁহার নেশা ছুটিল, জ্ঞান আসিল, তখন অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু অনুতাপের আর সময় নাই। তাঁহার নিকট আর এক কপর্দ্দকও নাই,—তিনি আজ কি আহার করিয়া জীবন রক্ষা করিবেন? এই বিদেশে তাঁহার কি অবস্থা হইবে? কাহার নিকট কোথায় যাইবেন? এ ভারতবর্ষ নহে যে লোকের দ্বারে গেলে লোকে একমুষ্টি ভিক্ষা দিবে? এ ইংরাজের দেশে যাহারা ভিক্ষা করে তাহাদিগকে কারাগারে দেওয়া হয়;—এখানে ভারতের ন্যায় অতিথিসৎকার নাই। সুরেশ উন্মত্তের ন্যায় লণ্ডনের রাজপথে বহির্গত হইলেন।



চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদ।

সুরেশ খবরের কাগজ বিক্রেতা।

কি করিবেন কোথায় যাইবেন সুরেশ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া যেদিকে মন চলিল, সেইদিকেই চলিলেন। অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি লণ্ডনের বিখ্যাত উদ্যান হাইড্‌পার্কে আসিলেন। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া হতাশ চিত্তে তিনি একটী ঝোপের মধ্যস্থ বেঞ্চিতে বসিয়া প্রড়িলেন। তৎপরে ভাবিতে ভাবিতে ভাবনার কূল না দেখিয়া বিষণ্ণচিত্তে সেই বেঞ্চের উপর শয়ন করিলেন। কখন কিরূপে নিদ্রাদেবী আসিয়া তাঁহার চক্ষে অধিষ্ঠিতা হইলেন তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই।

সহসা হাস্যধ্বনিতে সুরেশের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন একটী ইংরেজ বালক তাঁহার ন্যায় এক কালো মানুষকে এইরূপে শায়িত দেখিয়া আমোদে আটখানা হইয়া হাসিতেছে! সুরেশ প্রথমে উঠিয়া বসিলেন, তৎপরে বালক তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছে দেখিয়া সুরেশের ক্রোধের উদ্রেক হইল,—বালক বোধ হয় সুরেশের মনের ভাব বুঝিল, বলিল, "ভায়া, কোন দেশ থেকে এখানে?"

বালকের বালসুলভ স্বভাবে সুরেশের ক্রোধ দূর হইল, তিনি বলিলেন, "আমি দূর ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছি।"

বালক। বাঘ আর সাপের দেশ?

সুরেশ। হাঁ।—যে দেশ আর্য্যজাতির সভ্যতার আকর।

বালক। তার কিছুই জানি না। সে ব্যাপার খানা কি?

সুরেশ হাসিলেন। এতো সামান্ত সম্বাদপত্র বিক্রেতা বালক। ইংলণ্ডের যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা পর্য্যন্ত ভারতের বিষয়ে এতই অজ্ঞ যে তাঁহাদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পাণ্ডিত্য দেখিলে হাস্ত সম্বরণ করিতে পারা যায় না। সুরেশ হাসিয়া বলিলেন, "যখন এ দেশের লোকে কাপড় পরিতে জানিত না, তখন আমাদের দেশ সভ্যতার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল।"

বালক। আমি সে বিষয়ের ভাবনায় বড় ব্যস্ত নই। কি অভিপ্রায়ে তুমি এ দেশে?

সুরেশ। আমি একটা চাকুরি লইয়া একখানা জাহাজে কলিকাতা হইতে লণ্ডনে আসিয়াছি। কিন্তু এখন এখানে আমার এমনই অবস্থা হইয়াছে যে পকেটে একটী পেনীও নাই যে একটুক্‌রা রুটী কিনিয়া খাই।

বালক কিয়ৎক্ষণ সুরেশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কি কর্ম্মে স্থির করেছ?" বালক এমনই ভাবে সুরেশকে এই প্রশ্ন করিল, যে সুরেশ তাহাকে সকল কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার অবস্থা সমস্তই তাহাকে খুলিয়া বলিলেন, সকল শুনিয়া বালক বলিল, "আলস্যে থাকিলে চলিবে না। এ দেশে নিজের অন্নের জন্ত সকলেই পরিশ্রম করে ও সকলকেই করিতে হয়, অন্ত উপায় নাই। কেহ কাহারও গলগ্রহ হয় না, হইতেও পায় না। তুমিও কেন পরিশ্রম কর না?

সুরেশ। আমি পরিশ্রম করিতে কাতর নহি, কিন্তু কাজ পাই কই?

বালক। তুমি আমাকে হাসালে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সহরে আবার কাজের অভাব। এখানে যথেষ্ট কাজ আছে; তবে চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম চাই।

সুরেশ। এই কথা মনে ভাবিয়াই আমি দেশ ছাড়িয়া এ দেশে আসিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে এসে সবই উল্টা দেখিতেছি। বিদেশী লোকের এখানে কোন কাজ পাইবার সম্ভাবনা কিছুই নাই।

বালক। আমি রাজার হালে নেই, তবে অনাহারেও মরিতেছি না। যদি আমি অনাহারে না থাকি, তবে তুমিই বা কেন থাকিবে তাহা জানি না।

সুরেশ। তুমি খবরের কাগজ বিক্রয় করিয়া দুপয়সা পাও; আমি বিদেশী, অপরিচিত, কোন্ কাগজওয়ালা আমাকে বিশ্বাস করিয়া কাগজ বিক্রয় করিতে দিবে?

বালক। যদি তুমি কাগজ বেচতে চাওত হয় ত আমি তোমাকে সে বিষয়ে সাহায্য কর্ত্তে পারি।

সুরেশ। যদি তুমি আমার এ উপকার কর, তাহা হইলে আমি চিরকালের জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব। যে কোন কাজই হউক না কেন, আমি করিতে প্রস্তুত আছি।

বালক। ধন্যবাদের পাত্র আমরা নই। আমাদের কাগজের ম্যানেজারের নিকট চল, বোধ হয় তিনি তোমাকে কাজ দিলেও দিতে পারেন।

সুরেশ বালককে ধন্যবাদ দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের আপিসে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৌভাগ্য বশতঃ ম্যানেজার সাহেব কোন আপত্তি করিলেন না, সুরেশকে কাগজ বিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত করিলেন। সুরেশ বাহিরে আসিয়া কোথায় বাসা লইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন,—সে বাসায় তাঁহার যাইবার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। তিনি তাহার মনের কথা বালককে বলায় সে বলিল, "যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে আমি যে ঘরে থাকি তুমিও সেই ঘরে আমার সঙ্গে একত্রে থাকিতে পার।"

কোন কাজেই সুরেশ অধিক দিন মনোনিবেশ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এক কাজ অনেক দিন তাঁহার ভাল লাগিত না। কাজেই সম্বাদপত্র বিক্রয় কাজও তাঁহার অধিক দিন ভাল লাগিল না। তিনি এ কাজে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন;—তাঁহাকে বিদেশী দেখিয়া অনেকে তাঁহার নিকট হইতেই সম্বাদপত্র ক্রয় করিতেন; তিনি ভারতবাসী শুনিলে গ্রাহকগণ অন্যের নিকট কাগজ না লইয়া তাঁহারই নিকট হইতে লইতেন,—এই রূপে সুরেশ অন্যান্য সম্বাদপত্র বিক্রেতা বালকগণ যাহা প্রত্যহ উপার্জ্জন করিত, তাহাপেক্ষা অনেক অধিক উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন,—কিন্তু তিনি এ কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার প্রাণে উচ্চ আশা সর্ব্বদা জাগরিত,—তিনি সংসার-সমুদ্রের গভীর জলে নিমগ্ন হইয়াছেন,—সম্রান্তবংশে জন্মিয়া এক্ষণে লণ্ডনের রাজপথে সম্বাদপত্র বিক্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন,—অব-

স্থার হীনতা যতদূর হওয়া সম্ভব তাহা হইয়াছে, কিন্তু তবুও তিনি আশা ছাড়েন নাই।

সম্বাদপত্র বিক্রয় আর ভাল না লাগায় তিনি এ কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। তার পর কয়েকদিন অতি কষ্টে কাটাইলেন। যখন সম্বাদপত্র বিক্রয় করিতেন, তখন তাঁহার আহারের ক্লেশ ছিল না, এক্ষণে তাহা দেখা দিল। কোন দিন কিছু আহার জুটিত, কোন দিন একেবারেই কিছু জুটিত না। এ সময়ে তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট কাজও ছিল না,—যখন যে দিন যাহা জুটিত, তখন তাহা করিয়া দুই এক শিলিং উপার্জ্জন করিতেন এবং অতি কষ্টে সে দিনটা কাটাইয়া দিতেন। এই সময়ে তিনি অনুসন্ধান করিয়া আসটন সাহেবের জনক জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অতি সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহারা কিছু কিছু অর্থও সাহায্য করিতেন। যাহাতে তাঁহার কোন একটা কাজের সুবিধা হয়, তাহার জন্ম বিশেষ যত্নও পাইয়াছিলেন,—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারাও সুরেশের কোন কাজ জোগাড় করিয়া দিতে পারেন নাই।

তাঁহার অবস্থা ঘোরতর শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। অনাহার মুখ ব্যাদন করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। বাড়ীওয়ালী ভাড়া না পাইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িল। এ ভারতবর্ষ নহে, এদেশে গৃহ না থাকিলে গাছতলায় শয়ন করিয়া রাত্রি কাটে; ২৪ পয়সা হইলে একরূপে দিন কাটিয়া যায়। লণ্ডন সেরূপ স্থান নহে, কঠোর শীতে কেহ ঘরের বাহিরে রাত্রিযাপন করিতে পারে না। বাহিরে এক মুহূর্ত্তও থাকিবার যো নাই, অবিশ্রান্ত

বরফ পড়িতেছে। গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলে তিনি কোথায় গিয়া বাস করিবেন? তাহা হইলে শীতে ও বরফে লণ্ডনের রাজপথে তাঁহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে?

তিনি অর্থের জন্য বাড়ী পত্র লিখিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভুলিয়াছে। তাঁহার আত্মীয় স্বজনের নিকট তিনি আর জীবিত নাই। তাঁহার পিতা বা খুল্লতাত কেহই তাঁহার পত্রের উত্তর দিলেন না। দেশ হইতে এক পয়সা পাইবার আশাও তাঁহার রহিল না। তিনি কি করিবেন,—কি রূপে কোন কাজ সংগ্রহ করিবেন! শেষ কি লণ্ডনের পাপসাগরে পাপে ডুবিবেন? শেষ কি উদরান্নের জন্য চুরি জুয়াচুরি প্রভৃতিও করিতে হইবে! ঘোর বিপদে পড়িয়া পেটের দায়ে হয়ত সুরেশকে মহাপাপে নিমগ্ন হইতে হইত, কিন্তু যিনি পদে পদে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন তিনি এবারও তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

এক দিন রাত্রে তিনি শয়ন করিয়া আছেন, গৃহ ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ। সহসা তাঁহার বোধ হইল যেন, সেই গৃহে সেই অন্ধকারে আর এক জন দণ্ডায়মান রহিয়াছে। লণ্ডনে তিনি যে দিন প্রথম রাত্রি যাপন করেন, সেই দিন ঠিক এই দৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এই ছায়ামূর্ত্তি তাঁহার শয্যার চারি দিক পর্য্যবেক্ষণ করিল, তৎপরে এই মূর্ত্তি শয্যার পদপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল,—তৎপরে হস্ত উত্তোলন করিয়া তাঁহার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল। সুরেশ স্পষ্ট বুঝিলেন, এই মূর্ত্তি, যাঁহার মূর্ত্তিই হউক, তাঁহাকে সাবধান হইতে বলিতেছেন। কেন তিনি জানেন না তাঁহার হৃদয়ে বল দেখা দিল; হৃদয়ে আশা পুনরুদ্দীপিত হইল;—তিনি প্রাণে শান্তিলাভ

করিলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে এই ছায়ামূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল, তিনিও নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

পর দিবস প্রাতে সুরেশ লণ্ডনের রাজপথে মুটেগিরি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পেটের জন্ত কোন পাপকার্য্য করা অপেক্ষা মুটেগিরি করিয়া খাওয়াও ভাল, এই ভাবিয়া তিনি অবাধে বিনা দ্বিধায় লণ্ডনে মুটের কাজ আরম্ভ করিলেন। নাথপুরের সম্ভ্রান্ত বিশ্বাস বংশের পুত্র সুরেশ বিশ্বাস বিলাতের রাজপথে মুটে ও কুলির কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিলেন। সুরেশ দেখিলেন সম্বাদপত্র বিক্রয় অপেক্ষা ইহাতে উপার্জ্জন অনেক বেশী হয়, তিনি যে দিন হইতে এই কার্য্য আরম্ভ করিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার অনেক কষ্ট ঘুচিল। আহারের কষ্ট একেবারেই থাকিল না, বরং তিনি এক রূপ বেশ সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে পারিলেন। তবে তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন, যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা প্রয়োজন,—কারণ অসুখ বিসুখ আছে,—সময় সময় কাজকর্ম না জুটিতে পারে;—এরূপ অবস্থায় কিছু অর্থ হাতে থাকা নিতান্তই আবশ্যক। এই জন্য এখন হইতে সুরেশ প্রত্যহ যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা হইতে কিছু কিছু প্রত্যহই সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। মুটের কার্য্যে বেশ দুই পয়সা রোগজার হইতেছিল সত্য, কিন্তু সুরেশ ইহাতেও বহু দিবস মনোনিবেশ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি কয়েক মাস পরে এ কাজ ছাড়িয়া দিলেন।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।

প্রেমে-সঙ্কট।

এই সময়ে সুরেশ বাসা পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি যে রূপ শ্রেণীর লোকের সহিত বাস করিতেছিলেন,—এবার যে বাড়ীতে গেলেন তথায় তাহাপেক্ষা উচ্চ কথঞ্চিৎ শ্রেণীর ভদ্র-লোক সকল বাস করিতেন। তবে ইহাঁরা পোষাক পরিচ্ছদে যে রূপ ভদ্র পরিচিত বলিয়া সে রূপ বোধ হইতেন,—প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা ছিলেন না। লণ্ডনের ডিটেক্‌টিভ পুলিস্ কর্ম্মচারী-গণ ইহাঁদের প্রতি সর্ব্বদাই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। সহরের কোন স্থানে কোন চুরি জুয়াচুরি হইলে কখনও কখনও এই সকল লোকের মধ্যে কেহ কেহ ধৃত হইতেন।

পূর্ব্বের বাড়ীতে যে রূপ কতকগুলি স্ত্রীলোক ছিল, এখানেও কতকগুলি সেই রূপ ছিল। সতীত্ব বলিয়া যে এ সংসারে কিছু পদার্থ আছে তাহা তাহারা জানিত না, ভাবিতও না। পয়সা ও মদের জন্য ইহারা না পারিত এ রূপ কাজও সংসারে ছিল না। সুরেশ ইহাদের বড়ই প্রিয়পাত্র হইলেন। তাঁহার নিকট ইহারা ভারতবর্ষের গল্প শুনিতে বড়ই ভাল বাসিত,—সুরেশও কতক সত্য কতক মিথ্যা ইহাদিগকে নানা গল্প শুনাইতেন।

যাহার শরীরে বল আছে ও হৃদয়ে সাহস আছে ইংরাজ রমণীগণ তাহাকে বড় ভালবাসেন। স্থরেশের শরীরে অসীম বল ছিল;—সাহসে স্থরেশের সমতুল্য পাওয়া যাইত না। ইংরাজের মধ্যে অল্প লোকই ছিল যে তাঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিত,—এ কারণেও ঐ সকল ইংরাজ-মহিলা তাঁহাকে বড় ভালবাসিত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একজন তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতে আরম্ভ করিল। সে তাঁহাপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠা, এবং বিবাহিতা,—তাহার স্বামী ছুতোরের কাজ করিত। প্রথম হইতেই সে স্থরেশকে বড়ই যত্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল,—তাহার হৃদয় যে তাঁহার প্রেমে পূর্ণ হইয়াছে স্থরেশ ইহা কতক কতক বুঝিতেও পারিয়াছিলেন,—এক দিন এই রমণী স্পষ্টই নিজ হৃদয় ভাব স্থরেশের নিকট জ্ঞাপন করিল। স্থরেশ তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সে তাঁহার জন্য পাগল;—কোন কথাতেই কর্ণপাত করিল না; প্রত্যহই তাহার ভালবাসার বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল,—সে ক্রমে অতি প্রকাশ্যভাবে স্থরেশের প্রতি প্রেম প্রকাশ করিতে লাগিল;—এমন কি স্থরেশ দেখিলেন যে ডাইভোর্স আদালতে হয়ত তাঁহাকে যাইতে হয়। রমণী এমনই কাণ্ড করিতে লাগিল যে এ কথা তাঁহার স্বামীর কর্ণগোচর হওয়া আর অসম্ভব রহিল না, তাহা হইলে স্থরেশের যে সমূহ বিপদ হইবার সম্ভাবনা তাহা স্থরেশও বেশ বুঝিলেন,—তিনি কত অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু রমণী তাঁহার কোন কথাতেই কর্ণপাত করিল না। স্থরেশ অতি কষ্টে তাঁহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন;—বিশেষতঃ তাঁহার এ সময়ে কোন কাজ না থাকায় দুই প্রহরে যখন সকলে কাজে

যাইত, তখন তাঁহাকে গৃহে থাকিতে হইত। এ সময়ে তাহাকে নির্জ্জনে পাইয়া রমণী তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিত,—অনেক সাধ্যসাধনা করিত,—কখন কখন উন্মত্তের ন্যায় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিত,—সুরেশ এ মহা সঙ্কটে পড়িয়া কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

এক দিন রাত্রে সুরেশ তাঁহার নিজ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া এক মনে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন,—এ রূপ সময়ে একটী অর্দ্ধ উলঙ্গী রমণী নিঃশব্দে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল, নিঃশব্দে তাঁহার নিকটে আসিয়া সহসা ফুঁ দিয়া আলো নিবাইয়া দিল। সুরেশ চমকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিলেন, কিন্তু কে তাঁহাকে এই সময়ে সবলে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিল,—তাহার ওষ্ঠে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিল;—সুরেশ কথা কহিতে গেলে হাত দিয়া মুখ চাপিয়া ধরিল। সুরেশ অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" রমণী উত্তর করিল, "নিষ্ঠুর, যাহাকে তুমি পাগল করেছ?"

সুরেশের বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি এ রমণীকে জ্ঞাতসারে এ রূপ অভিসারে আসিতে কখনও উৎসাহিত করেন নাই। ইহাতে তাঁহার সমূহ বিপদের আশঙ্কা আছে। তিনি ভীত হইয়া বলিলেন, "আপনি কি করিয়াছেন! এত রাত্রে আমার নিকট কেন আসিয়াছেন। আপনার স্বামী জানিতে পারিলে আপনাকে ও আমাকে উভয়কেই বিপদে পড়িতে হইবে।

রমণী। বিপদ! বিপদাপদ বুঝি না। তুমি আমাকে পাগল করিয়াছ। আমি মরি, আমাকে রক্ষা কর।

এই বলিয়া রমণী কাঁদিয়া উঠিল। ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে

লাগিল। সুরেশ মহাবিপদে পড়িলেন,—কি করিবেন, কিছু স্থির করিতে পারিলেন না।

তখন রমণী বলিল। "আমার স্বামী বাড়ী নাই, রাত্রে আসিবে না। তার জন্ত কোন ভাবনা নাই। বল তুমি আমায় ভালবাস, তা হলেই আমি সন্তুষ্ট হব। তোমাকে না পেলে আমি প্রাণ রাখিব না।

সুরেশ। "এ রকম কথা বলিবেন না। এ রূপ কথা বলা শোনা দুই পাপ। আমায় ক্ষমা করুন।

রমণী তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। সহসা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে শোয়াইয়া ফেলিল, তাহার হৃদয়ের উপর শুইয়া পড়িল। সুরেশ তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সৌভাগ্য ক্রমে পার্শ্বের প্রকোষ্ঠ হইতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল "কি মহাশয় এখনও নিদ্রা যান নাই।" সুরেশ বলিলেন, "না— তারই আয়োজন করিতেছি।" পার্শ্বের গৃহে লোক জাগিয়া আছে দেখিয়া রমণীও সুরেশকে ছাড়িয়া দিল। বলিল "একটী বিদায় চুম্বন দাও আমি চলিয়া যাই।" সুরেশ কি করেন, তিনি রমণীর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ত অগত্যা সম্মত হই- লেন। তখন সেই রমণী নিশব্দে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

জীবনে সুরেশ এরূপ বিপদে আর কখন পড়েন নাই। তিনি এই রমণীর হস্ত হইতে কিরূপে রক্ষা পাইবেন। প্রথমে তিনি ভাবিলেন যে তাহার বন্ধু সম্বাদপত্র বিক্রেতা বালকের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিবেন, কিন্তু তৎপর মুহূর্তেই ভাবিলেন, রমণী হৃদয়কে দমন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে

ভালবাসিয়াছে, কেহ সে কথা জানে না, তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া সে তাঁহার নিকট হৃদয় ভাব প্রকাশ করিয়াছে, এরূপ স্থলে তাহার কথা পরকে বলা নিতান্তই অন্যায় হইবে। সুরেশ এ কথা নিজের মনে মনেই রাখিলেন, কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না। তবে এ বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য তাহাও মনে স্থির করিতে লাগিলেন।

অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে তিনি এ বাড়ীতে আর বাস করিবেন না। তার পর ভাবিলেন অন্য কোন বাড়ীতে থাকিলেও রমণী তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারে, তাহাই তিনি ভাবিলেন যে তিনি অন্ততঃ মাস কয়েকের জন্য লণ্ডনেই থাকিবেন না। সুরেশ যখন যাহা মনে স্থির করিতেন, তাহা সম্পন্ন করিতে কাল বিলম্ব করিতেন না। লণ্ডন ত্যাগ করিতে তিনি মনে মনে যে স্থির করিলেন, অমনি তাহারই আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন। তিন চারিদিন যাইতে না যাইতে তিনি লণ্ডন সহর পরিত্যাগ করিয়া বিলাতের পল্লি-গ্রাম ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।



ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

সুরেশ ফিরিওয়ালা।

লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া সুরেশ কি করিবেন তাহা মনে মনে পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট যে যৎসামান্য অর্থ ছিল তাহা দিয়া কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিলেন। কলিকাতায় যেমন বহুসংখ্যক পুরাতন দ্রব্য বিক্রয়ের দোকান আছে,—এই সকল দোকানে যেমন নানা প্রকার দ্রব্য অতি সস্তায় মিলে লণ্ডনেও এইরূপ দোকান অনেক আছে। ভাঙ্গা চুরা নানা দেশের নানা প্রকার দ্রব্য এই সকল দোকানে বিক্রয়ার্থ থাকে। সুরেশ কয় দিন ধরিয়া এই সকল দোকানে গিয়া ভারতীয় দ্রব্য যাহা কিছু সস্তায় পাইলেন তাহা ক্রয় করিলেন। তৎপরে সেইগুলি একটা পোটলায় বাঁধিয়া পৃষ্ঠে ফেলিয়া পদব্রজে বহির্গত হইলেন। লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া তিনি গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি রেলে বা গাড়ীতে কোথাও গেলেন না। রেলে বা গাড়ীতে যাইবার তাঁহার অর্থ ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। হাঁটিয়া গেলে দেশের যত দেখিতে পাওয়া যায়, গাড়ীতে গেলে তাহা কখনও হয় না। বহুদিন হইতে

বিলাতের পল্লীগ্রামগুলি দেখিবার জন্ম সুরেশের বড়ই কৌতূহল ও ইচ্ছা ছিল। তিনি এক্ষণে সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্ম এবং ছুতার রমণীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার অভিপ্রায়ে পদব্রজে বিলাতের গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার দ্রব্যাদিও বেশ দরে বিক্রয় হইতে লাগিল। একে তিনি ভারতবাসী বিদেশী,—অনেকে তাঁহাকে দেখিবার জন্ম, তাঁহার সহিত কথা কহিবার জন্ম, তাঁহার নিকট ভারতবর্ষের কথা শুনিবার জন্ম তাঁহাকে গৃহে ডাকিয়া লইয়া যাইত। শেষে তাঁহাকে কেহ ফিরাইতে পারিত না;—কিছু না কিছু ক্রয় করিত। একে তিনি ভারতবাসী তাহাতে দেখিতেছে ভারতীয় দ্রব্য;—তাহার উপর সুরেশ কতক সত্য কতক মিথ্যা এই সকল দ্রব্যের নানা ইতিহাস বলায় অনেকেই অধিক মূল্য দিয়া তাঁহার দ্রব্য ক্রয় করিতে লাগিল। এইরূপে কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহার সকল দ্রব্যই বিক্রয় হইয়া গেল। তাঁহার সমস্ত খরচ খরচা বাদে তাঁহার দুই পয়সা বেশ লাভও হইল। তিনি আবার লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া আবার নানা দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আবার একদিকে বহির্গত হইলেন। এইরূপে ফিরিওয়ালার কাজ ৪।৫ মাস করিবার পর তিনি দেখিলেন যে, সুখে স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিয়াও তাঁহার প্রায় ১০০।১৫০ টাকা জমিয়া গিয়াছে। যদিও এ কার্য্যে ক্লেশ অনেক হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু আমোদও অনেক ছিল। ভারতবাসী বলিয়া সর্ব্বত্রই তিনি বিশেষ সমাদর পাইতেন,—কোন গৃহে যাইতেই তাঁহার প্রতিবন্ধক ছিল না, সকলেই তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার

বিলাতের সমস্ত গ্রাম দেখা হইল,—সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকের সহিত আলাপ হইত। এইরূপে এই সময়ে তাঁহার সহিত অনেক পল্লিগ্রামবাসী সাহেব মেমের সহিত বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছিল।

এ দেশের পল্লিগ্রামের ন্যায় ঠিক বিলাতের পল্লিগ্রাম নাই। বিলাতে জঙ্গল একেবারেই নাই, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি কোন হিংস্র জন্তু বিলাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। বলিতে গেলে বিলাতে সহরের সংখ্যা অধিক, পল্লিগ্রামের সংখ্যা অল্প। অল্প হইলেও ইংলণ্ডময় নানা সুন্দর সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের নিকটে বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে প্রায়ই একটী না একটী বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই অট্টালিকায় গ্রামের জমিদার বাস করেন। অনেক সময়ে হয়তঁতিনি এখানে থাকেন না, হয় লণ্ডনে না হয় অন্যত্র বাস করেন, তাঁহার চাকর বাকরেরা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। গ্রামের এক প্রান্তে একটী গির্জ্জা আছেই আছে; অনেক গ্রামে গির্জ্জার নিকট বিদ্যালয় গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামবাসীগণের অধিকাংশই কৃষক, সকলেরই ২।৪টী গরু ও ঘোড়া আছে। এদেশে গরু চাসের জন্য নহে, দুগ্ধের জন্য। এখানে ঘোড়া দ্বারা চাস করান হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সব বাড়ীতেই প্রায় দুই দশটা ভেড়া ও শূকর আছে,—এগুলি ভোজনের জন্য। সব বাড়ীর পিছনেই একটী ক্ষুদ্র বাগান আছে, দুই দশটা ফুলের গাছ নাই এমন বাড়ী দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বিলাতি কৃষকদিগের বাড়ীগুলি দেখিলে ছবি বলিয়া বোধ হয়, বাড়ীর ছেলে পিলে গুলিও যেন প্রস্ফুটিত ফুল, সকলেই স্বাস্থ্যের পূর্ণ ছবি।

সুরেশ এইরূপ সুন্দর সুন্দর গ্রামের পর গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া চলিয়াছেন। এই সকল গ্রামের নিকট প্রায় সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হোটেল ও সরাই আছে। গ্রামবাসীগণ সন্ধ্যার পর কাজ কর্ম্ম শেষ হইয়া গেলে সকলে আসিয়া এইখানে সমবেত হয়েন। সকলেই কিছু কিছু সুরাপান করেন ও চুরুট খাইতে খাইতে নানা কথোপকথন করিতে থাকেন। এইরূপে অনেক রাত্রি কাটিয়া যায়, তখন সকলে যে যাহার গৃহে প্রস্থান করেন। যে খানে যে দিন রাত্রি হইত সুরেশ সে দিন সেখানকার হোটেলেই রাত্রি যাপন করিতেন। সন্ধ্যার পর হোটেলে তাঁহার নানা লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হইত, আমোদ প্রমোদে, কথাবার্ত্তায় সময় কাটিয়া যাইত।

সকাল ব্যতীত অন্য সময়ে তিনি দ্রব্যাদি বিক্রয়ে বড় সুবিধা পাইতেন না। অন্য সময়ে সকলেই যে যাহার কাজে চলিয়া যাইত, কাহার সহিত দেখা হইত না,—কাজেই সুরেশ সে সময়ে হোটেলে থাকিতেন। কাজেই তাঁহার অনেক সময় কিছুই করিবার থাকিত না। দেখিয়া শুনিয়া সুরেশ লেখা পড়ার উন্নতি করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, এক্ষণে এইরূপ সময় পাওয়ায় ও অর্থের একটু সচ্ছলতা হওয়ায় তিনি পড়া শোনায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে রসায়ন, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রই তাঁহার প্রিয় ছিল, এবং এই সকল শিক্ষার জন্যই তিনি বিশেষ চেষ্টিত হইতেন। ইন্দ্রজাল, ম্যাজিক প্রভৃতি শিক্ষার জন্য তিনি এই সময়ে ল্যাটিন [গ্রীকেরও আলোচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি যে কয় বৎসর ফিরিওয়ালা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া

বিলাতের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াছিলেন, সেই কয়বৎসরে লেখা-পড়ায় বিশেষ উন্নতি সাধন করিলেন। এক্ষণে আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা ও শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত ইংরাজগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। বলা বাহুল্য তিনি এ সময়ে পুরা সাহেব হইয়াছিলেন।



সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ।

সারকাসে প্রবেশ।

এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে সুরেশ একদিন কেণ্ট প্রদেশের একটী ক্ষুদ্র সহরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে সেই সহরে একদল সারকাসওয়ালা ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেছিলেন,—এ সারকাস খুব ভাল বা বড় সারকাস নহে,—ইঁহারা পল্লিগ্রামে খেলা দেখাইয়া দুই পয়সা রোজকার করিতেন। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে ইঁহারা এ সহরে আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর সারকাস দলের ক্রীড়কগণ সকলেই সুরেশ যে হোটেলে বাস করিতেছিলেন, সেইখানে আমোদ প্রমোদ ও কথাবার্ত্তা কহিতে আসিলেন। ক্রমে সুরেশের সহিত ইঁহাদের আলাপ পরিচয় হইল, উভয় পক্ষেই নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে সুরেশ ভারতবর্ষের অনেক কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন, এবং তাঁহারাও সুরেশের প্রশ্নে সুরেশকে সারকাসের অনেক কথা কহিলেন। সারকাসে যে কত আমোদ, কত উৎসাহ, কত প্রশংসা, কত যশ, কত খ্যাতি তাহা মহোৎসাহে তাঁহারা সুরেশকে বলিতে লাগিলেন, শুনিয়া সুরেশের মন তাঁহাদের কথায় বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইল। তিনি সে রাত্রি নিদ্রা যাইতে

পারিলেন না, নানা চিন্তায় হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল, সার্কাসের দলে মিশিতে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তিনি ফিরিওয়ালা বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে স্থির সঙ্কল্প করিলেন, ভাবিলেন যদি এই সারকাস দলে মিশেতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে খ্যাতিলাভত হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে বিপুল অর্থও উপার্জ্জন হইবে,—আর আমোদ প্রমোদে ও সুখ সচ্ছন্দের কথাইত নাই। এইরূপ নানা চিন্তায় তাঁহার নিদ্রা হইল না। ভোর হইতে না হইতে তিনি সেই সারকাস দলের ম্যানেজার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন "যদি আপনি আমাকে সারকাসদলে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি কুস্তি, জিম্‌নাষ্টিক প্রভৃতির খেলা দেখাইতে পারি।" সুরেশকে দেখিলে বলবান বলিয়া বোধ হইত না, তিনি আকারে খর্ব্বাকৃতি, দেহেও সেরূপ পুষ্ট ছিলেন না, তবে তাঁহার মাংসপেশী সকল বোধ হয় লৌহ অপেক্ষাও কঠিন ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি ব্যায়ামপটু, কলিকাতায় অনেক জিম্‌নাষ্টিক ও কুস্তি করিয়াছেন,—বিলাতে আসিয়াও তিনি এ অভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই। সময় ও সুবিধা পাইলেই ব্যায়ামচর্য্যা করিতেন। তাঁহার শরীরে এইরূপে অসীম বল হইয়াছিল, কিন্তু ম্যানেজার সাহেব তাঁহার আকৃতি দেখিয়া তাঁহাকে বলবান বলিয়া ভাবিলেন না। তিনি যুবক সুরেশের কথায় মৃদুহাস্য করিলেন। সুরেশ তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "আমাকে পরীক্ষা করুন।" বোধ হয় একটু মজা করিবার জন্যই ম্যানেজার সাহেব তাঁহার দলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলবান ক্রীড়ককে আহ্বান করিলেন। আকৃতিতে সে

দীর্ঘাকার ও বলে অসুর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে উপস্থিত হইলে ম্যানেজার সাহেব বলিলেন, "তুমি ইহার সহিত লড়িতে পার?" সুরেশ বিনা দ্বিধায় বলিলেন, "কুস্তি হয় ত পারি।"

তখন উভয়ে কুস্তির আয়োজন হইল, তৎপরে উভয়ে কুস্তি আরম্ভ হইল। শীঘ্রই দর্শকমাত্রেই বুঝিল যে সাহেব-ক্রীড়কের শরীরে কিছু বল অধিক থাকিলেও দক্ষতায় তিনি কোন অংশেই ভারতবাসীর সমকক্ষ নহেন। ১০ মিনিট যাইতে না যাইতে তিনি পরাজিত হইলেন। সুরেশ তখন হোরাইজণ্টাল ও প্যারেলাল বারেও ক্রীড়া দেখাইতে চাহিলেন, কিন্তু ম্যানেজার সাহেব তাঁহার ক্ষমতা বুঝিয়াছিলেন, বলিলেন, "না; আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমাদের দলে যোগ দিতে পার।"

সেই দিন হইতে সুরেশ সেই সারকাস দলে অন্তর্ভুক্ত হইলেন। মাহিয়ানারও একটা বন্দোবস্ত হইয়া গেল। সারকাস দল হইতে তিনি সমস্ত আহারাদির ব্যয় পাইবেন, অধিকন্তু সপ্তাহে ১৫ সিলিং করিয়া পারিশ্রমিক লাভ করিবেন। যদিও সারকাস ক্রীড়কদিগের ইহাপেক্ষা অনেক বেশী মাহিয়ানা ছিল, তবুও সুরেশ এই মাহিনাতেই স্বীকৃত হইলেন। তিনি নূতন, ক্রমে কাজ শিখিলে অবশ্যই তাঁহার বেতনের হার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইবে। এ দলে না হয়, অন্য দলে মিলিবে। এক দিকে সপ্তাহে ১৫ সিলিং পাইয়া সুরেশ যেরূপ উৎফুল্ল হইলেন, অন্যদিকে ম্যানেজার সাহেবও একজন প্রকৃত কালো ভারতবাসী এত সস্তায় পাইয়া মনে মনে বিশেষ

প্রীত হইলেন। এখন বিজ্ঞাপন দিবার খুব সুবিধা হইবে,—প্রকৃত ভারতবাসীর খেলা জানিলে সারকাস দেখিবার জন্ত হাজার হাজার লোক আসিয়া পড়িবে!

তাহাই হইল। সাসেকস্ প্রদেশের ক্ষুদ্র একটী সহরে আসিয়া ম্যানেজার বিজ্ঞাপন দিলেন, "অদ্য রাত্রে এক ভারতবর্ষীয় যুবক অদ্ভুত ক্রীড়া দেখাইবেন।" সহরে যত লোক ছিল, সে রাত্রে সকলে আসিয়া সারকাসের তাবু পূর্ণ করিল, সুরেশ সারকাসওয়ালা হইয়া, সারকাসের রং বেরংয়ের পোষাকে সজ্জিত হইয়া, দর্শকদিগের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথম দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে অভেনেতা ও অভিনেত্রীগণের মনের যে কিরূপ অবস্থা হয়, এ অবস্থায় না পড়িলে তাহা উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারা যায় না। মুহূর্ত্তের জন্ত সুরেশের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, প্রাণ হৃদয়ে যেন বসিয়া গেল, তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই দর্শকদিগের ঘোর করতালিতে তাঁহার সংজ্ঞা হইল, এবং আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া খেলা আরম্ভ করিলেন।

প্রতিপদেই করতালি, প্রতিপদেই প্রশংসা। সুরেশ সে দিন যেরূপ অদ্ভুত কৌশল ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিজেই বিমোহিত হইয়াছিলেন। প্রশংসার উপর প্রশংসার সহিত খেলা শেষ করিয়া সুরেশ দর্শকদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের পরও করতালি ধ্বনিতে গগনস্থল কয়েক দণ্ড পর্য্যন্ত মাতিয়া উঠিল। আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া ম্যানেজার



সাহেব তাঁহার পাণিপীড়ন করিলেন। অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণও তাঁহার গৌরবে ও প্রশংসায় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।



অষ্টবিংশতি পরিচ্ছেদ।

সারকাসে।

প্রথম রাত্রির পর সুরেশ ইংলণ্ডের নানা সহরে দর্শক-মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নানা ক্রীড়া দেখাইতে লাগিলেন। সারকাস ক্রীড়ক বলিয়া খ্যাতি লাভ তাঁহার হৃদয়ের ঐকান্তিক বাসনা; সারকাসক্রীড়ক বলিয়া যাহাতে তিনি জগতে অদ্বিতীয় হইতে পারেন, তাহাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। যে কোন বিষয়েই হউক না কেন প্রাণপণে চেষ্টা পাইলে সিদ্ধ মনোরথ হওয়া বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ সুরেশ চিরকালই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন,—যখন যে বিষয়ে মন নিবেশ করিতেন, যতক্ষণ না তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিতেন, ততক্ষণ তাহা ছাড়িতেন না। এক্ষণে সারকাসে প্রবিষ্ট হইয়া যাহাতে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন তাহার জন্য যত্ন বা পরিশ্রমের ত্রুটি করিলেন না। দিবসের অধিকাংশ সময়ই আপন ব্যবসায় দক্ষতা লাভ করিবার জন্য তাহার অনুশীলন করিতেন,—কাজেই দেখিতে দেখিতে তিনি এক জন অতি সুদক্ষ ক্রীড়ক হইয়া উঠিলেন। দেশ দেশান্তরে যেখানে তাঁহাদের ক্রীড়া হইতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই

তাঁহার খ্যাতিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল,—ক্রমে ভারতবাসী সারকাসওয়ালার নাম চারিদিকেই ব্যপ্ত হইল।

সারকাসে প্রবেশ করিয়া সময় পাইলেই তিনি নানা পুস্তকাদি পাঠ করিতেন;—কিন্তু অনেক সময়ে তাঁহার সহ-সারকাসক্রীড়কগণ তাঁহার পড়া শুনার বিশেষ ব্যাঘাত দিত। বিশেষতঃ তাঁহাদের দলে যে কয়েকটী বালিকা ছিল, তাহারা তাঁহাকে বড়ই জ্বালাতন করিত;—তাঁহার হাতে বই দেখিলেই কাড়িয়া লইত,—তাঁহাকে পড়িতে দেখিলে তাঁহার নিকটে আসিয়া হাসিত, তাঁহাকে হাসাইত, কিছুতেই পড়িতে দিত না। দলের অধিকাংশ যুবক যুবতীই সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে থাকিতে ভালবাসিত,—তাহাদের নিকট আমোদ প্রমোদই জীবনের সারব্রত ছিল; সময় ও সুবিধা পাইলেই হাসিতামাসা খেলা ধূলায় সময় কাটাইত,—ইহারা সুরেশকেও দলে লইবার জন্ত ব্যগ্র হইল,—তাঁহাকে পড়া শুনা করিতে দেখিলে নিকটে আসিয়া ব্যাঘাত ঘটাইত।

এইরূপে সারকাস দলে সুরেশের দিন কাটিতে লাগিল। এ দলের সহিত তিনি ইংলণ্ডের নানা সহরে ভ্রমণ করিলেন,—কিন্তু তিনি স্বদেশকে একেবারে ভুলেন নাই,—আত্মীয় স্বজনের নাম তাঁহার হৃদয় হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। সাহেবদলে মিশিয়া পুরা সাহেব হইয়া তিনি তাঁহার স্বজাতিকে ভুলেন নাই। তিনি বরাবরই নিয়মিতরূপে তাঁহার খুল্লতাত কৈলাসবাবুকে পত্র লিখিতেন। যখন যেখানে যাইতেন, যাহা করিতেন, যে ভাবে থাকিতেন, সকলই তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইতেন। স্নেহময়ী জননীর জন্ত তিনি সর্ব্বদাই হৃদয়ে ব্যথা পাই-

তেন,—প্রত্যেক পত্রেই মাকে প্রণাম জানাইতেন,—পত্রের অধিকাংশই মায়ের কথায় পূর্ণ থাকিত। কখন কখন যে তাঁহার প্রাণ দেশে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইত,—আত্মীয় স্বজনকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইত, কখন কখন তাঁহার হৃদয় মায়ের জন্য যে কাঁদিয়া উঠিত, তাঁহার এই সময়ের পত্র পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার কয়েকখানি পত্র পরিশিষ্টরূপে এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইল।

সুরেশ পূর্ব্বে বিদেশে যত কষ্ট পাইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই রূপ সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহার আহারবিহারের কোনই কষ্ট নাই;—সপ্তাহে সপ্তাহে ১৫/২০ শিলিং উপরন্তু পাইতেছেন; তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ ভাল হইয়াছে, তিনি এক্ষণে ভদ্রসমাজে ভদ্রভাবে মিশিতে পারিয়াছেন এইরূপে তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে মান সম্ভ্রমে থাকিয়া ক্রমে খ্যাতি লাভ করিতেছিলেন।

এক্ষণে তিনি আর বালক নাই,—যৌবনে উপনীত হইয়াছেন। যৌবন-সুলভ ভাবাবেশে তাঁহার দেহ মন সমস্তই উৎফুল্ল হইয়াছে,—তাঁহার হৃদয়ে তাঁহার অজ্ঞাতসারেই প্রেম দেখা দিয়াছে। সারকাসদলে কয়েকটী বালিকা ছিল, ইহার মধ্যে একটী জারমান,—জারমানি দেশে জন্ম।—তবে এই বালিকা বা যুবতী জারমান হইলেও ঠিক ইংরাজের ন্যায় কথা বলিতে পারিতেন। ইনি ইহার গত জীবনের বিষয় কাহাকেও কিছু বলিতেন না,—ইহার পিতা মাতা বা গৃহের কথা কেহ জানিত না, ইনিও কাহাকে কিছু এ সম্বন্ধে বলিতেন না। কেহ এ সম্বন্ধে কথা তুলিলে ইনি বিলক্ষণ বিরক্ত হইতেন। ভ্রূকুটি করিতেন। ইহার

প্রকৃতি বড় গম্ভীর ছিল,—ইহার সেই গাম্ভীর্য্যে দলের সকলে ইহাকে ভয় করিত,—মান্য করিত। দলের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিলে ইনি উপস্থিত হইয়া নিরস্ত হইতে আজ্ঞা করিলে তখনই সকল মিটিয়া যাইত,—ইহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কাহারও সাহস কুলাইত না।

অন্যান্য বালিকাগণ অপেক্ষা শিক্ষায় ও বংশমর্য্যাদায় যে ইনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইত;—দেখিতে তাহাদের অপেক্ষা বিলক্ষণ সুন্দরীও ছিলেন। বিশেষতঃ ইঁহার চুল ঘন কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় সুরেশ ইহাকে বড়ই সুন্দরী দেখিতেন। ইহার ভালবাসা পাইবার জন্য দলের অনেকেই লালায়িত হইয়াছিল। বাহিরের দর্শকগণের মধ্যেও অনেকে ইঁহার জন্য পাগল হইয়াছিল,—কিন্তু ইনি কাহাকেই কোনরূপে উৎসাহিত করিতেন না,—ইহার গম্ভীরভাবে ভীত হইয়া ইহার সহিত কোন রূপ প্রেমালাপ করিতে কেহও সাহস পাইত না। কিন্তু ইহার প্রাণ যে সুরেশের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। ইনি প্রকাশ্যভাবে সকলের সম্মুখে অন্যান্যের ন্যায় সুরেশের সহিত বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। অন্যান্যকে যে রূপ দেখিতেন, সুরেশকেও তেমনই দেখিতেন;—সুরেশের প্রতি যে ইহার মন আকৃষ্ট হইয়া ছিল তাহা কেহই জানিতে পারিত না। তবে যখন ইনি ঘটনা ক্রমে সুরেশের সহিত একাকিনী একত্র হইয়া পড়িতেন, তখন ইহার গাম্ভীর্য্য ভাব লোপ পাইত; সুরেশকে প্রেমের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে বিশেষ আমোদ পাইতেন, পড়াশুনায় তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন,

তাঁহার গত জীবনের সমস্ত কথা শুনিবার জন্ম কৌতূহল প্রকাশ করিতেন। তিনি মনোভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও সময় সময় পারিতেন না। তাঁহার বদনে তাঁহার চক্ষে তাঁহার মনের ভাব প্রতিফলিত হইত। সুরেশ যে ইহা একেবারে বুঝিতেন না, তাহা নহে,—তবে তিনি তাঁহার মনকে এ কথা বিশ্বাস করিতে দিতেন না। তিনি মন হইতে সর্ব্বদাই রমণীর মূর্ত্তি অন্তর্হিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন; কন্তু তিনি যতই চেষ্টা করেন, যতই হৃদয়কে দমন করিতে চাহিতেন, ততই হৃদয়ের বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তিনি কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তাঁহার বিবাহের অবস্থা নহে, তিনি এক্ষণে যাহা উপার্জ্জন করেন তাহাতে যেম বিবাহ করা চলে না। বিবাহ করিয়া তাহাকে কোথায় লইয়া যাইবেন? ইংরাজী হিসাবে এক্ষণে তাঁহার বিবাহের বয়সও হয় নাই,—এখন বিবাহের ইচ্ছাকে তাঁহার হৃদয়ে কোনমতেই স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি হৃদয় হইতে তাহার প্রেম দূর করিবার জন্ম প্রাণপণে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে লুকাইত করিবার জন্ম সর্ব্বদা চেষ্টিত রহিলেন, তথাচ সময় সময় যখন তিনি রমণীর সহিত একত্রে একাকী থাকিতেন, তখন ভাব ভঙ্গীতে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িত অন্ম কেহ তাঁহাদের মনোভাব জানিতে না পারিলেও তাঁহাদের দুই জনের মনের ভাব দুইজনে বুঝিতে বাকি থাকিত না। এইরূপে উভয়ে উভয়ের অজ্ঞাতসারে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিলেন।

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

একদিন সুরেশ বাজার হইতে নিজ প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিলেন। এইরূপ দ্রব্যাদি আনিলে উক্ত জারমান বালিকা তাঁহার দ্রব্যাদি লইয়া তাঁহার বাক্সে গুছাইয়া রাখিয়া দিতেন। অদ্যও ইনি সুরেশের দ্রব্যাদি এক এক করিয়া কাগজের মোড়ক হইতে খুলিতেছিলেন। একটী দ্রব্য একখানি পুরাতন জারমান সংবাদপত্রে জড়িত ছিল। নিজ দেশের সংবাদ পত্রই হউক বা যে কারণেই হউক বালিকার দৃষ্টি সেই কাগজে আকৃষ্ট হইল। তিনি কাগজখানি তুলিয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহার দৃষ্টি একটী বিজ্ঞাপনে পড়িল। বিজ্ঞাপনটীতে মৃত্যু শয্যায় শায়িতা জননী নিরুদ্দেশ কন্যাকে সত্বর তাঁহার সহিত মৃত্যুকালে একবার দেখা করিবার জন্য কাতর কণ্ঠে অনুনয় করিতেছেন। বিজ্ঞাপনটী দেখিয়া বালিকার দুই চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারে নয়নাশ্রু বহিল। সুরেশ অন্যদিকে চাহিয়া ছিলেন, সহসা ফিরিয়া বালিকাকে কাঁদিতে দেখিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিত ও ব্যথিত হইলেন, তিনি সাদরে বালিকার হস্ত ধারণ করিয়া সস্নেহে সপ্রেমে তাঁহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার প্রশ্নে বালিকা শোকে

আরও অভিভূতা হইয়া পড়িল, তাঁহার হস্তে কাগজখানি দিয়া তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সুরেশ বালিকার নিকটই কিছু কিছু জারমান ও ফ্রেঞ্চ শিক্ষা করিয়াছিলেন,—সুতরাং তিনি পাঠ করিয়া বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম এক রূপ জ্ঞাত হইতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন যে বালিকার সদ্বংশে জন্ম; বাল্যকালে কেবলমাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে সারকাস শিক্ষা করিবার জন্য ইনি গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার পলায়নের পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, এখন তাঁহার মাতা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা! মৃত্যু শয্যায় একবার কন্যাকে দেখিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন। নিরুদ্দেশ কন্যা কোথায় তিনি তাহা জানেন না, তাই কাতর কণ্ঠে সম্বাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। কন্যাও এ সময়ে মাতাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলা হইলেন।

পরদিবস তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া সকলের নিকট বিদায় লইলেন। সুরেশ তাঁহাকে লণ্ডন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে চলিলেন। লণ্ডন বন্দরে বালিকা একখানি ভাল জাহাজে উঠিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জাহাজে সুরেশকে বিদায় দিবার সময় তিনি তাঁহার হৃদয়ভাব আর লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি যে সুরেশের নিকট তাঁহার হৃদয় প্রাণ সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছেন তাহা প্রকাশ্যভাবে বলিলেন। শুনিয়া সুরেশের প্রাণ হর্ষ-বিষাদে পূর্ণ হইল, তিনি সজল নয়নে সাদরে বালিকার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, "তোমার আমার আকাশ পাতাল প্রভেদ, আমাদের বিবাহের সম্ভাবনা নাই। আমাকে ভুলিয়া যাও, যদি পারি, আমিও ভুলিবার চেষ্টা করিব।"

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।



শুভাদৃষ্টের পথে।

সুরেশের খ্যাতি ভাল কুস্তিবাজ বা জিম্‌নাষ্টিককারী বলিয়া নহে। দুর্দ্দমনীয় হিংস্র বন্যপশু বশীভূত করিবার ক্ষমতার জন্যই তিনি বিখ্যাত। মহাদুর্দ্দান্ত ভয়ানক ভয়ানক আফ্রিকাদেশীয় সিংহসিংহনিকে তিনি কুকুরের ন্যায় বশ করিতেন,—অবলীলাক্রমে তাহাদের পিঞ্জরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেন। তাঁহার অত্যদ্ভুত সাহসে দর্শকমণ্ডলী স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া থাকিতেন। নিশ্বাস ফেলিতে সাহস করিতেন না। আমেরিকা-দেশীয় অসভ্যজাতির সহিত তিনি যে পরে বিপুল সাহসে ঘোর যুদ্ধ করিয়াছিলেন,—তাহাপেক্ষা এই সকল হিংস্র পশুর সহিত ক্রীডা কম সাহসের কার্য্য নহে।

এইরূপে যখন তিনি সারকাসদলে থাকিয়া বিলাতের নানা সহরে ঘুরিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে এক দিন সুবিখ্যাত হিংস্রপশু-বশকারী প্রফেসার জামবাক্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। হিংস্রপশু বশ করিতে ইহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না,—হিংস্রপশুদিগের স্বভাব দেখিবার জন্য ইনি নানা দেশের ঘোর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছেন,—

ভারতবর্ষে আসিয়াও ভারতের নিবিড় অরণ্য মধ্যে ব্যাঘ্র, ভল্লুক হস্তীর সহিত বাস করিয়াছেন,—ইয়োরোপে ইহার তুল্য পশু-বশকারী আর কেহ ছিলেন না। সুরেশকে দেখিয়া, সুরেশের সাহসে, সুরেশের তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে, সুরেশের মানসিক বলে, তিনি সুরেশের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং নিজ সহকারীরূপে তাঁহাকে পশুবশ কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সুরেশ তাহাই চাহেন,—এত দিনে অদৃষ্টদেবী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন,—তিনি ধন মান যশের পথে অগ্রসর হইলেন। জামবাক্ সাহেব প্রস্তাব করিবামাত্র তিনি সাগ্রহে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সারকাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত তিনি তাঁহার পশুশালায় প্রস্থান করিলেন।

এখানে জামবাক্ সাহেবের অধীনে তিনি নানা হিংস্রজন্ত বশ করিয়া তাহাদের সহিত নানা ক্রীড়া কৌতুক করিতে লাগিলেন। সিংহ ও ব্যাঘ্র বশ করা ও তাহাদের সহিত ক্রীড়া করাই তাঁহার বড় প্রিয় কার্য্য ছিল। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই এই দুঃসাহসিক কার্য্যে এত সুদক্ষ হইলেন যে জামবাক্ সাহেব দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন,—প্রকৃতই তাঁহার সহকারীদিগের মধ্যে সুরেশের সমকক্ষ আর কেহই ছিল না।

এইরূপে দুই বৎসর কাল জামবাক্ সাহেবের নিকট থাকিয়া তিনি পুনরায় সারকাস দলে প্রবেশ করিলেন। এক্ষণে 'সারকাসে তিনি ব্যাঘ্র সিংহের সহিত খেলা দেখাইয়া দর্শকদিগকে মোহিত ও স্তম্ভিত করিতে লাগিলেন। যখন যেখানে তাঁহার খেলা হইয়াছিল সেইস্থলে সকলেই তখন তাঁহার অমানুষিক সাহসে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অনেক রাজন্তবর্গের সম্মুখেও ক্রীড়া দেখাইয়া

তিনি বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে সমস্ত ইয়োরোপে তাঁহার নাম প্রচার হইতে লাগিল;—সকলেই তাঁহাকে চিনিল।—অবশেষে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যে মহা প্রদর্শনী হয়, সুরেশ সেই প্রদর্শনীতে সিংহ ও ব্যাঘ্রের সহিত ক্রীড়া করিয়া জগদ্ব্যাপী খ্যাতি লাভ করিলেন। এই সময়ে তিনি বহু সংখ্যক মেডেল ও সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন, এখানে সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সারকাস দলের সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি এক সময়ে হামবার্গ নগরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে গাজেনবাক নামক এক সাহেবের এক বৃহৎ পশুশালা ছিল। ইনি দেশ ও বিদেশ হইতে নানা পশু আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে নানা রূপে শিক্ষা দিয়া তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন দেশের পশুশালায় বা ভিন্ন ভিন্ন সারকাস দলে এই সকল পশু বিক্রয় করিতেন। ইহাই ইহার ব্যবসা ছিল এবং এই ব্যবসায়ে ইনি বিলক্ষণ অর্থও উপার্জ্জন করিতেন। হিংস্র পশুর সহিত সুরেশের ক্রীড়া দেখিয়া ইনি সুরেশকে নিজ পশুশালায় নিযুক্ত করিতে ব্যগ্র হইলেন এবং সারকাসে যে বেতন পাইতেন, তাহাপেক্ষা অধিক বেতন দিতে স্বীকৃত হইলেন। সুরেশও সারকাস পরিত্যাগ করিয়া গাজেনবাক সাহেবের পশুশালায় কার্য্য গ্রহণ করিলেন।

এখানে সুরেশ সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী প্রভৃতি বন্ত পশুদিগকে নানা ক্রীড়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং নিজে, অন্ত পশুর কথা দূরে থাকুক দুর্দান্ত সিংহ ব্যাঘ্রকে কুকুর বিড়ালের ন্যায় করিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিতেন,—তাহারা তাঁহার হাত চাটিত, গা চাটিত,

—তিনি তাহাদের ভয়াবহ মুখের ভিতর তাঁহার মস্তক প্রবেশ করিয়া দিতেন,—এই সকল ভয়ানক পশু যে তাঁহার প্রাণ নাশ করিতে পারে এক মুহূর্ত্তের জন্ম তাহা তিনি ভাবিতেন না। ভয় বলিয়া যে কিছু পদার্থ তাঁহার হৃদয়ে আছে তাহা বোধ হইত না। একটী ব্যাঘ্রকে তিনি শৈশব হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন,—ইহার নাম রাখিয়াছিলেন ফ্যানি,—এটী ইহার এতই অনুগত হইয়াছিল যে কুকুরও বোধ হয় তত হয় না।—সুরেশকে ইহার সহিত খেলা করিতে দেখিলে লোকে স্তম্ভিত, বিস্মিত ও মুগ্ধ হইত। একটী হস্তীকে তিনি এমনই শিক্ষিত করিয়াছিলেন যে তিনি না খাওয়াইলে সে খাইত না। জোগ কার্ল নামক জনৈক পশুব্যবসায়ী বহু মূল্যে এটী ক্রয় করেন,—কিন্তু তিনি এটীকে লইয়া গিয়া মহা-বিপদে পড়িলেন। সুরেশের অভাবে সে আহার পরিত্যাগ করিল,—কিছুতেই আহার করিল না। কার্ল সাহেব এমন সুশিক্ষিত হস্তী পরিত্যাগ করিতেও না পারিয়া, অগত্যা তিনি অধিক বেতনে সুরেশকে আপনার পশুশালায় নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন।

জামবাক সাহেবের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সুরেশ বহু দিবস কার্ল সাহেবের নিকট কাজ করিতে লাগিলেন। এখানেও তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেন। হিংস্র পশুগণ যেন তাঁহার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব,—তিনি সর্ব্বদা ইহাদের সহিতই বাস করিতেন,—ইহাদের সহিত, ইহাদের নিকট, আহার বিহার করিতেন,—স্বহস্তে ইহাদিগকে আহার দিতেন,—ইনিও ইহাদিগকে ভালবাসিতেন, তাহারাও তাঁহাকে ভাল-

বাসিত। তাঁহার শিক্ষিত পশু সকল বহু মূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল,—সঙ্গে সঙ্গে সুরেশেরও বহু অর্থাগম হইতে লাগিল। ধনে মানে এক্ষণে তিনি একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোক। এক্ষণে তিনি আর সে সুরেশ নাই।



একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেম।

এমন মানুষ নাই, যাঁহার হৃদয়ে কখন না কখন প্রেম দেখা দিয়াছে। বোধ হয় কেবল হিন্দু যোগীগণই নিজ নিজ সাধনার বলে হৃদয় হইতে দুর্দ্দমনীয় প্রেমবৃত্তি উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইঁহারাই কেবল যোগ-সাধনার বলে ইন্দ্রিয় দমন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইতে সমর্থ হইয়াছেন। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে ইন্দ্রিয় সংযমন একরূপ অসম্ভব,— এমন মানুষ নাই, যিনি, জীবনের কোন না কোন সময়ে, হৃদয়ের সৌন্দর্য্য পিপাসায় পীড়িত হইয়া কামিনীর কমনীয়রূপে আকৃষ্ট না হইয়াছেন ও প্রেমের তরঙ্গে পতিত হইয়া আত্মহারা না হইয়াছেন।

সুরেশও প্রেমের হাঁত এড়াইতে পারিলেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সারকাসের জারমান বালিকার প্রতি তাঁহার প্রাণ আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তিনি জানিতেন যে জারমান বালিকাকে লাভ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, এই জন্ত তিনি তাঁহার হৃদয়কে দমন করিতেছিলেন, বালিকাকে ভুলিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছিলেন। বালিকা সারকাস পরিত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত

লাগিয়াছিল, কিন্তু তিনি সেই হৃদয় বেদনার মধ্যেও মনে একটু সান্ত্বনা পাইলেন। ভাবিলেন, বালিকার নিকট হইতে দূরে থাকিলে, বালিকাকে না দেখিলে তিনি তাহাকে হৃদয় হইতে অন্তরিত করিতে পারিবেন; এবং এই উদ্দেশে— বালিকার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য— তিনি তাহার পত্রের উত্তর দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন। কিন্তু হায়! এত করিয়াও তিনি সেই সুন্দর মুখখানি ভুলিতে পারিলেন না; অহোরাত্রি সেই সুন্দর মুখখানি তাঁহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে লাগিল। বালিকার সহিত আর কখনও দেখা হইবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ না হইলে তিনি চাই কি তাহাকে ভুলিলেও ভুলিতে পারিতেন। কিন্তু ভগবান অন্যরূপ ব্যবস্থা করিলেন, তিনি মনে মনে যাহা স্থির করিলেন ঘটনাচক্রে তাহা উল্টাইয়া গেল।

সুরেশ সারকাস দলের সহিত ইয়োরোপের নানা সহরে ফিরিতেছিলেন। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি জারমান দেশীয় একটী নগরে উপস্থিত হইলেন। সহসা একটা দোকানে তিনি সেই জারমান বালিকাকে দেখিলেন। তিনি একণে আর বালিকা নাই, পূর্ণ যৌবনে ভাসমানা, সুরেশও এখন আর সেই পূর্ব্বের শ্মশ্রুহীন সুরেশ নাই, তিনিও যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। বহুকাল উভয়ে উভয়কে দেখেন নাই, উভয়ের আকৃতিতে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু উভয়ে উভয়ের কেহও কাহাকে বিস্মৃত হন নাই। যখন উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইলেন, তখন উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, কাহারও বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না। যদিও বহুদিন উভয়ে সাক্ষাৎ নাই, তবুও

এইরূপ সহসা উভয়ের দর্শনে উভয়েই বুঝিলেন যে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে ভুলিতে পারেন নাই। ক্ষণেক নিস্পন্দ থাকিয়া কিঞ্চিৎ পরে উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণ করিয়া সেই দোকান হইতে বহির্গত হইলেন। নিকটস্থ উদ্যানের নির্জ্জন বৃক্ষনিম্নস্থ বেঞ্চে বসিয়া উভয়ে কত কথা কহিলেন;—কত দিনের কত কথা, সে কথার শেষ নাই, বিরাম নাই। সে প্রেমিক যুগলের প্রেম কথোপকথন কত মধুর, কত কোমল তাহা প্রেমিক ভিন্ন অপরে বুঝিবেন না।

সে দিনের জন্য উভয়ে উভয়কে প্রেমালিঙ্গন করিয়া বিদায় হইলেন, কিন্তু সেই সাক্ষাৎ শেষ সাক্ষাৎ নহে;—সেই দিন হইতে প্রায়ই প্রত্যহ উভয়ে গোপনে ও নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। যুবতী ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা, পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় তিনিই এক্ষণে ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী;—সুতরাং তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য দেশের মান্যগণ্য অনেকে ব্যগ্র, এরূপ স্থলে যুবতীর আত্মীয় স্বজনগণ যে অজ্ঞাত কুলশীল এক অপরিচিত কৃষ্ণবর্ণ ভারতবাসীর সহিত, সামান্য পশু শিক্ষকের সহিত তাঁহার বিবাহে সম্মত হইবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। যাহাতে যুবতী যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারেন তাঁহারা প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রাবৃট কালের স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রেমের স্রোত প্রবল তরঙ্গময়ী, কে সেই বেগের প্রতিবন্ধক হইতে পারে? যুবতীর আত্মীয় স্বজন যতই প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রেম স্রোতও ততই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। যে কোন উপায়ে হউক তিনি প্রত্যহ গোপনে সুরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে

লাগিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রেমে উন্মত্ত হিতাহিত কাণ্ডাকাণ্ড সমস্তই ভুলিলেন, এরূপ ব্যাপারে যাহা হয়,—তাহাই ঘটিল,—যুবতী কলঙ্কের ডালা মাথায় করিলেন।

এ কথা বহুকাল গোপন রহিল না। ক্রমে যুবতীর আত্মীয় স্বজন সকলেই যুবতীর এই অপকলঙ্কের কথা শুনিলেন, তখন তাঁহারা ক্রোধান্ধ হইয়া সুরেশের প্রাণ সংহার করিবার জন্ত স্থির প্রতিজ্ঞ হইলেন। সুরেশের আর জারমানিতে থাকা হইল না, তিনি প্রাণ রক্ষা করিবার জন্ত জারমানি পরিত্যাগ করিলেন। জারমানি পরিত্যাগ করিয়াও তিনি নির্ভয় বা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। যুবতীর আত্মীয়গণ তাঁহার পশ্চাতানুসরণ করিলেন, নগরে নগরে তাঁহার অনুসন্ধানে লোক লাগাইলেন। অগত্যা সুরেশ বাধ্য হইয়া ইয়োরোপ পরিত্যাগ করিলেন। আটলাণ্টিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া সুদূর আমেরিকায় প্রস্থান করিলেন। বহুদিবস হইতে তাঁহার আমেরিকা দেখিবার সাধ ছিল, এক্ষণে এক বৃহৎ সারকাস দলে নিয়োজিত হওয়ায় তাঁহার সেই বহু দিনের পোষিত ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সুবিধা হইল। তিনি সেই দলের সহিত মার্কিন দেশে যাত্রা করিলেন।



দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্রেজিলে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ওয়েল সাহেবের সুবিখ্যাত হিংস্র পশু-প্রদর্শনী দলে সুরেশ কার্য্য গ্রহণ করিলেন। ঐ বৎসরেই তিনি ঐ দলের সহিত আমেরিকায় গমন করিয়া নানাস্থানে নানা ক্রীড়া দেখাইতে লাগিলেন। ইউনাইটেড ষ্টেটের সমস্ত প্রধান প্রধান স্থানে ক্রীড়া প্রদর্শিত হইল, সর্ব্বত্রই সুরেশ বিশেষ প্রশংসা লাভ করিলেন।

ইয়োরোপ ও ইংলণ্ড হইতে এক্ষণে মার্কিন দেশ অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। মার্কিনের নিউইয়র্ক নগর এক্ষণে লণ্ডনের নিয়েই শোভা সমৃদ্ধির জন্য পরিগণিত; এরূপ সহর জগতে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না;—সভ্যতার বলে, জ্ঞানে, বিদ্যায় নিউইয়র্কবাসীদিগের সমকক্ষ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সুবিখ্যাত নিউইয়র্ক নগরেও সুরেশ ব্যাঘ্র সিংহের সহিত অদ্ভুত ক্রীড়া দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, চারিদিকে তাঁহার প্রশংসা হইতে লাগিল, বড় বড় সম্বাদ পত্রে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশিত হইতে লাগিল, নিউই-

ৰর্কের আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে কেবল তাঁহার কথা লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল।

ইউনাইটেট ষ্টেট হইতে তিনি সারকাস দলের সহিত প্রথমে মেক্‌সিকো, পরে দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তৃত সাম্রাজ্য ব্রেজিলে উপনীত হইলেন। তাহার পূর্ব্বে আর কখন কোন বাঙ্গালী এই দূরদেশে গমন করেন নাই। ব্রেজিল সাম্রাজ্য প্রায় ভারতবর্ষের স্তায় বৃহৎ, দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত মধ্যপ্রদেশ এই সাম্রাজ্য ভুক্ত। এক্ষণে প্রথমে স্পেন ও পর্টুগালবাসীগণ আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারা এই দেশের আদিম নিবাসী স্ত্রীদিগের সহিত উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হওয়ায় এক বর্ণসঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয়, এই জাতি ক্রিয়োল নামে খ্যাত। এক্ষণে ব্রেজিলের অধিবাসীদিগের মধ্যে ইহাদের সংখ্যাই অধিক। এতদ্ব্যতীত পর্টুগিজ প্রভৃতি শ্বেত জাতির সহিত কাফ্রি স্ত্রীলোকদিগের বিবাহে অন্ত আর এক বর্ণসঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয়;—ইহাদিগকে মুলাটো বলে। ব্রেজিলে মুলাটোর সংখ্যাও অতিশয় অধিক। এতদ্ব্যতীত পর্টুগিজ, জারমান প্রভৃতি ইয়োরোপীয় অনেক লোক এখানে অভিনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন।

পর্টুগিজগণ প্রথমে এদেশে রাজ্যস্থাপন করেন, পরে যখন নেপোলিয়ন পর্টুগাল দেশ আক্রমণ করিয়া রাজপরিবারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন, তখন রাজা স্বপরিবারে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ব্রেজিলে প্রস্থান করেন, পরে পর্টুগালের সহিত নেপোলিয়ানের সন্ধি হইলে রাজা আর দেশে ফিরিলেন না, তিনি সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিয়া ব্রেজিলে স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার অনেক আত্মীয় আসিয়া পর্টুগালে

রাজা হইলেন। তদবধি পর্টুগিজ সম্রাটই ব্রেজিলে রাজ্য করিতে ছিলেন, পরে রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়া এক্ষণে ব্রেজিল সাধারণতন্ত্র প্রণালী অনুসারে শাসিত হইতেছে।

যে দেশে সুরেশ গৃহবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বিবাহ করিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, সে দেশের স্থূল বিবরণ তাঁহার জীবন বৃত্তান্তে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভূবৃত্তান্ত পাঠে ইহার কতকটা আভাসও পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য দেশ যেরূপ উর্ব্বরা তাহাতে ইহাতে যদি সেইরূপ লোকের বসবাস থাকিত, তাহা হইলে জগতে ব্রেজিল ধনধান্যে একটী প্রধান দেশ বলিয়া পরিগণিত হইত,—কিন্তু ইহা আকারে ইয়োরোপের ন্যায় হইলেও ইহার লোক সংখ্যা অতি অল্প। দুই তিনটী সহর ব্যতীত আর সহর নাই, অধিকাংশ স্থলই ঘোর জঙ্গলে পূর্ণ,—লোকালয়ের সম্বন্ধ নাই। এত বড দেশে রেল একেবারেই ছিল না, সম্প্রতি কোন কোন স্থানে রেল হইয়াছে। ইহার প্রধান সহরের নাম রাইও-ডি জ্যানিরো। এই নগরটী আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত, ইহার লোকসংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষের উপর নহে। এইটীই এ দেশের রাজধানী।

এক্ষণে সুরেশ এই নগরে আসিয়া তাঁহার অদ্ভুত ক্রীড়া দেখাইতে লাগিলেন। তিনি যে এ সময়ে কেবল সারকাসই করিতেন এ রূপ নহে। "লা ক্রনিকা" নামক প্রসিদ্ধ সম্বাদ পত্রে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি এই সময়ে নানা বিষয়ে বক্তৃতাদিও প্রদান করিতেন। তিনি এই সকল বক্তৃতা যে কেবল ইংরাজীতেই দিতে লাগিলেন, এমত নহে;—ব্রেজিলে তিনি ব্রেজিলের রাজভাষা পর্টুগিজে সুন্দর বক্তৃতা প্রদান

করিতে পারিতেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজী, জার্ম্মাণ, স্পেনীয়, ফ্রেঞ্চ, পর্টুগিজ, ইটালিয়ন, ডানিস ও ডাচ্ এই সাতটী ভাষায় অনায়াসে অতি সুন্দর কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অবসর পাইলেই তিনি পাঠে মনোযোগী হইতেন। অঙ্কশাস্ত্র, দর্শন ও রসায়ন তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল; এই সকল শাস্ত্রে তিনি যে সাতিশয় দক্ষ হইয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই; কারণ এই সময়ে তিনি নানা স্থানে এই সকল বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য সহকারে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। নানা সম্বাদপত্রে তাঁহার এই সকল বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসাও প্রকাশ হইয়াছিল। অভিনিবেশ থাকিলে শিক্ষার সময় কখনও শেষ হয় না এবং প্রতিজ্ঞা ও আন্তরিক অনুরাগ থাকিলে অভীষ্টপথে অগণ্য বিঘ্ন অন্তরায় যে অচিরেই অন্তর্হিত হইয়া যায়, সুরেশচন্দ্রের জীবনের লক্ষ্য করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আমরা একে একে দেখাইব, কত প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া তিনি পরিশেষে ব্রেজিলে আপনার অবস্থিতির উপায় করিয়া লইয়াছেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রেজিলের রাজধানীতে আসিলেন, ব্রেজিলদেশ তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল;—ইহার প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া সুরেশ মুগ্ধ হইলেন,—তিনি এই দেশে বাস করিতে মনে মনে স্থিরসঙ্কল্প করিলেন। ঐকান্তিক অভিলাষ প্রায়ই অপূর্ণ থাকে না। তাঁহার এ ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সুবিধাও ঘটিল,—এই সময়ে ব্রেজিল দেশের রাজকীয় পশুশালার পরিদর্শক ও রক্ষকের পদ শূন্য হই-

য়াছিল। সেই পদ পাইবার জন্ত স্মরেশ আবেদন করিলেন। স্মরেশের স্তায় পশুপালক ও শিক্ষককে পাইবামাত্র ব্রেজিল-রাজ-কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। তখন স্মরেশ সারকাস পরিত্যাগ কিরিয়া ব্রেজিলের পশুশালায় সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্ট হইলেন! কর্ম্মান্তর গ্রহণে স্মরেশচন্দ্র কখনও সঙ্কুচিত নহেন। জীবনে যাঁহার মমতা নাই—প্রাণের আশঙ্কা যাঁহার বাল্যকাল হইতেই দেখা যায় নাই, দুর্দ্দান্ত হিংস্রপশু সিংহ ব্যাঘ্র যাঁহার নিকট ক্রীড়নক মাত্র, কর্ম্মান্তর গ্রহণে সঙ্কুচিত হইবার কারণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।



ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নব অনুরাগ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যদিও সুরেশ হিংস্রক পশু বশীকরণ কার্য্যেই শিক্ষিত হইয়াছিলেন বটে, তথাপি তিনি অবসর পাইলেই গণিতশাস্ত্রাদি আলোচনায় নিযুক্ত হইতেন; বস্তুতঃ এই সকল অনুশীলনে তিনি স্বভাবতঃ কেমন আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞ ছিলেন, অঙ্ক ও অন্যান্য শাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এবং লাটীন গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। দার্শনিক তত্ত্ব ও গুপ্তবিদ্যানিচয়ে তাঁহার সাতিশয় অনুরাগ ছিল, বিশেষতঃ ইন্দ্রজাল ও কিমিয়া বিদ্যায় তিনি সাতিশয় আসক্ত ছিলেন। শীত ও গ্রীষ্মকালে সমধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া সুরেশ তাঁহার সেই ক্ষুদ্র পাঠাগারে বসিয়া অনন্য মনে অধ্যয়নে রত থাকিতেন, অথবা কাচ যন্ত্রাদি ও মুচি লইয়া রাসায়নিক পরীক্ষায় বিব্রত থাকিতেন। নিয়ত প্রধাবমান কালস্রোত কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, জানিতেও পারিতেন না।

ঘটনাক্রমে সুরেশের সহিত একদা স্থানীয় চিকিৎসক-

কন্তার সাক্ষাৎ ঘটে। এই প্রথম সন্দর্শনেই তৎপ্রতি তাঁহার প্রেমের সঞ্চার হয়, কিন্তু উক্ত রমণী তখনও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়েন নাই। অনন্তর যথারীতি তাঁহারা উভয়ে উভয়ের সহিত পরিচিত হইলেন,—তাঁহার পক্ষে উহা বাহুল্য বলিয়া প্রতীত হইল। যাহা হউক, এই পরিচয়ের পর হইতে পথে, শকটে, বিপণীতে, উভয়ের সাধারণ বন্ধুগৃহে প্রভৃতি নানাস্থানে পরস্পরের প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ ঘটিত। ক্রমে ক্রমে তিনি সেই রমণীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, কিন্তু রমণী সে সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন না। পরে তিনিই আবার তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত ও শূন্য অংশ পূর্ণ করেন।

স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ কল্পনা বহুল বিচিত্র জীবনের অনুরাগিণী; তজ্জন্যই দেখা যায় যে, সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতেই তাহারা বীরবিক্রমের পক্ষপাতী। সর্ব্ব জাতির ইতিহাসেই ইহার প্রচুর উদাহরণও দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে, রমণীরা স্বয়ম্বরা হইলে অনেক স্থলেই ধনবান্ অপেক্ষা নিঃস্ব ব্যক্তিকেই বরমাল্য প্রদান করে, যদি তাঁহার জীবন এইরূপ হয় এবং এইরূপ পরিণয়ে [illegible] প্রেমে চিরসুখিনী হইয়া থাকে। সেই অর্ষাণ রমু-মর্জ্জরীর কথাই ভাবিয়া দেখুন না,—অভাগিনী এই অপরিচিত, সুরক্ষকের সহবাসে আসন্ন মৃত্যুমুখে স্থিত ভারতবাসীর অঙ্কশায়িনী হইবার আশায়, অনেক বর্দ্ধিষ্ণু ভূম্যধিকারী যুবার অযাচিত পাণিপ্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছিল।

যদিও উক্ত চিকিৎসককন্যা প্রথমে সুরেশকে তৎপ্রতি অনুরাগ প্রদর্শনে অণুমাত্রও উৎসাহ প্রদান করেন নাই, কিন্তু

সেই অটল প্রকৃতি সিংহপালকের প্রার্থনা তিনি অধিক কাল অপূর্ণ রাখিতে সক্ষম হয়েন নাই। সুরেশ এতাবৎ কাল ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না,—অসংখ্য ভীতি-পূর্ণ আসন্ন মৃত্যু অদ্যাপি তাঁহাকে বিচলিত করিতে সক্ষম হয় নাই। নানা মূর্ত্তিতে মৃত্যু অদ্যাবধি তাঁহাকে নানা বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছে,—মারী ভয়ের ভীতি, ক্রীড়নশীল সর্পকুলের দংশনাশঙ্কা, শিক্ষিত ব্যাঘ্র বা সিংহ নিচয়ের দংশন ভয়, এবং তৎশিক্ষিত করিকুলের দশনভীতি, প্রভৃতি কিছুতেই তিনি অণুমাত্রও শঙ্কিত হয়েন নাই। উপস্থিত প্রেমই তাঁহার জীবনের এক মাত্র বন্ধন; যদি তাহাতে নিরাশ হয়েন, তাহা হইলে মৃত্যু তদপেক্ষা শতগুণে বাঞ্ছনীয় বলিয়া তাঁহার মনে হইত। এ সকল উদ্দেশ্যবিহীন বৃথা বাক্য নহে,—প্রকৃতই সুরেশের প্রণয়িনী ঘটনা-বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইতেন এবং সেই কারণেই সুরেশের প্রতি কথঞ্চিৎ পক্ষপাতীও হইয়াছিলেন। সুরেশের নির্ভীকতা, জীবনকে অতি সামান্ত তৃণ অপেক্ষায় লঘু জ্ঞান, বিনা দ্বিধায় কি নৃশংস ব্যাঘ্র, কি ভয়াবহ অহিকুল, কি ভীষণদন্ত বারণ, কি তীব্রচক্ষুষ্মান ক্রূরমতি বন্য মার্জ্জার (Lynx) প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু মুখে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত দেখিয়া জীবক দুহিতা বস্তুতঃই মোহিতা হইয়াছিলেন। বিবিধ বন্যজন্তু তাঁহার সেই মোহিনী তীব্র দৃষ্টি প্রভাবে তাহাদের স্বাভাবিক হিংস্র ও দুর্দ্দান্ত-ভাব ভুলিয়া নিমেষে গৃহপালিত পশুদিগের মত শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার বশীভূত হইত।

ক্রমে উভয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে যতই ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্ব জন্মিল, ততই যুবতী স্বীয় পূর্ব্ব

গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রমণীজন সুলভ লজ্জা ভারতের ন্যায় পৃথিবীর অন্য কোনও অংশেই পরিদৃষ্ট হয় না; স্পেন ও পর্টুগালবাসীদিগের মধ্যে অবশ্য কতক পরিমাণে আছে বটে, কিন্তু ফরাসী ও মার্কিনদিগের মধ্যে আদৌ নাই। অদ্যাপি ব্রেজিলে মহিলাকুলের বাচালতা সামাজিক ব্যভিচার-রূপে পরিগণিত হয়। ফলতঃ পুরুষদিগের সহিত অবাধে সংমিশ্রণ ব্রেজিল-বালাদিগের পক্ষে রীতিবিরুদ্ধ; কিন্তু অন্য কোনও পাশ্চাত্য প্রদেশে এরূপ নিয়ম দেখা যায় না।

কিন্তু প্রেম নির্দ্দিষ্ট সমাজ বন্ধনীর অধীন নহে;—নহিলে তুষার ধবল ডেস্‌ডিমোনা সুন্দরী কৃষ্ণকায় সুরেশের চরণতলে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনার নারীজন্ম ও জীবন সার্থক করিবার জন্য এত লালায়িত হইত না। মদনের মোহন শাসনের অপ্রতিহত প্রভাবে ক্রমে সেই সুদূর ভারতবাসী যুবক ও ব্রেজিলবাসী ভিষক্‌বালার হৃদয় দুইটী একীভূত হইতে লাগিল। বালা প্রায়ই তাঁহাকে তাঁহার নানা স্থানের কীর্ত্তি-কাহিনী বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিতেন এবং সুরেশ যখন সেই সকল ঘটনাবলী অস্ফুটস্বরে ব্যক্ত করিতেন, তিনি উৎকর্ণ হইয়া নিবিষ্টচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন—সেই সকল আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয়ে কত তরঙ্গ উঠিত, গণ্ডদেশ রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিত, চক্ষু বিস্ফারিত ও সমুজ্জ্বল হইত—তিনি যেন দেখিতেন, পৃথিবীতে আর কিছুই নাই; কেবল দেশে বিদেশে সুরেশচন্দ্র মহামহিমার সৌন্দর্য্যে বীর্য্যে সর্ব্বস্থানে কীর্ত্তি-কলাপের বিজয়মালিকা পরিয়া দেবমূর্ত্তিতে চারিদিক্ আলো করিয়া আছেন। তিনি অন্তরে তিনি বাহিরে। তাঁহার

প্রশংসাবাদ করিতে তাঁহার অভাব হইত বলিয়া তিষকৃহৃহিতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রিয়তমের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন ও দৃঢ়তর মুষ্টিতে সুরেশের করপেষণ করিতেন।



চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

রণবিভাগে।

একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে রহস্যচ্ছলে প্রকাশ করেন যে, সুরেশকে সৈনিক সজ্জায় বোধ হয় বড়ই সুন্দর দেখায়। এই রহস্যবাক্য সুরেশের মনে গম্ভীর আদেশ বলিয়া প্রতীত হইল। সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হইয়া প্রণয়িনী সমীপে তাঁহার অনুরাগ প্রমাণিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তিনি সাগ্রহে সেনানীদলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সানন্দে কঠোর সামরিক নিয়মাবলী প্রতিপালনে রত হইলেন। সৈনিক দলভুক্ত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, তিন বৎসর কাল অবিচ্ছেদে তিনি এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য, এবং ইচ্ছা করিলেই এখন আর সেই পূর্ব্বের মত দেশ পর্য্যটনে সক্ষম নহেন। একবার যখন তিনি নিয়মাবদ্ধ হইয়াছেন তখন আর পলায়নের উপায় নাই—কারণ, সর্ব্বদেশের সমর নীতির কঠোর বিধান অনুসারে পলাতক সৈনিক মাত্রেই কারাবাস বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, প্রণয়িনীর প্রেমপরীক্ষার্থই তিনি সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, —অন্ততঃ তিনি নিজ প্রণয়বেগও দেখাইতে পারিবেন;— দেখাইলেন যে, প্রণয়িনীর জন্য তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করিতে

পারেন, দ্রব লৌহ গলাধঃকরণ করিতেও দ্বিধা করেন না। তিনি সামান্য সৈন্যরূপে প্রবেশ করেন, সৈনিক জীবন সর্ব্বপ্রদেশেই সমক্লেশকর।

সুরেশ ব্রেজিল সম্রাটের অধীনে সৈন্য নিযুক্ত হইলেন। ব্রেজিলে তখনও এখনকার ন্যায় সাধারণ তন্ত্র স্থাপিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমপদস্থ সাধারণ সৈনিকদিগের অপেক্ষা উন্নত ছিলেন; তিনি সাতটী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং যদিও প্রাচ্য বা প্রতীচ্য কোন বিশ্ব বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই তথাপি যে তথাবিধ অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা সুশিক্ষিত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি স্বচেষ্টায় নানাবিধ অসামান্য বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন,—সঙ্কটাপন্ন ও শ্রান্তিজনক ক্রীড়াবসানে যে অবসর পাইতেন, সেই সময়টুকু নানা জ্ঞানানুশীলনে অতিবাহিত করিয়া তৎসমুদায়ে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। এতৎ সত্বেও জাতি ও বর্ণের জন্য তাঁহার পদোন্নতির অন্তরায় ঘটিল—তাঁহার সম্বন্ধে ব্রেজিলেও বর্ণপার্থক্য বিষম অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইল! কিয়ৎকাল তাঁহাকে সাধারণ অশ্বারোহী সেনানী নিচয়ের কষ্টসমূহ ভোগ করিতে হইল,—স্বহস্তে স্বীয় অশ্বপরিচর্য্যা ও শস্ত্র পরিষ্কার করিতে হইত।

দেখা যায়, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সান্টাক্রুজে ক্ষুদ্র এক দল সেনানীর নায়করূপে কর্পোরাল পদে অধিষ্ঠিত। সান্টাক্রুজে সম্রাটের অশ্ব চারণের একটী মাঠ ছিল, কর্পোরাল সুরেশচন্দ্র তথাকার অশ্বরক্ষকদিগের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োজিত হয়েন। এই স্থানে তিনি বহু দিবস অবস্থান করেন। এখানে তাঁহার বিশেষ কার্য্য কিছুই ছিল না,—পাঠ, রাসায়নিক পরীক্ষা এবং

প্রণয়পাত্রীর প্রেম চিন্তায় কালাতিবাহিত করিতেন। তাঁহার প্রেমপুত্তলি যদিও সশরীরে সেখানে ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি স্বরেশের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরুক ছিল। উহা প্রবাসে সঙ্গিনী, দুর্দ্দিনের সহচরী, অবসাদে সঞ্জীবনী ও জীবনের সুখচিন্তা হইয়াছিল। যে রত্ন লাভাশায় তিনি অশেষ অসুবিধা অন্তরায় উপেক্ষা করিয়া সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন, যে স্থানে জাতি-ধর্ম্মের বিষম ব্যবধান তাঁহাদের সুখসৌভাগ্যের বিশেষ অন্তরায় ছিল, মোহিনী প্রতিমার স্নেহশীতল স্পর্শ ব্যতীত তথায় কিসে তাঁহাকে সঞ্জীবিত রাখে।

কিছুকাল পরে তিনি সাণ্টাক্রুজ হইতে রায়ো-ডি-জেনেরোর হাঁসপাতাল কর্ত্তৃত্বাধানে প্রেরিত হয়েন। এই স্থানে অবস্থান-কালে তিনি প্রকৃতপক্ষে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন, তদ্ব্যতীত ইতঃ-পূর্ব্বেই পুস্তকাধ্যয়ন করতঃ চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া-ছিলেন। ক্রমে তিনি অস্ত্র বিদ্যায় এরূপ সিদ্ধহস্ত হইলেন যে, বিনা দ্বিধায় ও নির্ভীক চিত্তে অধিকাংশ অস্ত্র চিকিৎসা সম্পাদন করিতেন। অধিকন্তু চিকিৎসা বিদ্যায় তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ অনুরাগ ছিল, এক্ষণে তাহা সমধিক বর্দ্ধিত হইল। বস্তুতঃ এই সময়ে এতৎসম্বন্ধে তিনি তাঁহার পিতৃব্যকে ও অন্যান্য দেশীয় বন্ধু বান্ধবকে সানন্দে বহুসংখ্যক পত্র লিখিয়া-ছিলেন। প্রকৃতই এই চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলন যেন তাঁহাকে প্রণয় পাত্রীর সহিত ঘনিষ্ঠতর বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছে বলিয়া তাঁহার মনে হইত,—চিকিৎসক কন্যার চিকিৎসা বিদ্যানুরাগ স্বতঃসিদ্ধ।

স্বরেশের তিন বৎসর সৈনিক পদে নিযুক্ত থাকিবার অঙ্গী-

কারপত্র ১৮৮৯ সালে ফুরাইল। ইচ্ছা করিলে এক্ষণে তিনি রণ, বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া মনোমত অন্য কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন; কিন্তু এই তিন বৎসর কাল একক্রমে সমর বিভাগে নিয়োজিত থাকিয়া এবং কষ্টকর পদাদি অতিক্রম করিয়া তিনি এই বিভাগে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন আর সহসা একার্য্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল না। তিনি অশ্বারোহী সৈন্য হইতে পদাতি শ্রেণীতে পদ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন এবং অনতিবিলম্বে সেই শ্রেণীর বন্দুক চালাইবার প্রথা ও অন্যান্য কর্ত্তব্যনীতি সর্ব্বথা শিক্ষা করিলেন। সুরেশ যদি নির্দ্দিষ্ট তিনবৎসর পরেই সমর-বিভাগ পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে জগৎবাসী ব্রেজিল সৈন্যাধ্যক্ষ রূপে জনৈক ভারতবাসীর অসম সাহসিকতা এবং অগণ্য অরাতি সৈন্য বিপক্ষে অদ্ভুত বীরত্ব কাহিনী শুনিতে পাইতেন না। তিনি অস্ত্র চিকিৎসক বা সিংহপালক রূপে কখনই এরূপ ভুবন বিখ্যাত যশোলাভ করিতে বা এরূপ উন্নত পদমর্য্যাদা ও কীর্ত্তিকলাপে বিভূষিত হইতে সক্ষম হইতেন না। কিন্তু জগৎপাতা ইচ্ছাময়ের নির্দ্দেশ যে, তিনি মেকলে প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচ্য গ্রন্থকারগণের বাঙ্গালি-দিগের কাপুরুষতা সম্বন্ধে শ্লেষবাক্য ব্যর্থ করিয়া নাথেরয়ের বিখ্যাত যুদ্ধে স্বনাম ধন্য হইবেন এবং জগৎ সমক্ষে প্রতীয়মান করিবেন যে, যদিও ইংরাজ রাজা তাঁহাকে অস্ত্রশস্ত্র প্রদানে বিমুখ, তথাপি তিনি মহারাজ্ঞীও মাতৃভূমির রক্ষার্থে তরবারি ধারণে সম্যক্ সিদ্ধহস্ত। বাঙালীমাত্রই ভীরু ও কাপুরুষ নহে। কার্য্যক্ষেত্রে পড়িলে তাহারা বজ্রনাদী কামানের মুখে অবলীলা-ক্রমে রণরঙ্গে মাতিতে পারে এবং যে কোন দেশের সুদক্ষ

সৈনিকদিগের সহিত সমভাবে আপনাদের বীরবিক্রম দেখাইতে অসমর্থ নহে।



পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শুভাদৃষ্ট।

ব্রেজিলিয়ান সেনানীমণ্ডলীর মধ্যে সুরেশ যে, উচ্চপদ লাভে সম্মানিত হইবেন, ইহাই বিধাতার বিধান; সময়ে তাহাই ঘটিল। যদিও এক্ষণে তিনি করপোরালের পদমাত্র লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি এক্ষণে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হওয়ায় ব্রেজিলিয়ান ভদ্রসমাজে তাঁহার যথেষ্ট মান ও পদমর্য্যাদা লাভ ঘটিয়াছিল।

যখন তিনি ব্রেজিলের রাজধানী রায়োডি-জেনারো নগরের হাঁস্পাতালে কাজ করিতেছিলেন, সেই সময়ে মার্কিন দেশের মারাত্মক ব্যাধি পীতজ্বরের প্রবল প্রকোপ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। তাহার উপর এই সময়ে দেশে এক ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল; চারিদিকে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল,—প্রত্যহ বহুসংখ্যক লোক আহত হইয়া হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থে আসিল। একদিকে পীতজ্বর-পীড়িত লোকের কাতরোক্তি,—অন্যদিকে আহতগণের আর্ত্তনাদ! হাঁসপাতাল দিন দিন ভীষণ ভাব ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। যাঁহারা হাঁসপাতালের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের অবস্থা যে কি রূপ হইল,

তাহা বর্ণনাতীত। সুরেশ এই সময়ে এই হাঁসপাতালের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া মুমুর্ষুগণের আর্ত্তনাদের মধ্যে ও শব পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছিলেন;—কিন্তু তিনি এক দিনও কর্ত্তব্য বিমুখ হয়েন নাই,—এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার হৃদয় কম্পিত হয় নাই। বীরসাহসে ও বীর উদ্যমে তিনি হাঁসপাতালের কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।



ষটত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাষ্ট্রবিপ্লব।

সুরেশ ক্রমে করপোরালের পদ হইতে উন্নীত হইয়া পদাতিদলের প্রথম সারজেণ্টের পদলাভ করিলেন। ১৮৯৩খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে, যদিও সেনানীমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার সমপদস্থ সৈনিকপুরুষদিগকে যে রূপ কার্য্য দেওয়া হয়, তাহাপেক্ষা তাঁহাকে সমধিক গুরুতর ও উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষের কাজ দেওয়া হইত, তথাপি তিনি কৃষ্ণকায় ভারতবাসী বলিয়া তাঁহার পদোন্নতির নানা প্রকার ব্যাঘাত ও অনেক বিলম্ব ঘটিয়াছিল। যদিও তিনি অনেক বীরোচিত কার্য্য করিয়াছিলেন, রাজ্যের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিলেন, সর্ব্বকর্ম্মে বিশেষ যশলাভ করিয়াছিলেন ও রাজকর্ম্মচারিগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিলেন,—তথাপি চারি বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার কোন পদোন্নতি হয় নাই। তিনি যে সারজেণ্ট সেই সারজেণ্টই ছিলেন। সে সময়ে দেশব্যাপী বিপ্লব চলিতেছিল, তখন প্রায়ই তাঁহাকে এই সকল যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হইত; তিনি সেই সকল যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতা ও সাহসের পরিচয় দেন; এবং তাঁহার উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষগণ তাঁহার বিশেষ

প্রশংসা করিয়া উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগকে জানাইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার কোনরূপ পদোন্নতি ঘটিল না। তিনি যেপদে ছিলেন, তাহাতে তিনি কেবল অল্পসংখ্যক সৈনিকদল পরিচালনা করিতে পারিতেন, কিন্তু প্রত্যেক যুদ্ধে তাঁহার অসীম সাহস ও বীরত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত,—অন্যান্য সৈনিকগণ তৎপ্রতি ঈর্ষান্বিত হইত, তবে সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত, সাহস করিয়া কেহ কিছু বলিতে পারিত না। সুদূর হিন্দুস্থানস্থ গঙ্গা-তীরবাসী কৃষ্ণকায় বাঙ্গালী যুবককে সকলেই ভয় করিত।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম লেফ্‌টানেণ্টের পদ পাইলেন। এই পদ পাইয়া প্রকৃতপক্ষে তিনি একটী সেনাদলের অধিনায়ক হইলেন; কিন্তু সহজে তিনি এ পদ পান নাই। দেশে এই সময়ে ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল। ব্রেজিলের নৌসেনানী-মণ্ডলী বিদ্রোহ পতাকা তুলিয়া রাজধানী রায়োডি-জেনিরো অবরোধ করিল। মহা ভয়াবহ যুদ্ধ বাধিল। এই সময়ে সুরেশ তাঁহার পদোন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার খুল্লতাতকে যাহা লিখিয়াছিলেন —আমরা এখানে তাহাই উদ্ধৃত করিব।

"খুড়া মহাশয়! আমি এক্ষণে যে পদ লাভ করিয়াছি, ভাবিবেন না, আমি ইহা সহজে পাইয়াছি। আমি যে এদেশের সেনানীমধ্যে একজন সেনাপতি হইব, ইহা আমি কখনও ভাবি নাই। অনেক সময়েই আমার পদোন্নতির কথা উঠিয়াছে এবং প্রত্যেকবারেই আমার নাম চাপা পড়িয়াছে,—আমি বিদেশী বলিয়া আমার পদোন্নতিতে প্রত্যেক বারেই ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। সম্প্রতি দেশে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে,—আমি ও আমার সম-পদস্থগণ একজন প্রধান সেনাপতির অধীনস্থ হইয়াছি। ইনি

আমাকে চিনিতেন না, কিন্তু ইনি গুণবান্ ব্যক্তি,—লোকের গুণ গ্রহণে সঙ্কুচিত নহেন। আমি কোন্ দেশবাসী, আমি কে, ইনি তাহা একবারও দেখেন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে ইনি আমার সাহস ও দক্ষতা দেখিয়া প্রীত হইয়া আমার পদোন্নতির জন্ত রাজপুরুষদিগকে লিখিয়াছিলেন,—তাহাতেই আমার এই পদোন্নতি ঘটিয়াছে। তিনি আমার সম্বন্ধে এ দেশের মার্শাল ভাইস-প্রেসিডেণ্টকে বিশেষরূপে লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই আমি লেফ্টানেণ্টের পদলাভ করিয়াছি। আপনি বোধ হয় শুনিয়াছেন যে, আমি লেফ্টানেণ্ট হইয়া নাথেরয় নামক স্থানে যে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য আমাদেরই জয় হইয়াছে।"

সুরেশ লিখিয়াছেন,—"আমি এই পত্রের সহিত নাথেরয়ের যুদ্ধের এক চিত্র পাঠাইতেছি। নাথেরয়ে আমার নিম্নস্থ সৈনিকগণ সকলেই আমাকে বিশেষ ভয় করিত;—কেন করিত বলা যায় না,—আমি তাহাদের কাহারও প্রতি কখনও নির্দ্দয় ব্যবহার করি নাই। আপনারা সকলেই লেখেন যে, যুদ্ধের বিশেষ বর্ণনা আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইবে,—কিন্তু কাকা! কি লিখিব? যুদ্ধের ভয়াবহ বর্ণনা আমি আপনাকে কি লিখিব! যে জীবন জগতে সকল অপেক্ষা প্রিয়, যুদ্ধে সেই জীবন ক্রীড়াদ্রব্যরূপে লোকে অনায়াসে নষ্ট করে। সাহস আর কাহাকে বলে। যুদ্ধক্ষেত্রে স্থিরচিত্তে প্রাণদান করার নাম, বা প্রাণদান করিবার জন্ত প্রস্তুত হওয়ার নামই সাহস।

যখন শত্রুগণ দূরে অবস্থান করে, তখন তোমার বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তোমার দক্ষতা, সাবধানতা, তোমার

কার্য্যকরী হইতে পারে, কিন্তু যখন শত্রুগণ নিকটে আগত, পরস্পরের সংঘর্ষ উপস্থিত, তখন কেবল সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন, অন্য কিছুই লাগে না। যে পক্ষ বিপুল সাহসে নির্ভর করিয়া শত্রু আক্রমণ করিতে পারে,—সেই পক্ষেরই জয় হয়। শত্রুগণ সেই পক্ষের অত্যধিক উদ্যমে ও সাহসে ভীত ও বিচলিত হইয়া পলায়ন করিয়া থাকে।"

এ সকল কথা প্রকৃতই বীরোচিত। প্রকৃত বীর হৃদয় না হইলে কেহ কখন অপরকে কুকুরের ন্যায় নিজ পদানুসরণ করাইতে পারে না। অন্যকে মৃত্যুমুখে লইয়া যাওয়া সহজ কার্য্য নহে,—প্রাণের প্রকৃত উন্মাদিনী শক্তি না থাকিলে কেহ কখনই পরকে প্রাণ হারাইতে উত্তেজিত করিতে পারে না। সুরেশের এই শক্তি না থাকিলে বিদেশীয় শ্বেতকায় সৈনিকগণ ঘোর যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার পদানুসরণ করিয়া আসন্ন মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইত না। যখন সুরেশ সেণ্টক্রুস নগরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় ব্রেজিলদেশীয় একজন অধিবাসী তাঁহাকে এতই ভালবাসিত যে, সে কেবল সুরেশের নিকট থাকিতে পারিবে বলিয়াই উক্ত সৈন্যদলে নাম লেখাইয়াছিল।

নাথেরয়ের যুদ্ধবর্ণনা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে আমরা এখানে সুরেশের গৃহস্থলী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। পাঠকগণ অবগত আছেন যে সুরেশ রায়োডি-জেনিরো নগরে আসিয়া তথাকার একটী রমণীকে ভালবাসিতেন। তাঁহারা উভয়ে উভয়কে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। ইনি এই দেশের এক জন চিকিৎসকের কন্যা ছিলেন,—ইহাকেই সন্তুষ্ট করিতে গিয়া সুরেশ সৈন্যদলে সামান্য সৈনিকরূপে নাম লিখাইয়া-

ছিলেন। রমণীও তাঁহাকে ভুলেন নাই। যদিও তিনি তদবধি সুরেশকে বহুকাল আর দেখেন নাই, যদিও দেশের নানা সম্ভ্রান্ত যুবক তাঁহার পাণিগ্রহণার্থে বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিলেন,তবুও রমণী তাঁহাকে এক দিনের জন্যও ভুলেন নাই। তিনি সুদূর ভারতবাসী অপরিচিত হিন্দু যুবকের মূর্ত্তি সর্ব্বদাই হৃদয়ে রাখিয়া পূজা করিতেন। যাঁহার দেশ কোথায় তাহা জানেন না;—যাঁহার আত্মীয় স্বজন কিরূপ তাহা অবগত নহেন,—তিনি তাঁহাকেই চিরজীবনের জন্য হৃদয়-আসনে বসাইয়াছিলেন। বহুকাল পরে সুরেশ যখন যশ মান লাভ করিয়া লেফ্‌টানেণ্টরূপে রায়োডি-জেনেরো নগরে উপস্থিত হইলেন, তখন আবার বহুকাল ধরিয়া একত্র মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল,—সেই হৃদয় দুইটী অবশেষে একত্র হইল। এত দিনে উভয়ের মিলন হইল। এত দিনে উভয়ে শুভ পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। মহা সমারোহে এই বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। নগরের সমগ্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই বিবাহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। যদিও এক্ষণে সুরেশ স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজন হইতে সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে অবস্থিত তথাপি তাঁহার বান্ধবান্ধবের অভাব ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই সম্ভ্রান্ত সমাজে মহাসমাদরে অভ্যর্থিত হইতেন। রায়োডি-জেনেরো নগরে লামোস নামক একজন মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন,—ইনি তত্রত্য একজন প্রধান জমিদার ও ধনী। ইহাঁর সহিত সুরেশের বিশেষ আত্মীয়তা জন্মে। প্রকৃতপক্ষেই লামোস সাহেবই ব্রেজিলদেশে তাঁহার প্রধান বন্ধু ছিলেন। এই সকল বন্ধুদিগের মধ্যে বসবাস করিয়া সুরেশের দেশের অভাব, আত্মীয় স্বজনের অভাব,—কোনও কষ্টই উপ-

ভোগ করিতে হয় নাই। সকলেই সর্ব্বদা তাঁহাকে বাধিত করিতে [redacted] আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সুরেশ ব্রেজিল প্রদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

সুরেশ সস্ত্রীক ব্রেজিলদেশে বড়ই সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন। তাঁহাদের যেরূপ দাম্পত্যপ্রণয় ছিল, তদ্রূপ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। এক বৎসর পরে তাঁহাদের গৃহ শিশুর আনন্দময় হাস্যরোলে প্রতিধ্বনিত হইল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষাংশে সুরেশের একটী পুত্রসন্তান জন্মিল। এক্ষণে এই পুত্রের বয়স প্রায় আট বৎসর।



সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নাথেরয়ের যুদ্ধ।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রেজিলপ্রদেশে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। যদিও এ প্রদেশ ষড়যন্ত্র, গৃহবিবাদ ও কলহের আগার, তথাচ এরূপ বিপ্লব এ অঞ্চলে কখনও হয় নাই। সমস্ত প্রদেশ আলোড়িত হইয়া উঠিল,—অধিবাসিগণ বিব্রত হইয়া পড়িল। দেশের সমুদয় রণপোতে বিদ্রোহপতাকা উড্ডীয়মান হইল। বিশখানি বৃহৎ যুদ্ধজাহাজ আসিয়া রাজধানীর উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ব্রেজিলের স্থলসৈন্ত অপেক্ষা রণপোতের সেনানীগণ অধিকতর শিক্ষিত ও দক্ষ ছিল, কাজেই প্রথমতঃ তাহারাই প্রতি পদে জয়ী হইতে লাগিল,—সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অধিবাসিগণ চারিদিকে পলাইতে আরম্ভ করিল। আইন কানুন, শান্তি সমস্তই এককালে লোপ পাইল। চারিদিকে অরাজকতা বিস্তারিত হইল।

যাহাহউক কোন ক্রমে দুর্গ সকল যুদ্ধোপযোগী করিয়া বহুসংখ্যক লোককে সখের সৈনিকরূপে নিযুক্ত করা হইল। বিদ্রোহী রণপোতের সৈনিকগণ যাহাতে নগর অধিকার করিতে না পারে তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে আয়োজন করা হইল। যুদ্ধপোত

হইতে অজস্র গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল, স্থলস্থ দুর্গবাসিগণও নিশ্চিন্ত নীরব রহিল না। প্রত্যেক দুর্গের প্রত্যেক কামান অনর্গল অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল। একদিকে রণপোতের বজ্রনাদ গোলা নিচয় নগরে পতিত হইয়া গৃহ অট্টালিকাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিল,—অন্যদিকে দুর্গস্থ গোলা রাশিও সমুদ্রকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। এইরূপে কয়েক দিন মহাসমর চলিতে লাগিল।

সুরেশও এ যুদ্ধে সর্ব্বদা উপস্থিত। তাঁহার উপর একদল সেনা পরিচালনা করিবার ভার ছিল। তিনি সেনাপতির অধীনে থাকিয়া অসীম সাহসে ও বিশেষ দক্ষতা সহকারে যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিলেন। বোধ হয়, ব্রেজিল সেনানীগণমধ্যে সুরেশের সমকক্ষ আর কেহই ছিলেন না।—প্রতি মুহূর্ত্তে ও প্রতি দিবসেই এইরূপে ক্রমান্বয়ে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। রণপোতের সৈনিকগণ ভাবিয়াছিল যেন স্থলস্থ সৈনিকগণ কোনক্রমেই যুদ্ধে স্থির থাকিতে পারিবে না। এক্ষণে ক্রমেই বুঝিল যে তাহারা যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নহে। ব্রেজিল সৈনিক মহোৎসাহে ও বিশেষ দক্ষতা ও সাহসসহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বিদ্রোহ জাহাজ হইতে প্রত্যহই নগর আক্রমণের চেষ্টা হইতেছিল, কিন্তু প্রত্যহই তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া জাহাজে ফিরিতে লাগিল।—তথাপি সহরের উপর গোলাবৃষ্টি কোনক্রমেই থামিল না, উভয় পক্ষেই অগ্নিক্রীড়া চলিতে লাগিল।

কোনও রূপে নগর অধিকারে অকৃতকার্য্য হইয়া রণপোতস্থ সৈনিকগণ নগর পরিত্যাগ করিয়া নগরের নিকটস্থ নাথেরয় নামক সহরতলীস্থ ক্ষুদ্র নগর অধিকারে প্রয়াস পাইল। কিন্তু

রেবিলের রাজপুরুষগণ নিদ্রিত ছিলেন না,—তাঁহারা সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিয়া দেশ রক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিলেন।—সেণ্টক্রুশ, যাগ, মানসাকো প্রভৃতি নগরের পার্শ্ববর্ত্তী দুর্গসকল ক্রমান্বয়ে গোলাবৃষ্টিতে ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছিল,—কিন্তু তবুও তাহারা ভীত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত উভয় পক্ষ হইতেই সৈন্যগণ স্থানে স্থানে সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল,—কিন্তু কোন পক্ষই জয়ী বা পরাভূত হয় নাই।—এইরূপে দিনের পর দিন কাটিতে ছিল।

অবশেষে রণপোতস্থ সেনাগণ নাথেরায় আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। প্রথমে ইহার উপর অনর্গল গোলাবৃষ্টি করিয়া পরে একযোগে বহুসংখ্যক সেনা এই ক্ষুদ্র নগর আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিল। এই নগর রক্ষার্থে সুরেশ সদলে উপস্থিত ছিলেন। যখন নগরে গোলাবর্ষণ হইতেছিল, তখন তাঁহারা বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই,—কেবল যাহাতে তাঁহাদের কামানের গোলা ঠিক জাহাজে গিয়া পড়ে তাহারই চেষ্টা করিতেছিলেন,—অন্য কিছুই করিবার উপায় ছিল না,—কারণ হাতাহাতি সম্মুখ যুদ্ধ না হইলে সুরেশ নিজের সাহস ও দক্ষতা কিছুই দেখাইতে পারিতেছিলেন না,—কিন্তু শীঘ্রই এ সুবিধা ঘটিল।

যখন বিদ্রোহিগণ ভাবিল যে, নাথেরায় সম্পূর্ণরূপে ভূমিসাৎ হইয়াছে, তখন তাহারা বিজয়োৎফুল্ল হইয়া বহুসংখ্যক সেনানী জাহাজ হইতে তীরে অবতীর্ণ করাইয়া পশ্চাদ্দিক্ হইতে ঐ ক্ষুদ্র নগর আক্রমণ করিতে প্রয়াস পাইল। তখন নাথেরায়ের রক্ষার জন্য যাঁহারা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের অবস্থা

অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। উভয়দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা নিতান্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িলেন ;—একে ঘোর অন্ধকার রাত্রি তাহাতে শত্রু পরিবেষ্টিত, কে শত্রু কে মিত্র তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। বিদ্রোহী সৈন্যগণ বিদ্রোহ কামান লইয়া ব্রেজিলদেশীয় সৈন্যগণকে বিপন্ন করিয়া তুলিল। তিন ঘণ্টা কালব্যাপী এই রূপ তুমুল সংগ্রাম চলিল। উভয় পক্ষেই শতশত হত ও আহত হইল। বিদ্রোহী সৈন্যগণ পিত্রোর ডায় নাথেরয়ের রক্ষকদিগকে এরূপভাবে আক্রমণ করিল যে, তাহাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়া তথা হইতে অবহৃত হওয়া দুরূহ হইয়া পড়িল। এইরূপে যুদ্ধজয়ের আশায় সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া প্রধান সেনাপতি নিজের সৈনিকদল মধ্য হইতে এক্ষণে কেহ যদি এই অসমসাহসিক কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকেন তাহার জন্য আহ্বান করিলেন। বিদ্রোহীগণ নগরের এক দিক অধিকার করিয়াছিল, তাহাদিগকে তথা হইতে দূরীভূত করিতে না পারিলে নগর রক্ষার আর কোন আশাই নাই। অথচ সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য অধিক সংখ্যক সেনা প্রেরণ করিবার উপায়ও তাঁহার ছিল না। কেবল মাত্র ৫০ জন সৈন্য লইয়া কোন সেনানায়ক এই দুঃসাহসিককার্য্য করিতে সক্ষম কি না ইহাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ; সর্ব্বাগ্রে সুরেশ অতি আনন্দের সহিত এই কার্য্য করিতে প্রস্তুত বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন ; এবং সঙ্গে কেবল মাত্র ৫০ জন সৈনিক লইয়া শত্রুদিগকে দূরীভূত করিতে অগ্রসর হইলেন। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, চন্দ্রমা ক্রমে মলিন হইয়া আসিতেছেন, এই সময়ে ঐ ৫০ জন সাহসী বীর লইয়া বদবীর সুরেশ ভগ্নাবশেষ নাথেরয় নগর হইতে বহির্গত হইয়া যে স্থানে বিদ্রোহী সেনাগণ

অবস্থিত ছিল, সেই দিকে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করিলেন। অন্ধকারে শত্রুপক্ষীয় শত্রুগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে?" সুরেশ বীরদর্পে উত্তর দিলেন, "আমরা ব্রেজিল দেশীয় সাধারণ তন্ত্রের বীরসেনানী।" "অস্ত্র পরিত্যাগ কর অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হও," এই বলিয়া বিদ্রোহী সেনানীগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সুরেশ তখন সদর্পে উত্তর করিলেন, "সাধারণ তন্ত্রের বীরসেনানী অস্ত্র পরিত্যাগ কাহাকে বলে তাহা জানে না" এবং নিজের সৈন্যগণের সম্মুখীন হইয়া আপন মস্তকস্থ উষ্ণীষ ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় শত্রুগণকে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাহারা এরূপ ভীষণ ভাবে গুলি চালাইতে লাগিল, সুরেশের সৈন্যগণ সেই আক্রমণের বিপক্ষে আর বুঝি তিষ্ঠিতে পারে না। তাহারা আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং প্রায় পশ্চাৎপদ হইবার উপক্রম করিল, তখন সুরেশ রোষকষায়িতনয়নে নিজ সৈনিকদিগের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া যুদ্ধের সেই মহাঘোর কলরবের উপর অভ্রভেদী স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সঙ্গিগণ, শত্রুগণ নিকটে অগ্নি উদ্গিরণ করিতেছে, ব্রেজিলের সাহসী সন্তানগণ মৃত্যুভয়ে কখন ভীত নহে, এবং তোমরাও দেখিবে যে, পবিত্রভূমি হিন্দুস্থানের সন্তান কেমন করিয়া এই সকল কামান অচিরাৎ অধিকার করিয়া লইবে; প্রস্তুত হও, অনুসরণ কর।"

সুরেশ উচ্চৈঃস্বরে অনুচরবর্গকে কহিলেন, "আমার অনুসরণ কর।" এবং স্বয়ং শত্রুদল মধ্যে ভীমবেগে প্রবেশ করিলেন। এক্ষণে সুরেশ আর একাকী নহেন, সহচরবর্গও সঙ্গে সঙ্গে

এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল যে, বিদ্রোহিগণ সেই আক্রমণবেগ সহ্য করিতে পারিল না। এই দুর্ব্বার আক্রমণে সেই চিরস্মরণীয় ব্যালাক্লাভার ন্যায় ভীষণ ও ঘোরতর ব্যাপার হইয়াছিল। শত্রুগণ তখন রণে ভঙ্গ দিল, কিন্তু সুরেশ ও তাঁহার অনুচর সৈন্যদল অমিততেজে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে কেবল শত্রুদিগকে দূত করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে; গোলন্দাজদিগকে স্ব স্ব স্থানেতেই বর্শা ও ছোরার আঘাতে বিনাশ করিলেন। হত্যাকাণ্ড অতি ভীষণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই যুদ্ধকাণ্ডেই সাধারণতন্ত্রীয় সেনাদল জয়লাভ করিল। স্বদেশ হইতে সহস্র সহস্র যোজন দূরে থাকিয়া বিজাতীয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়া, বিদেশীয় রাজ্যের সেনানায়ক হইয়া সুরেশচন্দ্র যে ভীষণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এমন ভারতবাসী কে আছে যে, তাহাতে আনন্দিত না হইবে এবং গৌরবান্বিত হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান না করিবে? সুরেশ যে গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন, তাহাতে যে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ কি?

লেফ্‌টেন্যাণ্ট বিশ্বাসের সেই অদ্ভুত আক্রমণেই যে জয়লাভ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু সমস্ত দিন খণ্ডযুদ্ধ ও মারামারি কাটাকাটি চলিয়াছিল এবং তাহাতেও অনেক বিদ্রোহী বন্দী হইয়াছিল।

সমস্ত দিনের সেই ঘোরতর ক্লেশ ও পরিশ্রমের পর সায়ংকালে সুরেশ দশজন বন্দীর সহিত শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া ক্ষণকাল বায়ুসেবনে স্নিগ্ধ হইবার জন্য নিক্রান্ত হইলেন। এইরূপে

একাকী বেড়াইতেছেন ইতিমধ্যে সুন্দর পরিচ্ছদধারিণী একটী রমণী তাঁহার সম্মুখীন হইল। স্ত্রীলোকটী ভদ্রবংশীয়া বলিয়া বোধ হইল। মৃত ব্যক্তিগণ কোথায় পতিত আছে, ইহাই তাঁহার জিজ্ঞাস্ত। স্ত্রীলোকটী বোধ হয়, কোন আত্মীয় ব্যক্তির মৃতদেহ অনুসন্ধান করিতেছিল। তাঁহার সৈন্যগণ যে স্থানে ছিল, তিনি রমণীকে আগ্রহের সহিত তাহারই অদূরবর্ত্তী গোরস্থানে লইয়া গেলেন। সহসা দুই জন বিদ্রোহী নৌসেনা চন্দ্রালোকোদ্দীপ্ত উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সুরেশ মুহূর্ত্তমধ্যে কোষ হইতে অসি নিষ্কাসিত করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, শত্রুগণ তাঁহার সহিত রণরঙ্গ সামান্ত ব্যাপার নহে বুঝিয়া দ্রুত পাদবিক্ষেপে পলায়ন করিল। নিস্তব্ধ রজনীতে সেই জনশূন্ত স্থানে তাহাদিগের অনুসরণ করার বিপদের সম্ভাবনা জানিয়া যখন তিনি প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার নাসিকায় সেই স্থানের দুঃসহ দুর্গন্ধে মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং তজ্জন্য শরীর এতই অবসন্ন হইয়া পড়িল যে, এক পদও চলিতে না পারিয়া অগত্যা নিকটস্থিত কোন প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া পড়িলেন। পরে স্বীয় অবস্থা পর্য্যালোচনাকালে পদতালে শৈত্য অনুভব করিলেন। সুরেশ নিজের পত্রে লিখিয়াছেন যে, "ঐ শৈত্য যেন চরণ হইতে ক্রমশঃ বুকে উঠিল; পরে ঠিক যেন সেইরূপ শৈত্য কর্ণে অনুভূত হইল, এবং তাহা মুখের উপর দিয়া ক্রমে বুকে আসিল। তাহার পরে তিনি অবশ ও অচৈতন্ত হইয়া শত্রু বা দস্যুর কৃপাপাত্র হইয়া পড়িয়া রহিলেন।" এইরূপ অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হইলে তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন।

ইতিমধ্যে দুই জন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে অর্দ্ধ উন্মাদ-

বস্থায় হাঁসপাতালে লইয়া যায়। তথায় তিনি অষ্টাহকাল একভা-বস্থায় ছিলেন এবং স্থানীয় ডাক্তারও তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। সংজ্ঞালাভ করিয়া স্বস্থানে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে যথাস্থানে লইয়া যাওয়া হইল। এদিকে কয়েক দিন অদৃষ্ট হওয়াতে তাঁহার বন্ধুবর্গ মনে করিয়াছিল যে, হয় ত কোন দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, এবং অনেকে তাঁহার পত্নীকে শোকপ্রশমনের সহানুভূতি পত্রও লিখিয়াছিলেন। কয়েক দিবস পরে আবার যখন তিনি দেখা দিলেন, তখন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও পরিবারমধ্যে আনন্দের আর সীমা রহিল না।



অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

এই বিস্ময়কর ও বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ জীবনীতে আমাদিগের বলিবার বিশেষ কিছুই নাই,—বিশেষতঃ চিরপ্রসিদ্ধ ভীরু কাপুরুষ বাঙ্গালীজাতির মধ্যে এরূপ কয়জন দেখা যায়? সুবিখ্যাত নাথেরয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই তিনি পদাতি সৈন্যদলের প্রথম লেফ্‌টে-ন্যাণ্ট পদলাভ করিয়া অবধি কেবল যে নানা যুদ্ধবিগ্রহেই নিযুক্ত ছিলেন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে নিজ বৈষয়িক বিষয়েও ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এক্ষণে সুরেশচন্দ্র রায়ো-ডি জেনিরো নগরীমধ্যে সুকুমারমতি পুত্র কন্যা পরিবৃত একজন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় আট বৎসর। সামাজিক ও আর্থিক, কোন বিষয়েই তাঁহার অভি-যোগের বা অসন্তোষের বিশেষ কোন কারণই নাই। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে সুরেশচন্দ্র সংসার সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ ও প্রবাহে ওতপ্রোত হইয়া এক্ষণে সুখ, সম্পদ, যশ ও ঐশ্বর্য্যের তৃপ্তিভোগ করিতেছেন। কুজ্ঝটিকা ও প্রবল ঝঞ্চার অব-সানে স্থিরবায়ু ও নির্ম্মল গগন অথবা মহাবিপ্লবের পর শান্তির অবস্থা সদৃশ সুরেশচন্দ্র আজ বিমল আনন্দ ও অতুল ঐশ্বর্য্যরাশির

মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু এস্থলে আমাদিগকে বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতে হইল যে, লেফ্‌টেন্তাণ্ট-স্থরেশ সম্বন্ধে আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, পত্রাদিও লিখিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন উত্তর পাই নাই। যে সকল পত্র আমরা তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, তৎসমুদায় পুনরায় আমাদিগের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ইহার অর্থ কি, তাহা আমরা বলিতে বা অনুমান করিতেও পারি নাই, তথাপি আমাদিগের বিশ্বাস যে, তিনি এখনও ব্রেজিল দেশীয় সেনানী মধ্যে অলঙ্কার রূপে অবস্থান করিতেছেন এবং অধিকতর পদমর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকিবেন। এস্থলে ইহাও আমাদিগের বক্তব্য যে, ব্রেজিলদেশীয় প্রথম লেফ্‌টেন্তাণ্টের পদ নিতান্ত সামান্ত বা নগন্ত নহে, কেন না রেজিমেণ্টের উহা দ্বিতীয় পদ।

আমরা এস্থলে মিঃ পুনাণ্ডো লিমস নামক স্থরেশের একজন স্থানীয় বন্ধুর একখানি পত্র উদ্ধৃত করিলাম। এই পত্রখানি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, স্থরেশ কিরূপ বীরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, এবং শত্রুগণ যে বাঙ্গালীকে কুৎসা করিয়া থাকে—ঘৃণা করিয়া থাকে, তাহাও বিদূরিত হইবে। স্থরেশের বীরত্ব ও সমর নিপুণতা দেখিলে বাঙ্গালী যে জগতে নিন্দিত ও ঘৃণিত তাহার অপনোদন হইবে। বিলাতের স্থবিখ্যাত প্রাচীন ও ক্ষমতাশালী, বাঙ্গালী-বৈরি 'টাইমস্‌' নামক পত্রও স্বীকার করিয়াছেন যে, যে বাঙ্গালী জাতি এক সময়ে—এক যুগমধ্যে স্থরেশ বিশ্বাস, জগদীশ বস্থ এবং অতুল চট্টোপাধ্যায় প্রসব করিতে পারে, সে জাতিকে কিছুতেই ঘৃণা করা যাইতে পারে না।

উল্লিখিত মিঃ পুনাণ্ডো লিমস, ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে

সুরেশচন্দ্রের পিতাকে এই পত্র লিখেন,—তিনি ব্রেজিলের এক জন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, সুতরাং তাঁহার লেখনী-প্রসূত কথাগুলি যে অতীব মূল্যবান তদ্বিষয়ে সংশয় নাই বলিয়াই আমরা সে পত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

পত্র।

রাইয়ো-ডি-জেনিরো, ১২ই মার্চ্চ ১৮৯৪।

আপনি ইতিপূর্ব্বে বোধ করি, নিশ্চয় জানিয়া থাকিবেন যে, আপনার পুত্র ব্রেজিল গবর্ণমেণ্টের সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারী। ব্রেজিলের পদাতি সৈন্যদলের তিনি প্রথম লেফ্‌টেন্যাণ্ট; সম্প্রতি নাথেরয়ের (Nitheroy) যুদ্ধে স্বীয় অদম্য বীর্য্য, উৎসাহ ও রণ-কুশলতায় তিনি বিপুল যশস্বী হইয়াছেন। সেই সুবিখ্যাত ভীষণ যুদ্ধের রজনীতে শত্রুগণ ছয়ঘণ্টাকাল অবিরত উক্ত নগরীতে গোলাবর্ষণ করিলে আমাদিগের পরমবন্ধু আপনার পুত্র সৌভাগ্য-বশতঃ সেইস্থলে স্বীয় সেনাদলের সহিত উপস্থিত থাকায় ৫০ জন সৈনিক সমভিব্যাহারে তিনি শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরিত হয়েন। শত্রুপক্ষীয়গণ শীঘ্রই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া-ছিল, এবং তৎপক্ষ হইতে তাঁহার কর্ণে এইমাত্র শ্রুত হইল যে "কে আসিতেছে"। তন্মুহূর্ত্তেই তাহার প্রত্যুত্তর হইল, "সাধারণ তন্ত্রের বীর সৈন্যগণ"। পুনরায় শত্রুপক্ষ কহিল, "হয় আত্ম সমর্পণ কর অথবা মৃত্যু নিশ্চয়।"

তদুত্তরে তিনি কহিলেন, "সাধারণ তন্ত্রের বীরসৈনিকগণ

কখন আত্মসমর্পণ করে না।” অনন্তর তিনি স্বীয় সৈন্যগণকে উদ্দেশ করিয়া শত্রুগণের দিকে অধিকতর বেগে ধাবমান হইবার জন্ত আদেশ করিলেন। শত্রুগণ তাহাদিগের কামান লইয়া তাঁহার গতি রোধ করিবার জন্ত অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র দণ্ডায়মান হইলেন এবং স্বীয় সৈনিকদিগের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “সঙ্গীগণ,—শত্রুদিগের রিভলভার-কামান আছে এবং উহা আমাদিগের অতি নিকটে স্থাপিত। আমাদিগের প্রিয়ভূমি ব্রেজিলের বীরপুত্রগণের হৃদয় মৃত্যুকে ভয় করে না, এবং তোমরাও দেখিবে যে, পবিত্র ভূমি হিন্দুস্থানের সন্তান কেমন করিয়া পাঁচ মিনিটকাল মধ্যে উহা অধিকার করিয়া লইবে, অতএব প্রস্তুত হও।” অনন্তর কয়েকবার আনন্দসূচক “হুরে”-ধ্বনি করতঃ স্বীয় সহচরবর্গকে অনুসরণ করিতে বলিয়া ভীমবেগে সেই শত্রুর কামানের মুখে তিনি অগ্রসর হইলেন। প্রবেশমাত্র বাস্তবিকই তিনি কামানগুলি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, পরে ভীষণ কাটাকাটি আরম্ভ হইল এবং পরিশেষে তিনিই জয়-লাভ করিলেন।

বিগত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ অবধি তিনি (সুরেশ) আমাদিগের কাছে ছিলেন; কারণ তিনি আমাদিগের পরিবারবর্গের বিশেষ আত্মীয়। তিনি এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, গতায়ু হইলে আমি যেন এই মর্ম্মে কলিকাতায় একখানি পত্র লিখি যে, তিনি যেখানে গিয়াছেন সেইখানেই যশস্বী হইয়াছেন, এবং যেন তাঁহার পুত্র তাঁহার কীর্ত্তি ও যশের কাহিনী জানিতে পারে এবং পিতার উপযুক্ত পুত্র হইয়া তৎপথ অনুসরণ করিতে যত্ন পায়। তিনি নব বিবাহিত পত্নী ও ১৮ মাসের একটী পুত্রকে

আমাদিগের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাহারা যত দিন জীবিত থাকিবে তাবৎ তাহারা আমার পরম আদরের ধন হইবে। ইহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী যথেষ্ট বিষয়-বিভব তিনি রাখিয়া গিয়াছেন এবং আমারও অনেকগুলি বাড়ী আছে, বিপুল সম্পত্তি আছে এবং তৎসমুদয় তাহাদিগের আশাতিরিক্ত।

সমাজে সুরেশচন্দ্র অতি ধীর প্রকৃতির লোক, আচার ব্যবহারে অতি সভ্য, এবং সুপণ্ডিত। তাঁহার মস্তিষ্ক নূতন নূতন ভাবে পূর্ণ এবং সর্ব্বদাই বিজ্ঞানচর্চ্চায় রত। বিপদ্‌কালে তিনি নির্ভীক, এদিকে দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অনুরক্ত। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তিনি এতই সুপণ্ডিত যে, এক সপ্তাহের মধ্যে আমার পরিবারের পক্ষাঘাতগ্রস্ত একটী পদ একবারে আরোগ্য করিয়াছেন। কোন ডাক্তারেই তাঁহাকে আরোগ্য করিতে পারে নাই। এই চিকিৎসা প্রণালীকে তিনি দৈহিক-তাড়িত কহেন। তিনি আমার পত্নীকে কোন ঔষধ সেবন করান নাই; তাহার শরীরে কেবলমাত্র স্বীয় হস্তের অঙ্গুলি চালনা মাত্রেই তাহাকে আরোগ্য করেন।"



পরিশিষ্ট



লেফ্‌টেন্যাণ্ট সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস—কলিকাতায় তাঁহার পিতৃব্যকে অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে কতকগুলি হারাইয়া গিয়াছে কিন্তু যে গুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, নিম্নে তৎসমস্ত উদ্ধৃত হইল——

[১]

সেণ্টক্রুজ, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭।

প্রিয় পিতৃব্য মহাশয়;—উপরে সেণ্টক্রুজ ঠিকানা দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, আমি আর এক্ষণে রাইয়ো ডি-জেনিরোতে নাই, কারণ আমি তথা হইতে এখানে বদলি হইয়াছি। এই সেণ্টক্রুজ ক্ষুদ্র গ্রাম, পূর্ব্বে অর্থাৎ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা ব্রেজিলদেশীয় সম্রাটের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল এবং তদীয় ক্রীতদাস গণ কর্ত্তৃক উহার আবাদ হইত, কিন্তু তাঁহার সেই সুবিখ্যাত-কারুণ্যবশতঃ তাহাদিগকে মুক্তিপ্রদান করিবার পর হইতে এই স্থান নিতান্ত পরিত্যক্ত অবস্থায় পতিত হইয়াছে এবং এক্ষণে কেবল ইহা গোচারণের মাঠ মধ্যে গণ্য। আমি এক্ষণে অশ্বা-রোহী সৈনিক শ্রেণীভুক্ত এবং এই সামরিক পদে অশ্বাদির

ভার গ্রহণ করিয়াছি। এই সকল অশ্ব ও অন্যান্য পশুচারণ জন্য স্থানীয় বিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য ভূমি রহিয়াছে। পিতৃব্য মহাশয়, আমি আপনাকে অতি আনন্দসহকারে এখন জানাইতেছি যে, আমি সৈনিকশ্রেণীর এক পদ উচ্চে উন্নীত হইয়াছি। আমি আর একণে সামান্য সৈন্য নহি,—আমি একণে কেবো-ডি-এস্কোয়াড্রা ইহাকে ফরাসি ভাষায় কর্পোরাল বলে, এবং সৈন্যদিগকে স্বেচ্ছামত পরিচালন করিতেছি। আপনি আমাকে বারম্বার লিখিয়াছেন যে, আমি যেখানে যাই বা যে জাতি দেখি, তৎসম্বন্ধে আপনাকে কিছু লিখি, কিন্তু তাহা করিতে হইলে আমাকে রাশি রাশি পুস্তক লিখিতে হয়। আমার অনেক ইয়ুরোপীয় বন্ধুও সেই কথা বলেন অর্থাৎ আমার অভিজ্ঞতা, আমার কার্য্য, প্রভৃতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে বলেন। বস্তুতই আমি অনেক দেখিয়াছি। আমি প্রায় সমুদায় বিজ্ঞানই জানি এবং সাতটী ভাষাও জানি। আমি ইংরাজি, ফরাসি, জর্ম্মন, স্পেনীয়, এবং পর্ত্তুগীজ এবং অল্প অল্প ইটালী, ডেনিস, ও ওলন্দাজ ভাষায় কথা কহিতে পারি, কিন্তু এই শেষোক্তগুলি আমি গণনা মধ্যে ধরি না। আমি একটী কপর্দ্দক লইয়াও বাটী হইতে আসি নাই এবং যদিও আমার তখন একটী কপর্দ্দকও ছিল না, বলিতে কি, আমি এক বস্ত্রেই বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলাম। বরাবর আমার ঐকান্তিক বাসনা ছিল যে, মাতাঠাকুরাণিকে দর্শন করিব এবং তাঁহার শিরোদেশ মণিমুক্তায় সুশোভিত করিব এবং যদি তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে অনেক দিন আগেই তাহা করিতাম—কারণ, একণে আমার সেরূপ অবস্থাও হইয়াছে। কিন্তু স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা

স্বতন্ত্র—সুতরাং এ জীবনে তাঁহার দর্শন লাভ আর ঘটিল না। কিন্তু হায়! আমি সংসারে একাকী এবং একাকীই থাকিব,—অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে। অহো! সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অসীম রাজ্যে একাকী ভ্রমণ করা এবং প্রকৃতি জননীর শোভা সৌন্দর্য্য উপভোগই এক্ষণে আমার একমাত্র সুখ। প্রকৃত সখ্যতা, প্রকৃত প্রেম সংসারে দুর্লভ, এবং সেই জন্যই দার্শনিক পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, 'পৃথিবীতে বাস করা আর অপর এক জগতের সৃষ্টি করা একই কথা"। আমি আমার সুখনিকেতন নির্ম্মাণ করিয়াছি, এবং এক দিন আমিও সেইখানে আমার সেই স্নেহময়ী জননীকে দর্শন করিব। আপনারা সকলে হয় ত মনে করেন যে, আমি নির্ম্মম ভবঘুরে। কিন্তু হে পিতৃব্য মহাশয়, এই ভবঘুরের নিকট সহস্র সহস্র ব্যক্তি পদানত। অধিক কি, ভয়াকুল বন্য শ্বাপদ জন্তুগণও এই ভবঘুরের সম্মুখে ভয়বিকম্পিত কলেবরে দাঁড়াইয়া থাকে। বিতাড়িত অর্থহীন ভিক্ষুকগণ বিনা সম্বলে বারম্বার আসিয়াছে, এবং আমি আপনার বিতাড়িত ও পরিত্যক্ত 'সুরী'ও তাহাই। পিতৃব্য মহাশয়। ভবঘুরে কথা আমি বড় ভালবাসি, এ শব্দটী আমার বড় ভাল লাগে; কারণ, আপনি যাহাকে ভবঘুরে বলেন, তাহা আমার কাছে অতি পবিত্রসত্তা। ভবঘুরে কাহাকে বলে, না যাহার কোথাও থাকিবার স্থান নাই, এবং যাহারা ত'হার জন্য একবারও চিন্তা করে না। তাহারাই সমধিক জ্ঞানী, কেননা অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুখকর স্থান অন্বেষণ করিয়া থাকে,—এবং পৃথিবীতে যত সুখ লাভ হইতে পারে, তাহাপেক্ষাও অধিকতর সুখী। এই সকল ভবঘুরেদিগের বিশ্বাস

যে, অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি পরমেশ্বরের এই বিশাল বিচিত্র বিশ্বের তাহারাই উত্তরাধিকারী, এবং এই বিশ্বাস,—এই ধ্রুব বিশ্বাসে তাহারা কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আনন্দে নৃত্যগীতাদি করিয়া দিনযাপন করে।

এতাবৎ কোন্ মনস্বী ব্যক্তি কবে এই মাধুর্য্যময় সংস্কারের মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছেন? বীরগণের মধ্যে প্লেটোয়া-বিজেতা পসিসিয়স্ হইতে জর্ম্মাণ সম্রাট্ উইল্হেম্ অবধি, কবি ও দার্শনিকগণের মধ্যে জেরোবায়াটার্ প্লেটো, হোরেস্ হইতে সেক্স-পিয়ার্, সিলার্, গেটী, গোল্ড্স্মিথ্ পর্য্যন্ত দেখুন, * * ইহাঁদের সকলেই মহাধীশক্তিসম্পন্ন ও সাতিশয় অভিমানী বিশুদ্ধচেতা ও সুতীক্ষ্ণ কল্পনাশালী পুরুষ। * * * যাহা বলিতেছিলাম,—এই সকল ভবঘুরে পৈত্রিক সম্পত্তির লালসা রাখে না। অপর সকলে যাহা জানিতে ব্যগ্র, তজ্জন্য উৎসুকও নহে; স্ব স্ব মনোবৃত্তি অনুসরণেই সর্ব্বদা ব্যস্ত। উর্ব্বরা কল্পনা প্রভাবে তাঁহারা যেন শূন্যমার্গে উড্ডয়ন প্রয়াসী; সকল বিষয়েই, যাবতীয় বস্তু ভেদকরে তাহাদিগের চিন্তা, কল্পনা, কার্য্য নিয়ত নিযুক্ত। সাধারণ সামাজিক বা বৈষয়িক ব্যাপারে তাহাদিগের অনুরাগও আসক্তি নাই। তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই উর্দ্ধতন রাজ্যে পরিধাবমান,—হইবারই কথা, কারণ আত্মা যে ঈশ্বরের অংশ, দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন। * * * যাহা হউক, এ সকল উর্দ্ধতন প্রদেশের প্রসঙ্গ যাউক।——বাবা যে আমার কলিকাতায় গিয়া তাঁহার ও আপনাদিগের সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কথা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি একান্তই অক্ষম;—তথায় আমার বিশেষ আকর্ষণী নাই। আমি যাঁহাকে জ্ঞানসমিভ্যর্ণ ও বুদ্ধি

এবং যিনি আমাকে ভালবাসিতেন ও এখনও বাসেন, তিনিও আর এ মর্ত্ত্যধামে নাই! আমি এক্ষণে ধৈর্য্য ধরিয়া তাঁহারই অপেক্ষায় এখানে রহিয়াছি, এবং থাকিব যতদিন না তাঁহার সহিত গিয়া মিলিত হইতে পারি। সেই অনন্ত পথের যাত্রী,—চক্ষুর অগোচর মেঘমালার অভ্যন্তরে মণিময় মন্দিরদ্বারে তিনি যে আমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন।

দ্বিতীয় পত্র।

রায়োডি-জেনিরো! ৫—১—৮৯।

পিতৃব্য মহাশয়! এই পত্র প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বোধ হয়, আমার আর একখানি পত্র পাইয়া থাকিবেন। এক্ষণে অতীব দুঃখিত অন্তরে ও বিরক্তির সহিত লিখিতেছি। আমাদিগের হাঁসপাতালে তাহারা পীতজ্বরে ঘন ঘন মরিয়া যাইতেছে, অগত্যা আমরা সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অন্ত বাড়ী লইয়াছি। একবার অনুধাবন করুন যে, এই ভীষণ গ্রীষ্মের দিনে আমাদিগকে কি কষ্টকর কার্য্য করিতে হইতেছে! আজকাল এখানে তাপমান যন্ত্রের ৯৩ হইতে ৯৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত গরম হইয়া থাকে, তা'ছাড়া বিদ্রোহ ত আছেই এবং তাহাতে আমাদিগের কতকগুলি সৈন্ত গুলিতে আহত হইয়া পড়িয়াছে। লিখিবার সময় আমি তাহাদিগের কাতর ধ্বনি শুনিতেছি। কাকা মহাশয়, আমাদিগের পুরাতন হাঁসপাতালের যে ভীষণ দৃশ্য আপনি কল্পনাও করিতে

সক্ষম হইবেন না। পুরাতন হাঁসপাতাল নূতন স্থান হইতে অধিক দূর নহে। জেস্থট সম্প্রদায়ের যে পুরাতন মন্দির বা চর্চ্চ ছিল, তাহাতেই পুরাতন হাঁসপাতাল অবস্থিত। এখনও সেখানে আমার একটা ঘর আছে, কারণ আমার সকল জিনিষপত্র এখনও সেখান হইতে আনিতে পারি নাই, তাহা ব্যতীত আমাকে সেখানে গিয়া ঔষধ তৈয়ার করিতে হয়, (বলা বাহুল্য আমি ডাক্তারী শিখিয়াছি) এবং অস্ত্র চিকিৎসার যন্ত্রাদিও সেখানে আছে। আর কিছু দিন যদি এখানে থাকি, তাহা হইলে আমি একজন ভাল অস্ত্র চিকিৎসক হইতে পারিব। আমি প্রায় সকল প্রকার অস্ত্রোপচারে সক্ষম এবং ডাক্তারেরা তৎসমুদয় ঠিক হইয়াছে বলিয়া অনুমোদন করেন। আমি যে হাঁসপাতালের কথা বলিতেছিলাম, তাহা একটা খিলানবিশিষ্ট সুবৃহৎ গৃহ বা হল, উহার উপরে স্কাই-লাইট বা আলোক আসিবার পথ আছে। ঘরটা যখন শূন্য থাকে, তখন উহাকে সমাধি মন্দির বলিয়া বোধ হয়। সকলেই সেই গৃহে প্রবেশ করিতে ভীত হইয়া থাকে এবং বস্তুতঃ সহজে কেহ তথায় প্রবেশ করে না; আমাকে কার্য্যক্রমে বাধ্য হইয়া সেইখান দিয়া সচরাচর যাতায়াত করিতে হয়, কিন্তু আমার তাহাতে কিছুমাত্র ভয় হয় না, কারণ আমার বিশ্বাস যে, প্রেতাত্মাগণ কখনই আমাদিগকে আশঙ্কিত বা বিরক্ত করিতে আসে না। প্রেতাত্মা সম্বন্ধে অনেক গল্পাদি শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তৎসমুদায় মানুষের নিজের কল্পনাপ্রসূত। তবে আমি ইহা জানি যে, প্রেতাত্মা আছে কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, আর কুকুরে বাড়ীতেও যথার্থই ভয় করে। কাকা মহাশয়, আমি মরণে কিছুমাত্র

ভয় করি না। মৃত্যুর পূর্ব্বে অনেক রোগীকে আমি চিকিৎসা করিয়াছি; অনেকে রোগ হইয়া মরিয়াও গিয়াছে, তথাপি আমি এখানে অবস্থান করিতেছি আর যদি আমিও মরিয়া যাই, তাহা হইলে আরও ভাল। যদি ভগবান আমাকে রক্ষা করেন, তাহা হইলে আবার এক দিন না একদিন আপনাদিগকে যে দেখিতে পাইব, ইহাই আমার পরম আনন্দের বিষয়। যা'ক, এই অপ্রীতিকর কথায় আর কাজ নাই।

পিতৃব্য মহাশয়, আমি শীঘ্রই এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব এবং এমন কোন একটা উপায় আবিষ্কার করিব যে, আমি অনায়াসে পরিভ্রমণ করিতে পারিব; কারণ, ভ্রমণেই আমার অপার আনন্দ এবং তাহা হইতেই একটা নূতন মৎলব পাওয়া যাইবে ও কোন দিন বাটী ফিরিয়া যাইতে পারিব বলিয়া মনে হয়। আমি সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিব, কারণ গতিই সৃষ্টির নিয়ম এবং জীবনের লক্ষণ। তা'ছাড়া ব্রেজিলে আসিয়া সামরিক বিভাগে পদার প্রতিপত্তি লাভের যে বাসনা ছিল তাহা আমার পূর্ণ হইয়াছে। আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল—ঘৃণার্হ রমণী জাতির সাধুতার বিষয় পরীক্ষা করা; দ্বিতীয়, আমার অনৈক বন্ধু যে কোন সামরিক কর্ম্মচারীর দ্বারা অবমানিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রতিশোধ লওয়া। এ দুইই আমার হইয়াছে, আমি রমণী জাতিকে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়াছি,—আর সেই বন্ধু বৈরী আমার আগমনে ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। অনেক কষ্টে এই সকল কার্য্য সমাধা হইয়াছে। আমি সুখজনক সাটাময় জীবন পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ ও কঠোরতাময় সৈনিক জীবন ইচ্ছাপূর্ব্বক তিন বৎসরের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই

বৎসরের ১০ই মে তারিখে আমার সৈনিক জীবন শেষ হইবে—তখন ইহাকে নমস্কার করিয়া নূতন কার্য্যে ব্যাপৃত হইব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া গিয়া এমন কোন উপায় অবলম্বন করিব, যদ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় সুখে সচ্ছন্দে ভদ্রলোকের ন্যায় থাকিতে পারিব। যদিও বাল্যকালে বাড়ীতে থাকিতে কোন কোন বিষয়ে আমি অতিশয় দুষ্ট ছিলাম তথাপি চিরদিন সরল ও সৎপথে থাকিয়া হৃদয় ও মনের উদারতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছি! বিমানচারী বিহঙ্গদিগের ন্যায় পুনরায় যে আমি স্বাধীন হইয়া প্রফুল্লচিত্তে নানাদেশ পরিভ্রমণ করিব ইহা স্মরণ করিয়া আমার যে কি অপার আনন্দ হইতেছে তাহা আর কি বলিব। আবিষ্কার বা অনুকরণ কার্য্যের জন্য আমি আবার বিজ্ঞানের চর্চ্চাই করিব। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী প্রভৃতি দুরন্ত পশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া বা শাসন করা—সে বিজ্ঞানের অন্তর্গত নহে। আমি একটী বাক্যালাপী মুণ্ড, বৈদ্যুতিক বালিকা, টেবিলের ক্রীড়া এবং ছিদ্রবিশিষ্ট স্বচ্ছ বালিকা (যাহার শরীরের অভ্যন্তর দেখা যায়) সৃষ্টি করিব। এদেশে ও অন্যত্র এই চারিটী জিনিষ দ্বারা আমি অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিব। কাকা মহাশয়, যাহার অর্থোপার্জ্জন করিবার মস্তিষ্ক আছে এবং সরলহৃদয় আছে, তাহার পক্ষে এ জগতে অর্থ অতি সুলভ সামগ্রী। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার, এবং ঈশ্বর সকলের। পৃথিবীতে আমি আছি ও পৃথিবী আমার জন্য আছে। ঈশ্বরের শক্তি মহান জানিয়া এবং পৃথিবী ঈশ্বরের বলিয়া যদি মনে করিয়া লই, তাহা হইলে আমার সঙ্গে সঙ্গে সকল স্থবিত পদার্থই চলিয়ে থাকিবে। সকল শাস্ত্র অপেক্ষা চিকিৎসা শাস্ত্রই উচ্চ। আমি উহা

খুব দক্ষতার সহিত শিখিয়াছি এবং উহার গুরুতম বিষয় পর্য্যন্ত জানিয়াছি। এই শাস্ত্রকে আমি পূজা করি কিন্তু উহার পাণ্ডা বা প্রোফেসরদিগকে ঘৃণা করি কারণ তাহাদিগের হৃদয়ে উদারতার বড়ই অভাব। উদারতাবিহীন চিকিৎসক আর পক্ষহীন পক্ষী একই পদার্থ। সকল শাস্ত্র অপেক্ষা মনোবিজ্ঞান অর্থাৎ যে শাস্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করে এবং যদ্দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায়, তাহাই মহান্‌ ও উচ্চ। এ সম্বন্ধে আমি কোন সমালোচনা করিব না, কারণ উহা স্মরণেও আমার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। এ বিষয়ে আমি কিছু কিছু পরীক্ষা করিয়াছি এবং তাহাতে কেবল আমার প্রাণে ভয় সঞ্চিত হইয়াছে।

আপনার স্নেহাধীন

সুরেশ।

তৃতীয় পত্র



রায়ো-ডি-জেনিরো,

১২ই মে, ১৮৯৩।

পিতৃব্য মহাশয়,—বস্তুতঃ অনেক দিন হইল, আপনার নিকট হইতে কোন পত্রাদি পাই নাই, গত বৎসর আপনাকে যে একখানি পত্র লিখি, তাহাতে এখানে যে একটা বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল, তাহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন উত্তর পাই নাই। সামরিক বিভাগে আমার ভাল হই-



তেছে। প্রথম সার্জ্জেণ্ট পদ হইতে আমি ব্রিগেড পদে উন্নীত হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বেই আমি একজন চিহ্নিত-কর্ম্মচারী অর্থাৎ অফিসার হইতে পারিতাম, কিন্তু আমি বিদেশী বলিয়া তৎপক্ষে কিছু ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। ছয় বৎসর কাল আমি এখানে আছি এবং বিশেষ সুপরিচিত হইয়াছি সুতরাং আমার পক্ষে ইহা অনেকটা সুবিধার কথা বলিয়া বিশ্বাস করি। তার পর আপনারা সকলে বোধ হয় জানেন যে, এখানে সকলে পর্ত্তুগীজ ভাষায় কথাবার্ত্তা কয়, কাজেই আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন কাহারও কথা বুঝিতে পারিতাম না কিম্বা কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিতাম না। এক্ষণে সে ভাষা আমি শিখিয়াছি এবং যে পদে অধিষ্ঠিত আছি, তাহা অতি অল্প লোকই পাইবার উপযোগী। সাধারণ তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক আমার পদোন্নতির কথা প্রচারিত হইলে আপনাকে যথাক্রমে জানাইব। বিগত ছয় বৎসর যে আমি সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়াছি, তাহা সরকারে লিখিত আছে, এবং বিনা কারাবাসে সামরিক যশলাভ করিয়াছি। এক্ষণে রায়ো গ্রাণ্ডি ডি শিউলে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। আমি তথায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু তথায় আমাদিগের যাইবার কোন হুকুম এখনও হয় নাই। পিতা মহাশয় আজ কাল কেমন আছেন? তিনি কি আমাকে মনে করেন। বাবাকে বলিবেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি ভালই আছি। আমি এক্ষণে মানুষ হইয়া উঠিয়াছি এবং সমাজে আমার মান সম্ভ্রম হইয়াছে। বদমায়েসের কাছে আমি যম, ডাকাতের কাছে ডাকাত, ভদ্রলোকের নিকট ভদ্রলোক, এবং পণ্ডিতের কাছে পণ্ডিত। আমি আপনা হইতেই সম্ভ্রান্ত ভদ্র-

লোক হইয়াছি, কেননা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই কেহই আমার জন্ত কোন চেষ্টা চরিত্র করেন নাই। আজ বোধ করি, আমার বত্রিশ কি চৌত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে কিন্তু ঠিক বলিতে পারি না কত! যাহা হউক আমি বিস্মিত হইয়াছি যে, ইহার মধ্যেই আমার মস্তকের কেশ এবং মুখের গোঁপ দাড়ি পাকিয়া গিয়াছে, তাঁছাড়া মস্তকে টাকও পড়িয়াছে। সকলকে আমার কথা বলিবেন—আর আমাকে যাহারা জানে তাহাদের খবরাখবর সমেত শীঘ্রই পত্র লিখিবেন।

আপনার স্নেহাধীন
সুরেশ।

চতুর্থ পত্র

রায়ো ডি-জেনিরো ১০-১ ৯৪।

কাকা মহাশয়,—আবার আপনাকে চিঠি লিখিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, কারণ, সেই অবধি আমি রিউমাটিসম্ রোগে শয্যাগত হইয়া আছি। প্রায় এক বৎসর হইল আমি এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছি। গত সপ্তাহে অধিক পরিমাণে মার্করি ও আয়োডাইড অব্ পটাশ সেবন করিয়া বেদনা থামিয়াছে, কিন্তু উক্ত ঔষধ সেবনে বিষ সেবনের লক্ষণ দেখা যাওয়ায় উহা বন্ধ করিয়াছি। ডাক্তারেরা বলে যে, উহা হইতে অব্যাহতি পাইতে অনেক সময় লাগিবে।

পত্রমধ্যে আমার দুইখানি ফটোগ্রাফ পাঠাইতেছি—একখানি আপনার ও অপরখানি বাবার জন্ম। কেমন আমার একটা ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, তিনি বোধ হয় আর জীবিত নাই আর তাহাও আমি জানি না যে, আমার এই ধারণা সত্য কি মিথ্যা। আমি যে ব্রেজিলদেশীয় পদাতি সৈন্যদলের অধিনায়ক বা লেফ্‌টেনাণ্টের পরিচ্ছদ পরিয়াছি, তাহা দেখিলে নিশ্চয়ই তিনি সুখী হইবেন এবং সে সুখ বা আনন্দ, গৌরব বা স্পর্দ্ধা—তাঁহারই। আপনি শুনিয়া হয়ত একেবারে স্তম্ভিত হইবেন যে, এই পোষাকটী প্রস্তুত করাইতে আমার এক সহস্র ডলার খরচ হইয়াছে, কারণ সুন্দর কাপড়, পালক, রেশম ও সোণার জরিতে ইহা তৈয়ার হইয়াছে। আমার সহধর্ম্মিণীরও একখানি ফটোগ্রাফ পাঠাইলাম, উহা বিবাহের পূর্ব্বেকার। এখন আমার পুত্রের ফটোগ্রাফ তোলান হয় নাই, সুতরাং তাহা পাঠাইতে পারিলাম না। আমি যে অদৃশ্য হইয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি। যুদ্ধ সংঘটনের প্রারংকালে দশজন নৌ-সেনাকে কয়েদীরূপে ধরিয়া লইয়া বাসায় ফিরিয়া গেলাম, পরে আবার একাকী ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। পথিমধ্যে একটী ভদ্রবেশী রমণী আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, মৃত ব্যক্তিগণ কোথায় রক্ষিত বা স্থানান্তরিত হইয়াছে। আমি আগ্রহের সহিত গিয়া তাহাকে সেই স্থান দেখাইয়া দিলাম। সহসা দুই জন নৌ-সেনা ছোরা হস্তে আমাকে আক্রমণ করিল। আমিও তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া আত্মরক্ষা করিলাম। আত্মরক্ষা ও আক্রমণে তাহারা আমাকে যথেষ্ট সমর্থ দেখিয়া দ্রুতপদে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। আমিও তৎক্ষণাৎ

স্বস্থানে প্রত্যাগমন মানসে ফিরিবার কালে স্থানীয় দুর্গন্ধে কষ্টবোধ হইল এবং বিশ পঞ্চাশ হাত যাইতে না যাইতে আমার মস্তক এমন ঘুরিয়া গেল যে, উপায়ান্তর না দেখিয়া নিকটস্থিত একখণ্ড প্রস্তরোপরি বসিয়া পড়িলাম এবং স্বতঃই নিজ অবস্থার বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলাম। চারি দিক অন্ধকার দেখিলাম এবং পায়ে ঠাণ্ডা অনুভব করিলাম। সেই ঠাণ্ডা ক্রমে জানু ও উরু বহিয়া বুক পর্য্যন্ত উঠিল। অনন্তর ঠিক সেইরূপ শৈত্য কর্ণে অনুভূত হইয়া গণ্ডদেশ বাহিয়া বুকে আসিয়া থামিল আর আমি সংজ্ঞাহীন হইলাম। তিন দিবস পরে আমার জ্ঞান হইল। দুই জন অপরিচিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অর্দ্ধ উলঙ্গাবস্থায় আমি হাঁসপাতালে নীত হই। অষ্টাহ পরে কথা কহিতে পারিলে স্বস্থানে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম ও যথাস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। সকলে মনে করিয়াছিল যে, আমি হারাইয়া গিয়াছিলাম।

আপনার স্নেহাস্পদ
সুরেশ।

পঞ্চম পত্র।

প্রিয় পিতৃব্য মহাশয়—আজ কয়েক দিন হইল আমি আপনার পত্র পাইয়াছি এবং তাহাতে অবগত হইলাম যে, আমি সাময়িক জয়লাভ করায় দেশের লোক বড় সন্তুষ্ট হইয়াছে।

এ সকল আমার কাছে এখন এত সহজ হইয়া গিয়াছে যে, তাহাতে আমি কিছু নূতনত্ব বা আশ্চর্য্যভাব দেখিতে পাই না। তবে অন্যান্য অনেক অফিসার বিশেষ কার্য্য-কুশলতা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু সন্তাপের বিষয় যে, আর তাঁহাদিগকে ইহজন্মে দেখিতে পাইব না। আমার সামরিক শিক্ষার কথা তবে বলি,—প্রথম অশ্বারোহী দলে সৈনিকরূপে তিন বৎসর কার্য্য করি, পরে পদাতিক দলে পাঁচ বৎসর। বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে যখন বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে এবং আমাদিগের সেই সুন্দর রায়ো-ডি-জেনিরো উপসাগরে তাবৎ রণপোত সম্মিলিত হইয়া ঘেরিয়া ফেলিয়া, "সান্তাক্রুজ;" "ফেজ, স" ও "জোয়াও" নামক সুন্দর সুন্দর দুর্গ সকলের প্রতি গোলা বর্ষণ করিতে থাকে, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদিগের কার্য্য আছে। সেই সকল দুর্গ হইতে ভীমনাদে রণপোত প্রতি গোলা ছুটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দেশ ব্যাপিয়া চারি দিকে সৈন্য সংগ্রহ হইতে লাগিল। উপসাগর কূলের তাবৎ উচ্চ স্থান মাত্রই সুদৃঢ় রূপে রক্ষিত হইল। যেখানে সেখানে ও সর্ব্বত্রই কাটাকাটি ও প্রতিনিয়ত গোলাবর্ষণ চলিতে লাগিল। সহস্র সহস্র বিদেশী লোক রায়ো-ডি-জেনিরো সহরে বাস করিতেছিল বলিয়া উহাকে বিধ্বংস করিতে না পারিয়া, বিদ্রোহী নৌসেনাগণ বিশখানি রণপোত সমেত নাথিরয় সহরকে আক্রমণ করিল। শেষোক্ত নগর ভূমিসাৎ করতঃ আমরা অতি অল্প সংখ্যক ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি মনে করিয়া তাহারা নগরে অবতরণ করিল। অতঃপর ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে যুদ্ধ হইল এবং তিনঘণ্টা কাল ভীষণ যুদ্ধের পর নৌসেনাগণ পরাভূত হইয়া ক্রতক পলায়নপূর্ব্বক

যব আহাজে গিয়া আশ্রয় লইল, অবশিষ্ট আমাদিগের হস্তে বন্দী হইল। পিতৃব্য মহাশয়, আপনি মনে করিবেন না যে, আমি যে পদে অধিষ্ঠিত, তাহা সহজে লাভ করিয়াছি। আমি যে কখনও বিশিষ্ট কর্ম্মচারি বা অফিসার হইতে পারিব, তাহা একবারও ভাবি নাই। প্রায় সর্ব্বদাই আমার পদোন্নতির কথা উঠিত কিন্তু আমি বিদেশী বলিয়া খাতা হইতে আমার নাম কাটা গিয়াছে। সম্প্রতি বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে আমি ও আমার অন্যান্য সহচর কোন জেনারেলের অধীনে কাজ পাই। উক্ত জেনারেল যদিও আমাকে চিনিতেন না, কিন্তু যুদ্ধকালে আমরা কিরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তৎকালে আমার বীরত্ব ও শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণ মধ্যে কি রূপ সাহসের সহিত প্রবেশ করি তাহাও দেখিয়াছিলেন।

আমি দেশী কি বিদেশী, তিনি তাহা জানিবার জন্য ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। আমার দক্ষতাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল এবং তদনুসারে তিনি সাধারণ তন্ত্রের সামরিক সহকারী প্রেসি-ডেন্টের নিকট রিপোর্ট করিলে আমি লেফ্‌টেন্টের পদে উন্নীত হই এবং এই পদে থাকিয়া নাথিয়রের অদৃষ্ট-মীমাংসার শেষ পর্য্যন্ত আমি সাহায্য করিয়াছি।

এই সঙ্গে আমি আপনাকে একখানি নাথিরয় যুদ্ধের ছবি পাঠাইতেছি। এইখানে আমার সহকারীগণ আমাকে বিশেষ ভীতিপ্রদর্শন করিয়াছিল আমি কিন্তু কখনই তাহাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করি নাই। আপনারা সকলেই বলেন যে, আমি আপনাদিগকে সবিশেষ বিবরণ লিখিয়া পাঠাই কিন্তু পিতৃব্য মহাশয়, যুদ্ধের বিভীষিকার বিষয় আর কি বর্ণন করিব? আমরা

এমন যে মহামূল্য জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে তাহা আমরা সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারি। তবে যে যতটা ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে সে ততটা আপনাকে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু বলুন দেখি প্রকৃত সাহস কি? কোন অভিপ্সিত বস্তু লাভের জন্য অবিচলিত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে জীবন উৎসর্গ করাকেই সাহস কহে। শত্রুগণ যখন দূরে অবস্থান করে তখন বিবিধ বিচার, বিতর্ক, অনুমান, পরিমাণ প্রভৃতি সকলই সম্ভব, কিন্তু শত্রু নিকটস্থ হইয়া আক্রমণোদ্যোগী হইলে একমাত্র উপায়—সমগ্র সেনা একত্র করিয়া অগ্রসর হওয়া,—এবং যত দ্রুতগতিতে ধাবমান হইতে পারিবে, তত অধিক পরিমাণে শত্রুদিগকে আতঙ্কিত করিতে পারিবে। আপনি আমার জীবনের আরও বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন। পৃথিবীর যে যে দেশে আমি গিয়াছি, সেইখান হইতেই ত আপনাকে পত্র লিখিয়াছি। আমি কি আপনাকে বলি নাই যে, সার্কাসের সহিত সিংহ পোষক বা শাসক হইয়া সমগ্র ইয়ুরোপ পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য পশুদিগকে খেলা শিখাইয়াছি? এই সঙ্গে আমি এই পত্রের সহিত আপনার জন্য বেনস্ এরেস্ (Buenos Ayres) হইতে প্রকাশিত একখানি সংবাদপত্র পাঠাইতেছি; উহাতে আমার জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে।

আপনার স্নেহের,
সুরেশ।

ষষ্ঠ পত্র।

রিও ; ১২ই এপ্রেল, ১৮৯৭।

প্রিয় পিতৃব্য মহাশয়,—আমি ১৫ই নবেম্বর তারিখে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহার কোনও প্রত্যুত্তর না পাইয়া সাতিশয় দুঃখিত আছি। সেই পত্রসহ আপনাকে কতকগুলি সংবাদ পত্র ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কাগজ পত্র পাঠাইয়াছিলাম, সেগুলি পাইলেন কি না তাহাও জানিতে পারিলাম না। আমি অনেকটা শারীরিক ভাল আছি। আজ সাতিশয় আহ্লাদের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, আমার আত্মচরিত অনেকটা লেখা হইয়াছে, তবে সেটী সম্পূর্ণ করিতে অবশ্যই বিলম্ব হইবে। সম্প্রতি আমার কাজের এতই ভিড় পড়িয়াছে যে, উহা লিখিবার প্রায়ই সময় পাই না, তবে আশা করি, সময়ে শেষ করিয়া তুলিতে পারিব। কাকা, জ্যোতিষ পড়িতে আমি বড়ই আনন্দ অনুভব করি—এবং বহু দিবস হইতেই সাগ্রহে পড়িতেও আরম্ভ করিয়াছি। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার জন্ম তারিখ যথাযথ লিখিয়া পাঠান। আমি স্বহস্তে নিজের একটী আয়ুচক্র প্রস্তুত করিব মনস্থ করিয়াছি—তাহাতে আমার জন্ম-তিথি, নক্ষত্র ও গ্রহ উপগ্রহের যথাযথ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিব। সেই চক্রখানি থাকিলে ভাবী বিপদ, পীড়া প্রভৃতির কথা পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত হইয়া সে গুলি সহজেই দূর করিতে পারিব। আমি অন্যান্য অনেক শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, এবং ঐ সকল শাস্ত্রের প্রকৃত তথ্যও জানিতে পারিয়াছি ; কিন্তু আমি মিলাইয়া দেখিতে চাই যে, জ্যোতিষ ফলের সহিত সে গুলির

ঐক্য হয় কি না। সামুদ্রিক ও অন্যান্য লাক্ষণিক বিদ্যাবলে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র ও চন্দ্র আমার সাতিশয় বলবান। চন্দ্রের বলে আমাকে এত কাল্পনিক করিয়াছে এবং আমার জলযাত্রার হেতুভূত হইয়াছে। শুক্রের বলে আমি মনোমত কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিতেছি—কল্পিত বিষয়গুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার উপযোগী ক্ষমতা ও বিদ্যালাভ করিয়াছি। মঙ্গল আমাকে সৈনিকের সাহস ও হঠকারিতা প্রদান করিয়াছে এবং বৃহস্পতির প্রভাবে অনেকগুলি স্ত্রীলোকের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। আমি ইহাও জানি যে, বুধ, শনি, সূর্য্য প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহগণেরও অল্পাধিক আমার উপর দৃষ্টি আছে; তবে তাহাদের ফলাফল জানিবার জন্য আমি সাতিশয় উৎসুক এবং তজ্জন্য তাহাদের স্থান নির্ণয় আবশ্যক। কাকা, আপনি ত জানেন যে, ইউরোপ পর্য্যটনের সময় ইউরোপের সর্ব্বাগ্রগণ্য অধ্যাপকদিগের নিকট আমি এই সকল শাস্ত্রের অনুশীলন করি; ভবিষ্যতে তাঁহাদের নাম ধাম আপনাকে জানাইব। কিন্তু ভগবৎ প্রসাদে যদি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে সম্মোহন তত্ত্ব এবং জ্যোতিষ ও অন্যান্য গূঢ় বিজ্ঞানগুলি আমি সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিব—সেই সকল বিষয়ে অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভ করিব। এই সকল বিদ্যাবলেই ত আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রাচীন মনস্বীগণ সর্ব্বলোক-আরাধ্য নির্ব্বাণ লাভ করিতেন এবং অদ্যাপি সন্ন্যাসীরা নানাবিধ অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ সাধিত করিয়া থাকেন;—ভূগর্ভে ইচ্ছামত বাস, মুহূর্ত্ত মধ্যে বীজ হইতে বৃক্ষোৎপাদন ও তাহা হইতে ফলোৎপাদন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য ইহারাই করে। জানি না, এই সকল বিষয়ে আপনার মনোভাব কি রূপ,

—এই সকল বিষয় জানিতে আপনার ঔৎসুক্য আছে কি না; প্রত্যুত এই সকল বিষয় জানিতে যদি আপনি আনন্দ অনুভব করেন জানিতে পারি, তাহা হইলে এক সময়ে এই সকল বিষয় বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আপনাকে বুঝাইয়া দিব। যদি এই বিষয়ে আপনার বিশ্বাস না থাকে তাহা হইলে আমাদিগের দেশের যুবকদিগকে যশ ও সম্মান লাভের পথ প্রদর্শন করিব। অনুগ্রহপূর্ব্বক বাবা কেমন আছেন লিখিবেন। আমি জানি তিনি শারীরিক অসুস্থ আছেন—শারীরিক না হইলেও মানসিকত বটেই। তাঁহার অবস্থা জানিতে পারিলে আমি তাঁহার কোন-না-কোন উপকার করিতে পারি। আমি জানি না তিনি জীবিত আছেন কি না; তজ্জন্যই আমি তাঁহাকে পত্র লিখি না।

কলিকাতার অনেকগুলি যুবক আমাকে পত্রযোগে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, ব্রেজিলে আসিবার কোনও উপায় আছে কি না। আমি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাদিগের পত্রের উত্তর দিব।

বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার যথো-চিত অভিবাদন জানাইবেন।

আপনার স্নেহের,

সুরেশ।

সমাপ্ত।

দিগের বিরহে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতেছে। বকুল গাছ একলা তাহাদিগের জন্য যেন ভাবিতেছে। একটু বেলা হইলে; যে পুষ্করিণীর কমল-কুমুদ-শোভিত নীল জল, রমণী কমলিনীর শোভায় ফুটিয়া পড়িত;—সেই পুষ্করিণীর জলে কমলিনী ফুটিয়া আছে, কুমুদিনী তাহার সূর্য্যকে দেখিয়া লজ্জায় মুখ মুদিয়া আছে, কিন্তু সে সব সুন্দরীদিগের কলনাদ নাই—হাস্যামোদ নাই। যুবতীদিগের রসপুরিত কোমল করকমলে মৃণালিনী আর দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে না; তাঁহাদিগের অলঙ্কারের মৃদু মধুর মনোমোহন শব্দ শুনিয়া কোকিল কুহু কুহু ধ্বনিতে আর গান গাহিতেছে না; এখন মনোহর নিকুঞ্জ—নিস্তব্ধ—ভয়প্রদ। এখন জলে নামিতে ভয় হয়—তীরে বসিলে আতঙ্কে গা শিহরিয়া উঠে—গাছ পালার দিকে চাহিলে তরল অন্ধকারে বিভীষিকার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া পলাইতে হয়।

গ্রামে বাড়ীর ভিতরে দলে দলে শকুনি, কাক উড়িতেছে; কুকুর শিয়াল পাগল হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে; রাস্তা ঘাটে কলসী গড়াগড়ি দিতেছে; শ্মশানে তো আর কথাই নাই। যেন শ্মশান চারিদিকে—আপনার দেহ প্রসারিত করিয়াছে—চারিদিকে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে—চারিদিক আপনার বেশে সজ্জিত করিয়াছে—চারিদিকে আপনার ভীষণমূর্ত্তির চিত্র আঁকিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

:০:—

প্রাণের প্রিয়তম সামগ্রী মরিয়া যাইলে, পুরুষের শোক কয়েক দিন পর্য্যন্ত প্রবল থাকে; তার পর, পুরুষের ধৈর্য্যবলে সে শোক চাপা পড়ে; পুরুষ তাহাকে আপনার হাড়ের ভিতরে পুরিয়া রাখে। যদি কখনও সে শোকাগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তাহাতে পুরুষের হাড়ের ভিতরে একরূপ দাহ উপস্থিত হয়, পুরুষ চক্ষু মুদিয়া কোন প্রকারে তাহা সহ্য করে; এবং একেবারে নিবাইতে না পারুক, হাড়ের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলে। কিন্তু স্ত্রীলোক তাহা পারে না। স্ত্রীলোকের কোমল হাড় ভেদ করিয়া সে শোক অশ্রু-জলাকারে এবং স্ফুট ক্রন্দনে প্রকাশিত হয়—প্রকাশিত হইয়া প্রাণের যাতনার ভার কমাইয়া দেয়।

পুত্র, কন্যা, জামাতা বা স্বামী হারা হইলে স্ত্রীলোকের শোক একেবারে বিলীন হয় না। যত দিন না সে শ্মশানে যায়, তত দিন শোকটা স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে মাঝে মাঝে ফুটিয়া থাকে। নূতন শোকে স্ত্রীলোক একটু অবসর পাইলেই মৃত আত্মীয়ের জন্য ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিতে থাকে। দিবসের কার্য্যাবসানে বিশ্রামের জন্য যখন শয়ন করে তখন একবার কাঁদে, রাত্রে শুইবার সময় অন্ধকারে একবার কাঁদে এবং শেষ রাত্রে জগতে প্রাণের স্রোত ফিরিয়া আসিবার সময়ে একবার কাঁদে!' এই

শেষ রাত্রের করুণ ক্রন্দন বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। এই মর্ম্মস্পর্শে যে হৃদয় না গলে, তাহা নিশ্চয়ই পাষাণে নির্ম্মিত।

একদিন ভোরে, মফস্বলের সেনপুর গ্রামে কোন ব্রাহ্মণ বাটীতে, কোটা ঘরের ভিতর হইতে, কোন স্ত্রীলোক ঐরূপ কাতর স্বরে কাঁদিতেছিল। গ্রীষ্মের ভোর। বাতাস শীতল ও সুখদ। আকাশে নেশার ঘোরের মত, গাছের ঝোঁপের ভিতরে ঘনীভূত শোকের মত—তরল অন্ধকার রহিয়াছে; কিন্তু ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিতেছে; গাছের পাতা কাঁপাইয়া, ভূতলের তৃণ পত্র নাচাইয়া, পুকুরের জলে ঢেউ তুলিয়া, খোলা জানালার কবাট নাড়িয়া, গ্রীষ্মের সুখস্পর্শ বায়ু বহিতেছে। পাখী সকল আকাশের নীরবতা পূর্ণ করিয়া কোলাহল করিতেছে। স্ত্রীলোক আপনার কক্ষে শুইয়া আছে। কাছে একটী বালিকা। বালিকা ঘুমাইতেছে। স্ত্রীলোক (বালিকার জননী) শোকভরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। জননীর ক্রন্দন ক্রমশঃ বালিকার নিদ্রার ভিতরে প্রবেশ করিয়া বালিকাকে আক্রান্ত করিল। বালিকা চক্ষু চাহিল, পাশ ফিরিয়া দেখিল জননী কাঁদিতেছে, চক্ষের জলে বালিস ভিজিয়াছে, বালিকা তখন উঠিয়া বসিল। মার করুণস্বরে কাঁদ কাঁদ হইয়া আপনার অঞ্চল দিয়া মার চক্ষু মুছিতে মুছিতে কাতরস্বরে বলিল 'মা! ওমা! কেঁদনা, আর কেঁদ না'।

বালিকার কথায় মার কান্না না থামিয়া আরও বাড়িয়া উঠিল। মার কান্না বাড়িয়া উঠিলে, বালিকাও প্রবল বেগে কাঁদিতে লাগিল। বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে থামাইবার জন্ত প্রয়াস পাইল। জননী কন্যার ক্রন্দন শুনিয়া আপনি থামিল,

ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিল,—বালিকার মুখের দিকে সজল নয়নে চাহিয়া যখন দেখিল, বালিকার মুখ লাল হইয়াছে, নীল চক্ষু আরক্ত হইয়া জলে ভাসিতেছে—তখন আপনার হৃদয়-যাতনা বালিকার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, প্রবল স্নেহ-ভরে কন্যাকে আপনার কোলের দিকে আকর্ষণ করিল এবং জামাতাকে স্মরণ করিয়া কন্যার মুখচুম্বন করিয়া বলিল 'মা তুই আর কাঁদিস্ নি মা। যোগেন্দ্র আমার বেঁচে থাকুক, তোর হাতের লোহা মাথার সিঁদুর বজায় থাক্, তোর ভয় কি?' জননী আপনার অঞ্চল দিয়া কন্যার অশ্রুজল মুছাইতে লাগিল। কন্যা থামিল, জননী শোকটা সম্বরণ করিল।

তারপর জননী ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিল। শোককে বুকের ভিতরে চাপিয়া বিছানা তুলিল। শোকোচ্ছ্বাসে ফুলিতে ফুলিতে ঘর দ্বার ঝাঁট দিল। তারপর কখন সরবে কখন নীরবে অশ্রুমোচন করিতে করিতে প্রাঙ্গনাদি মার্জ্জনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার পর স্নানাদি করিয়া রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিল।

বালিকা তখন বাটীর ছাদের উপরে উঠিয়াছিল। উঠিয়া আলিসার ধারে বসিয়া নিকটস্থ শ্মশানের দিকে চাহিতে চাহিতে চক্ষের জল ফেলিতেছিল।. গ্রামে আর কেহ নাই। কেবল বালিকা অবলা এবং তার জননী এবং সন্নিকটস্থ কায়স্থ বাটীতে একটী স্ত্রী ও পুরুষ। গ্রামে আর কেহ নাই। বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবক যুবতী, বালক বালিকা সব সেই শ্মশানে গিয়াছে। গোরু বাছুর পুকুরের মাছ পর্য্যন্ত মরিয়াছে। মরে নাই কেবল পাখী, শৃগাল, কুকুর, কীট, পতঙ্গ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বালিকা ছাদের উপরে বসিয়া এদিকে ওদিকে চাহিতে চাহিতে আপনার বাপ, ভাই ও সখীদিগের কথা ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে লাগিল। ছাদের উপরে বালিকার খেলা ঘর যেমন তেমনি রহিয়াছে। সেই খেলা ঘরে প্রায় দুই মাসাবধি খেলা করা হয় নাই। এই দুই মাসের মধ্যে প্রাম শূন্য হইয়াছে। বালিকার খেলার সঙ্গিনীগণ চিরকালের মত বালিকাকে খেলা-ঘরের সহিত রাখিয়া গিয়াছে। বালিকা সেই সব ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতেছিল, সোণার দেহ কাঁপাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল; এমন সময়ে নিম্ন হইতে জননী ডাকিল, মা! নীচে নেমে আয়—আমার বড় অসুখ হয়েছে।'

অবলা জননীর কাতরস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল। তখন জননীর ভয়ানক ভেদবমি আরম্ভ হইয়াছে। কয়েকবার ভেদব্যমির পর জননীর শরীর কাঁপিতে লাগিল—যাতনায় প্রাণ অস্থির হইল। গা জ্বলিতে লাগিল—তৃষ্ণায় বুক ফাটিতে লাগিল—ক্রমশঃ শরীর অবসন্ন হইল—চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট, নিস্তেজ, ও মলিন হইল। জননী ক্রমশঃ ধোঁয়া দেখিতে লাগিল। জননী তখন বুঝিল—আর নয়—আমার দফা রফা হইল। হতভাগিনী, অবলার জন্য মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া, তখন সেই নিস্তেজ মলিন চক্ষু দিয়া অশ্রুমোচন করিল। ধোঁয়ার ভিতর দিয়া অবলার অস্ফুটমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত, জননী নিরাশ্রয়া অবলাকে,দুঃখের অকূল পাথারে ভাসাইয়া জনমেরমত চলিয়াগেল। অবলায় অন্তরাত্মা বিপদ বুঝিতেপারিয়া মর্ম্মভেদী স্বরে "মা গো কোথায় গেলি গো" ! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অবলার দুঃখময় জীবনের প্রথম অঙ্ক আরম্ভ হইল।

প্রাণের সামগ্রী মরিয়া যাইলেও হঠাৎ মন তাহাতে বিশ্বাস করিতে রাজী হয় না। তাই অবলা চীৎকার করিবার পর মনে ভাবিল 'মা কি নাই? মা নাই—মন বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তাই অবলা আবার ভাবিল, মা হয় তো দুর্বলতা বশতঃ চুপ করিয়া আছে।

এই ভাবটির ভিতর হইতে অবলার প্রাণে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হইল। অবলা কাতরভাবে মার গা ঠেলিয়া ঠেলিয়া ডাকিতে লাগিল। 'ওমা! মা! ওঠ না মা। ঘরে শুবি চ' না মা।

মা সাড়া দিল না—পাষাণের মত চুপ করিয়া থাকিল। পরে অনেক ডাকাডাকির পর বালিকা বুঝিল, মা আর নাই। তখন বালিকা শোকে দুঃখে ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—মার দিকে একদৃষ্টে পাগলিনীর মত তাকাইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে প্রকৃতির ভিতর হইতে শোক দুঃখের যেন একটা কোয়াসা বালিকার অস্তিত্বকে ডুবাইয়া ফেলিল।

বালিকা প্রস্তরের মত সেই শোকের কুজ্ঝটিকায় আত্মসমর্পণ করিয়া কিয়ৎকাল নীরবে থাকিল। সে বড় ভীষণ নীরবতা। সেই নীরবতায়—নীরব যাতনায় বালিকা আত্মবলি দিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পাগলিনীর মত ভয়বিহ্বলা হইয়া মার নিকট হইতে সরিয়া গেল। আস্তে আস্তে রোয়াকের নীচে উঠানে নামিল। ধূলায় বসিল। তার পর কাঁদিতে কাঁদিতে ধূলায় শয়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদিয়া মুখ খানা মাটিতে গুঁজিয়া শোকের ভীম যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কিন্তু মার কাছ ছাড়িয়া অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না। ধূলা মাখা গায়ে, ধূলা মাখা কাপড়ে, ধূলা মাখা চুলে,

ধূলা মাখা সৌন্দর্য্যে, মার মৃত দেহের নিকটে গমন করিল। মা যে মরিয়াছে অবলা তাহা ভাবিতে পারিতেছে না। মা মরিলেও মাতৃস্নেহ যেন মরে নাই। মাতৃস্নেহের স্মৃতি অবলার কাছে অবলার মাকে যেন নিদ্রিতা রাখিয়াছে।

মার কাছে গিয়া অবলা মার মুখখানি দু'হাতে ধরিয়া আপনার কোলের উপরে রাখিল। মার মুখে য়োরাকের ধূলা লাগিয়াছিল, অবলা আঁচল দিয়া মুছিতে মুছিতে মার মুখের উপরে কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে মার মুখের কাছে মুখ রাখিয়া মাকে কত ডাকিল। কই! মা সাড়া দিল না—কথা কহিল না। অবলার অশ্রুরাশি জননীর মুখ বাহিয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল।

অবলার দুঃখে প্রকৃতি স্থির হইয়া থাকিল; গাছ পালা নড়িল না—একটি পাখী ডাকিল না—গ্রাম নিস্তব্ধ হইয়া থাকিল। কেবল মাঝে মাঝে পথ দিয়া ছুটিতে ছুটিতে দুই একটা কুকুর ডাকিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অবলা যখন নিশ্চয়ই বুঝিল মা আর নাই তখন বালিকার আপাদ মস্তক কম্পিত হইল। বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে চারিদিকে ধোঁয়া দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হইয়া মার মৃতদেহের কাছেই পড়িয়া গেল।

অবলা বাপ মার কত আদরের মেয়ে। অবলার বড় ভূতের ভয়। রাত্রে ভূতের গল্প শুনিতে চাহিত না। একলা কোথাও যাইতে পারিত না। বাটির দাসীর সঙ্গে কখন কখন বাটির বাহিরে যাইত; কিন্তু দাসী রাস্তায় একটু পিছনে ফেলিয়া যাইলে, দৌড়িয়া দাসীকে ধরিয়া কোলে উঠিত।

এখন সংসারের এই ভীষণ দুর্যোগে বালিকাকে কে রক্ষা করে? গ্রামের এই শোচনীয় অবস্থায়, সেই নির্জ্জন বাটির ভিতর, দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা আর কাহার মুখের দিকে চাহিবে?

বাপ ভাই মরিয়াছিল তাহাতে কি? মা ছিল। যাঁকে দেখিয়া শিশুসন্তান সব ভুলিতে পারে। কিন্তু আজ অবলার মা, বাপ, ভাই যে পথে, সেই পথে গিয়াছে। কে বালিকার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিবে? কে আদর করিবে? কে প্রতিপালন করিবে? কাঁদিলে গলা ধরিয়া কে মুখ চুম্বন করিবে? ক্ষুধায় যখন ছট্‌ফট্ করিবে তখন কে আদর করিয়া খাওয়াইবে? অবলা যে শিয়াল কুকুর ডাকিলে ভয় পাইয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরে, শৃগাল কুকুর যখন ভীষণ শব্দে গ্রামকে কম্পিত করিবে তখন সোণার বালিকা আর কার গলা জড়াইবে? বালিকা যে এক মুহূর্ত্তও বাটিতে একলা থাকিতে পারে না; এবার যে একলা থাকিতে হইবে—কি প্রকারে থাকিবে? বেলা প্রায় দশটা বাজিয়াছে, অবলা যে এতক্ষণ খাবার খাইয়া ভাত খায়। আজ বালিকা একটুও জলস্পর্শ করে নাই। মা রাঁধিবার জন্য উনুনে আগুণ দিয়া ভাত চড়াইয়াছিল মাত্র। ভাত যে চুঁইয়া যাইতেছে—কে ভাত নামাইয়া দিবে? কে আর সাত তরকারী রাঁধিয়া অবলাকে খাওয়াইবে?

বালিকার আজ কি দুর্দ্দিন। এমন বিপদে কেবা পড়ে? মা, বাপ, ভাই, ভগিনী কার না মরে? মরে বটে; কিন্তু সময় অসময় আছে? এই সকল সংগ্রামে মানুষের জীবনের পরীক্ষা—এই সকল যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশে আত্মার উপকারই হয় বটে; কিন্তু ননীর পুতলি বার বৎসরের বালিকা, আজ

সকল লুকায়ে রহিয়াছে। চারিদিকের আকাশ, প্রকৃতির অব-য়ব ভয়-স্পর্শে অবলার চৈতন্ত হরণ করিতে লাগিল। অবলার চাহনি কাঁপিতে কাঁপিতে ভয়ে মুদিয়া অন্ধকারে ডুবিল। শারীরিক ক্রিয়া ক্রমশঃ অসাড়তায় মিশিল—অবলা আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে অবলার চৈতন্ত-সঞ্চার হইল। শোকের অসাড়তা অতিক্রম করিয়া অবলার বুদ্ধি জাগ্রত হইল। অবলা আবার চক্ষের পল্লব তুলিয়া পূর্ব্ব-স্মৃতিতে পূর্ব্বশোকে উত্থিত হইল। তখন ভয়ে, শোকে, নিরাশায় ব্যাকুল হইয়া "মাগো বাবা গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। যেন জগ-তের কাতরতা সেই বালিকার কোমল কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিল। গাছ পালা চুপ করিয়া তাহা শুনিল—আকাশ নীরবে তাহা শুনিল—কেহই তাহার প্রত্যুত্তর করিল না—কালের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া গেল।

বালিকা যখন কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া চারিদিকে অন্ধ-কার দেখিতেছিল—একটা ভীষণ যমের হস্তে আপনার প্রাণকে অনুভব করিতেছিল, তখন বাটীর বৃক্ষ হইতে ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ এই বিকট শব্দের সহিত এক বিকটাকার মূর্ত্তি ঝুপ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। বালিকা সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া আপনার প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিল। এবার আর মূর্চ্ছা হইল না। ভয়ে বালিকার গা হইতে গল্ গল্ করিয়া ঘাম বাহির হইতে লাগিল। চক্ষু দুটী মুদিয়া, সমুদয় শরীর স্থির করিয়া শুইয়া থাকিল। এই সময়ে একটী পিপীলিকা বালিকার পৃষ্ঠে দংশন করিতেছিল বালিকা ভয়ে পিপীলিকাকে কিছু বলিতে পারিল না, পিপীলিকা হুল ফুটাইয়া পৃষ্ঠে বদ্ধ হইয়া থাকিল। বালিকা

আস্তে আস্তে চক্ষু চাহিল ; দেখিল 'দাঁত কাটার মত' কে একজন তার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে। দেখিবামাত্র বালিকা আবার সংজ্ঞা রহিত হইল, মড়ার মত স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়া থাকিল। গায়ের ঘামে বালিকার ভূমিশয্যা ভিজিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বালিকার নিকটে যে ভীষণ মূর্ত্তিটী দাঁড়াইয়া বিকট চক্ষুর বিকট দৃষ্টিতে চারিদিকে ভীষণতার প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিতে করিতে নিরাশ্রয়া বালিকার সমুদয় প্রকৃতিকে বিকম্পিত করিতেছিল সেই মূর্ত্তির কিছু পরিচয় প্রদান করি।

সেই বিকটাকার মনুষ্যের বর্ণ অমাবস্যার নিবিড়ান্ধকারের ন্যায় আহ্লাদায়ক। যেন নিবিড় অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া গিয়াছে। সচরাচর মানুষের মুখ গহ্বর যে ভাবে যে স্থানে থাকে তাহার সেরূপ নহে। কর্ণমূল হইতে আরম্ভ হইয়া নাসিকার, গহ্বরদ্বয়ের সম্মুখ পর্য্যন্ত দন্তশ্রেণী ভীষণভাবে অবস্থিতি করিতেছে। দুইপাটী দন্ত সর্ব্বদা প্রকাশিত কিছুতেই লুক্কায়িত হইবার নহে। নাসিকা কোথায় গিয়াছে, কেবল দুটী নাসারন্ধ্র মাত্র আছে। সেই রন্ধ্রে কয়েক গাছা কেশ বাস করিতেছে। চক্ষু দুইটীর মধ্যে একটির পোঁটা বাহির হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মাথার চুলের লম্বা লম্বা জটা ঝুলিতেছে। উদরটি লোমে পরিপূর্ণ এবং কলসীর তলার ন্যায় গোল। দুপায়ে দুটি বৃহদাকার গোদ। লম্বা লম্বা দুটি হাতে আঙ্গুল একটু একটু আছে —সম্পূর্ণভাবে একটি আঙ্গুলও নাই।

এই মোহন মূর্ত্তির ভিতরে উন্মাদ রোগ উপযুক্ত বাসস্থান পাইয়া মনের সুখে রাজ্য করিতেছে, সেই ভীষণতার উপরে ভীষণতা স্থাপিত করিতেছে। সেই মূর্ত্তি কখন বিষ্ঠায় রঞ্জিত হইত; কখন কাদায় চর্চ্চিত হইত; কখন হাড়ের মালা গলায় দিয়া নাচিত, চীৎকার করিত—অট্টহাস্যের রোলে চারিদিক কাঁপাইত। এই মূর্ত্তিটি এক গ্রামে থাকিত না; এ গ্রাম ও গ্রাম করিয়া বেড়াইত। কখন সন্ধ্যাকালে ঘোষেদের খিড়কীতে আমগাছে বসিয়া থাকিত—স্ত্রীলোক সকল ঘাটে যাইলে ভয় দেখাইত; আবার দুষ্ট ছেলেদের তাড়া পাইলে গাছ হইতে নামিয়া দ্রুতবেগে মাঠের দিকে পলায়ন করিত।

মাঠে রাখালছেলেরা গোরু চরাইতে চরাইতে অন্যমনে খেলা করিতেছে, এমন সময়ে সেই মূর্ত্তিটি দুলিতে দুলিতে, আসিয়া সেই স্থানে মহা গোলযোগ করিত। কখন হাঁ করিয়া দুটি হাত প্রসারিত করতঃ অঁা অঁা অঁা শব্দ করিতে করিতে কোন ছেলের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইত। কখন বা গ্রামের ভিতরে বাঁশ বনে প্রবেশ করিয়া বাঁশ পাতা বিছাইয়া শয়ন করিত। কখন বা গৃহস্থের বাটিতে স্ত্রীলোকেরা, আহার করিতেছে এমন সময়ে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, দুই হাত তুলিয়া অ্যা—অ্যা—অ্যা—অ্যা—শব্দে গর্জ্জন করিতে করিতে নৃত্য করিত, এবং ভাত খাবার জন্য ব্যাকুলতা দেখাইত। এই মূর্ত্তির নাম দাঁতকাটা।

অন্ধকার রাত্রে কখন কখন কোম্পানীর রাস্তার দাঁড়াইয়া থাকিত। পথিকগণ দূর হইতে সেই মূর্ত্তি দেখিয়াই "রাম" নাম করিতে করিতে পলায়ন করিত। দাঁতকাটার নামে

গ্রামের ছেলেরা আতঙ্কে কাঁপিত। দাঁতকাটা তিনখানি নিকটবর্ত্তী গ্রামেই বাস করিত; সুতরাং এই গ্রামগুলি উহাকে মানুষ বলিয়াই জানিত। কিন্তু দাঁতকাটা ২।১ মাস অন্তর দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইত।

হয়ত ১০।১২ ক্রোশ দূরের কোন গ্রামে সন্ধ্যার পর প্রবেশ করিয়া গ্রামের রাস্তার ধারের কোন বৃহৎ তেঁতুল গাছে আশ্রয় লইত। সেই গাছতলা দিয়া যে যায়, তারই গায়ে দাঁতকাটা প্রস্রাব করে। নিশ্চয়ই ঐ লোক ভূত ভাবিয়া, চারিদিকে সেই গাছের ভূতের কথা প্রকাশ করিতে থাকে। গ্রামস্থ অনেকই সেদিন হইতে সেই গাছকে ভয়ের চক্ষে দেখিতে থাকে। দাঁত-কাটা এইরূপে দূরস্থ কত গ্রামে ভূতের ভয় প্রবল করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

অনেক পাঠিকা হয়ত ভাবিতে পারেন, এর কি বিবাহ হইয়াছিল। হায়! হায়! কে এমন হতভাগিনী আছে যে ইহাকে স্বামিত্বে বরণ করিবে! কিন্তু পাঠিকা। এমন ভাব মনে আনিও না। দাঁতকাটার বিবাহ হইয়াছে—স্ত্রীও আছে। স্ত্রী দেখিতে পরমাসুন্দরী। উহারা গোপ-জাতীয়। দাঁত-কাটাকে সেই রাঁধিয়া দেয়, কত যত্ন করে; কত ভালবাসে দাঁতকাটার উন্মাদ রোগ আরাম করিবার জন্ত অনেক বাড়িতে দাসীপনা করিয়া টাকা উপায় করিতেছে। যাহা পায় স্বামীর রোগের জন্ত খরচ করে। যদি স্বামী উন্মাদ না হইত তাহা হইলে স্ত্রীর সুখের সীমা থাকিত না। স্ত্রী সর্ব্বদা ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করে যে; ভগবান! আমার স্বামীকে আরাম কর, আমি ভিক্ষা করিয়া স্বামীকে সুখে রাখিব। স্ত্রীর নাম

দিগম্বরী। দিগম্বরী কাহারও মুখে স্বামী নিন্দা শুনিতে ভালবাসিত না। যদি কেহ বলিত, "হ্যাগা তুই অমন ভাতার ল'য়ে কেমন ক'রে ঘর করিস্" তাহা হইলে দিগম্বরী বলিত "জন্ম জন্ম যেন ঐ স্বামী ল'য়ে ঘর করি। কেন গা! আমার মনে কষ্ট দাও। আমার স্বামী আমার কাছে সোণা। তোমার স্বামী তোমার কাছে যেমন, আমার স্বামী আমার কাছে তেমন। স্বামী ত বটে। স্বামীকে লয়ে ঘর করবো, সুখে থাকবো— স্বামীর চেহারা লয়ে কি ধুয়ে খাব নাকি। তোমরা বুঝি স্বামীর চেহারা ধুয়ে ধুয়ে খাও।"—দিগম্বরী একদিন রাজাদের বাটীতে বিবাহ দেখিতে গিয়াছিল। রাজপুত্র বর সাজিয়া বাহির হইয়াছে। এমন সময়ে দিগম্বরীর একজন বন্ধু বলিল 'আচ্ছা ভাই কেমন বর বল্ দেখি' ?

দিগম্বরী বলিল ভাল বটে, কিন্তু ভাই তাকে (দাঁতকাটাকে) আমার যেমন সুন্দর দেখায় এমন আর কাকেও নয়—তোরা যে কেন তাকে অমন দেখিস্ তা বলতে পারি না! পৃথিবীর লোক গুলো যেন কেমন কেমন! সহচরী বলিল—আমার ইচ্ছা হয় ঐ যদি আমার স্বামী হ'ত।

দিগম্বরী কাণে হাত দিয়া বলিল—ছ্যা—ছ্যা! রাম রাম! গলায় দড়ি দিয়ে মরগে, জন্ম জন্ম যেন তাকে পাই। ভগবান যদি পাগল না করতেন তো দেখতিস আজ আমার কত সুখ। বলিতে বলিতে দিগম্বরী কাঁদিয়া ফেলিল। হা অমূল্য রত্ন সতীত্ব! তুমি স্ত্রীজাতির প্রকৃত অলঙ্কার। তোমার তুল্য সুন্দর রত্ন স্বর্গেও নাই। তাই বলি, সতী স্ত্রীর হৃদয়ে স্বর্গের সমুদয় সৌন্দর্য্যের সমষ্টি। এমন স্ত্রী যে পাইয়াছে, সে সহজ পাপে



পাপী হইলেও পরম ভাগ্যবান। তার সুখের একবিন্দু যদি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর প্রাপ্ত হয় তো আপনার সাম্রাজ্যকে অতি তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অবলা বালিকা আপনার প্রাণের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সেই ভয়ানক মূর্ত্তির দিকে একবার চাহিয়াই ভয়ে দৃষ্টি অবনত করিয়া থাকিল। বালিকার চঞ্চল চক্ষু একেবারে স্থির—যেন প্রস্তর নির্ম্মিত। ভয়ে সমুদয় শরীর থর থর কাঁপিতেছে। ক্রমে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল—হৃদয় দগ্ধ ব্যথিত হইতে থাকিল। সংসারের ঘোরতর প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে বা অবলা বালিকা দগ্ধ হইয়া যায়। অবলার চন্দ্রমা নিন্দিত বদনে কালিমা সঞ্চারিত হইয়া মুখখানিকে বিবর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।

দাঁতকাটাকে কখনও বালিকা দেখে নাই, লোকের মুখে তাহার কথা শুনিয়াছিল মাত্র। অবলা তাহাকে পিশাচ বলিয়া স্থির করিয়াছে।

দাঁতকাটা আস্তে আস্তে রোয়াকের উপর উঠিল। উঠিয়া মৃত দেহটিকে স্কন্ধে লইয়া ধীরে ধীরে পলায়ন করিল।

বালিকা আরও ভীত হইল। জননীর দেহ কোথায় চলিয়া যায় দেখিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। দুটি চক্ষুর জলে বালিকার বক্ষে স্রোত বহিতে থাকিল। বালিকার হঠাৎ মস্তক ঘুরিতে লাগিল—নিজের অস্তিত্ব যেন কোথায় চলিয়া যাইতেছে—যেন

পৃথিবী ঘুরিতেছে—কে যেন আছাড় মারিতেছে—এরূ বোধ হইল।

বালিকা একেবারে বিকট চীৎকারে গ্রামের নির্জ্জনতাকে পরিপূর্ণ করিল। আকাশ ভেদ করিয়া সেই পাষাণ-দ্রবিণী কাতরতা, সন্নিকটস্থ কায়স্থদিগের বাটিতে উপস্থিত হইল। সেই বাটির স্ত্রীলোকটি সেই কাতরতাপূর্ণ চীৎকারে চমকিত হইয়া স্বামীকে বলিল 'ওগো, বামুনদের বাড়ীতে এবারে যে ভয়ানক শব্দ হ'ল। ওদের অবলার বুঝি বা কিছু হ'ল। চল একবার দেখে আসি'।

স্বামী বলিল—'গিয়ে নিজের প্রাণ হারাব, বাঁচতে হবে না—তবু যদিন বাঁচি তদিনই ভাল'।

স্ত্রী বলিল—আহা। আমি একবার যাই। আমার প্রাণটা কেমন ক'রছে। এই কথা বলিয়া স্ত্রী ব্যাকুলতার সহিত বেগে ব্রাহ্মণ বাটির দিকে ধাবিত হইল।

বাটির ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বালিকা অবলা অচেতন প্রায় পড়িয়া আছে, চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু বর্ষণ হইতেছে, সমুদয় শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

বালিকার চক্ষু দিয়া জলের স্রোতরেখা বহিতেছিল। হঠাৎ সেই স্ত্রীলোককে দেখিবামাত্র স্রোত প্রবলতর হইয়া উঠিল, অবলা যেন কুজ্ঝটিকার ভিতরে প্রবেশ করিল।

কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দুঃখ গলা চাপিয়া রাখিয়াছে, বাক্য নিঃসরণের পথ বন্ধ করিয়া বসিয়াছে, কথা কোথা দিয়া বাহির হইবে? স্বপ্নে যেমন অনেক সময়ে বাক্য-স্ফুরণ হয় না, অবলার পৃথিবীর এই প্রকৃত স্বপ্নে তেমনি কথা

স্ফুরিতেছে না। বোবার ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রু প্লাবিত নয়নে প্রস্তরের মূর্ত্তির ন্যায় একদৃষ্টে সেই রমণীর দিকে চাহিয়া থাকিল; সেই রক্তিম চাহনি ভেদ করিয়া নীরব অশ্রু-ধারা ঝরিতে লাগিল। সেই চাহনির পিছনে কত ভাব, কত জ্বালা ঘন হইয়া পাষাণবদ্ধ স্রোতের ন্যায় ঠেলিতে লাগিল। সে চাহনিতে যে ভাব দেখা দিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা গভীর রসপূর্ণ কবিতা আর জগতে নাই,—তাহা বিশ্ব-কবিতার একটি ভীষণ অধ্যায়।

বালিকা চাহিয়া থাকিল—সেই চাহনির অবসরে জগতে কত ঘটনা ঘটিল—লোকে সবই বুঝিল, কিন্তু অবলার সে চাহনির গভীর ভাব কেহ বুঝিল না। সে জ্বালা—সে ভাব—সে চাহনিতেই আবদ্ধ থাকিল। অবলা রমণীকে কত কি বলিয়া প্রাণের ক্ষোভ নিবারণ করিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু ভাষা ভাবরসে, দ্রবীভূত হইয়া অশ্রুজলেই প্রকাশিত হইতে লাগিল।

রমণী অবলার সে চাহনি দেখিয়া ভয় পাইল, কাঁদ কাঁদ হইল; কাতর ভাবে কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "অবলা! তোর মা?"

সে প্রশ্নে অবলার অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি দুঃখভারে জড়ীভূত হইল—অশ্রুধারা প্রবলতর হইল—চক্ষু মুদিয়া আসিল—অবলা কাঁপিতে লাগিল। রমণী অবলার কাছে আসিল। অবলার মাথায় হাত দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল 'ও অবলা! কি হয়েছে তোরমা? কোথা? তেদ বমী কার? অবলার তখনও একটু সংজ্ঞা ছিল; ও কথা আবার শুনিয়া একেবারে মূর্চ্ছিতা হইল। অবলার দুই চক্ষু কপালে উঠিল—অবলার দাঁতে দাত বসিয়া গেল।

কায়স্থ রমণী অবলার মূর্চ্ছা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—"ও অবলা। কি করলি! ওমা কি হবে গা! কেউ যে নাই গা!

রমণী ঐ কথা গুলি বলিতে বলিতে আপনার স্বামীকে ভাবিতেছিল; ভাবিতেছিল—তাহার স্বামী যদি সেখানে আসে, তো, সে বিপদে অনেক সাহায্য হয়। রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁপিতে কাঁপিতে তখন নিকটস্থ কলসী হইতে জল আনিতে গেল। কলসীতে হাত দিয়া জল পাইল না—কলসী শূন্য। তখন ঘরে প্রবেশ করিল। ঘড়া ঘটি বাটী দেখিল, জল পাইল না। রান্নাঘরে যাইল। রান্নাঘরে উনুনে আগুণ নিবিয়া গিয়াছে; একটু একটু ক্ষীণ ধূম উঠিতেছে। রান্না ঘরের ঘড়া হইতে একটা বাটি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জল ঢালিল। কতক জল বাটির বাহিরে পড়িল—কতকটা বাটিতে পড়িল। রমণী দ্রুত বেগে অবলার কাছে আসিল। ভগবান। রক্ষা কর। বলিয়া অবলার মুখে চোখে জলের ঝাপট দিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বালিকার চক্ষের পল্লব দুটি দুঃখের নিবিড় আঁধারে ধীরে ধীরে সরাইয়া চক্ষু দুটি প্রকাশিত করিল। অবলা সেই দুঃখপ্লাবনের তীরে সেই রমণীকে দেখিয়া একটু আশ্বাসিতা হইল। রমণী অবলাকে হাত দুটী ধরিয়া ভূমি হইতে তুলিল। তুলিয়া স্নেহমাখা বচনে বলিল "এখন আমাদের বাটিতে চল। কি হয়েছে বুঝতে-পারছিনা। তোর মা কি কোথাও গেছে?'

অবলা তখন "মা গো কোথা গেলি গো" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। সে করুণস্বর তীক্ষ্ণবাণের ন্যায় রমণীকে বিদ্ধ করিল। রমণী কাঁদিয়া ফেলিল। চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিল,

ওমা! সে কি গো! বলিস্ কি? তোর মা নাই! কই! কোন ঘরে পড়ে আছে?

অবলা ঘাড় নাড়িল—কথা কহিতে পারিল না।

রমণী অবলাকে সেইখানে ফেলিয়া চমকিত ভাবে এঘর ওঘর ভাল করিয়া দেখিল ঘরে বাসন, বিছানা, খাট, আলনা সবই আছে—একটা বিড়াল একটা জানালার কাছে বসিয়া ঝিমাইতেছে। অবলার মার মৃত দেহ দেখিতে পাইল না। আরও চমকিত ভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া অবলার কাছে শরীরটিকে অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া অবলার মলিন মুখের দিকে চাহিয়া রমণী জিজ্ঞাসা করিল "বলি কি সব খুলে বল দেখি! তোর মা জলে টলে ডোবেনি ত?

অবলা কিছু উত্তর করিল না। ধীরে ধীরে উঠিল, উঠিয়া দাঁড়াইল—দাঁড়াইয়া পাগলের মত রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রমণীর বুকের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল। রমণী দুহাতে অবলাকে আপনার বুকে চাপিয়া অনেক স্নেহ প্রকাশ করিল। অবলা রমণীর বুকে ভরে মুখ গুজিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল "এখানে আর থাক্‌বোনা বড় ভয় করছে"। "ভয় কি? আমার সঙ্গে চ"—বলিয়া রমণী অবলাকে হাত ধরিয়া আপনাদের বাটিতে লইয়া যাইবার জন্য আকর্ষণ করিল। দুজনে ধীরে ধীরে চলিল। বালিকা যেন মাতৃস্নেহে আকর্ষিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে—দীর্ঘনিশ্বাসে ফুলিতে ফুলিতে—জন্মভূমির দুঃখের মাটিতে পা ফেলিতে ফেলিতে চলিল।

কায়স্থ বাটির চারিদিকে মাটির প্রাচীর। প্রাচীরে খোড়ো চাল। বাটির ভিতরে দুখানা মেটে ঘর। একখানা বড়, এক

খানা ছোট। বড় ঘর খানার দাওয়া খুব উঁচু ও চওড়া। বাহিরের দেওয়ালে সুন্দর উলুটি। সেই উলুটি করা কাঁথে মাঝে মাঝে স্ত্রীলোকের হাতে আঁকা বড় বড় পদ্ম ফুল। ঠিক মাঝ খানে একস্থানে লক্ষ্মী পূজার জন্য আলপোনার লক্ষ্মীর পেচক, ফুলের ঝাড় আঁকা রহিয়াছে। কিন্তু তাহার উপর দিয়া এক পোঁচ ঘরনিকানর গোলা চলিয়া যাওয়ায়, লক্ষ্মীর মূর্ত্তি ও ফুলের ঝাড় এবং পেচক একটু অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। সম্মুখে সেই চিত্রের উপরে দুটা বড় বড় কুলুঙ্গি। কুলুঙ্গির একটাতে দুটা খুরিউপ্টান —একটা মালায় তামাক—একটা সরায় খান কতক টিকা। আর একটাতে চকমকীর পাত্র—তার কাছে একটা পোড়া শোলা। বাটির উঠানের উপরে লাউ, শশা কুমড়ার জন্য বাঁশের মাচা। উঠানের কোনে একটা খড়ের গাদা। তার একটু দূরে একটা পেয়ারা গাছ। পেয়ারা গাছের কাছে দেয়াল ঘেঁসিয়া কয়টা নিস্তেজ মানকচুর গাছ। কচুগাছের কাছে আধখানা ভাঙ্গা জালা। তারই কাছে একটা বড় খোঁটা ও গরুর ডাবা। গরু নাই। গরু বাঁধা দড়ির খানিকটা খোঁটার কাছে পড়িয়া আছে মাত্র।

অবলা সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে গিয়া সেই বড় ঘরের বড় দাওয়ার উপরে একটি খুঁটির কাছে বসিল। বসিয়া অধোমুখে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তগ্নকণ্ঠে গদগদভাবে জননীর মৃত্যু-কথা ও সেই পিশাচ-কর্তৃক মাতৃদেহাপহরণের কথা বলিতে বলিতে, দুঃখের অগাধ অশ্রু-সাগরে যেন সাঁতার দিতে থাকিল। রমণীর স্বামীও শুনিতে শুনিতে কাঁদিতে লাগিল এবং বিধাতাকে মনে মনে গালি দিতে লাগিল।

কথা শুনিতে শুনিতে রমণী স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,"না

আর এখানে থাকা নয়। বিষয় টিষয় ফেলে এখান থেকে পালাই চল'।

পুরুষটি তখন চকমকী ঠুকিয়া একটা অতি ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ শোলায় ফেলিয়া ফুঁ দিতেছিল। শোলায় আগুণ লাগায় শোলাটি লাল হইয়া পুরুষের ফুঁ-দেওয়া ঠোঁট দুটাকে অগ্নির দীপ্তিতে আভাময় করিয়াছিল। সে শোলায় আগুণে টিকা ধরাইল। তার পর কলিকায় টিকা রাখিয়া ফুঁ দিতে দিতে কি ভাবিতে ভাবিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। হুঁকার মাথায় কলিকা দিয়া আপনার দুঃখ-পীড়িত মনে একটু সান্ত্বনা, একটু আরাম ঢালিবার জন্য, বিপদের অদ্ভুময় বন্ধু হুঁকার মুখে মুখ রাখিয়া হুঁকার অধর হইতে ধুমামৃত পান করিতে লাগিল। হুঁকা টানিতে টানিতে পুরুষটি ভাবিতেছিল, আর বাস্তভিটার মায়ায় পড়ে থাকা কেন? বাগান, পুকুর, জমী জরাতের মায়া ছেড়ে প্রাণলয়ে কোথাও পালানই ভাল। এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে অবলার দিকে চাহিল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণটা দুঃখে ভারি হইল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল 'মা। তুই কিছু ভয় পাসনি'। আমি তোর সম্পর্কে কাকা। তুই আমাদের কাছে থাকবি। আমরা যদি কোথাও যাই তোকে সঙ্গে লয়ে যাব।"

রমণী 'হা হরি' বলিয়া এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তারপর দুঃখিত স্বরে বলিল 'না আর দেরি করা নয়'। তুমি আজই একটা আমাদের বিলি কর। আর এখানে থাকবো না। ও গাঁ হতে গরুর গাড়ি ভাড়া করে আন, কি পাল্কি আন। বিষয় টিষয় পড়ে থাক। এখন প্রাণ বাঁচিয়ে ভালয় ভালয় কলিকাতায় পালাই চল। পুরুষটা তখন ক্ষুন্নস্বরে বলিল 'ও গাঁয়ে গরুর

গাড়ি আছে গাড়োয়ান নাই, গরু নাই। বেহারা পাড়ার সব মরিয়াছে, বাড়ি ঘর পড়িয়া আছে।

ব। তবে পায়ে হেঁটে যা'ব চল।

পু। মরণ বাঁচন ভগবানের হাত, মৃত্যু কোথায় নাই।

ব। যা হয় কর, আমার কিন্তু কিছু ভাল লাগেনা। কলিকাতায় পালিয়ে গেলেই ভাল।

অবলা কথা শুনিতে শুনিতে ভাবিতেছিল, হয়তো তাহাকে একলা থাকিতে হইবে—অবলা কি প্রকারে থাকিবে?

স্ত্রী পুরুষে কথা কহিতে কহিতে এই স্থির হইল যে, পরদিবস অবলাকে সঙ্গে লইয়া সে গ্রাম পরিত্যাগ করা হইবেক।

পুরুষটী তামাক অন্তঃসার করিয়া, ধূমে সে স্থানের আকাশ পূর্ণ করিয়া বাটির বাহিরে গমন করিল।

স্ত্রীলোক অবলাকে দাওয়ায় রাখিয়া রান্না ঘরে প্রবেশ করিল। তখন রান্না ঘরে উনুনে ভাত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল। ভাতের ফেন মুক্তার মুকুট তৈয়ার করিতে করিতে,—মানুষের আকাঙ্ক্ষার অনুকরণ করিতে করিতে হাঁড়ির মুখের উপর উঠিতেছিল। কতকটা ফেন হাঁড়ির গা বহিয়া উনুনের আগুনে পড়িয়া শোঁ শোঁ করিতেছিল। রমণী ব্যস্ত ভাবে হাঁড়িতে একটু জল ঢালিয়া দিল। তারপর একটা কাটি দিয়া দুটা ভাত তুলিয়া টিপিয়া বুঝিল ভাত হইয়াছে। রমণী ভাত নামাইয়া আবার অবলার কাছে গেল। অবলার তত বেলায় খুব ক্ষুধা পাইয়াছে ভাবিয়া রমণী বলিল যাহবার হ'য়েছে,—স্ত্রীলোকের স্বামী বেঁচে থাকলেই সব বজায় থাকলো। আর কেঁদে কি করিবি মা! মুখ চোখ যে কেঁদে কেঁদে ফুলেছে, চোখ

লাল হ'য়েছে। মা! আর কেঁদনা কিছু খাও। অবলা চুপ করিয়া থাকিল। রমণী আবার জিজ্ঞাসিল "তা দুটী ভাত আমাদের খানা? ছেলে মানুষ দোষ কি? আর কেবা জানবে? অবলা চুপ করিয়া থাকিল। একটা ভারি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ছল ছল দৃষ্টিতে একবার রমণীর মুখের দিকে তাকাইল। অবলার সে মুখ দেখিয়া রমণীর চোখে জল আসিল।

আঁচলে আপনার চোখের জল মুছিয়া রমণী আবার অবলাকে ভাত খাইতে বলিল। অবলা বলিল "তাকি পারি জাত যাবে যে"। বলিতে বলিতে মার চেহারা বাবার চেহারা স্মৃতিতে দেখিতে দেখিতে অবলা কাঁদিয়া ফেলিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অবলা নিকটের পুকুরে রমণীর সঙ্গে গিয়া স্নানাদি করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আহারাদির পর কায়স্থরমণী অহল্যা, মলিনমুখী অবলাকে ঘরের ভিতরে লইয়া, একখানা মাদুরে বসিয়া, কথোপকথন করিতেছিল। অবলার কাছে সংসারের ভীষণতম মূর্ত্তি—আর অহল্যার কাছে সে মূর্ত্তির অন্ধকারময়ী ছায়া। অবলা বালিকা হইলেও বিপদে পড়িয়া যেন একটু বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। মলিনভাবে, অবনতমুখে মাটিরদিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া, নিরাশার দেশে প্রাণ হারাইয়া, দুঃখের পূর্ণতায় আপনার অস্তিত্ব অনুভব করিতেছে। অহল্যার প্রাণের লাবণ্যে সে অবস্থার একটা কাল-ছায়া পড়িয়াছে। তাহারা দুজনে উক্ত অবস্থায় একটা মোটা মাদুরে আছে। অবলা হেটমুখে মাদুরের ধারে একটা ভাঙ্গা কাটি লইয়া খুঁটিতেছে। অহল্যা অবলার ম্লান মূর্ত্তির দিকে মাঝে মাঝে তাকাইতেছে। কবাটে একটা টিক্‌টিকি চুপ করিয়া আছে—মাঝে মাঝে লেজটি ঈষৎ নাড়িতেছে। অহল্যা তখন অবলার বিষয় ভাবিতেছিল। অহল্যা ভাবিতেছিল "স্বামী যখন আছে তখন আর অবলার ভয় কি" ?

অমনি কবাটের ত্রিকালজ্ঞ টিক্‌টিকি সায় দিয়া বলিল "টিক্ টিক্ টিক্"।

টিক্‌টিকির সায় পাইয়া অহল্যা হৃদয়ে বল পাইল। উৎ-সাহিত হৃদয়ে আবার অবলার বিষয় ভাবিতে লাগিল। অব-লার দুঃখে অহল্যা দুঃখ অনুভব করিতে করিতে ভাবিল :—

এত বিপদেও কি স্বামী ওর খবর লবে না! একবার জান্‌তে পারলে নিশ্চয়ই লবে!

ভাবিয়াই টিক্‌টিকির দিকে মন স্থির করিল; অহল্যার হৃদয়টা একটু চমকিয়া উঠিল। টিক্‌টিকি কিছু উত্তর দিল না, ইহাতে অহল্যার প্রাণটা বড় বিমর্ষ হইল। অহল্যা তখন বিমর্ষ প্রাণে ভাবিল, "তবে বুঝি হতভাগীর খবর লবে না"। অমনি টিক্‌টিকি যেন যমালয় হইতে সায় দিল "টিক্ টিক্ টিক্"।

অমনি অহল্যার বুক ভাঙ্গিয়া একটা বিষপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস পড়িল অহল্যার দুচক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। সে দীর্ঘশ্বাসে অবলা না বুঝিয়া একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। অহল্যা আবার ভাবিল, "স্বামীর কাছে অবলাকে পাঠায়ে দিলে, কি, স্বামী যত্ন করিবে না!! অমন সুশীলা অমন সুন্দরী স্ত্রীকে কি স্বামী যত্ন করিবে না? এইরূপ অনেক ভাবিতে ভাবিতে অহল্যা দুঃখে মৃতপ্রায় হইতে লাগিল। আবার টিক্‌টিকির দিকে মনস্থির করিয়া ভাবিল "হতভাগীর নিতান্তই পোড়াকপাল"।

অমনি টিক্‌টিকি জোরে সায়দিল "টিক্ টিক্ টিক্"। অবলার অদৃষ্টের উপর টিক্‌টিকির ভীষণ ব্যবস্থা দেখিয়া অহল্যার প্রাণ মুচড়িয়া গেল। তখন অহল্যা প্রাণের দুঃখ প্রাণে চাপিয়া অবলার সহিত কথা আরম্ভ করিল।

অহল্যা অবলার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ অবলা? মার জন্য কি মন কেমন করছে"? প্রশ্ন শুনিবামাত্র অবলার দুচক্ষু দিয়া কয় ফোঁটা জল টস টস করিয়া পড়িয়া গেল। দেখিয়া অহল্যা মনে মনে বড় অপ্রতিভ ও ব্যথিত হইয়া অন্য কথা আনিল।

"তোর শ্বশুরবাড়ীর খবর কিছু জানিস" ? অবলা মুখ হেঁট করিয়া থাকিল, কিছু উত্তর করিল না। কথাটা শুনিবামাত্র অবলার অস্তিত্বের ভিতরটা যেন কি আশায় কি ভরসায় কি ভাবনায় ফুলিতে লাগিল। অবলা মনে মনে স্থির করিল "আমি শ্বশুর বাড়িতেই যাব সেখানে খাশুড়ি আছে"। অমনি সেই আশাপূর্ণ ভাবের সহিত অবলার মলিন সৌন্দর্য্য কাঁপাইয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পতিত হইল—তাহাতে যেন যন্ত্রণার কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়িল।

অহল্যা আপনার কথার উত্তর পায় নাই তাই আবার জিজ্ঞাসিল "তার আর লজ্জা কি মা। আমার কথার উত্তর দাও"।

অবলা আস্তে আস্তে ভারিস্বরে বলিল "কি" ?

অহ। তোর শ্বশুর বাড়ির খবর কিছু জানিস ?

অবলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল "না" ?

অহ। শ্বশুর আছে না ?

অব। না।

অহ। খাশুড়ি ?

অব। আছে।

অহ। কোথা ?

অব। কলকাতায়।

অহ। জামাই কোথায় ?

অবলার প্রকৃতিটা অমনি কাঁপিয়া উঠিল—অবলা চুপ করিয়া থাকিল—তখন অবলার দুঃখের সাগর যেন উথলিয়া উঠিল।

অবলার সেই গভীর ভাব দেখিয়া অহল্যার প্রাণের উপর দিয়া একটা দুঃখের স্রোত যেন চলিয়া গেল। অহল্যা কিয়ৎক্ষণ

পরে ধীরে ধীরে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"অত লজ্জা করছ কেন মা'! দেখ্‌ছোতো কি বিপদ উপস্থিত! এই তিনজন মাত্র প্রাণে বেঁচে আছি! তাও কে কবে মরবো তার ঠিক্ নাই।

. অহল্যা আবার ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল "জামাই কোথা আছে জানিস' ?

অবলা তখন চক্ষের পল্লব দুটী একটু অহল্যার মুখের দিকে তুলিয়া বলিল "কলকাতায় পড়ে'। বলিয়াই চক্ষু অবনত করিল।

অহল্যা আবার জিজ্ঞাসা করিল "জামাই আর বে করে নাই তো" ?

অবলা সেই প্রশ্নের ভিতরে যেন আর একটা দুঃখের ভীষণ ছায়া অনুভব করিল, তাই অবলার বুকটী অমনি গুর গুর করিয়া উঠিল, নিশ্বাস জোরে পড়িল, সুন্দর মুখে নীলিমা পড়িল।

অহল্যা অবলার আকৃতির পরিবর্ত্তন দেখিয়া কতকটা বুঝিল সে কথা উল্টাইয়া অন্য কথা পাড়িল।

অহ। হাঁ অবলা। তোমার বয়স এখন কত ?

অব। ১২ বৎসর।

অহ। বে হয়েছে কয় বৎসর ?

অব। তিন বৎসরে বে হয়েছে।

অহ। জামাই একবার এসেছিল না ?

অবলা ভারি সুরে বলিল "না"।

অহ। সেকি লো! একবারও আসে নাই।। আমি সে বৎসর যখন বাপের বাড়ি যাই, তোর বাপ আনতে গেছল না ?

বাপের কথা হওয়ায় অবলার প্রাণটী আবার ব্যাকুল হইল, সুতরাং ব্যাকুল সুরে অবলা উত্তর দিল "না"।

টিক্‌টিকিটা এতক্ষণ একটা মাছি শীকারে ব্যস্ত ছিল। এখন মাছিটাকে জয় করিয়া সেটাকে ধরিয়া কয়েকবার জোরে নাড়া দিয়া উদরস্থ করিল। তারপর আস্তে আস্তে কপাটের এক-পাশে গিয়া উহাদের দুঃখের কথা শুনিতে থাকিল।

অহল্যা অবলার বিষাদপূর্ণ "না" শুনিয়া, যখন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া ভাবিল "কি দুরদৃষ্ট একবার আসে নাই। মেয়েটার কপাল বড়ই মন্দ দেখছি ;" তখন টিক্‌টিকিটা খুব জোরে সায়-দিল "টিক্ টিক্ টিক্"।

এবার টিক্‌টিকির শব্দ অহল্যার ভাল লাগিল না। অহল্যা সেটার উপর বড়ই বিরক্ত হইল। তাই কবাটে সেটাকে দেখিতে পাইয়া হাত বাড়াইয়া কবাট ধরিল। "আ পোড়ার মুখ তোমার" বলিয়া জোরে কবাট ধরিয়া নাড়া দিল। টিক্‌টিকিটা লম্ফ করিয়া দেওয়ালের উপরে পরলের কাছে থাকিল। থাকিয়া কথা শুনিবার জন্য কাণ পাতিল। টিক্‌টিকিরা কত লোকের গুপ্তকথা শুনে—তাহাতে সায় দেয়। টিক্‌টিকিরা ত্রিকালজ্ঞ—উহাদের কথা জীবনে অনেক ফলিয়া থাকে।

অহল্যা অবলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "তাইতো। একবারও আসে নাই ? কেন আসে নাই জানিস" ?

অব। কি জানি ?

অহল্যা মনে মনে ভাবিল "ক'নে মনে ধরেনি কি ? অমন সুন্দরীমেয়ে মনে ধরেনি। কি আবার বিয়ে করবে বুঝি! তা হবে!

টিক্‌টিকিটি আবার দেওয়ালের উপর হইতে বলিল—"টিক্ টিক্ টিক্"।

আরে ঝাঁটা মার তোরে!! বলিয়া অহল্যা ভ্রুভঙ্গি করিয়া দেওয়ালের উপরে দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করিল। সেখানে টিকটিকির ভয় নাই, সে সেইখানেই চুপ করিয়া থাকিল।

অহল্যা ভাবিতে ভাবিতে কতকটা নিরাশার সহিত বলিল— "অবলা তোমার মামা আছে না"?

অব। আছেন বোধ হয়—এ মড়কে কেমন আছেন জানিনা।

অবলার আবার দীর্ঘশ্বাস পড়িল, চোক মুখ দুঃখে ভরিল অবলা কাঁদিয়া ফেলিল।

অহ। খবর কতদিন পাও নাই?

অব। মামার বাড়ীর খবর অনেক দিন পাওয়া যায় নাই।

বলিতে বলিতে অবলার স্মৃতিতে মামার চেহারা খানা ফুটিয়া উঠিল—মামার সে আকৃতিটী যেন সামনে ভাসিতে লাগিল। মামার বাড়ীর কত কথা মনে আসিল। অবলার দিদিমার আকৃতি মনে আসিল, অবলা ফুঁপিয়া ফেলিল। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু মুদিয়া দুঃখপূর্ণ শূন্যের দিকে এবং রমণীরদিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আমার দশা কি হবে?—আমি হয়তো আর বাঁচিবো না। এত দুঃখে পড়িয়াও মানুষের মরিতে ভয়। মানুষ মহাবিপদে পড়িয়া বাঁচিতে চায়। তখন অহল্যা সজলনেত্রে বাৎসল্যভাবে ধীরে ধীরে বলিল—"সে কিমা! অমন কথা বলতে আছে। তুমি আমাদের কাছে থাকবে! তোমার কিছু ভয় নাই মা" বলিতে বলিতে অহল্যা আঁচল দিয়া অবলার চক্ষের জল মুছাইতে লাগিল।

দুরবস্থা ভাবিতে ভাবিতে অবলার অশ্রুবেগ বাড়িয়া উঠিল। অবলা প্রবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিল "না হয় ভিক্ষা

করে খাব"। বালিকার মুখে ভিক্ষার কথা শুনিবামাত্র অহল্যা কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ভিক্ষা কোথা পাবে মা, গ্রাম যে শ্মশান।!

অবলা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরবাড়ীর বিষয় ভাবিল; কিন্তু কোন চেহারা মনে আসিল না। সকলের যেমন শ্বশুরবাড়ী স্বামী, তারও তেমনি,—ইহা ব্যতীত আর কোন ভাব মনে আসিল না। তারপর মামার চেহারা ভাবিল—মামার বাড়ীর কথা ভাবিল। ভাবিতে ভাবিতে সে বিপদে যেন একটু সুখের ছায়া অনুভব করিল।

অহল্যা অবলার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাহাকে কোন প্রকারে স্বামীর কাছে পাঠানই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিল। অবলার স্বামীর প্রতি ভালবাসা আছে কিনা জানিবার জন্ম অবলাকে লক্ষ্য করিয়া অহল্যা বলিল "স্বামী স্ত্রীলোকের কেমন সামগ্রী। এই দেখ সব ম'রে গেছে, আমি স্বামীর মুখ দেখে বেঁচে আছি। তা তুমি ভিক্ষা করে খাবে কেন মা? তোমার স্বামী তোমায় ল'য়ে যাবেন তোমার ভয় কি"?

সে কথা গুলি শুনিতে শুনিতে অবলার প্রাণে আশার সঞ্চার হইতে লাগিল।

অবলার যদিও তিন বৎসরের সময় বিবাহ হইয়াছিল; অবলা বিবাহের পর আর স্বামীকে এপর্য্যন্ত দেখে নাই; সুতরাং স্বামীর আকৃতির কোন কথা অবলার মনে ছিল না। তথাপি অবলা স্বামীর কথা সময়ে সময়ে ভাবিত। মা চুল বাঁধিবার সময় জামাইএর কথা কোন আত্মীয়ের কাছে বলিত; কি প্রকারে শ্বশুর ঘর করিতে হয় অবলাকে সে বিষয়ে উপদেশ

দিত। যার মুখে স্বামীর কথা শুনিতে অবলা বড় ভাল বাসিত। যার মুখে স্বামীর কথা শুনিতে শুনিতে অবলা স্বামীর প্রতি ভালবাসা স্থাপন করিল। বালিকা আপনার ক্ষুদ্র হৃদয় স্বামীর কথায় পূর্ণ করিয়াছিল। "স্বামী স্ত্রীলোকের গুরু, স্বামীর তুল্য গুরু নাই"; যার মুখে একথা শুনিয়া অবধি স্বামীকে তদ্রূপই ভাবিত। বালিকার ক্ষুদ্রজীবন প্রণয়-সৌরভে পূর্ণ হইয়াছিল।

রমণী ঐ সব কথা কহিলে অবলা বলিল, "হ'য়তো বেঁচে নাই।"

কথাটি বলিয়াই অবলা প্রবলবেগে অশ্রুমোচন করিল,চারিদিক শূন্য দেখিল, যাতনায় বুক ফাটিবার মত বোধ হইল।

অহ। বালাই! ওকথা বলতে আছে মা! জন্ম এয়োস্ত্রী হ'য়ে বেঁচে থাক।

অহল্যা আবার বলিল "তুমি তোমার স্বামীর কাছে যাবে"?

অবলা তখন দুঃখ ও আশার মাঝে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কে রেখে আসবে"? কথা বলিতে বলিতে অবলার হৃদয়ে একটা আশার উচ্ছ্বাস উঠিল,—সেই ভাবোচ্ছ্বাসে অবলার মলিন মুখে একটা দীপ্তি ফুটিল। অহল্যা তখন একটু উৎসাহের সহিত বলিল "তা উনি না হয় রেখে আসবেন।"

অবলার প্রাণে আশার বল বাড়িল। অবলা আশায় বিহ্বলা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'উনি কি জানেন কোথা?

অহ। তা সন্ধান করে রেখে আসবেন।' অবলা কিছু বলিল না, রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটি আশার দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

দুইজনে এইরূপে কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে বাহিরে কাহার পদশব্দ অহল্যা শুনিতে পাইল। বুঝিল স্বামী আসিয়াছে। অহল্যার স্বামী বিশ্বনাথ দাওয়ায় উঠিয়াই আড়কাটা হইতে একটা মাদুর পাড়িল—ধুপ করিয়া একটা বালিস টানিয়া দাওয়ায় উপর ফেলিল। অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে মাদুরটা ছড়াইল,—ভাল ছড়ান হইল না; মাঝে মাঝে কুঁচকান থাকিল, বালিসের খানিকটা মাদুরে খানিকটা মাটিতে থাকিল। সেই অবস্থায় বালিসে মাথা দিয়া শুইয়া কাতরে অহল্যাকে ডাকিল "বাহিরে এস বড় গা কেমন ক'রছে"।

ইতিপূর্ব্বে মাদুর ও বালিসের ধুপ ধাপ শব্দ এবং বিছানা পাতার গোলমেলে আওয়াজ শুনিতে শুনিতে অহল্যা "উঠি উঠি" করিতেছিল। এখন স্বামীর কাতর আহ্বান শুনিবামাত্র বড়ই চমকিত ভাবে ধড়মড় করিয়া উঠিল। "কি সর্ব্বনাশ হয় বা"—ভাবিতে ভাবিতে এলো থেলো ভাবে, লুণ্ঠিত আঁচলে খোলাগায়ে দাওয়ায় আসিয়া যখন দেখিল, স্বামী বিছানায় একপেশে হইয়া শয়ন করিয়াছে তখনই মাথার মগজ ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অহল্যা ক্রত স্বামীর কাছে আসিয়া বসিল। স্বামীর পৃষ্ঠের উপরে শরীর হেলাইয়া মুখের কাছে মুখ রাখিয়া অতি মলিনমুখে অতি কাতরভাবে জিজ্ঞাসিল কি অসুখ করছে; ভয়ে আমার

সর্ব্বশরীর যে কাঁপছে"। বাস্তবিক তখন অহল্যা ভয়ে কাঁপিতে ছিল। স্বামী শুইয়াছিল, উঠিয়া মাদুর হইতে সরিয়া দাওয়ার ধারে গিয়া বসিল। বিশ্বনাথের গায় ভিতরে তখন একটা ভীষণ যাতনা হইতেছিল—সর্ব্বশরীর ঘুরিতেছিল। বিশ্বনাথ দাওয়ার ধারে বসিয়া বমি করিল—তারপর ভয়ানক ভেদ হইল। অহল্যার দুচক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। অবলা তখন কাছের খুঁটিতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল "এ আশ্রয় ও বুঝি যায়"। অবলা তখন জীবনের সম্মুখে এক ভীষণ কাল রাত্রি দেখিতেছিল। তখন মার ভেদ বমির কথা মনে স্পষ্ট উঠিতেছিল। অহল্যা স্বামীকে ধরিয়া শুয়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অবলাকে বলিল "দাঁড়ায়ে আর দেখছিস কি মা! শীঘ্র এক ঘটি জল আন।' অবলা তাড়াতাড়ি শীঘ্রই একটা বড় ঘটি করিয়া জল আনিল।

বিশ্বনাথের আবার একবার যখন ভেদ হইল, তখন দুর্ব্বলতা বশতঃ বিশ্বনাথের শরীর কাঁপিতে লাগিল। অহল্যা দ্বিতীয় বারের ভেদ দেখিয়া বড়ই ভয় পাইল। অবলার দিকে পাগলিনীর মত অশ্রুপূর্ণ নয়নে চাহিয়া বলিল "মা অবলা! কি হবে মা। একবার ও গাঁয়ে যেতে হবে—শীঘ্র যা মা। হরি ডাক্তারকে ডেকে আন মা"। অবলা বিশ্বনাথের দশা দেখিয়া কেমন হইয়াছিল, এখন অহল্যার কাতর কথা শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে কম্পিত স্বরে অবলা বলিল, "তবে আমি যাই—ডাক্তারকে ডেকে আনি"। বলিয়াই অবলা দাওয়া হইতে নামিল। তখন অহল্যা ব্যাকুল ভাবে অবলাকে বলিল "দেখিস্ মা! আজ তোর হাতে আমার প্রাণ

সমর্পণ করিলাম শীঘ্র ডেকে আনতে চাস্।" কথা শুনিয়া অবলা কাঁদিয়া ফেলিল। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুত ধাবিত হইল। অবলা বরাবর দ্রুত চলিল। কখন কখন ব্যাকুলভাবে ছুটিতে লাগিল। দুঃখের উচ্ছ্বাসে অবলার প্রকৃতি কাঁপিতেছে—দুচক্ষু লাল—অশ্রুপূর্ণ—মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে। সেই ভাবে অবলা ডাক্তার আনিতে চলিল। অবলা ডাক্তারকে ২।৩ বার দেখিয়াছিল কিন্তু তাহার বাড়ী চিনিত না। তথাপি অবলা চলিল—আর যে কেহ নাই। অবলা ভয়ে-বিকম্পিত-পাদবিক্ষেপে দ্রুত চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু সে সব গ্রাহ্য না করিয়া অবলা দুঃখে ভয়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে চলিল। অবলা আপনাকে ভুলিয়া, বিশ্বনাথের বিপদের কথা ভাবিতে ভাবিতে, বিকৃতমনে সোজা রাস্তা ভুলিয়া বাঁকা রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল। তখন বৈকাল বেলা, সূর্য্য ভীষণ মূর্ত্তি দেখাইয়া পশ্চিমের আকাশে অনেকটা চলিয়া পড়িয়াছে। তথাপি রৌদ্রের খুব উত্তাপ। শশানতুল্য গ্রামের জনশূন্য বাটী সকলের ছায়ার উপর দিয়া ও কখন রৌদ্রপূর্ণ পথের মধ্য দিয়া, ভয়ে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে, কখন গাছ পালার দিকে তাকাইতে তাকাইতে অবলা চলিতে লাগিল। অবলা পুকুরের পাড়ের কাছ দিয়া, কখন পাড়ের উপর দিয়া, কখন বাঁশ বনের ভিতর দিয়া, গ্রামের নির্জ্জনতা নীরবতা অতিক্রম করিয়া, মাঠে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই মাঠ পার হইয়া হরি ডাক্তারের বাড়ী—শ্যামপুরে যাইতে হয়।

অবলা এদিক ওদিক চাহিয়া শ্যামপুরের দিকে চলিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্যামপুরের নিকটে পঁহুছিল। সেখানে মাঠের ধারে একটা ইটের পুরাণ পাঁজা। তার উপরে কয়েকটা অশ্বথের চারা জন্মিয়াছে। পাঁজার আশপাশ বিছুতীর ঝাড়ে পূর্ণ হইয়াছে। বিছুতির লম্বা লম্বা সাপের মত শাখা বায়ুভরে দুলিতেছে। পাঁজার কাছে একটা শুষ্ক ডোবা—তার ধারে ছোট ছোট তালগাছ—চারিদিকে ভ্যারেণ্ডার বন। অবলা সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল;—বিরসপ্রাণে অধোমুখে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, কোন্ দিকে কোন্ পথে যাবে তাহা ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া কিছু ঠিক পাইলনা। অবলার সম্মুখে একটা বড় আম বাগান। অবলা সেই বাগানে রাস্তার চিহ্ন দেখিল। লোকের যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় সে রাস্তা লুপ্তপ্রায়—ঘাসে, আগাছায়, আমের পাতায় পুরিয়া রহিয়াছে। অবলা আমবাগানে প্রবেশ করিল। অনেক দূর লক্ষ করিয়া দেখিল বাগানের পরে একটা কোটা বাড়ী। প্রাণে একটু আশা জন্মিল। সে বাটীতে মানুষ থাকিতে পারে, এই আশায় বুক কাঁপাইয়া একটী দীর্ঘশ্বাস পড়িল—অবলার চক্ষে জল আসিল। বিশ্বনাথের নিদারুণ দশার কথা সর্পদংশনের ন্যায় অবলার প্রকৃতিতে একটা যন্ত্রণার আগুন ফেলিয়া দিল। অবলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। তখন বাগানের গাছ সকল আমে ভরিয়াছে। খাবার লোক নাই পাড়িবার লোক নাই। আম গাছের তলায় রাশি রাশি টাট্কা রাশি ২ পক্ক আম পড়িয়া আছে। বাগানে কাক ডাকিতেছে—পাখী ডাকিতেছে—উড়িতেছে—আমে ঠোকর মারিতেছে—ঠোকরের আঘাতে পাকা পাকা আম ধুপ ধাপ করিয়া ভুয়ে পড়িতেছে। অবলা সে সব দেখিল না—দ্রুতবেগে পাথরিজীর

মত চলিতে লাগিল। অবলা বাগানে চলিতে চলিতে অসংখ্য পোকার ফড়ফড় শব্দ শুনিল। সেই শব্দ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সেই সব পোকা অবলার মুখে গায়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বসিতে লাগিল অবলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অবলা অনেক ক্লেশে নাক, মুখ টিপিয়া—আঁচলের ঝাড়া করিয়া তাহাদের সহিত লড়াই করিতে করিতে বাগান পার হইল। সেই কোটাবাড়ির সামনে গিয়া বালিকা হাঁপ ছাড়িল। সেনপুর প্রকাণ্ড গ্রাম, গ্রামে জন-মানবের সাড়া নাই। কেবল কাক ডাকিতেছে—কুকুর চীৎকার করিতেছে—গাছের শুক পাতা মাঝে মাঝে ঝরিতেছে। এরূপ অবস্থার মাঝে সেই প্রকাণ্ড জনশূন্য কোটা। কোটার বাহিরে প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডীমণ্ডপের নীচে ঘাস বাড়িয়াছে--চণ্ডীমণ্ডপের সিঁড়ির উপরে ইটের ফাটলে ফাটলে ছোট আগাছা গজাইয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর হইতে একটা বিশ্রি গন্ধ বাহির হইতেছে। ভিতরে চামচিকা উড়িতেছে—চড়াই ডাকিতেছে—বেঙ্ লাফাইতেছে—জানালায় মাকড়সার জাল ঝুলিতেছে। চণ্ডীমণ্ডপে কতদিন ঝাঁট পড়ে নাই। চণ্ডীমণ্ডপ চালের কুটী, উইয়ের মাটী, ধুলা, পাখীর পালক, পাখীর ডিমের খোলা, সাপের খোলস, পাখীর বিষ্ঠা প্রভৃতিতে ভরিয়া রহিয়াছে। গন্ধে সেখানে দাঁড়ায় কার সাধ্য! অবলা সেখানে বাপের সহিত আসিয়া কয়েকবার যাত্রা শুনিয়াছিল-এখন তা মনে পড়ায় আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিল কাঁদিতে কাঁদিতে চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে একবার দাঁড়াইল। ভিতরে একটা রাঙা কুকুর তার কয়েকটা সাদা দাঁত বাহির করিয়া এক পেশে হইয়া ঘুমাইতেছিল। অবলা আস্তে আস্তে চণ্ডীমণ্ডপে

উঠিল। অবলার পার সাড়া পাইয়া কুকুরটা একটু শিহরিয়া উঠিল। কুকুর ঘুমাইতে লাগিল। অবলা চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া আসিল। কুকুরটা তখন জাগ্রত হইয়া বিকট মুখব্যাদনে হাই তুলিল দাঁড়াইয়া অঙ্গভঙ্গি করিয়া পার আলস্য ভাঙ্গিল—ফট্ পট্ করিয়া কাণ দুটা নাড়িল—তারপর লাল পাতলা জিভ্‌টা কাঁপাইয়া লাল ফেলিতে ফেলিতে উর্দ্ধ-লাঙ্গুলে ছুটিয়া অবলাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

অবলা কোটার পার্শ্বস্থ একটা বড় রাস্তা দিয়া গ্রামের ভিতরে চলিল। মানুষ আসতে দেখিল না। রাস্তার ধারে মড়ার মাদুর—বাঁশবনে মড়ার বালিস, লেপ, কাঁথা। কোথাও মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে—কোথাও মৃতদেহ শৃগাল কুকুরে টানাটানি করিতেছে। কোথায় একটা পুকুরের পাড়ের ধারে একটা কুকুর মড়ার হাত লইয়া চর্ব্বন করিতেছে। কোথাও কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিতেছে। অবলা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে যেন যমালয়ের ভিতরে অগ্রসর হইতেছে। ঐ কুকুরটা আসিতেছে—এইবার অবলা কাঁপিতে লাগিল--কিন্তু কিছু বলিল না অবলার পাশ দিয়া ছুটিয়া গেল।

অবলা কিয়দ্দূর গিয়া মানুষের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইল--অবলার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিল—চোকে জল আসিল। অবলা সেই ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়া চলিল। ক্রমশঃ সেই ক্রন্দনের কাছে পঁহ-ছিল অবলা একটি ক্ষুদ্র বাঁশঝাড়ের পাশে একখানা চালাঘর দেখিল। সেই ঘরের ভিতর হইতে কান্না আসিতেছে। ঘর খানার চালের খড় পচিয়াছে—মাঝে মাঝে কাল বাঁখারি বাহির হইয়াছে। একটা দাঁড়কাক তার মটকায় বসিয়া গলা ফুলা-

ইয়া গম্ভীর ভাবে, বাঁশঝাড়ের উপরের আর একটা কাকের সহিত সমস্বরে ক ক শব্দে ডাকিতেছে। বাড়ীর ধারে বাহিরে রাশিকৃত গুগুলি ও শামুখের খোলা—ঘরের চালে একখানা ছেঁড়া জাল টাঙান দেখিয়া অবলা বুঝিল—কোন ছোট লোকের বাড়ী। অবলা আস্তে আস্তে সেই বাটির ভিতর প্রবেশ করিল।

ঘরের ভিতরে যে কাঁদিতেছিল, সেই আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিল। তার বয়স প্রায় সত্তর। রং কাল। গার মাংস কুঁচকান। কপাল, গাল, গলা, পেট, আশপাশ সর্ব্বস্থানের মাংস কুঁচকান। বাম গণ্ডের উপরে ছোট তেঁতুল বীজের মত একটা বড় তিল। তিলের উপরে এক গাছা চুল। বুকের হাড় বাহির হইয়াছে। সেই শুষ্ক কেটোস্থান হইতে দুটা কদাকার স্তন শুষ্ক বেগুনের মত ঝুলিতেছে;—কালের আকর্ষণে তাহা চুপ্সিয়া গিয়াছে। বুড়ি বয়সে, শোকে, রোগে, অনেকটা বাঁকিয়া পড়িয়াছে। একখানা ছেঁড়া ময়লা দুর্গন্ধ নেকড়া পরিয়া আছে। বুক খোলা। পেট খোলা। কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করিয়াছে মাত্র। বুড়ি বাটীর ভিতরে সেই রূপের রাশি দেখিয়া চমকিত হইল। অনেক দিন মানুষের মুখ দেখে নাই তাই আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল। নাকের শ্লেষ্মা বাম হাতে ঝাড়িতে ঝাড়িতে ভারি ভারি স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কাদের মেয়ে বাছা"!

অবলা একটু উৎসাহিত প্রাণে কাছে অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে মিষ্টস্বরে বলিল "আমি সেনপুর থেকে এসেছি"।

"কেন মা! কেন এসেছিস?—এ যম-পুরীতে আসতে ভয় করেনি?" বুড়ি অতিব্যস্তে এই কথা বলিল।

"হ্যাগা! হরি ডাক্তারের বাড়ী কোন খানে? একবার ডেকে দেবে?"—বালিকা কাতরস্বরে এই কথা বলিল।

"কেন বাছা! কি দরকার?" একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বুড়ি এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

অবলা। "আমাদের বাড়ীতে বড় ব্যায়রাম গো—তাই।"

বু। তুমি কাদের মেয়ে?

অব। বামুনদের।

বু। হা ভগবান! হরিডাক্তার কি আর আছে। এই রাক্ষসি সব খেয়েছে মা সব খেয়েছে! আমি তার বাড়ীতে দশ বছর থাকি। কত গু মুত কেটে তার ছেলে মেয়েকে মানুষ করি। বলিতে বলিতে বুড়ি কাঁদিতে লাগিল। অবলাও সঙ্গে সঙ্গে চখের জল ফেলিল।

তারপর বুড়ি অবলাকে সতর্ক করিবার জন্ত বলিল "ছেলে মানুষ এখানে থেক না মা! বড় ভুতের ভয়। সন্ধ্যা হয়ে এল। শীঘ্র ঘরে যাও মা শীঘ্র ঘরে যাও;—বড় শিয়াল কুকুর ক্ষেপেছে।"

অবলা ভয়ে কাঁপিল—নৈরাশ্যে ডুবিল—কাঁদিতে কাঁদিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অবলা শ্যামপুরের হরি ডাক্তারকে ডাকিতে যাইবার পরেই, বিশ্বনাথের যখন তৃতীয়বার ভেদ হইল তখন বিশ্বনাথ শয্যাগত। অহল্যার তখন মনে হইল কর্পূর খাওয়াইয়া দি। অহল্যা কাঁপিতে কাঁপিতে কোমরের ঘুন্‌সি হইতে চাবি বাহির করিল। তারপর ভারি ভারি নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কাঁদিতে কাঁদিতে বাক্স খুলিল। বাক্স খুলিয়া কর্পূর খুঁজিতে লাগিল। ওগেবে ওগেবে, এশিশি ওশিশি, উল্টাইতে উল্টাইতে সময়যায়—অহল্যা ব্যাকুলতায় অস্থির হয়—কর্পূর খুঁজিয়া পায় না। কর্পূর একটা কুলিঙ্গিতে ছোট একটা শিশিতে ছিল—অহল্যার তাহা মনে ছিল না। বাক্স খুঁজিতে দেরি হইতে লাগিল—অহল্যা পাগলিনীর মত কাঁপিতে কাঁপিতে বাক্সটা উল্টাইয়া মেজের উপরে ঢালিল। টাকা, সিকি, পয়সা, কাঁচের বাটি ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল। দুটি কাঁচের মারবেল মেজের উপরে গড়াইতে গড়াইতে চলিল। অহল্যার ডান চক্ষু নাচিয়া উঠিল। অহল্যা সে বাক্সে কর্পূর পাইল না। আর একটা খুঁজিল—পাইল না। তারপর আর একটা ছোট বাক্সে যখন মিলিল না, তখন রাগে বাক্সটা অহল্যা উঠানে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। বাক্স ফেলিয়া শীকার হাঁড়ি খুঁজিল, পাইল না। এক একটা হাঁড়ি উল্টাইয়া মেজেতে ফেলিতে লাগিল। হাঁড়ি হইতে মসলা প্রভৃতি ভূমে পড়িয়া গেল। গোলমরিচগুলা গড়াইতে গড়াইতে চারিদিকে

ধাবিত হইল। কর্পূর মিলিল না। তারপর একুলিঝি ওকুলিঝি খুঁজিল। অনেকক্ষণ পরে সেই কর্পূরের শিশিটা হস্তগত করিল। খানিকটা কর্পূর জলে গুলিয়া প্রাণের যাতনায় কাঁপিতে কাঁপিতে ভগবানকে ব্যাকুল প্রাণে ডাকিতে ডাকিতে কর্পূর স্বামীর মুখের কাছে লইয়া গেল। তখন বিশ্বনাথের শ্বাস হইয়াছে—চক্ষু ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়াছে।

অহল্যা স্বামীর মুখের দিকে অনিমিষনয়নে চাহিয়া যখন বুঝিল গতিক ভাল নয়;—তখন পাষাণভেদীস্বরে চীৎকার করিল;—

"ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হলরে।"

আর নাই—চীৎকারের পরই বিশ্বনাথের দুচক্ষু স্থির, শরীর হিম অসাড়।

অহল্যা ভূতলে লুণ্ঠিতা হইল। যাতনায় মুখ মাটিতে চাপিয়া কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিল। শোকটা যতক্ষণ প্রকৃতির ভিতর ঘনীভূত হইতেছিল—ততক্ষণ অহল্যা বাক্যহীন ছিল। তারপর সেই ঘনশোক অহল্যার প্রাণ কাটাইয়া সরব ক্রন্দনে প্রকাশিত হইল। অহল্যা "আমার কি হ'লগো"—বলিয়া চীৎকার করিল। অহল্যা স্বামীর পাশে শোকের জ্বালায় ছট্ ফট্ করিতে থাকিল। হাত ছুড়িতে ছুড়িতে হাতের চুড়ি এক এক গাছি করিয়া ভাঙ্গিয়া সেখানে খসিতে লাগিল। প্রবল শোকে অহল্যা মাথা খুঁড়িতে লাগিল—আপনার বুকের যাতনার উপর করাঘাত করিতে থাকিল—মাথার যাতনা কমাইবার জন্য মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিল। বালা ও ভাঙা চুড়ির আঁচড়ে বুক চিরিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল, গভীর শোকে, ভীষণ মর্ম্মভেদী নীরবতা, চীৎকার, কাতরোক্তি অহল্যার প্রাণে চাপ দিয়া সংগ্রাম করিতে থাকিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অবলা শ্যামপুর হইতে ফিরিল। মাঠ পার হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। তখন সূর্য্য ডুবিয়াছে। বাতাস ধীরে ধীরে গাছের পাতা কাঁপাইয়া বহিতেছে। পাখী আকাশে উড়িতেছে। সেই ভীষণ জনশূন্য গ্রামে রাত্রির কালছায়া পড়িতেছে। সেই ছায়া আকাশের নীলিমায়, আকাশের মেঘে, গাছের ঝোপে, বনের গাম্ভীর্য্যে, পুকুরের জলে সূক্ষ্মাকারে প্রবেশ করিতেছে।

অবলা যখন গ্রামের ভিতরে গিয়া বিশ্বনাথের বাটির নিকটে গেল, তখন খানিকটা অশ্রু প্রবলবেগে অবলার বক্ষঃ ভাসাইতে লাগিল। অবলা অসাড়ভাবে দাঁড়াইয়া নীরবে কাঁদিতে থাকিল। অবলার আর পা উঠে না। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অবলা দ্বারের কাছে আসিল। সেই খানে দাঁড়াইয়া, মানুষের শব্দ শুনিবার জন্য একমনে কাণ পাতিয়া থাকিল। কিন্তু কাহারও শব্দ শুনিতে পাইল না। বাটী নীরব নিস্তব্ধ। বাটীতে কি কেহ নাই? অবলার বুক চিপ্ চিপ্ করিতে লাগিল—গা ঘামিল। অবলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাটীর ভিতরে সাহসে ভর দিয়া প্রবেশ করিল। উদাসপ্রাণে পাগলিনীর মত বড় ঘরের দিকে ধাবিত হইল। ঘরের কাছে গিয়া কাহারও সাড়া না পাইয়া চমকিত হইল—অবলার কাঁপুনি বাড়িল। থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দাওয়ায় উঠিল। দাওয়ায় কেহ নাই। বিশ্বনাথ কোথা? অহল্যা কোথা? ঘরের ভিতরে বুঝি!

অবলা ঘরের ভিতরে গেল। ঘর অন্ধকার। জনমানব নাই! ঘরের মেজের উপরে তরল অন্ধকারে বাক্স কয়টা উল্টান রহিয়াছে। সাদা সাদা টাকা, সিকি, কাঁচের বাসন পড়িয়া আছে। পীকার হাঁড়ি উল্টান রহিয়াছে—মশলা ছড়ান রহিয়াছে। কই! মানুষ কই!! অবলা তখন ভয়ে নৈরাশ্যে আত্মঘাতিনীর মত উদাস ভাবে ডাকিল :—

"কাকী-মা"!

কেউ উত্তর দিল না। অবলা আবার ব্যাকুল প্রাণে চীৎকার করিয়া ডাকিল :—

"কাকী"।

কেহ উত্তর দিল না। সেই আঁধারপূর্ণ ঘরের ভিতরে বাসনের গা হইতে, বড় বড় কলসী, জালা, ঘটী, বাটীর ভিতর হইতে মৃদু বন্ বন্ শব্দে সেই কথার প্রতিধ্বনি হইল।

অবলা ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। উঠানে নামিল। সেখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে জোরে ডাকিল :—

"কাকী মা"!

কোন উত্তর পাইল না। অবলা তখন ভয়ে বিহ্বলা হইয়া আকাশের দিকে চাহিল। চাহিয়া এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। সে দীর্ঘশ্বাসে বালিকার যেন বুক ভাঙ্গিয়া গেল—দাঁড়াইতে পারিল না, বসিয়া পড়িল। বসিয়া চক্ষু মুদিয়া কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে বালিকার গলদঘর্ম্ম হইল—অবলা কাতর প্রাণে চীৎকার করিল :—

"বাবাগো! মাগো! বড় ভয় করছে গো"! চীৎকারের

পরই বালিকার মূর্চ্ছা হইল। অবলা উঠানের ধূলায় অন্ধকারে একলা পড়িয়া থাকিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অবলার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। অবলা আস্তে আস্তে চক্ষু চাহিল। অবলার চারিদিকে অন্ধকার। অন্ধকারের মাথায় আকাশে নক্ষত্র মিটি মিটি করিতেছে—অন্ধকারের উপরে বনে ফুল ফুটিতেছে। অবলা চক্ষু চাহিয়াই তরল অন্ধকারে কাহাকে দেখিল;—ছায়ার ন্যায় আকৃতি--অবলার মার মত-কে? অবলার শরীরের রক্ত হটাৎ যেন কাঁপিয়া উঠিল-অবলা উঠিয়া দাঁড়াইল; পাগলিনীর মত সেই আকৃতির দিকে "মা! মা" করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল। কিন্তু সে আকৃতি শূন্যে মিশিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

অবলা সে বাড়ীতে একলা আর থাকিতে পারে না। এক-বার আকাশের দিকে চাহিতেছে, আর অনন্ত-প্রসারিত নীলাকাশ যেন করাল-বদন ব্যাদন করিয়া কত বিভীষিকার মূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া, বালিকাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে। অবলা গাছপালার দিকে ভয়বিহ্বলা হইয়া নয়নক্ষেপ করি-তেছে, আর গাছপালা হইতে যেন সংহারের মূর্ত্তি অবলাকে ভ্রুকুটি প্রদর্শন করিতেছে। নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছে, আর শরীর যেন মাটিতে মিশিবার জন্য অবলাকে ভয় দেখাইতেছে। অবলা সেখানে বসিতে পারে না; সেখান হইতে পলাইতেও পারে না, বালিকা ভয়ে চক্ষু মুদে, আবার ভয়ে চক্ষু খোলে। চক্ষু চাহিলে বাহিরে অন্ধকারে সেই শ্মশান সম গ্রাম এবং ভয়বিজড়িত প্রকাণ্ড আকাশ; আর চক্ষু মুদিলে আপনার ভিতরে, বাহিরের অন্ধকার অপেক্ষা ভীষণতম অন্ধকার, রাক্ষসের ন্যায় যেন তাহাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে, এইরূপ মনে হয়।

সেই অন্ধকারে বিভীষিকার মধ্যে থাকিয়া অবলার ক্ষুদ্র মন কত কি ভাবিতে লাগিল! বালিকা আর অধিক ভাবিতে পারে না,—সে শক্তিও ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে। বালিকা ভাবিতে ভাবিতে ভয়-প্রকাণ্ডতায় অভিভূত হইতেছে—সেই ভয়-জগতে আপনাকে একটি পোকার ন্যায় অনুভব করিয়া

মূর্ত্তিহনেরে যেন মৃত্যুস্পর্শে চেতনা; অবলা কত ভ কিয়াছিল সেখানে আর থাকিতে পারে না। কই ভয় পাইলে যার গলা সে আর একটী মানুষও নাই। অজ-প্রাত মুখচুম্বন করিত— কি না, অবলা জানে না। ভাবিতেছে দুই ক; আজ সে মা পার হইয়া যে গ্রাম দেখিব, সে গ্রামে হয়তো অনেক লোক— আছে—অনেক ঘর বাড়ীতে আলো জলিতেছে, আমি সেই গ্রামে যাইয়া সেখানে কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া থাকিব। বলিব আমার ঘর বাড়ী লও গহনা লও; কেবল দুটি দুটি খেতে দিও, আমি আর কিছু চাহি না। আবার ভাবিতেছে, তারপর একটু বড় হইলে কলিকাতায় গিয়া তাঁর (স্বামীর) অনুসন্ধান করিব। অবলা ভাবিতেছে আর ভয়ে কাঁপিতেছে।

এইরূপ চিন্তার সাগরে ভাসিতে ভাসিতে বালিকা অন্যমনে আছে, নিজের দুঃখের ভারে নিজের দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগে আপনার সোণার দেহ কাঁপাইতেছে, এমন সময়ে নিশার আঁধার ঘন হইয়া, আকাশ, পথ, ঘাট, এদিক্ ওদিক সব আবৃত করিল। সেই জনশূন্যগ্রামে অমনি একবারে শত শত শৃগাল উচ্চ কর্কশ রবে চারিদিক কাঁপাইতে লাগিল। খদ্যোতের দল গাছের উপরে গায়ে, নীচে উড়িতে বসিতে থাকিল। বালিকা সেই অন্ধকারের উদরে একলা থাকিয়া প্রকৃতির সেই বিকটমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে মৃতপ্রায় হইতে থাকিল।

সে বাটী ছাড়িয়া, স্থানান্তরে যাইবার জন্য অবলা ব্যস্ত হইল। যদি পাখা থাকিত তো কোন জনপূর্ণ গ্রামে, কোন গৃহস্থের বাটীতে উড়িয়া যাইত। অবলা ভাবিতেছে যদি কেহ এবাটীতে আসে তো বাঁচি। তার পায় ধরিয়া বলি তুমি আমায়

...করাশি হইয়া থাকিব। কিন্তু কেহ
...র নিবিড় হইয়া ভীষণতার ভাব ধরিতে

নব... আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া এদিক ...চাহিল। কিন্তু যে দিকে চাহে সেই দিকে কে যেন গিলিবার জন্ত হাঁ করিয়া বসিয়া আছে। নিজের দিকে চক্ষু রাখিয়া, ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া, বাটীর বাহিরে যাইতে লাগিল। বাটীর বাহিরে গিয়া ভয়ে দৌড়িতে লাগিল। যত দৌড়ায় ততই কে যেন পিছনে পিছনে ছুটিয়া অবলাকে গিলিতে আসে। ছুটিতে ছুটিতে সম্মুখে আপনাদের বাটী দেখিল, ভয় একটু কমিল। কিন্তু বাটীতে আজ আর কেহ নাই—বাটী শ্মশান। আগে বাটীতে প্রবেশ করিলে মাকে দেখিত, দাদাকে দেখিত, মার আদর পাইত, দাদার, বাবার আদর পাইত, আজ সে সব জন্মের মত ফুরাইয়াছে। বাটির ভিতরে প্রবেশ করিয়া বালিকা দেখিল, সব যেন দুঃখের শোকের মরণের বেশে দাঁড়াইয়া আছে। কোঠাটা যেন নিস্তব্ধ পাহাড়ের মত—তাহাতে কত সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, কত বিপদ বাস করিতেছে। আগে ঘরে ঘরে আলো জ্বলিত; রোয়াকে দাদা বসিয়া মার কাছে কত গল্প শুনিত—অবলা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িত। আজ আর সে সব কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে—এজনমে দাদার দেখা অবলা আর পাবে না;—তার "দাদা" বলা এজনমের মত ঘুচিয়া গিয়াছে।

বালিকা বাটির ভিতরে প্রবেশ করিয়া রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মা রাঁধিতে রাঁধিতে বসিয়াছে—আর

মা অবলার সহিত কথা কহে নাই; অবলা কত ত কিয়াছিল তবু সাড়া পায় নাই। অবলা একটু ভয় পাইলে মার গলা জড়াইয়া ধরিত, আর মা বুকে রাখিয়া কত মুখচুম্বন করিত—কত আদর বাখান কথা কহিয়া ঘুম পাড়াইত; আজ সে মা নাই। ঐখানে শুইয়াছিল;—আর ভাবিতে পারিল না;—সেই বিকট দাঁত কাটার মূর্ত্তি মনে পড়িয়া গেল। যেন দাঁত কাটা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে;—অবলা ভয়ে সেইখানে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া পড়িল।

অবলা চক্ষু মুদিয়া বসিয়া, দুঃখের তাড়নায়, বিভীষিকার আঘাতে, আপনার প্রকৃতির ভিতর নিমগ্ন হইয়াছিল। অবলার মনের ভিতরে যে আকাশ অপেক্ষা গভীর বিস্তৃত মুক্ত সৌন্দর্য্যময় জগৎ—সেই জগতের একটা বৈদ্যুতিক তেজে অবলা হঠাৎ অনুপ্রাণিতা হইল; বালিকার মলিন মুখে দীপ্তি ফুটিল, শিরার রক্তপ্রবাহ সতেজ হইল; সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল;—অবলা সাহসস্পর্শে ভাবিল ভয় কি? আমার তো স্বামী আছে;—আমার কিসের ভয়? তখন অবলার প্রকৃতিতে একটি বিপ্লব উপস্থিত হইল। সেই অন্তরবিপ্লবে অবলা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল। বুক সাহসে স্ফীত হইল—মেরুদণ্ড সতেজ হইল—রক্তপ্রবাহে—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিল—দুচক্ষে যেন বিদ্যুৎ জলিতে লাগিল—সেই আলোকে অবলার দুঃখের অমাবস্যা সুখের পূর্ণিমার পরিণত হইল। অবলা তখন সেই বিভীষিকাময়ী ভীমা প্রকৃতির বুকে পা দিয়া দাঁড়াইল—ঊর্দ্ধে নক্ষত্র সকলের দিকে চাহিয়া, হৃদয়ের শক্তিতে যেন তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া ভাবিল "আমার তো স্বামী আছে আমার কিসের ভয়?"

তখন সেই কালরাত্রির ভীষণতা চলিয়া গেল—রাত্রি যেন অবলার সখীর ন্যায় কাছে দাঁড়াইয়া থাকিল।

যেমন কাল কোমল মেঘে বিদ্যুৎ ছুটিয়া থাকে, কোমল গভীর সাগরে বাড়বাগ্নি জ্বলিয়া থাকে, সেইরূপ বালিকার কোমল গভীর হৃদয়ে স্বামী-ভাব জাগ্রত হইয়া, বালিকাকে প্রকৃতি-বিজয়িনী শক্তিতে পরিপূর্ণ করিল।

সেই মঙ্গলময় স্বামীভাব-ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া অবলা আপনহারা হইল। সেই বিভীষিকাময় অন্ধকার, সেই ভয়বিজড়িত আকাশ, সেই যমদূতসম সতত দণ্ডায়মান বৃক্ষ সকল, এখন অবলার সেই স্বামী-ভাবালোকে যেন আলোকময় হইয়া উঠিল। বালিকা স্বামী-ভাবে আত্মহারা হইয়া একটা মহাতেজে মহাসুখে ডুবিয়া যেন আপনার হৃদয়ের নূতন বলের পরীক্ষা করিতে লাগিল।

মাথার উপরে আকাশে তারা সকল ঝিক্ মিক্ করিতেছে—আঁধারের গায়ে খদ্যোৎ চক্ মক্ করিতেছে—আর বালিকার দুঃখপূর্ণ অন্তরে সুখের এক নূতন জগৎ প্রকাশিত হইতেছে—আর সেই জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে অবলা স্বামী নাম পাঠ করিতে করিতে প্রেমোন্মাদিনী হইয়া উঠিয়াছে।

সেই স্বামী ভাবের ভিতর দিয়া কত তেজ, কত আশা, কত স্নেহ প্রবাহিত হইতে লাগিল,—তাহাতে বালিকার অস্তিত্ব প্লাবিত হইল। তখন বালিকা স্বামীর মূর্ত্তি ভাবিতে লাগিল—আকৃতি মনে আসিল না—তখন বিস্মৃতির বুক ভাঙ্গিয়া সে আকৃতি দেখিবার জন্য অবলা পাগলিনী হইল। তখন হঠাৎ একখানি ছবির কথা মনে পড়িল। হৃদয় দর্পণে সেই ছবির

ছায়া পড়িবামাত্র অবলা প্রেমবিগলিত হইয়া অশ্রুমোচন করিল। এ কান্নায় দুঃখ নাই কেবল সুখ, কেবল আশা। সে অশ্রু, সতীত্বাকাশের শিশির-বিন্দু।

বার বৎসরের বালিকা কার ছবি হৃদয়ে দেখিয়াছে? কোন ছবির বিষয় ভাবিতেছে? বালিকা বয়সে এত ছবির ভাবনা কেন? প্রেমের নিঃশ্বাস কেন? প্রণয়ের স্ফূর্ত্তি কেন? ছবি অচেতন পদার্থ! তার বল নাই যে অবলাকে বিপদে রক্ষা করিবে। তার কথা নাই যে অবলাকে শোকে প্রবোধ দিবে। তার হৃদয় নাই যে অবলার দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী হবে। ভ্রমর যেমন চিত্রের পদ্মে ভুলিয়া থাকে অবলাও চিত্রের মূর্ত্তিতে সেইরূপ ভুলিয়া রহিল।

সেই মূর্ত্তির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মূর্ত্তিটি দেখিতে ইচ্ছা হইল। ছবি ঘরের ভিতরে আছে—আর ভয় থাকিল না। যে ঘরে যাইতে এত ভয় হইতেছিল, সে ঘরে ছবি আছে—সে ঘরে আনন্দের মূর্ত্তি আছে—সুখের পদ্ম ফুটিয়া আছে। ঘরে অবলা সাহস করিয়া প্রবেশ করিল। গিয়া খুঁজিয়া দেসলাই বাহির করিয়া প্রদীপ জ্বালিল। বালিকার সে বিবর্ণ মুখে একটু যেন সুখের রেখা দেখা দিয়াছে—ঠোঁটে প্রেমের রক্তিমবর্ণ প্রকাশিত—দুটি গাল একটু রক্তাভ হইয়াছে। সমস্ত দিন আহার করে নাই—কত কাঁদিয়াছে—কত মাথা খুঁড়িয়াছে—শরীর অবসন্ন হইয়াছে, হঠাৎ প্রেমমদে বলবান্—প্রেমালোকে আলোকিত—আশার কুহকে বিহ্বল।

মার বাক্স মধ্যে ছবিটি আছে। চাবি লইয়া বাক্সটি খুলিতে গিয়া মার জন্য কাঁদিল। মা বলিয়াছিল, এ বাক্সটি

তুই যখন শ্বশুর বাড়ি যাবি তখন দেব—এটী তোরই। সেই কথা অবলার মনে পড়িল। প্রেম চখের জল শুকাইয়া দিল—মন-প্রাণকে আবার উন্মত্ত করিল। অবলা চাবি খুলিয়া ছবি বাহির করিল। ঘরে কেহ নাই—বাহিরে কেহ নাই—গ্রামে কেহ নাই—সব নির্জ্জন—সব নিস্তব্ধ। বালিকা ছবিতে মূর্ত্তিটি দেখিবামাত্র শোকপীড়িত বক্ষ কাঁপাইয়া দুখের একটি গভীর ভারি ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। অবলার চক্ষু দিয়া সেই নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িল। বালিকা, মূর্ত্তি দেখিয়া পাগলিনী হইল। বালিকা সেই ছবিকেই জীবন্ত মূর্ত্তি বলিয়া মনে করিল।

সেই ছবিতে যেন কত সুখ, কত আশা, কত ভরসা। তার ভিতরে যেন কত গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য্য-সমষ্টি—কত সহস্র পদ্মের সুশীতল গন্ধ বিরাজিত। যেন কত হীরকের খনি তার ভিতরে। কত চন্দ্র, সূর্য্য, তারা সব তার ভিতরে। সে ছবি যেন মানুষের লিখিত নহে, যেন স্বর্গ হইতে, যেন কোথা হইতে অবলাকে সুখে ভাসাইবার জন্য, শোকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, দুঃখের অশ্রুবিন্দু মুছাইবার জন্য, প্রেমোচ্ছ্বাসে হৃদয় প্রাণকে উন্মত্ত করিবার জন্য আসিয়াছে। সে ছবি দেখিয়া বালিকা সব ভুলিয়া গেল—যেন কিছু বিপদে পড়ে নাই, যেন বিপদ বিপদই নহে।

অবলা বিছানা করিয়া শয়ন করিল। বুকের উপরে ছবি-খানিকে রাখিল। শয়ন করিয়া আবার উঠিল। ঘুম আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আজ আর অবলা ঘুমকে আদর করিতেছে না। বালিকা প্রদীপের আলোকে ছবি রাখিয়া হৃদয়ের সমস্ত

শক্তির সহিত দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই ছবিতে আপনাকে হারাইয়া জগৎ ভুলিতে থাকিল। ভুলিতে ভুলিতে সেই ছবির উপরেই কখন ঘুমাইয়া পড়িল তাহা জানিতে পারিল না।

রজনী প্রভাত হইল। বালিকা উঠিল। উঠিয়া ছবিখানিকে অতি যত্নে আবার বাক্সের ভিতর রাখিতে যাইল। অনিচ্ছায় বাক্সের ভিতরে রাখিল। রাখিয়া অনিমিষ নয়নে আপনাকে সেই ছবিতে আহুতি দিয়া, চোখ মুখ লাল করিয়া অবলা কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বাক্স বন্ধ করিল। তারপর জীবন রক্ষার জন্ত আহারের আয়োজন করিতে থাকিল।

আহারের যোগাড় করিতে করিতে অবলা ভাবিতেছে,—"একলাই এবাড়ীতে থাকিব। ভয়? কিসের ভয়? যার স্বামী আছে তার আবার ভয় কি? আমি যাঁর ছবি পেয়েছি, তাঁর নাম করিয়া, তাঁর কথা ভাবিয়া, এই বাটীতে সুখে থাকিতে পারিব। তিনি কি আর এখানে আসিবেন না? আসিবেন এক দিন। আসিয়া সব দুরবস্থা দেখিবেন"। অমনি অবলার চক্ষে জল পড়িল—হৃদয়ে সাহসের তেজ জ্বলিল—অবলা স্বামীভাবে বিভোর হইল! আবার ভাবিল "আমি তাঁকে রাধিয়া দিব। তাঁর সঙ্গে তাঁর কাছে যাব"। বালিকা এইরূপ যখন ভাবে তখন আর কিছুই ভাল লাগে না। ভাল লাগে কেবল সেই ছবি দেখিতে, সেই ছবি দেখিয়া পৃথিবীময় ছবি আঁকিতে—আকাশের গায়ে সেইরূপ অসংখ্য ছবি বসাইতেছে।

অবলা অনেক কষ্টে অন্তমনা হইয়া রন্ধন শেষ করিয়া আহার করিল।

তার পর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বাক্স হইতে ছবি বাহির করিল। সম্মুখে ছবি রাখিয়া বসিল। একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে প্রেমোন্মাদে উন্মাদিনী হইতে লাগিল। অবলার ঘরে আলতা ছিল। অবলা আলতা গুলিয়া সেই ছবি দেখিয়া ছবি আঁকিতে লাগিল। ছবি আঁকে আর আকাশে চায়—আকাশে দেখে সেই ছবি। ছবি আঁকে আর গাছ পালার দিকে তাকায়—দেখে গাছ পালায় কে সেই ছবি ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। অবলা চক্ষু মুদে—দেখে আপনার ভিতর সেই ছবি আনন্দে হাসিয়া হাসিয়া অবলাকে সোহাগ করিতেছে।

কিন্তু বালিকার দুঃখ শোকের জ্বালা একেবারে যাইতেছে না। ছবিটি লইয়া যতক্ষণ অন্যমনে থাকে ততক্ষণই প্রকৃত স্বর্গ সুখে থাকে। তার পর আঁধার সেই সব মনে পড়ে আর ভয়ে কাঁপিতে থাকে। সহিতে সহিতে সকলি সহিয়া যায়। দুঃখ ভুগিতে ভুগিতে হৃদয়ে বল বাড়ে। অবলার ক্রমে হৃদয় শক্ত হইতে লাগিল; একলা সেই বাড়িতে থাকিবে স্থির করিল। ঘরের চাল, নুন, তেল যতদিন থাকিবে ততদিন আর কোথাও যাইবে না স্থির করিল। তবে যখন সব ফুরাইবে তখন অন্য কোন গ্রামে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া রাঁধিয়া খাইবে। সে বাটি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা হইল না, এইজন্য যে, যদি স্বামী আসে। যদি অন্যত্র চলিয়া যাই, তো, স্বামী আসিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া স্থির করিবে সবই মরিয়াছে। যদি স্বামী আবার বিবাহ করে—যদি আর না দেখা হয়! স্বামীকে দেখিবার আশায় হৃদয়ে সাহসের বল বাঁধিয়া সেই নির্জ্জন



পুরীতে দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা সাহসী পুরুষের ন্যায় বাস করিতে লাগিল।

মায় মৃত্যুর পর চতুর্থ রাত্রে বালিকা ছবিখানিকে বক্ষে রাখিয়া নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে:—

"যেন বক্ষে স্বামী আসিয়া শুইয়া আছে! কত আদরের সহিত মুখ-চুম্বন করিতে করিতে গল্প বলিতেছে! অবলা উঠিয়া গিয়া স্বামীর জন্য জলখাবার সাজাইতেছে, পানের খিলি করিতেছে। স্বামী যেন খাইতে খাইতে অবলাকে খাওয়াইতেছে। অবলার মা যেন আড়াল হইতে দেখিতে পাইয়া মুচকিয়া হাসিতেছে। পাড়ার বউ ঝিরা যেন আসিল; আসিয়া অবলাকে কোলে লইয়া স্বামীর কোলে বসাইয়া দিল। রাত্রি হইল, অবলা যেন স্বামীর কাছে গিয়া শয়ন করিল। স্বামী যেন গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিতেছে। অবলাকে কোলে লইয়া বই পড়াইতেছে। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা আড়ি পাতিয়া সব দেখিতে দেখিতে হাসিয়া ঢলাঢলি করিতেছে।

এইরূপে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সুখের তরঙ্গে ভাসিতেছে, এমন সময়ে বাহির দরজায় ভয়ানক শব্দ হইল। শব্দ হইল— দম্ দম্ দম্।

সেই শব্দে অবলার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া অন্য ভাব ধারণ করিল। অবলা আবার কেন-স্বপ্নে শুনিতেছে বাটিরবাহিরে কে যেন বন্দুক ছুড়িল দুম্ দুম্ দুম্! আবার বাহিরে শব্দ হইল, "তারা রা রা রা"। বালিকা স্বপ্নে শুনিল 'তারা তারা তারা ও তারা—' বাহিরের দরজা ভাঙ্গিয়া গেল 'মড় মড় মড়াৎ'। বালিকা স্বপ্নে

শুনিল 'মড়া মড়া মড়া'। যেন স্বামী আর নিকটে নাই যেন অবলা এক শ্মশানে ডাকাতের দলে পড়িয়াছে। ডাকাতেরা অবলাকে কাটিবার জন্ত তরবার তুলিয়াছে—অবলা চক্ষু চাহিতে চেষ্টা করিতেছে, পারিতেছে না, কে যেন চক্ষু বাঁধিয়াছে।

ক্রমে ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া গেল 'মড় মড় মড়াৎ'। বালিকার তবুও তন্দ্রা ভাঙ্গিল না। বালিকা স্বপ্নে দেখিতেছে যেন শ্মশান হইতে আসিয়া ঘরে শুইয়াছে—সেই সব ডাকাত ঘরে প্রবেশকরিয়া টাকা চুরি করিতেছে।

ঘরের ভিতরে কে একজন বলিল, "আরে বিছানায় শুয়ে যে বড় সুন্দরী"; বলিবামাত্র আর একজন বালিকার হাত ধরিয়া তুলিল, অমনি বালিকা চক্ষু খুলিয়া দেখিল ঘরে মশাল জলিতেছে—সম্মুখে যমদূতের মত কাহারা দাঁড়াইয়া আছে—একজন সিন্দুক ভাঙ্গিতেছে। বালিকা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিতা হইল; ডাকাতের দল বাড়ি লুট করিল, গহনা টাকা যা ছিল সব চুরি করিল। পরে বালিকার মুখ বাঁধিল—হাত পা বাঁধিল। একজন বলিল, 'বেশ রূপসী রে! লয়ে যাই চল'। এই বলিয়া সে বালিকাকে বগলে করিয়া লইয়া গেল। বালিকা এতক্ষণ মূর্চ্ছিতা ছিল।

ডাকাতেরদল গ্রাম পার হইয়া দ্রুতবেগে মাঠে গিয়া উপস্থিত হইল, বালিকাকে মাঠের উপর দড়াম করিয়া ফেলিয়া দিল—বালিকাকে গুরুতর আঘাত লাগিল—সেই আঘাতে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল।

বালিকা চক্ষু চাহিয়া দেখিল—চারি দিকে অন্ধকার; আকাশ

মেঘে ঢাকা, বৃষ্টি পড়িতেছে। মশালের আলো আর নাই। রাত্রি খাঁ খাঁ করিতেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চক্‌ মক্‌ করিয়া নিবিরের মধ্যে সমস্ত জগৎ আলোকিত করিয়া, আবার অন্ধকার নিবিড়তর করিতেছে। অবলা—বিদ্যুতালোকে যমদূতের ন্যায় দস্যুদিগকে দেখিবামাত্র আবার ভয়ে আড়ষ্ট হইল—দুচক্ষু মুদিয়া আপনার প্রকৃতির ভিতর যেন লুকাইবার চেষ্টা করিল। বালিকা অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ভাবিল—'আর বাঁচিব না, জীবন ফুরাইল, মা! বাবা! দাদা! তোমরা এইবার এস। আমি তোমাদের কাছে যাই!' ভাবিতে ভাবিতে একবার ছবিখানার জন্য উন্মাদিনী হইল—সে ভাবে অভিভূতা হইয়া নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া থাকিল।

দস্যুগণ সেই সময়ে লুণ্ঠনদ্রব্য ভাগ করিতে ছিল। সব ভাগ হইবার পর একজন বলিল 'এখন এ মালটা কে নেবে?"

অন্য একজন বলিল—"কেটে ভাগ করতে হবে"।

কথাটা শুনিবা মাত্র অবলা একেবারে মূর্চ্ছিতা হইল।

একজন দস্যু বলিল "নিয়ে আর বাবা! অনেক দিন মানুষ কাটিনি, আজ কচি মানুষটা এক কোপে কাটি"।

ডাকাতের নেতা বৃদ্ধ। তার মেয়েটির রূপ দেখিয়া একটু দয়া হইয়াছিল। সে বলিল "না না মেরে কাজ নাই। যেমন আছে পড়ে থাক্‌, আমরা চলে যাই চ"।

নিবিড় আঁধারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু পাকা ডাকাতদের অনুভূতি অতিশয় প্রবল। অন্ধকারে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ খেলিতেছে। একজন দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত বৃদ্ধের কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিল—"না তা হবে না ওকে কাটি"।

বলিয়া শাণিত তরবার ঊর্দ্ধে তুলিয়া বিদ্যুতালোকে অবলার গলা লক্ষ্য করিয়া মারিল। তরবার লাগিবামাত্র শোণিত-ধারা সতেজে বহির্গত হইল। এবং তৎক্ষণাৎ 'বাপরে !' বলিয়া এক মৃত্যু-যন্ত্রণা ' রিপুরিত বিকট শব্দ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল। সেই শব্দের সহিত প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।



দশম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

দস্যুগণ প্রস্থান করিল। বিদ্যুৎ আকাশে ঝক্‌মক্ করিতে থাকিল। আকাশ বজ্রনাদে গর্জ্জন করিতে লাগিল। বৃষ্টির তেজ বাড়িতে লাগিল—মাঠে বৃষ্টিজলের স্রোত বহিতেছে,—প্রকৃতি গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিল। প্রকৃতি সেই ভীষণ হত্যার শোণিত ধৌত করিবার জন্যই যেন অজস্র বারি বর্ষণ করিল।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। এমন সময়ে একজন গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ, একটী ভৃত্য সমভিব্যাহারে, সেই মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাঠে নামিয়া দেখিল, এক মৃতদেহ। মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে পড়িয়া আছে। মৃত দেহের নিকটে একটি অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না বালিকা—নড়ন চড়ন নাই। মরিয়া গিয়াছে। গায় রক্ত লাগিয়াছে।

ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বালিকার কাছে আসিয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। দেখিল বালিকার বক্ষঃদেশ নিঃশ্বাসে কাঁপিতেছে। নাসিকার নিকটে হাত রাখিয়া দেখিল নিঃশ্বাস বহিতেছে—প্রাণবায়ু এখনও বাহির হয় নাই, কিন্তু মৃত্যু নিকটস্থ।

প্রথমতঃ তেমন রূপরাশি ভদ্রলোক কখনও দেখে নাই। শরীর শীর্ণ, কিন্তু রূপের অপূর্ব্ব মাধুরী। দন্তপংক্তি ঈষৎ প্রকাশিত—ধূলা লাগিয়াছে, তথাপি তার কাছে মুক্তা হার মানিতেছে। একখানি কাদামাখান সাড়ি পরিধান, কিন্তু সে রূপরাশি—সে স্নিগ্ধ সুশীতল রূপের কিরণ—সে বিধাতার

অপরূপ গঠন— সে মধুর ভাব—কিছুতেই ঢাকিতে পারিতেছে না। ভদ্রলোক দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—জড়িতস্বরে ভৃত্যকে বলিল, "হেথা আয়। একটু জল ল'য়ে আয়। চাকরটি সেই খুন করা মড়া দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, বলিল, না মশাই আমরা পালাই চলুন,—দেখ্‌চেন না, কে খুন ক'রে গেছে। শেষে কি আমরা আবার খুনের দায়ে পড়ব।

মনিব বলিল 'নারে ভয় নাই,—যা বলি শোন্'।

চাকর বলিল "কি বলুন।" ভদ্রলোক বলিল 'এ মেয়েটিকে কোলে ক'রে ল'য়ে বোস দেখি'। চাকর বলিল "না মশাই ওটা মড়া—আমি তা পারবো না।"

মনিব একটু বিরক্তভাবে বলিল 'মড়া নয—ধর, কোলে ক'রে ধর'।

চাকর অগত্যা মেয়েটিকে কোলে করিয়া বসিল।

ভদ্রলোক বালিকার চ'খে জলের ঝাপট এবং মুখের ভিতর ফুঁদিতে লাগিল। দিতে দিতে 'মা মা মা' এই অস্ফুট কাতর ক্ষীণস্বরে বালিকা নড়িয়া উঠিল

ভদ্রলোক কাপড় দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। বালিকা চক্ষু চাহিল। দেখিল কার ক্রোড়ে শুইয়া আছে। মা যে মরিয়াছে, মনের বিকৃত অবস্থায় স্মরণ ছিল না, তাই বলিল, 'মা ওমা! আমার বড় জিব্‌ শুকিয়ে গেছে'। ভদ্রলোক পুকুর হইতে জল আনাইয়া মুখে দিল। বালিকা জল খাইয়া একটু বল পাইল। বল পাইয়া পাশ পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিল মা নহে অন্য একজন মানুষ, আর একজন জামাজোড়া পরা কে। বালিকার দুটি চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ভদ্রলোকও কাঁদিয়া ফেলিল। পরে ভদ্রলোক বলিল, "কেন বাছা তুমি অত কাঁদছ?

বালিকা আর হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ভদ্রলোক কাপড় দিয়া বালিকাকে খুব বাতাস করিতে লাগিল। বাতাস করিতে করিতে বালিকার মুখ আসিল দেখিয়া ভদ্রলোক ভৃত্যকে বলিল, "তুই ওরে বুকে ক'রে আস্তে আস্তে ল'য়ে চল;—এ দেশে মড়কে সব ম'রেছে—চল আমাদের বাটিতে ল'য়ে চল"।

ভৃত্য বালিকাকে বক্ষে তুলিয়া আস্তে আস্তে যাইতে লাগিল। এক মাইল যাইবার পর, বালিকা চক্ষু চাহিয়া দেখিল, কার বুকে রহিয়াছে। ভাবিল ডাকাতে আমাকে লইয়া যাইতেছে—তখন বালিকা ভয়ে আড়ষ্টভাবে চক্ষু মুদিল দুচক্ষু বাহিয়া মৃত্যুচিন্তা-জনিত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া সেই ভৃত্যের অঙ্গ স্পর্শ করিল। ভৃত্য বুঝিতে পারিয়া বলিল, "বাবু মেয়েটি বুঝি কাঁদছে"।

ভদ্রলোকটির মেয়েটির প্রতি কেমন একটু দয়া জন্মিয়াছে; তাই করুণ বচনে বলিল "কেন বাছা কাঁদ, এস আমার কোলে এস।

বালিকা চাহিয়া দেখিল। ভাবিল, এরা কারা? আমায় কোথায় লইয়া যাচ্ছে—আমার সে ছবি কোথা? ভাবিয়া পেট-কাপড়ে হাত দিয়া দেখিল ছবি নাই! বালিকার প্রাণে প্রাণ থাকিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বালিকা আস্তে আস্তে কাতরস্বরে বলিল "হাঁগা! তোমরা আমায় কি মেরে ফেলবে? বলিয়াই বালিকা অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। শুনিয়া ভদ্রলোক বলিল, "না বাছা তোমায় কিছু ভয় নাই। তুমি কিছু খাবে?" বালিকা কিছু বলিল না; ছবির জন্য আকুল হইল।

ভদ্রব্যক্তি মেয়েটিকে কোলে করিয়া আপনার বাটিতে উপস্থিত হইলে মেয়েটির কম্প দিয়া জ্বর আসিল। বাটিতে ভদ্রলোকের এক বৃদ্ধা মা ও স্ত্রী—আর কেহ নাই। মেটে ঘর দুখানি ও একখানি রান্না ঘর। বাটিতে গিয়া দেখিল কেহ নাই। তখন অপরাহ্ন। বেলা প্রায় ৫টা। ঘরে উঠিয়া দেখিল দ্বার ভেজান আছে। দ্বার খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বিছানায় পীড়িতা বালিকাকে শয়ন করাইয়া ঘরের দ্বারে শিকল দিয়া ডাক্তার আনিতে গেল।

বালিকাটি জ্বরে কাঁপিতেছে আর শব্দ হইতেছে উহু—হুহু উহু—আ—আ গেনু। ভদ্রলোকের স্ত্রী কাপড় কাচিয়া আসিয়া বড় ঘরের দ্বারে উঠিয়া দেখিল, ঘরে শীকল দেওয়া, দেখিয়া ভয় হইল। কে আসিয়া শিকল দিল। বউটির বড় ভূতের ভয়। একবার ভূতেও পাইয়াছিল। ঘরের দরজার শিকল খুলিতে যাইবামাত্র শুনিতে পাইল ঘরের ভিতরে শব্দ হইতেছে—"উহু—হুহু"। বউটি অমনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দৌড়িয়া উঠানে নামিয়া আসিল। দেখিল শাশুড়ি আসিতেছে; দেখিয়া কাছে গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চুপে চুপে বলিল, মা সর্ব্বনাশ বড় ঘরে ভূত। বৃদ্ধা চমকিত হইয়া বলিল,'অ্যা! বলিসকিরে! ওমা সেকি গো!

বউটির কাঁপুনি আরও বাড়িল। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল 'মা চল আস্তে আস্তে ওদের বাড়ী যাই। কাছে ঘোষেদের বাড়ী ছিল; সেখানে শাশুড়ী বউএ গিয়া সকলকে বলিল 'আমাদের বড় ঘরে ভূত'। ঘোষের বাড়ীতে একটি যুবা ছিল। সে কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এ পড়ে। সে অমনি হাসিয়া বলিল 'দূর দূর ভূত নাই, তোদের সব মিথ্যা কথা'।

বৃদ্ধা বলিল "আচ্ছা চল দেখি কেমন নাই"। যুবক অমনি বলিল "আচ্ছা চল আমি যাই" বলিয়া একগাছি ছড়ি লইয়া যাইতে উদ্যত। এমন সময়ে তার মা আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল 'আর অতকে কাজ নাই—শেষকালে কি প্রাণটা হারাবি'।

যুবা কিছুতেই মানিল না, দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদের বাটির উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। যুবা দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে 'যদি বাবা কিছু হয়—অনেক সাহেবও ভূত মানে'। ভাবিতে ভাবিতে ভয়ে কম্পিত হইতেছে এমন সময়ে বৃদ্ধা বউ ও যুবার মা আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবা উহাদিগকে দেখিয়া ভাবিল 'এদের কাছে অপ্রস্তুত হ'লে চলিবে না'। এই ভাবিয়া জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কো কোন ঘরে"। বৃদ্ধা কথা কহিতে সাহস করিল না, অঙ্গুলি দ্বারা ঘর দেখাইয়া দিল। যুবা থর থর কাঁপিতেছে—গা দিয়া ঘাম ঝরিতেছে—মুখের আকারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ঘরের দ্বারে উঠিয়াই শুনিল শব্দ হইতেছে "উহু হু হু হু, উহু হু হু, হুহু হু হু"। শুনিবামাত্র "ওরে বাবারে" বলিয়া চীৎকার করিয়া লম্ফ দিতে দিতে বাটির বাহিরে গিয়া উপস্থিত হইল। বধূটি সেই শব্দে অজ্ঞানবৎ পড়িয়া গেল; আর দুই জনে 'বাবাগো' বলিয়া প্রস্থান দিল। শাশুড়ী বাহিরে আসিয়া বধূকে না দেখিতে পাইয়া আবার বাটির ভিতরে প্রবেশ করিয়া বধূর চেতনা করাইয়া সঙ্গে লইয়া ঘোষেদের বাটিতে গেল। বধূটি ঘোষেদের বাটিতে বসিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—শাশুড়িরও বুক দুড় দুড় করিতেছে। যুবার প্রাণ ভয়ে উড়িয়া গিয়াছে। যুবাকে মা জিজ্ঞাসা করিল "কি দেখিলি"। যুবা বলিল "ঘরে কে গোঁ গোঁ করছে আর বোটকা গন্ধ বেরিয়েছে—আর ঘরের ভিতরে

কে খোঁনা খোঁনা কথা ক'চ্ছে। আমার বোধ হয়, যেন ভূত। বধূটি, যুবা ও যুবার মার কাছে গিয়া বসিল। ভয়ে বধূর আর যুবার কাছে বসিতে লজ্জা নাই। বৃদ্ধা বলিতেছে “আর ও বাড়ীতে যাব না, আমার ছেলেকে বাবা একখানা বুঝিয়ে চিঠি লেখ আমরা অন্য কোথাও গিয়ে থাক্‌বো”।

যুবা বলিতেছে “আমি ভূতে বিশ্বাস ক'র্‌তাম না; কিন্তু আজ হতে ক'র্‌তে হলো। বাবা! ভূত আবার নাই—আমাদে কলেজের সাহেবদের একবার এনে দেখাব”।

যুবার মা জিজ্ঞাসা করিল “হ্যারে সাহেবেরা কি ভূত মানে না”। বৃদ্ধা বলিল “ওগো সাহেবেরা ভূত মানে, তবে ভয় করে না। শুনেছি নাকি ভূতে সাহেব দেখিলে পালিয়ে যায়”।

অনেক সাহেবের পায়ের গন্ধে ভূত পালায় যথার্থ বটে।

বউটি বলিতেছে সাহেবেরা ইংরাজীতে কথা কয়, ভূত তা বুঝতে পারে না—তাই পালায়'।

পেটের দায়ে ইংরাজী শিখিতে হয় বটে, কিন্তু ভাষাটা ভূতের ভাষাই বটে।

যুবা বলিল, তা নয় সাহেবরা ভূত মানে। তোমরা ব'স আমি একখানা ইংরাজী বই হ'তে ভূতের বিষয় পড়ি। বলিয়া যুবা হ্যামলেট আনিয়া পড়িতে লাগিল ও বাঙ্গালায় অর্থ বলিতে থাকিল।

স্ত্রীলোক গুলি কথাটি শুনিতে শুনিতে ঠেসাঠেসি করিয়া এর কনুএ কনুই রাখিয়া হাঁটুতে হাঁটু রাখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভদ্রলোক ডাক্তারের ডিস্পেনসারিতে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন ডাক্তার মহাশয় চেয়ারে বসিয়া চক্ষু দুটি মুদিয়া কি ভাবিতেছেন—যেন ডাক্তারের আত্মা ভাবিতে ভাবিতে পৃথিবী ছাড়িয়া কোথায় উড়িয়া বেড়াইতেছে। ডাক্তারের কাছে আর একটী বাবু বসিয়াছিল। ভদ্রলোককে দেখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, আসুন বাঁড়ুজ্যে মশাই আসুন। বাঁড়ুজ্যে মহাশয় বসিলেন। বসিয়া ডাক্তারকে ডাকিতেছেন 'ডাক্তার মশাই' ডাক্তার মশাই শুনিয়াও সাড়া দিলেন না। ডাক্তার মশাই! ও ডাক্তার মশাই'! ডাক্তার আরও ভাবনা-সাগরের তলায় তলাইতে লাগিলেন। পরিশেষে চক্ষু চাহিয়া বলিতেছেন 'অ্যা—অ্যা কোথা হ'তে বায়ুর তরঙ্গ আমার কাণের শিরায় আঘাত করিল—মনে কি কতকগুলি ভাব এসে দাঁড়াল'। বাঁড়ুজ্যে মশাই বলিতেছেন "ডাক্তার মশাই"! ডাক্তার বলিলেন, অ্যা—অ্যা—আপনি কি চাহিতেছেন?

বা। একবার আপনাকে চাই।

ডা। আমায় তুমি চাও—Necessity (নেশেসিটি) ও তাই আমায় চাও, আমি না হলে তোমার চলিবে না?

বা। একবার আমাদের বাড়ীতে যেতে হবে।

ডা। তোমার নাম কি? অর্থাৎ কি বিশেষ কথায় সকলে তোমায় ডাকিয়া থাকে?

বা। সেকি মশাই! আপনি কি আমায় চিন্‌তে পারছেননা?

ডা। হাঁ—তোমাতে এমন কতকগুলি চিহ্ন অর্থাৎ Marks (মার্কস) আছে তাহা দ্বারা তোমায় মনুষ্য বলিয়া ডাকিতে পারি কিন্তু মনুষ্যের সংখ্যা অনেক। ও, সে আমি তুমি এই সব ভাবে পরিচয় পাওয়া যায়। সেই জন্যই বলিতেছি আপনার বিশেষ নাম কি; অর্থাৎ ইংরাজী গ্রামারে যাহাকে বলে Proper name (প্রপার নেম্);—অমনি হাসিয়া বলিতেছেন, এখন আমার কথা বুঝতে পেরেছেন বোধ হয়।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিলেন "হাঁ আমি বুঝিয়াছি আপনি যে বিদ্যার তেজে একবারে যেন পুড়ে গিয়াছেন"।

ডা। আপনার নাম কি?

বা। আপনি কি আমায় ভুলে গেলেন। আমাদের কলিকাতার বাসায় সেবার যে ১৫ দিন ছিলেন, আমি যে আপনার কত ঔষধ নিজের টাকা দিয়ে কিনে দিলাম। ১০০ টাকা আপনি আমার কাছ হতে ধার নিলেন, আবার এখন কি রকম কথা বলেন।

ডা। হাঁ—হাঁ আমি ১০০ টাকা ধার নিয়েছি, এক ভদ্র লোকের কাছ হ'তে,—সে তোমারই মত। তার চেহারা ঠিক তোমারই মত। কিন্তু চেহারা দুইজনের এক রকমও থাকতে পারে। তাই জিজ্ঞাসা করছি আপনার নাম কি?

বা। আমার নাম হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডা। বাটী?

বা। এই গ্রামে।

ডা। কোন্ হরিদাস?

বা। যার কাছ হ'তে কলিকাতায় টাকা ধার লইয়াছেন।

ডা। তাইতো মহা মুস্কিলে ফেল্লে—তুমিই যে সেই—হরিদাস তার তো প্রমাণ কিছুই পাচ্ছি না। মহা বিপদেই প'ড়লাম কার টাকা বা কাকে দিয়ে ফেলি।

বলিয়া ডাক্তার মহাশয় একখানি বৃহৎ ফিলজফি লইয়া উল্টাইতে বসিলেন। হরিদাস বিরক্ত হইয়া বলিল "মশাই"—কি দেখছেন—আগে দেখবেন চলুন। তারপর বই খুলে ঔষধের বন্দোবস্ত ক'রবেন।

ডাক্তার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, হো- হো—আমি ঔষধ টৌষধ কিছু দেখছি না—তবে কিনা তুমি যে সেই হরিদাস, এ সম্বন্ধের প্রমাণ ফিলজফিতে কি প্রকার আছে, তাহাই দেখিতেছি। তুমি যে টাকার কথা কয়ে মহা বিভ্রাটে ফেল্লে হে।

হরিদাস ভাবিতেছে—"ব্যাটা বা ফাঁকি দেয়, মহা বিপদে ফেল্লে"।

ডাক্তারের নিকট যে আর একটী ভদ্রলোক বসিয়াছিল, সে ভয়ানক রাগিয়া উঠিল। বলিল, জ্বালালেন যে। এই রকমেই তো পসারটা মাটি করলেন। কি পাগলের মত ভাবেন, তার ঠিক নাই—এক বদ্ধ পাগল এসে জুটেছেরে বাবা"। ডাক্তার মহাশয় পুস্তক রাখিয়া বলিলেন, আচ্ছা চল তোমাদের বাটিতে যাই"।

পোষাক পরিয়া ছড়ি হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন "হাঁ চল, সূর্য্যটা ডুবু ডুবু হয়েছে আর বড় ভয় নাই"।

হরিদাস। কিসের ভয়?

ডা! ভয় সর্ব্বদাই আছে হে। দুপুরবেলা যখন সূর্য্যটা ঠিক মাথার উপর আসে তখনি বেয়াদা ভয়ের কারণ। কি জানি যদিই বা মাথায় দম করিয়া পড়িয়া যায়।

হরিদাস আর হাসি রাখিতে পারিল না, "এ মহা পাগল একে দিয়ে রোগী দেখান তো দায়" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া ফেলিল। ডাক্তার মহাশয় হাসিটা শুনিয়া চমকিত হইয়া বলিল, হাসিলে কেন?

হ। আপনি কি মাথা মুণ্ডু বকেন তাই।

ডা। তুমি বিজ্ঞানশাস্ত্র বোধ হয় তত পড় নাই। অনেক গ্রহ মধ্যে মধ্যে কক্ষচ্যুত হইয়া পড়ে। সূর্য্যটা যে পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতে পারে, তার আর সন্দেহ কি?

হ। যদি পড়ে তো আপনি ঘরের ভিতর থাকিলেও ঘরে পড়িবে। আপনি বাহিরে থাকিলেও যে বিপদ ঘরে থাকিলেও সেই বিপদ।

ডা। তা তো জানি, কি জান যদি সূর্য্যের খানিকটা ভেঙ্গেই যদি মাথায় পড়ে। তবে কি জান যত সাবধান হওয়া যায়, ততই ভাল।

ডাক্তার মহাশয় আবার কি ভাবিতে ভাবিতে হরিদাসের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে মনের ঠিক নাই। রাস্তার ধারে একটী শান বাঁধান পুকুর। সেই পুকুরের দিকেই যাইতেছেন—ঘাটে গিয়া সিড়ি দিয়া জলের দিকেই নামিতেছেন—নামিতে নামিতে পা পিছলিয়া ধড়াম করিয়া জলে পড়িবামাত্র "আরে কোথা এসেছি হে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হরিদাস পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন ডাক্তার নাই।

পেঁছুতে আসিয়া দেখেন, ডাক্তার পুকুরের জল হইতে আস্তে আস্তে উঠিতেছেন। হরিদাস রাগিয়া উঠিল। কিছু বলিতে পারিল না। ডাক্তার বলিতেছে, "তুমি রাগ করছ বুঝি।" ও রকম আমার রোজই হয়—ভাবছিলাম সূর্য্যটা যদি পড়িয়া যায়—আবার কত নক্ষত্র মাথার উপরে রহিয়াছে, সব পড়িলে তো মহা বিপদ—এ পৃথিবীতে বাস করাই দায়" এইটে ভাবিতে ভাবিতে জলে পড়ে গেছি হে।

হরিদাস এবারে ডাক্তারের হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। ডাক্তার আবার কি ভাবিতেছে—ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছে, এমন অবস্থায় পায়ে মহা হোঁচট লাগিল। হরিদাস চাহিয়া দেখিল কিলক্কার হোঁচট খাইয়া বসিয়া পড়িয়াছে।

তারপর হরিদাসের বাটিতে গিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার কে বাহিরে দাঁড় করাইয়া হরিদাস বাবু বাড়ীর ভিতরে গিয়া দেখিল, সন্ধ্যা অতীত, তথাপি বাড়ীতে কেহ নাই। দেখিয়া মহা বিরক্ত হইল। বাহিরে আসিয়া ডাক্তারকে বলিল, "মহাশয় একটু দাঁড়ান আমি আসছি।" ঘোষেদের বাটিতে হরিদাস যাইবামাত্র বৃদ্ধা বলিতেছে, 'এই যে আমার হরি এসেছে। আয় বাবা আয়। বাড়ীতে কি আছে জানিস? হরিদাস রাগিয়া বলিল, 'আচ্ছা আচ্ছা এখন সব বাড়ী চল--সন্ধ্যা হয়েছে কখন, ভিটেতে এখনও সন্ধ্যা জ্বালনি, যত বেল্লিক জুটে সর্ব্বনাশ করলে'।

যুবা বলিতেছে 'না হরিদাস বাবু।' আমি স্বচক্ষে দেখেছি আপনাদের বড় ঘরে ভূত হুঁ হুঁ হুঁ করছে"। হরিদাস হাসিয়া বলিল, "সে যে মানুষ—জ্বর হয়েছে তার—তাকে ধরে শুইয়ে রেখে ডাক্তার ডাক্‌তে গেছলাম। ডাক্তার মশাই বাহিরে দাঁড়ায়ে

কষ্ট পাচ্ছেন" । শুনিয়া সকলে অবাক হইল। বৃদ্ধা, বধূ, হরিদাসের সঙ্গে বাটিতে যাইয়া ঘরে আলো জ্বালিয়া দেখিল, বিছানায় যেন পদ্মফুল ফুটিয়াছে—একটি বালিকা জ্বরে কাঁপিতেছে।

ডাক্তার রোগীর হাত দেখিয়া ঔষধের প্রেসকিপসন লিখিতেছেন। হরিদাস জিজ্ঞাসা করিল, কেমন দেখলেন ?

ডাক্তার বলিল, "তোমার কথার অর্থ কি ভাল করিয়া বল।"

হ। ভাল না মন্দ দেখ্‌লেন ?

ডা। বড় শক্ত প্রশ্ন করেছ ? রোস ভাবি, তারপর বলবো। চক্ষু মুদিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন 'ভাল মন্দ ওটা তুলনার কথা—আমি যেটাকে ভাল বলি, তুমি হয়তো মন্দ বল—আবার যেটাকে এখন ভাল বলিলাম, সেটা আর একটার —হিত তুলনায় মন্দ। আমি যে তোমার কথার কি উত্তর দেব ঠিক করতে পারছি না'।

হরিদাস হাসিয়া বলিল, 'বলি ঔষধখেলে উপকারতো হবে'?

ডা। উপকার হবে কি না ? তুমি যে মহামুস্কিলে পাড়লে হে বাপু! উপকার নানা অবস্থার নানা ভাবে লওয়া যায়। মরণে অনেকের উপকার ও জীবনে অনেকের উপকার। আবার মরণে যেমন উপকার তেমনি উপকারও আছে।

হ। মরণে উপকার কি রকম মশাই—আপনি কি পাগলের মত বক্‌ছেন।

ডা। হাঁ হাঁ পাগল তো বলবেই। তবে একটি দৃষ্টান্ত দি শুনঃ—একজন সমুদ্রের জলে পড়েছে তাকে উদ্ধার করবার কেহ নাই,—তাকে যদি বরাবর সেই জলের ভিতর থাকিয়া কষ্ট ভুগতে

হয় তো কি ভয়ানক ব্যাপার বল দেখি ; এ অবস্থায় মরণে উপকার কি নাই?

হ। হাঁ—আছে। এখন জিজ্ঞাসা করি এ বালিকাটি বাঁচবে তো ?

ডা। তুমি যে আবার বিপদে ফেল্লে দেখছি। মরণ বাঁচন এবে মহা প্রশ্ন! প্লেটো এ সম্বন্ধে কি বলেছেন শুন Who knows whether that which is called living be not indeed rather dying, and that which is called dying, living ? এর অর্থ এই যে, যাহাকে জীবন বলিতেছ হয়তো তাহাই মৃত্যু ; আবার যাহাকে মরণ বলিতেছ তাহা হয়তো জীবন। তাই বলিতেছি তুমি যে সব প্রশ্ন করছ, বড় বড় পণ্ডিতেরা তার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। এখন তোমার "বাঁচবে" এই কথার মানে কি ?

হরিদাস ভাবিল, না একে বিদায় করিয়া দি, আর একজন কাল ভাল ডাক্তার আনবো। এই ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা আপনি এখন চলুন।"

ডাক্তার বলিল 'আমি যাব না আমার দেহ যাবে হে'।

হরিদাস বলিল 'আচ্ছা তাই দেহ চলুক'।

ডা। তুমি তা হলে আমার সঙ্গে যাচ্ছনা?

হ। না—আপনি যান না। বরাবর পূর্ব্বদিগের বড় রাস্তা দিয়ে গেলেই আপনার ডিস্পেন্সারী পঁহুছিবেন।

একটু রাত্রি হইয়াছে—পশ্চিমে চন্দ্র দেখা দিয়াছে। ফিল-জফার মহাশয় বাহিরে আসিয়া দেখিলেন পশ্চিমাকাশে চন্দ্র। ভাবিতেছেন পূর্ব্বদিক কমনে। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে

ঘুরিয়েছে। চাঁদটা যেদিকে উঠিয়াছে ঐদিকটা নিশ্চয়ই পূর্ব্ব এই স্থির করিয়া সেইদিকে যাইতে যাইতে দেখিলেন একবারে মাঠ—ডিস্পেন্সারী কোথা তো নাই! ভাবিতেছেন এ কমনে আসিলাম। আবার হরিদাসের বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া ডাকিতেছেন, "ও হরিদাস বাবু"—হরিদাস বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কি মহাশয় এখনও যান নাই!"

ডা। আরে যাব কি। একেবারে মাঠে পড়েছিলাম।

হ। বেশ! আপনি কোন দিকে গেছলেন বলুন দেখি?

ডা। কেন ঐ দিকে।

হরি। বেশ বেশ ওযে পশ্চিম দিক। আপনার বয়স পঞ্চাশ বৎসর আজও পূর্ব্ব পশ্চিম জ্ঞান হয় নাই। আপনি আর ডাক্তারি করিবেন না।

ডাক্তার কিলজফর একবারে রাগিয়া বলিলেন, তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি নাই, বিজ্ঞান পড়নিতো, তাই এমন কথা বল্‌ছ। পশ্চিমে কি চাঁদ উঠে? পৃথিবী কোন দিক হ'তে কোন দিকে ঘুরছে বল দেখি?

হ। কেন পশ্চিম হতে পূর্ব্ব দিকে?

ডা। তা হলে চাঁদটা কোনদিকে উঠিবে।

হ। পূর্ব্বদিকে।

ডা। ঐ দেখ চাঁদ কোন দিকে উঠেছে। প্রত্যক্ষকে যে উড়াতে যাও। তুমি কেমন মূর্খ।

হ। যাহক আমি মূর্খ, আপনি এই দিক দিয়া যান।

ডা। আচ্ছা তুমি তোমার হাতাটী এনে দাও; আমার মাথার ব্যারাম আছে; বিজ্ঞানে লেখা আছে মাথার ব্যারামে

সূর্য্যের আলো মাথায় লাগাইবে না। তোমার ছাতাটা মাথায় দিয়ে যাই; দেখছ না জ্যোৎস্নার আলো বড় হয়েছে।

হ। এখন রাত্রে সূর্য্যের আলো কোথা! বড় পাগল যে আপনি!—চাঁদের আলোকে আপনি সূর্য্যের আলো বল্লেন। আপনি ও পণ্ডিত হয়ে প্রত্যক্ষকে উড়াইতেছেন। এখন কে—

ডা। আরকি বলিব বলুন। সূর্য্যের আলো চাঁদে পড়ে—সেই আলো পৃথিবীতে পড়ে। একেই বলে জ্যোৎস্না। তাহলে চাঁদের আলোটি সূর্য্যের আলো হয় না।

হ। আচ্ছা মশাই আপনি দাঁড়ান; আমি ছাতা এনে দিচ্ছি।

হরিদাস ছাতা দিয়া ডাক্তারকে বিদায় করিল। ভাবিল 'এত পড়ে এত মূর্খ তো দেখিনি'।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাসের যত্নে ডাক্তারের ঔষধে অবলা আরোগ্যলাভ করিল। আরাম হইয়া আপনার অবস্থার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কাতর হইতে লাগিল। কাতরতায় সেই সোণার বর্ণ হীনপ্রভ হইতেছে—মুখের মধুর সরলহাসি একটু একটু শুষ্ক ভাব ধরিতেছে—শতদল তুল্য প্রফুল্ল নয়নদ্বয় ক্ষণে ক্ষণে মলিন ভাব প্রকাশ করিতেছে।

হরিদাসের মার নাম শ্যামা; স্ত্রীর নাম গোলাপ; দুজনেই অবলাকে যৎপরোনাস্তি যত্ন করিতে লাগিল। একদিন অবলা বৈকালে উঠানে বসিয়া আকাশের দিকে ভ্রূকুঞ্চনে মলিন নয়নে চাহিয়া আছে; মৃণাল ভুজ দুটীর একটী বাম গণ্ডে রাখিয়া আকাশের গায়ে যেন কি লেখা একমনে পাঠ করিতেছে। একটি একটি করিয়া পাখী আপনার স্বাধীনতার গানে আকাশ প্লাবিত করিয়া মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া অবলা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল 'হায় যদি পাখী হতাম'। আবার ভাবিল 'তাহলে কি আর ভাবনা থাকতো,' ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত এই কথাটি উচ্চারিত হইল, অমনি দুইটি চক্ষের দুটি তারা দুই বিন্দু জলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বালিকার প্রাণ হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—হৃদয়ে কি এক সাহসের তড়িত-তরঙ্গ উঠিবামাত্র মুখে রক্তিমা প্রকটিত হইল—শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহ ছুটিল। আকাশের নীলপটে এক দিব্য পুরুষের এক অসামান্য প্রেমময়মূর্ত্তির প্রতিচ্ছায়া দেখিল।

আবার আপনার হৃদয়ে—আপনার লাবণ্যময় উজ্জ্বল দেহে—পশ্চিম শোভিত রবিবক্ষে—চতুর্দ্দিক্ শোভিনী বিটপী শ্রেণীতে সে অপূর্ব্ব ছবির অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া আপনার সুখসাগরে আপনি ডুবিতে লাগিল।

অবলা ছবি হারাইয়া অবধি দিন রাত্রি সেই ছবির কথা ভাবিত। ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিয়া আকুল হইত। রাত্রে স্বপ্নে কেবল ছবির স্বপ্ন দেখিত। প্রকৃতি-পটে সেই ছবির জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আত্মহারা হইতেছিল। আত্মহারা হইতে হইতে অবলা ভাবঘোরে বসিয়া পড়িল—বসিয়া নতমুখে কেন—কিসের জন্য—অশ্রু ফেলিতে লাগিল। গোলাপ একটু আড়াল হইতে সব দেখিতেছিল। অবলাকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল "কেন অবলা! তুমি কাঁদ কেন" ?

অবলা চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল—দেখিল গোলাপ। অবলা গোলাপের কথার কোন উত্তর দিল না; আবার মুখ অবনত করিয়া থাকিল। গোলাপ আবার জিজ্ঞাসিল :—'কেন ভাই! কাঁদ কেন? আমায় বলতে দোষ কি?"

অবলা ভারি ভারি স্বরে বলিল, "আমার কিছু ভাল লাগে না।"

বলিয়া মুখ নত করিল।

গো। কেন? তোমার কি কিছু কষ্ট হয় অযত্ন হয়।

অ। না—এখানে কিছু কষ্ট নাই।

গো। তবে কাঁদ কেন? শুধু আজ নয় রোজ তোমায় যে কাঁদতে দেখি ভাই! কার জন্য এত কাঁদ? মার জন্য? তা কেঁদে কি করবে ভাই! আমার এই যে মা—আমার এক মুক্তি

রেখে মরেছেন। কেউতো চিরকালের জন্ম আসে নাই; তার জন্ম কেঁদে কেবল কষ্ট পাওয়া বইতো নয়।

অবলা একটু নীরবে থাকিয়া একটু মর্ম্মভেদী স্বরে কহিল, "আমার চিরকালই কাঁদতে হবে—একান্না যাবার নয়"। কথা শুনিয়া গোলাপের মনটা বড় নরম হইল। নরম সুরে বলিল "কান্না কি ভাই ভাল। যখন পাবার আর যো নাই তখন মিছামিছি কষ্ট পাওয়া"। ছবির জন্ত প্রাণের যা ভাব তাহা কষ্ট হইলেও সে কষ্ট অবলার সুখ,—তাই বালিকা সেই কষ্টের পোষকতা করিয়া বলিল "না এতে কষ্ট আর কি"?

গো। কি ভাই! বুঝতে পারি না। কষ্ট যদি নয় তো কাঁদ কেন—সত্যি কথা বলিস ভাই"।

প্রেমের কষ্ট যাতনা ফুলের গায়ে কাঁটার মত, তাই, প্রেমিকা প্রেমের গন্ধ ও শোভা প্রেমের কাঁটার সহিত মিশাইয়া একাকার করিতে চায়। সেইজন্ত অবলা বলিল, "আমি ভাই! মিথ্যা বলি নাই। আমি কাঁদলে যদি তোমাদের কষ্ট হয় তো আর কাঁদবো না" বলিয়াই আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিল—সে দুঃখের বন্যা বাড়িয়া উঠিল।

গো। ভাই! তোমার আগড়ম বাগড়ম কিছু বুঝি না। ও সব ভাই! তোমার কেমন কথা? এই বল কাঁদবো না, আবার কেঁদে আকুল হও।

অনেকক্ষণ পরে জড়িতস্বরে অবলা বলিল, "তুমি কি এরকম কখনও কাঁদ নাই। আমি ছেলে মানুষ—কেন কাঁদি বুঝাতে পারবো না—কান্না পায় তাই কাঁদি। তা কাঁদি—তাতে আর কষ্ট কি?"

অবলার দুঃখস্রোত প্রেম-পরিখায় বহিয়া থাকে তাই দুঃখের ভিতরে সু অনুভব করে না।

গো। আমাদের আর কি ভাই! তুমি কান্না কাটনা করলে আমাদের কষ্ট হয় তাই বলি। তা তোমার কষ্ট কিসে যায় আমাকে সব খুলে বলনা।

অবলার মুখে চোখে একটী চিন্তা ফুটিয়া উঠিল। অবলা ধীরে ধীরে বলিল, "আমি একবার বাড়ি যাব"। বলিয়াই এক গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

গো। সেখানে তো কেহ নাই—গিয়া কি হবে।

অ। আমি আবার আসিব। একটী লোক যদি সঙ্গে দাও তো যাই আবার তার সঙ্গেই আসি।

গো। সেখানে কি এত দরকার?

অ। একটি জিনিস আছে আনিব।

বালিকার সকল কথা বলা হইল না অনেকটা ভিতরে থাকিল। যাহা ভিতরে থাকিল তাহার কিয়দংশ মাত্র অবলার ছল ছল চাহনিতে ও মুখের গাম্ভীর্য্যে দেখা দিল। প্রেমের অর্দ্ধস্ফুট কথার আড়ালে জগতের যেটুকু লুকান থাকে (সেটুকু একবারেই অব্যক্ত) তাহার মত সুন্দরতম রহস্য আর কিছু আছে কি?

গো। জিনিস আবার কি? ডাকাতে সব লুট করেছে নয়?

"ডাকাতে লবার জিনিস নয়।" বলিয়াই অবলা নীরব মর্ম্মযাতনায় অধীর হইয়া অশ্রুমোচন করিল। ~~কিন্তু তাহাতে~~ মর্ম্মগত ভাবের কিছুই প্রকাশিত হইল না। সেই অশ্রুবিন্দুর অন্তরালে যে প্রেমের অনন্ত সমুদ্র; পাঠক পাঠিকা তাহা অনুভব করিয়া কৃতার্থ হউন।

গো। তবে সে তুচ্ছ জিনিসের জন্ত তত দুঃখ যাবে কেন? তা তুমি বলনা আমি তা দেব।

গোলাপ! অবলার তাহা তুচ্ছ সামগ্রী নহে। তাহা অবলার একটি সৌরজগৎ।

অ। সেটি আমার প্রাণের তুল্য। তাহা না পাইলে আমি হয় পাগল হব—না হয় মরিব।

অবলা মরার অধিক যাহা তাহাও করিতে পারে! সেই সময়ে অবলার মুখেরদীপ্তি চক্ষের তেজ দেখিয়া গোলাপ বিস্মিতা হইল। বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসিল, 'কি এমন জিনিস পাগল হবি নাকি?'

অ। একখানি ছবি।

ছবি না বলিয়া ঈশ্বরের একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলিলেই ঠিক হইত। জড়িত-স্বরে কথাটি বলিতে বলিতে অবলার দুচক্ষু জলে ভরিয়া গেল অবলার কণ্ঠরোধ হইল।

গোলাপ কিছুই বুঝিল না। হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল,—বলিল, "একখানা ছবির জন্ত এত! ওমা! পাগল হবার যো হয়েছিল যে! আমার ঘরে আর কখানা ছবি চাস এখনি দেব। তা এত দিন বলিস নাই কেন ভাই!" বলিয়া অবলার হাত ধরিয়া গোলাপ টানিতে লাগিল।

অবলা গোলাপের সেভাবে বড় দুঃখিত বড় লজ্জিত হইল—দুঃখে লজ্জায় কাঁদিয়া ফেলিল। মনে মনে ভাবিল "আমি পাপিষ্ঠা। তাই মনেরকথা বলিলাম। বলিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছি।'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বৈকালবেলা। গ্রীষ্মকাল। কলিকাতার গড়ের মাঠে গঙ্গার ধারে, এক যুবা বেড়াইতেছে। গঙ্গার বক্ষে উর্ম্মির পর উর্ম্মি—বড় বড় উর্ম্মির পাশে ছোট ছোট উর্ম্মি—সব সারি বাঁধিয়া নদীর দৈর্ঘ্যে প্রস্থে—কুল কুল স্বরে গান গাহিতেছে। নৌকা সকল হেলিতে হেলিতে দুলিতে দুলিতে যাইতেছে,—আসিতেছে—ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গঙ্গার ধারে রাস্তা দিয়া কত গাড়ি ঘোড়া, সাহেব বিবি পৃষ্ঠে লইয়া দৌড়িতেছে। কোন গাড়িতে খালি সাহেব; কোনটায় বা বিবি কোনটায় সাহেব বিবি দুই আছে। কোন গাড়ির একপার্শ্বে সাহেব অপরপার্শ্বে বিবি উন্নত বক্ষের শোভা দেখাইয়া—তাম্রবর্ণের বেণী পৃষ্ঠে দুলাইয়া শ্বেত হস্ত শ্বেত হস্তে রাখিয়া বায়ু সেবনে হৃদয় প্রাণ মগ্ন করিতেছে।

হরিদাস একটি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে:—কি চমৎকার রং—দুধে আলতায় গুলিলে যে রং হয় তার অপেক্ষাও ভাল। এমন সুন্দর রং দেখি নাই। অনেকের রং আছে গঠন নাই। গঠন আছে রং নাই। এ তা নয়, যেমনি গঠন তেমনি রং—যেমনি রং—তেমনি গঠন। তাই কি যেমন তেমন, অন্ধকার ঘরে চলিয়া বেড়াইলে, বোধ হয়, যেন বিদ্যুতের রাশি রমণীবেশে বেড়াইতেছে। কবির বর্ণনা পড়িয়াছি—অনেক রাজ কন্যাও দেখিয়াছি—কলিকাতায় আর রূপবতী নারী দেখিতে

বাকী নাই ;—কিন্তু তেমনটী দেখি নাই। এখন বালিকা ; বয়স ১২ বৎসর মাত্র। এখনি এত রূপের ছটা—শোভার ঘটা। আল ঠোঁট দুটি যেন রক্তিম গোলাপ ফুলের দুটি পাপড়ী। সেই ডাগা ডাগা চোক—যেন তাহাতে কত ভাষা আছে কত ভাবের তরঙ্গ আছে। দুটি হাতের আঙ্গুলগুলির এক একটি নয়ন ভরিয়া রাতদিন দেখিতে ইচ্ছা হয়। সেই দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশজাল কাল মেঘের ন্যায়—অমাবস্যার অন্ধকারের ন্যায়—আর তার মধ্যে সেই চন্দ্রবদন বাস্তবিকই নিষ্কলঙ্ক শশধরের তুল্য। কোরক সম এখনও বালিকা ; যৌবনে শীঘ্রই পদার্পণ করিবে। এখনও বক্ষঃ সমতল—কিন্তু যৌবন যখন সে দেহে প্রকাশিত হইবে, যখন কটিদেশ আরও ক্ষীণতর হইবে—মুখে লজ্জা-জ্যোতির সহিত যৌবন-জ্যোতি মিলিবে—যখন নব কুচোদ্গমে বক্ষের শোভার নিকট কমল-কোরকের শোভা মলিন হইবে, তখন বসন্তে বসন্তের শোভা আসিয়া মিশিবে—

সেই অধরে—রক্তিম অধরে—না জানি কত সুধা ক্ষরিবে ; সেই মৃগনিন্দিতনয়ন চঞ্চলতায় কত হৃদয়ভেদী—কত অস্থি-ভেদী অদৃশ্য মধুর শরজাল বর্ষিত হইবে—

সেই সুন্দরীর এক ফুৎকারে, এক নয়ন ভঙ্গিতে কত রাজ্য ডুবিতে পারে উঠিতে পারে ;—কিন্তু যে ডুবিবে সে আর উঠিবে না—যে উঠিবে সে আর ডুবিবে না।"

এইরূপ ভাবনার ঝটিকা বহিয়া হৃদয়কে আন্দোলিত করিতেছে এমন সময়ে আর এক গভীর ভাবের—পবিত্র ভাবের ঝঙ্কার হইল :—

"ছি! ছি! কি ও? মানুষ না পশু? পশু না কীট? কীট না

মধু ? কে তুমি ? আশ্রয় দিয়া কন্যার স্বায় দেখিয়া এ আবার কি ? এসব ভাল নয়। এসব ভাবিতে নাই। ছি ! ছি ! মানুষের একি ধর্ম। আশ্রিতাকে এ রকমে ভাবিতে নাই। তুই কি মানব দেহে কুকুরের আত্মা ? না তুই মানববেশে নরকের কীট। আর এক কথা—তোমার স্ত্রী আছে ; সে যদি কাহারও বাটীতে ঐ অবস্থায় গিয়া পড়ে, আর যদি আশ্রয়দাতা তোমার মত ভাবে উন্মত্ত হয় ;—তুমি যদি তাহা জানিতে পার—তোমার হৃদয় যদি তার হৃদয়ের ভাবকে অনুভব করিতে পারে তাহা হইলে তোমার হৃদয় রাগিয়া কাঁদিয়া নিশ্চয়ই তাহাকে বলিবে ; রে নরপিশাচ রে নিষ্ঠুর—নরকে যা—নরকে প'চে মর।

হৃদয়মধ্যে স্বর্গ নরকের সংগ্রাম উপস্থিত। নরক আবার হৃদয়কে অধিকার করিবার জন্য বলিতে লাগিল :—

'কিসের ভয় ? যতদিন আছ সুখ কর। যখন অমন রত্ন দৈবক্রমে পাইয়াছ তখন ভোগ কর। রাজারা অমন জিনিষের জন্য কত যুদ্ধে শোণিত স্রোত বহাইয়াছে কত নগর অগ্নিতে ভস্ম করিয়াছে। এমন রমণীরত্ন তুমি অগ্রাহ্য করিও না। যাহাতে সেই রূপবতীর প্রণয়াস্পদ হইতে পার, যাহাতে তাহার বদন চুম্বনে আপনার মানব জন্মের সার্থকতা করিতে পার, তজ্জন্য বদ্ধ পরিকর হও। পাপ কি কর নাই—যখন একটি পাপ করিয়াছ, তখন আর যাতনার ভয় রাখিও না ;—মরিতে যখন হইবে—মরণের হাত কেহ এড়াইতে পারিবে না ; মরিবার পূর্ব্বে যত সুখ করিতে পার কর। আর এমন সুখ কি আছে। ঐ রূপ-জ্যোতিতে ডুবিয়া যাও—

ঐ হীরকমালা গলে পর, সেই মৃণালভুজ গলায় জড়াইয়া সেই অধর-প্রান্তে চুমু খাইয়া—সেই মধুর বিদ্যুতময় বক্ষ-স্বর্গ আপনার কর্কশ বক্ষে রাখিয়া জীবনের সার্থকতা কর ভয় নাই—ভয় নাই'।

যুবা এই ভাবে অভিভূত হইল। দেবাসুরের যুদ্ধে অসুরের আপাততঃ জয় হইল। হরিদাস মনে মনে বলিল, আমার সৌভাগ্যবশতঃ, যখন পেয়েছি তখন আমি নয় তো কি আর একজন ভোগ করিবে? শুনেছি তার স্বামী আছে—তা থাকুক, গিয়া বলিব মরিয়াছে। তা হলেই সব আপদ চুকে যাবে। আর যৌবনের ভার সে কি সহিতে পারিবে? আমি নিজের ঘরে পাইয়াছি যখন, আর ভাবনা কি?

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। অবলা, গোলাপ দুই জনে একটি কক্ষে শুইয়া আছে। হঠাৎ গোলাপ উঠিয়া শাশুড়ির আহ্বান শুনিয়া শাশুড়ির ঘরে গেল। শাশুড়ি বলিল, ও ঘরের শিকল দিয়া এস, আমার পেটে হাত বুলাও, বড় অসুখ কচ্ছে।

পূর্ণিমা। চন্দ্রালোক আকাশ প্লাবিত করিয়া বসুন্ধরা পৃষ্ঠে মধুর ভাবে নৃত্য করিতেছে। ফুলের বুকে বুক দিয়া জ্যোৎস্না হাসিতেছে; সরোবরের নীল জলে তরঙ্গের ঘাড়ে চাপিয়া খেলা করিতেছে—প্রস্ফুটিত কুমুদিনীর যৌবন কান্তিতে আপনার কান্তি মিশাইয়া কুমুদিনীমুখে চুম্বন করিতেছে। গাছ সকলের গায়, মাথায়, পাতায়, চন্দ্র-কিরণ বায়ুভরে সঞ্চালিত হইতেছে। বনের ভিতরে গাছের ছায়া পড়িয়াছে—সেই ছায়ার মাঝে মাঝে চাঁদের কিরণ পড়িয়া ছায়ার সহিত দুলিয়া দুলিয়া

নাচিতেছে। যে কক্ষে অবলা নিদ্রিতা, সেই কক্ষের উন্মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া কোমল স্নিগ্ধ রশ্মি অবলার মুখে পড়িয়াছে।

কি মধুর দৃশ্য! মনুষ্য চক্ষুতে যে এমন রূপলাবণ্যে সুধাকর লঘ পড়িতে দেখিয়াছে তার স্বর্গ সুখের আর আবশ্যক নাই। ি—গবাক্ষ দ্বার উন্মুক্ত ছিল, হঠাৎ বায়ুবেগে দ্বার বন্ধ হইল। রূপের প্রতিমা অন্ধকারে আলো করিতে লাগিল।

অবলা স্বপ্ন দেখিতেছে—'যেন ডাকাতের দল অবলার ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই ছবিখানি লইয়া পা দিয়া ভাঙ্গিতেছে' অবলা চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিল। নিদ্রার ঘোর কাটে নাই—ভাবিতেছে আমি কোথা, ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিল গোলাপের কাছেই শয়ন করিয়া আছি। আপনি হাত দিয়া গোলাপের হাত ধরিল, কিন্তু দেখিল হাত শক্ত, হাতে বালা নাই। মুখে হাত দিয়া দেখিল, মুখে দাড়ি। অমনি বাবা গো মা গো! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার করিবা-মাত্র—'কেন? কেন গোলাপ? বলিয়া জোরে আলিঙ্গন করিয়া মুখ-চুম্বন করিল'। অবলাকে যখন আলিঙ্গনে বাঁধিয়া চুম্বন করিল, তৎক্ষণাৎ অবলা আপনার নখ সেই পুরুষের চক্ষে ফুটাইয়া দিল। অমনি যুবা যন্ত্রনায় অধীর হইয়া বালিকাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

শ্যামা ও গোলাপ 'কি—কি' শব্দ করিতে করিতে গৃহ-মধ্যে উপস্থিত হইল। দেখিল অবলা নীচে অচেতন প্রায় পড়িয়া আছে। অবলার চ'খে মুখে জল দিয়া চেতনা সম্পাদন করিয়া অবলার মুখে সব কথা শুনিয়া স্থির করিল, নিশ্চয় চোর বা ভূত আসিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

উক্ত ঘটনার পর হইতে অবলার মন বড়ই খারাপ—কিছুই ভাল লাগে না। মন যেন দেহ ছাড়িয়া কোথায় উড়িয়া বেড়াইতেছে—মন যেন মন নয়—অবলা যেন সে অবলা নয়। ভাবিতে ভাবিতে সে রূপরাশিতে কালিমা পড়িল। মুখ বিবর্ণ—বিষণ্ণ—সর্ব্বদা অবনত। অবলা ভাবিতেছে 'যদি স্বপ্ন সত্য হয়—যদি সে ছবি আর না পাই, তবে আমি কি প্রকারে বাঁচিব। আমি এ দেহ আর রাখিতে পারি না। ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিল। আগে ছবির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিত বটে, কিন্তু সে কান্নার তলায় যেন একটু সুখ ছিল, কিন্তু এখন যে কাঁদিল এ কান্নার প্রতি অশ্রুবিন্দুতে যেন মৃত্যুর সহস্রগুণ যন্ত্রণা—নরকের অনন্ত গুণ ভীষণতা। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে মনে মনে বলিল মা যেখানে, আমিও সেখানে যাব—আর থাকিব না—কেন থাকিব? আর খাব না—কেন খাব? সে ছবিখানি যদি পাই, তো গাছ তলায় থাকিতে পারিব—শ্মশানে ভূতের দলে নির্ভয়ে হাসিতে হাসিতে বাস করিতে পারিব। আর যদি না পাই' অবলা আর ভাবিতে পারিল না; অবলার শরীর থর থর করিয়া ভয়ে কাঁপিতেছে—বুকের ভিতরে দুড় দুড় গুর গুর শব্দে শোকোচ্ছ্বাস উঠিতেছে। অবলা আবার ভাবিতেছে 'আচ্ছা ছবি নাইবা পেলাম; তাহাতে কি, যাঁর ছবি'—ভাবনা এই পর্য্যন্ত আসিবামাত্র

অবলার মূর্ত্তিতে কে যেন গাম্ভীর্য্য ঢালিয়া দিল—কে যেন বালিকার মুখে সতীত্বের আলো জ্বালিয়া দিল—নয়নের জলে যেন স্বর্গের অমৃত-তরঙ্গ বিদ্যুৎ মাখিয়া খেলিতে লাগিল। সহসা যেন সিংহের সাহসে হৃদয় বলীয়ান হইল—শরীর কণ্টকিত হইল।—বালিকা স্বামীর জন্য হাসিতে হাসিতে সাগরের গর্জ্জনকে তুচ্ছ করিতে—বজ্রের ভীষণ শব্দকে হেয় জ্ঞান করিতে এবং শত শত বীরের শাণিত তরবার প্রহার আপনার বক্ষে ধরিতে পারে।

যাঁর ছবি তিনি কেমন?—ঠিক ছবির মত, না ছবি তাঁর মত? ছবির মুখ সেই মুখের মত, ছবির হাত পা সব তাঁরই মত। তা ছবি যায় যাক, যাঁর ছবি তাঁকে যদি পাই।—কেন পাবনা কেন? আমি যাঁর জন্য এত কাঁদি তাঁকে পাবনা? আমি এত ভুগি যাঁর জন্য তাঁকে পাবনা? তবে কাকে পাব? আর যদি তাঁকে না পাই—অভাগিনীর ললাটে যদি সে সুখ না থাকে কি করিব? পৃথিবীতে তাঁর আকৃতি যখন পাইয়াছি তখন সেই আকৃতি লইয়া জীবন-পাত করিব। আহা সে ছবি দেখিলে কত আহ্লাদ, কত বুক ভরা সাহস, কত হৃদয় পোরা শান্তি। সে ছবির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমি যেন স্বর্গ পাই। ছবিকে লইয়া এত; না জানি তাঁকে পাইলে কত সুখ হয়। এই পর্য্যন্ত আসিয়া প্রেমিকা একেবারে অভিভূতা হইয়া সুখে কি দুঃখে নিমগ্না হইল বুঝিতে পারিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্র ডুবিয়াছে। একটু একটু অন্ধকার। গ্রামের পাশে মাঠের মধ্যস্থ বড় রাস্তা দিয়া একখানি গরুর গাড়ী ক্যাঁ—কোঁ ক্যাঁ—কোঁ শব্দ করিতে করিতে যাইতেছে। গাড়োয়ান গাড়ীর উপরে শুইয়া গাহিতেছে :—বঁধু ফিরে যাওহে, শ্বশুর জাগে ভাশুর জাগে, বঁধু ফিরে যাওহে। গাড়ীর কিছু পিছুতে রাস্তার দুই পাশে দুই দল গরু খড়ের বোঝা লইয়া যাইতেছে। হরিদাস মাঠের মধ্যস্থ একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া দূরস্থ ছায়ার ন্যায় সেই গাড়ী, গরু ও মানুষ গুলি দেখিতেছে। অশ্বত্থ বৃক্ষের ডাল হইতে একটি কাক কা—কা রবে উড়িয়া গেল। একটি শৃগাল আস্তে আস্তে হরিদাসের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। অদূরে মুসলমান পাড়ায় কুকুর গুলি কর্কশ শব্দে সকলের ঘুম ভাঙ্গাইতে লাগিল।

হরিদাস ভাবিতেছে "সমস্ত রাত্রি জাগিয়া, পথ হাটিয়া কলিকাতা হইতে আসিলাম। ঘরে গিয়া শয্যায় সুবিধা মাপিক, আপনার কোলে পাইলাম। অতটা বাড়াবাড়ি না করিলেই ভাল ছিল। এখন বাড়ীর ভিতরে একটা নিশ্চয়ই গোলযোগ হইয়াছে। আমায় চিনিতে কখনই পারে নাই। গোলাপী ভাগ্যে জানিতে পারে নাই। আর যদিই জানিতে পারে তাহাতেই বা কি? দুইবার যে তাকে ভূতে পেয়েছিল সে সবই নষ্টামি! বাড়ীতে যে ইট পাটকেল পড়িত, সে মানুষ

ভুক্তেই ফেলিত। ছুঁড়ি আমায় অনেক কষ্ট দিয়াছে—আমি এই বার শোধ দিব। তার সব গহনা গুলি অবলাকে দেব। মা রাগ করেন করবেন—রাগ ক'রে কিছুই করতে পারবেন না! গোলাপী যদি সুখের পথে কাঁটা দিতে প্রয়াস পায় তো ছুঁড়িকে, বাড়ী হ'তে দূর করে দেব। ছুঁড়ির চরিত্রটা খারাপ আছে—আরও যাতে খারাপ হয় তার চেষ্টা করব; তা হইলেই অবাধে অবলাকে বুকে রেখে স্বর্গ-সুখে সুখী হ'ব। গোলাপী ছুঁড়িকে আর স্ত্রী ব'লে ভাববো না—অবলার চাকরাণী ব'লেই ভাবিব'।

দেখিতে দেখিতে আকাশ পরিষ্কার হইল। পূর্ব্বদিকে লাল সূর্য্য প্রকাশিত হইল। চাষারা লাঙ্গল ঘাড়ে লইয়া একে একে গরুর সহিত মাঠে গোলমাল করিতে লাগিল।

হরিদাস আস্তে আস্তে শঙ্কিত মনে, কম্পিত হৃদয়ে বাড়ীর দিকে চলিল।

বাড়ীতে গিয়াই দেখিল গোলাপ রোয়াকে দাঁড়াইয়া আছে, শ্যামা উঠানে বসিয়া কি করিতেছে। 'মা' বলিয়া হরিদাস বাবু শ্যামাকে চমকিত করিল।

শ্যা। কেরে? হরি? এত সকালে যে?

হ। সকাল কোথায়?

শ্যা। আর বাছা—সে দিনে বলেছিলে বাড়ীতে ভয় নাই এই শেষ রাত্রে যে হ'য়ে গেছে—না বাছা—এ বাড়ীতে আর থাকা নয়।

হ। কি হয়েছে—কিছু নয়। ভূত নেই ভূত নেই।

অবলা শুনিতে পাইয়া গোলাপকে জিজ্ঞাসা করিল 'কিগা'?

গোলাপ চুপে চুপে বলিল 'এ বাড়ীতে ভূত আছে বোন— ভূত আছে'।

হরিদাস ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল গোলাপের কাছে অবলা। অবলাকে দেখিবামাত্র পাপিষ্ঠের হৃদয়ের রক্ত কাঁপিয়া উঠিল, বক্রদৃষ্টে অবলাকে দেখিয়া গোলাপকে বলিল—'দাও একখানা কাপড় দাও'।

গোলাপ কাপড় দিলে, হরিদাস বলিল 'যাও কাজ কর্ম্ম কর গে'। গোলাপ ঘরের বাহিরে যাইবা মাত্র অবলা সঙ্গে সঙ্গে গেল হরিদাসের ইচ্ছা গোলাপ যাউক অবলা একলা ঘরে থাকুক। পাপিষ্ঠ হরি অবলার পিছু পিছু চলিল।

অবলার বড় লজ্জা। এ পর্য্যন্ত আরাম হইবার পর কোন পুরুষের সহিত কথা কহে নাই। হরিদাসকে দেখিলে ঘাড় হেট করিয়া থাকিত। হরির আকৃতি যে কিরূপ তাহা অবলা ভাল দেখে নাই, দেখিবার মধ্যে পা দুটি দেখিয়াছিল। অবলা হরিকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে।

গো। অবলা আমার ঘর হতে তেলের বোতলটা আন।

অবলা তেলের বোতল আনিতে ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র— হরি পিছু পিছু ঘরে ঢুকিল। অবলা লজ্জায় জড়িতা হইয়া আস্তে আস্তে বোতল খুঁজিতেছে, হরিদাস অবলার পদাঙ্গুলি হইতে কেশ পর্য্যন্ত স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে বিছানায় বসিয়া বলিল 'অবলা তুমি হেথা এস দেখি, তেলের বোতল ও লয়ে যাবে এখন'।

ভক্তিপরায়ণা দেবতার নিকট যে ভাবে যায়, অবলা সেই রূপে—নিম্ন-দৃষ্টিতে লজ্জার শোভা বিস্তার করিয়া, মৃদু মৃদু

পা ফেলিতে ফেলিতে হরির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। অবলার সমস্ত শরীরের ভিতরে পবিত্রতা ও লজ্জার প্রভা দেখিবামাত্র হরির হৃদয়ে কে বলিল—"লজ্জিত হও—দেবীর অবমাননা করিও না"।

সে স্বর্গীয় ভাবে একটু আক্রান্ত হইয়া হরি ভয়ে ত্রাসে জড়িতস্বরে বলিল 'না তুমি বোতল লয়ে যাও'।

হরিদাসের মনের ভিতরে আবার দেবাসুরের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কাম হরিদাসের মনে, হৃদয়ে, বুদ্ধিতে, সমস্ত প্রবৃত্তিতে একটা গোলযোগ বাধাইয়া বলিল, "হরি! তোর বুকে আমি অবলাকে সম্ভোগ করিতে পাব না? তুই কেন ভয় করিস্? আমা হতে তোর কত সুখ হবে। আমি তৃপ্ত না হ'লে তোকে ছাড়িবনা। তোর মর্ম্মে সূচ ফুটাইব—তোর বুকের ভিতরে সর্প হইয়া দংশন করিব। তোর মাথায় আগুণ হইয়া জ্বলিব। অমন সুন্দরীকে যদি ভোগ করিতে—অমন অধরে যদি অধর দিতে না পারিস তো, তুই বড় হতভাগ্য"।

আবার বিবেক সেই অন্ধকারে একটু আলো বিকীর্ণ করিয়া বলিল, "সাবধান! সাবধান! পাপ করিলেই নরকের আগুণে পুড়াইব। আমার হিতোপদেশ শ্রবণ কর। আমি যা বলি তা ঈশ্বরের বাণী। কথা শুন দেখি—দেখি অমৃত-ভোগ হয় কি না। কামের তৃপ্তিতে সুখ নাই। ওর মিথ্যা প্ররোচন বাক্যে মুগ্ধ হইলে তোমাকে ও বিপদের পর বিপদে ফেলিবে। কাম রাক্ষস অপেক্ষাও ভীষণ। তোমার বক্ষের শোণিত পান না করিলে উহার তৃপ্তি হইবেনা। তোমার কাঁচা হাড় গুলি আগুণে পুড়াইতে পারিলে, তোমার মস্তিষ্কের ভিতরে বিষের

আগুন জ্বালিয়া, তোমাকে পাগল করিতে পারিলেই উহার সুখ। কামের বক্ষে পদাঘাত কর, আমার কথা শুন—অবহেলা করিও না"। গম্ভীর স্বরে হৃদয়ে এই অমৃতময় উপদেশ উপস্থিত হইল। কামান্ধকারে বিবেকের আলো প্রজ্বলিত হইল। হরিদাস একটু লজ্জিত হইল, কামের নিকট হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। হরিদাসের হৃদয় গুর গুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হরিদাস মনে মনে বলিল, 'না—পাপ করিব না'। হরি বিছানায় শুইয়া আছে। অবলা আবার কিসের জন্য ঘরে আসিল। অবলাকে দেখিবামাত্র আবার কাম মাথা তুলিল। হরিকে আবার বিমুগ্ধ করিল। বিবেকের আলো নিবিল। বাহিরে ঘরের পাশাড়ে রসালের ডালে বসিয়া সর্ব্বনেশে কোকিল ডাকিল—'কু'"।

যেন কাম হরিকে মোহিত করিবার জন্য গান গাহিল।

অবলা বাহিরে গেল। কিন্তু স্মৃতির উদ্দীপনায় ঘরে অবলার সবই থাকিল। আবার কোকিল ডাকিল—"কু"।

সেই 'কুহু' স্বর একটা ভীষণ উদ্দীপনা—ভীষণ দাহ লইয়া পাপিষ্ঠের হৃদয় প্রাণ জর্জ্জরীভূত করিল—রক্ত যেন আগুনে জ্বলিয়া উঠিল—পাপিষ্ঠ যেন সে আগুনে পুড়িতে থাকিল।

হরিদাস ইতিপূর্ব্বেই বিবেকের মাথায় পদাঘাত করিয়াছিল, ঈশ্বরপ্রজ্বলিত আলোক কামের ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করিয়াছিল,—এখন লজ্জাবিহীন হইয়া জড়িত স্বরে মাকে ডাকিয়া বলিল, 'মা অবলাকে পাঠায়ে দাও, আমার বড় হাত পা কাম্ড়াচ্ছে টিপে দেবে'।

গোলাপ প্রথমেই হরিদাসকে ভত সকালে বাড়ী আসিতে দেখিয়া বুঝিয়াছিল,—নিশ্চয়ই ঐ হতভাগা,—রাত্রে ঘরে এসে অবলার কাছে শুয়েছিল। হরিদাসকে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য গোলাপ বার বার অবলাকে ঘরে পাঠাইতেছিল। গোলাপ এসব বিষয়ে খুব চতুরা। পা টিপিবার কথা শুনিয়াই গোলাপ আপনি ঘরে গিয়া, ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া, দাঁতে রাগ চাপিয়া বলিল "বলি অবলাকে কেন? আমি পা টিপলে কি হবে না" ?

হ। না না—তুমি কাজ করগে—শীঘ্র দুটি ভাত রাঁধগে।

গোলাপ কিছু উত্তর দিলনা, রাগে ফুলিতে লাগিল। মনে মনে গালি দিয়া বিকৃত মূর্ত্তিতে বাহিরে আসিয়া, অবলাকে ঘরে পাঠাইয়া দিল।

অবলা—সরলা—সে পাপের চক্র জানেনা। আস্তে আস্তে ঘরে গিয়া হরির পায়ের কাছে অবনত মস্তকে দাঁড়াইল। পাপিষ্ঠ ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রের ন্যায় অবলার রূপের প্রতি লোলুপ হইয়া ধীরে ধীরে বলিল "পা টেপ"।

অবলা আস্তে আস্তে পা টিপিতে লাগিল।

ব্যাঘ্র বলিল "হেথা সরে এস;—কেমন ক'রে টিপিতে হয় দেখিয়ে দি'।

এই ফাঁদে ফেলিয়া কত দুর্ব্বৃত্ত কত অবলার নিকলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক আরোপন করিয়াছে। এই জন্য স্ত্রীলোকের পর পুরুষের কাছে দাঁড়ান সর্ব্বনাশের কথা।

অবলা সরিয়া গেল। ব্যাঘ্র অমনি শীকারের হাত ধরিল। এই রকমে টিপিতে হয় বলিয়া অবলার হাত টিপিতে লাগিল।

অবলার বড় লজ্জা হইতে লাগিল কিন্তু মন্দ আশঙ্কা কিছু মনে আসিল না।

গোলাপ আড়াল হইতে সব দেখিতেছে। হরি অবলার হাত টিপিতে টিপিতে সেই কোমল করপল্লবের মাধুরী ও কোমলতার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। তারপর পাপিষ্ঠ সর্ব্বনাশ করিল।—পাপিষ্ঠ উন্মাদ হইয়া সরলা বালিকার নিষ্কলঙ্ক হাতে চুম্বন করিল।

সেই সময়ে পাপিষ্ঠ বায়ুতে বিলীন হইল না কেন?

"যাও এইবার পা টেপগে"।—হরির বুক গুর গুর করিয়া কাঁপিল। সরলা বালিকা তখন ভয়ে লজ্জায় কাঁপিতে কাঁপিতে নীরবে কাঁদিয়া ফেলিল।

মনুষ্যকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ভগবান হৃদয়ে এমন এক শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে পাপ করিবা মাত্র সেই শক্তি হৃদয় প্রাণে যাতনার বিষাগ্নি ঢালিয়া দেয়। হরিদাস যেই সেই শক্তির অবমাননা করিয়া স্বর্গের দেবীর হস্তে কলঙ্কের দাগ বসাইল—সে দাগ সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়া হরিদাসের মুখে কালিমা সঞ্চারিত করিল—সে দাগ দেবীর হাতে বসিতে পারিল না। হরি কুকুরের ন্যায় কার্য্য করিবা মাত্র হৃদয়ের অন্তস্থলকে ভয়ে কে বিকম্পিত করিয়া দিল,—হরিদাস আজ নরকের দ্বারদেশে পদার্পণ করিবা মাত্র কি এক ভয়ানক অশ্রু-পূরিত ভীতির হস্তে পড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নীরবে বিছানায় শুইয়া থাকিল। অবলা ভয়ে, লজ্জায়, ঘৃণায় কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরের বাহিরে এক পা এক পা করিয়া যাইতেছে এমন সময়ে গোলাপ

ঘরে আসিয়া অবলার হাত ধরিয়া বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল। বলিল 'তুই যা; আমি সব বুঝেছি; আমি পা টিপছি'।

হরি ভয়ানক রাগিয়া উঠিয়াছে। গোলাপ ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র কম্পিতস্বরে বলিল 'তুমি যে বড় গিন্নি হয়ে পড়েছ দেখছি—আমার উপর কর্ত্তাত্তি'।

গোলাপ চক্ষু রাঙ্গাইয়া দন্তে দন্ত টীপিয়া ভ্রূকুটি-
বলিল "বোঝা গেছে সব বোঝা গেছে"।

হ। কি? কি? কি?

গো। হাতে চুমু খাওয়া।

কথাটার ভিতর দিয়া হরির প্রকৃতিতে যেন

হরি এখনও তত পাপিষ্ঠ হয় নাই।

হরি চমকিত ভাবে-আপন হৃৎকম্প চাপা দিং
"কি? কি? কি?

গো। মুখপোড়া! ছেলে মানুষ যদি এনেছিস...
কি?

হ। কি? কি? কি?

হরিদাসের গোলাপের উপর বড় রাগ।

গো। অবলা না হ'লে পা টেপা হয় না;—অবলা যেন ও'র মাগ।

হ। কি? কি? কি? খুব লোক তো তুমি।

বলিতে বলিতে হরিদাস বিছানায় উঠিয়া বসিল।

গো। যাকে ব'লছি রোস। আর দেখি কেমন অবলা তোর কাছে আসে।

হ। মুখ সাম্‌নে কথা কবি।

বলিয়াই পাপিষ্ঠ গোলাপকে ঘুঁসি দেখাইল।

গো। কেন—মাগ তো আর মরেনি।

হরি মহা গোলযোগে পড়িয়া রাগে কি বকিতে বকিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

বন্ধনাদি শেষ হইল। হরি আহার করিয়া ঘরে শুইয়া এক

ন। বৈকাল হইয়াছে। গোলাপ হরির ঘরে বসিয়া

তেছে। আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে মধুর কর-

র স্ফীত বক্ষদেশ আন্দোলিত হইতেছে—হরি

ধুরান্দোলন অবলোকন করিতেছে।

াড়ীর বাহিরে এক দ্বারবান আসিয়া ডাকিল—

।" 'কেও' বলিয়া হরিবাবু বাহিরে গিয়া

াহেবের নিকট হইতে দ্বারবান আসিয়াছে।

।ম থাকা হইল না, দ্বারবানের সঙ্গে সঙ্গে কলি-

াইতে হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হরিদাস কলিকাতা যাইবার দুই ঘণ্টা পরে, সন্ধ্যার কিয়ৎ-ক্ষণ পূর্ব্বে, ঘোষেদের বাড়ীর সেই যুবা পুরুষটী হরির বাটিতে আসিল। এ সময়ে যুবার কলেজ বন্ধ—গ্রীষ্মাবকাশ। হরি বাটিতে থাকিলে যুবা দুই একবার আসিত। হরি না থাকিলে দিবা রাত্রি কেন যে থাকিত ঠিক্ বলা যায় না। বোধ হয় গোলাপের সহিত কিছু সম্বন্ধ ছিল,—তাই।

যুবার নাম রামচন্দ্র। রামচন্দ্র খুব সুন্দর পুরুষ। কলি-কাতায় অনেক স্ত্রীর মাথা খাইয়াছে। কিন্ত এক কথা বলিয়া রাখি, গোলাপই রামচন্দ্রের মাথা খায়। গোলাপের বাপের পার্শ্বস্থ বাড়ীটি রামচন্দ্রের মামার বাড়ী। রামচন্দ্র মামার বাড়ীতে গোলাপকে দেখিয়াছিল—গোলাপের বিবাহের পূর্ব্বে। বিবাহের পূর্ব্বেই—গোলাপ রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিত। পরে বিবাহ হইল—গোলাপ যৌবনে ফুটিতে লাগিল। রামচন্দ্রের গোঁপে রেখা দিল। গোলাপের পূর্ব্বে কোন কুভাব থাকে নাই, তবে বাপের বাড়ীতে অন্যান্য স্ত্রীলোক-দিগের সহিত বসিয়া রামচন্দ্রের নিকট নানা প্রকার গল্প শুনিত। গল্প শুনিতে শুনিতে গোলাপ রামচন্দ্রকে হৃদয় বিক্রয় করে। রামচন্দ্রও গোলাপের নয়নবাণে আপনাকে পরাস্ত স্বীকার করে। মেয়ে ছেলের বিবাহ ছেলে বেলায় দিলে এ সব আপদের ভয় থাকে না।

এখন রামচন্দ্র আসিবামাত্র গোলাপ বসিবার আসন বাহির করিয়া দিল। রামচন্দ্র বসিয়া গোলাপের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। গোলাপ একটি পান আনিয়া রামচন্দ্রের হাতে দিবামাত্র রামচন্দ্র গোলাপের হাতে চিমটি কাটিল। গোলাপ নয়ন ভঙ্গিতে রামকে বিদ্ধ করিয়া একটু দূরে গিয়া বসিল অবলাও গোলাপের কাছে বসিল। শ্যামা রান্না ঘরে কি কাজ করিতেছিল। শ্যামা বদ্ধ কালা।

গো। এই মেয়েটি কে জান?

রা। হরি বাবু এনেছেন যাকে সেইতো?

গো। কেমন মুখ দেখেছ?

রা। না—তোমার চেয়ে আর ভাল হবে না। দেখিনা—দেখি।

অবলা লজ্জায় মুখটি অবনত করিয়া রহিল। 'অত লজ্জা কেন' বলিয়া গোলাপ মুখ তুলিয়া রামচন্দ্রকে দেখাইল। রামচন্দ্র সেই রুচি লাবণ্য-পূর্ণ-ঢলঢলে পবিত্রতা রচিত মুখ দেখিল।

রামচন্দ্র সে অতুল মুখ দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। যেন অন্ধকারে হঠাৎ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ চক্ মক্ করিল। এ যেন শীতল বিদ্যুৎ। দেখিবামাত্র রামচন্দ্রের মনে হু হু করিয়া পবিত্রতার বড় বহিল—রামচন্দ্র যেন পৃথিবীর চারিদিকে স্বর্গের শোভা প্রকাশিত দেখিল। স্বর্গের আলো যেন সেই বালিকা—সেই আলোকে আপনাকে যেন বিবের কৃমির ন্যায় দেখিল—আর সেই গোলাপকে যেন ভয়ঙ্করা রাক্ষসী বলিয়া বোধ হইল। রামচন্দ্র ইংরাজিতে পড়িয়াছিল Behold

the lillies of the field. এখন সে ভাবটি মনে কত ভাবের উদয় করিয়া দিল। দেখ্ দেখ্ কেমন সতীমূর্ত্তি—বিধাতার মধুর সৃষ্টি কেমন দেখ্—আর কি পাপ করা যায়—আর কি মনে পাপ থাকিতে পারে?

কি ক্ষণে কি লগ্নে, কি দেখিয়া, কার মন কিরূপ হয়, কে বলিতে পারে? বালিকার সৌন্দর্য্যে কোমলতা ও পবিত্রতার দীপ্তি রামের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছিল—নহিলে এরূপ হবে কেন? রমণীর রূপে যদি সতীত্বের রূপ ফোটে, তো, সেরূপ দেখিলে, মানুষের সুপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। স্বভাব-স্রোতে পড়িয়া রামচন্দ্র ভাবিতেছে, "অবলা কে? কেন আমি পাপ করি? অবলা আমার ছোট ভগ্নি—সহোদরা"। ভাবিতে ভাবিতে রামের হৃদয়ের কোমলতা অশ্রুধারায় পরিণত হইল। রামের সেখানে বসিতে ভয় হইল। গোলাপ যেন রাক্ষসী—যেন বাঘিনী। রাম ভাবে অভিভূত হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। রাম বাড়ীতে গিয়া মাকে বিস্মিত ভাবে বলিল, "মা—বামুনদের বাড়ীতে যে মেয়েটী এসেছে দেখেছ'?

মা। আহা মরি! যেন দুর্গা প্রতিমা।

রা। মা তুমি তাকে আমাদের বাড়ীতে এনে রাখ।

মা। আহা কেউ নেইরে—হরি কুড়িয়ে পেয়েছিল—ডাকাতে নাকি ফেলে রেখে গেছলো।

রা। মা—সেটি তোমার মেয়ে—তুমি তাকে মেয়ের মত দেখ্বে—তাকে ওখানে রাখা হবেনা—ওদের বাড়ী বড় খারাপ।

মা। বাড়ীতে ওদের ভূতের দৌরাত্ম—সেদিন রাত্রে নাকি

অবলার কাছে কে এক মিন্‌সের মত শুয়েছিল—তার পর যে কোথায় গেল দেখ্‌তে পায় নাই।

রা। আমাদের বাড়ীতে তুমি এনে রাখ। ওখানে থাকা ভাল নয়।

মা। বামুনের মেয়ে হয়েই যে গোল হয়েছে।

রা। তা না হয় একজন বামনী রেখে দেব। ওটি তোমার মেয়ে।

মা। তা কাল সকালে এখানে ডেকে আনবো।

রা। ওকে মেয়ের মত যত্ন করবে। যেমন আমি তেমনি অবলা। এটি তোমায় কর্ত্তেই হবে।

হরিদের বাড়ীটি কেমন তা জানতো?



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অবলা একটি মেয়েলোক সঙ্গে লইয়া নিজ গ্রামে যাত্রা করিল। স্বামীর চিত্র আনিবার জন্য, সেই চিত্রে আপনার জীবন সংস্থাপিত করিয়া, ভবসংসারে সুখী হইবার জন্য অবলা চলিয়াছে। গ্রাম পার হইয়া মাঠে, আবার গ্রামে, আবার মাঠে এইরূপ গ্রামের পর মাঠ, মাঠের পর গ্রাম, পার হইতে হইতে হাসিভরা মুখে অবলা চলিয়াছে,—আবার যদি সমুদয় আশা বিফল হয়, এই ভাবনায় কাঁদিতে কাঁদিতেও চলিয়াছে। যাইতে যাইতে বেলা হইল, একটি গ্রামে একখানি দোকান পাইল। মেয়ে লোকটি বলিল 'বেলা হয়েছে কিছু খাও না" ?

অবলার মন ছবিখানির জন্য—জন্মভূমি দেখিবার জন্য—নিজের বাড়ীতে পদার্পণ করিবার জন্য, আনন্দে—দুঃখে উন্মত্ত। দুঃখ এই যে মা নাই, বাপ নাই, কেহ নাই, সুখ এই যে ছবিখানি পাইব—স্বামীর মূর্ত্তি দেখিব—সেই ছবি দেখিয়া আবার ছবি আঁকিব,—আবার দুঃখ এই, যদি ছবি না পাই। এই প্রকারে কত কি ভাবিতে ভাবিতে—কখন মৃদু হাসি হাসিতে হাসিতে—কখন শোকে দুঃখে অশ্রু মুছিতে মুছিতে চলিয়াছে।

মেয়েলোকটির বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল বুঝিতে পারিয়া, অবলা বলিল, "আমি খাব না, তুমি খাও"—

"পয়সা দাও"

"এই নাও"

"তা আরও দুটি দাওনা—তুমিও খাও। ছেলে মানুষ, এখনও কতদূর, অসুখ করবে যে"।

"না আমি খাবন।"

অতি কাতর স্বরে অবলা এই কথা বলিল।

মেয়ে লোকটি খাবার কিনিয়া খাইল।

সে অবলাকে খাওয়াইবার জন্ত অনেক জেদ করিল, অবলা কিছুই খাইল না—কথার উত্তর দিল না—কি ভাবিতে ভাবিতে একটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলিল।

মে। আর কতদূর?

অ। এই মাঠ পার। মাঠে যেতে ভয় করে।

মে। কেন গা?

অ। এই মাঠেই আমাকে ডাকাতে ফেলেছিল।

কথাটি শুনিয়াই মেয়ে লোকটি ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, বলিল, "ও বাবা! না বাছা—তবে আমি ফিরে যাই"।।

অ। ডাকাত কি আর দিনের বেলা আছে।

এমন সময়ে সেইখানে এক বুড়ি বাঁশ বনে কাঠ ভাঙ্গিতে ছিল। বুড়িকে দেখিয়া, মেয়ে লোকটি ডাকিবামাত্র বুড়ি কাঠের ঝুড়ি কোমরে করিয়া আস্তে আস্তে সেইখানে আসিল।

মে। হাঁগা ঐ মাঠ পার হয়ে যাব, কোন ভয় নেই তো?

বু। ওরে বাবারে—দুপুর বেলা—খবরদার খবরদার।

মে। দেখলে অবলা! তুমি ছেলে মানুষ; দেখ দেখি

অজানা দেশে লোকের অনুরোধে প'ড়ে এলাম। না বাছা আমি যেতে পারবো না।

বু। না না তোমরা যেওনা—মাঠে লেটেরার বড় ভয়—কাল নাকি কাকে মেরে ফেলেছে; বাবারে। যেও না—যেও না।

মে। না—মা আমি তো মেরে ফেল্লেও যাব না। ও যায় যাক্।

বু। তোমরা কোথা যাবে বাছা।

মে। সেনপুর।

বু। যে গাঁয়ে ওলাউঠায় সব মরে গেছে, ওমা। সে গাঁয়ে যে বড় ভয়।

মেয়ে লোকটীকে সে সব কথা কেহ বলে নাই; সে জানিত অবলা বাপের বাড়ী যাবে, সেখানে মানুষ আছে—বড় টন্ন হবে। এ সব শুনিয়া তার "আক্কেল গুড়ুম" হইল। সে অবলার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'হ্যাগা। তাকি আমায় বলতে নেই আগে; কোন্ শালি তাহলে আসতো। না বাছা। আমি যেতে পারবো না—ভূতের পুরীতে নে গে মারবে—অ্যাতদে আর কাযনি, ভালমানুষের মেয়েদের একাজ বটে।

গ্রীষ্মে রৌদ্র প্রখর হইয়াছে। মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, ধূসর রৌদ্র যেন হন্ হন্ করিয়া ছুটিতেছে। অবলা অবশেষে একলা যাইতেই প্রস্তুত হইল। মেয়ে লোকটিকে বলিল "আচ্ছা—তুই ওই দোকানে ব'সগে আমি একলাই যাই'।

'তাই যাও মা তাই যাও। আমি কাছেই থাকলাম—তার আর ভয় কি'? বলিয়া মেয়ে লোকটি দোকানে গিয়া বসিল।

অবলা মাঠ পার হইতে লাগিল। দুই ঘণ্টার পরে নিজ গ্রামের নিকট গেল। গ্রামের নিকট শ্মশান দেখিল। শ্মশানে গিয়া একবার দাঁড়াইল। বাপকে যেখানে পুড়াইয়াছিল; সেই চুল্লীর দিকে চাহিয়া কাঁদিল—কাঁদিতে কাঁদিতে থমকিয়া বসিল। দেখিল চুল্লীর পর চুল্লী। আধপোড়া বাঁশ, কয়লা, কলসী, সরা, মড়ার মাথা, হাড়, সব গড়াগড়ি যাইতেছে। কোন চুল্লী কয়লাপূর্ণ, তাহাতে আধপোড়া বাঁশ—উপরে একটী সরা ঢাকা কলসী।—কোন চুল্লীতে কেবল কয়লা, কলসী নাই—সরা নাই। কোনটার কাছে একটি কলসী উল্টিয়া পড়িয়া আছে। কোন চুল্লীর চারিদিকে লম্বা লম্বা ঘাস উঠিয়াছে—তাহার মধ্যে কাঁটা গাছ জন্মিয়াছে। কোনটির কাছে বা একটি শিমুল গাছের চারা মাথা তুলিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে অবলা শ্মশান পার হইয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল। দুইধারে বাঁশবন, বনের মধ্য দিয়া রাস্তা। রাস্তার কোনখানে মাদুর, কোনখানে বালিস, কোনখানে মড়ার মাথা।

খানিক দূরে গিয়া দেখিল, মেটে ঘরগুলির প্রাচীরে ঘাস জন্মিয়াছে—বাড়ির দ্বার খোলা,—ভিতর উপর ঘাসে পূর্ণ। কোটা বাড়িগুলির কোনটির ভিতরে একটি কুকুর কোনটির ভিতর শৃগাল শুইয়া আছে।

অবলা রাস্তার ধারে সেই প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ তলায় সেই ষষ্ঠী ঠাকুরাণী দেখিল। ঠাকুরুণের ললাটের সিন্দুরের প্রভা নাই। ঠাকুরুণের চারিদিক অশ্বত্থ পাতায় পূর্ণ হইয়াছে। আগে পূজার কলা দুই একটি পড়িয়া থাকিত—সে

সব কিছুই নাই। দেখিল সেই ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর সম্মুখেই শৃগাল কুকুরে মলত্যাগ করিয়াছে।—ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর নিকটে অবলা দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল;—সেইখানে কত বার আসিয়াছে—কতবার ছোট চুবড়ি করিয়া খইকলা লইয়া সহচরী দিগের সহিত সাধ মিটাইয়া খাইয়াছে। সেই ঠাকুরের তলায় বন-:ভোজন হইত। সেই তলায় কত খেলা খেলিত; সেই দেবীকে কতবার প্রণাম করিয়াছে—মা বাপ দাদার জীবনের জন্ত কতবার প্রার্থনা করিয়াছে। এই সব ভাবিতে ভাবিতে অবলা কাঁদিতে লাগিল। গ্রাম নিস্তব্ধ—শ্মশান তুল্য। সেই গাছের উপরে একটি কাক ডাকিতেছে—কা—কা—কা। একটি শকুনী মাথা তুলিয়া বসিয়া আছে। অদূরে দুটি ঘুঘু মাথা নাড়িতে নাড়িতে ঘুরিতেছে।

অবলা মনের দুঃখে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাড়ির দিকে যাইল বাড়ির দ্বার সম্মুখে। দ্বার খোলা। দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবলা দুঃখ-পীড়িত প্রাণে অশ্রু-ভরা নয়নে বাপের বাড়ী—বাপের ভিটা দেখিল। অবলা দেখিল দ্বার-দেশ গাছের পাতায় ভরিয়াছে—দ্বারের কপাটে উঁই ধরিয়াছে—দুদিকের কপাট অবলম্বনে মাকড়সা জাল বুনিয়া দ্বারের মাঝখানে প্রহরীর ন্তায় বসিয়া আছে। অবলা দেখিল বাড়ির ভিতর জঞ্জালে পূর্ণ—তৃণে আচ্ছন্ন। কাঁঠাল গাছ যেমন তেমনি আছে কেবল একটি শালিক বাসা বানাইয়াছে—শালিক বাসায় বসিয়া ডিমে তা দিতেছে। দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া অবলা পাগলিনীর মত বাড়ির ভিতরে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া থাকিল।

সেই সব কথা—কত বৎসরের কথা—সুখের কথা—দুঃখের কথা—যাহা কখন ভাবে নাই সেই সব কথা কত প্রকারে শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে, অবলার মনে আসিতে লাগিল। অবলার দুচক্ষু লাল—অশ্রুজলে যেন বন্যায় ভাসিয়েছে। ধীরে ধীরে মাকড়সার জাল ছিন্ন করিয়া বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিল—বালিকা কান্না ঘরের দিকে চাহিয়া মৃতপ্রায় হইল। অবলা রোয়াকে বসিল। শোকে ডুবিয়া, কখন নীরবে কখন সরবে কাঁদিতে লাগিল। "মাগো কোথায় গেলি গো," বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নির্জ্জন গ্রামে অনেক দিনের পরে লোকের অশ্রুজল পড়িল। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, পথ, ঘাট, আকাশ, সরোবর, সেই শোকের কান্না যেন একমনে শুনিতে লাগিল। আম গাছের তলায় রাশি রাশি আম, কাঁঠাল গাছের তলায় কয়েকটা কাঁঠাল পড়িয়া আছে। অবলা ঘরের দেয়ালের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল, অমনি যেন যাদুতে পড়িয়া অবলার ভিতরে আর এক নূতন অবলার প্রকাশ হইল। অবলা আপনার হাতে আলতা দিয়া স্বামীর ছবি দেখিয়া ছবি আঁকিয়াছিল—সেই সব ছবি দেয়ালে এখনও বিলীন হয় নাই। দেখিবা-মাত্র অবলার প্রকৃতি কাঁপিয়া প্রথমতঃ কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল—শোক দুঃখ প্রবলতম হইয়া উঠিল—তারপরই সে সব একে একে—কোথায় লুকাইয়া পড়িল। বর্ষার আকাশে চাঁদ উঠিল—আকাশের মেঘ কাটিল,—চাঁদ পৃথিবীকে জ্যোৎস্নায় পরিপূর্ণ করিল। অবলা প্রেমোন্মাদিনী হইয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। শয্যার উপরে সেই—"ছবি"—অবলার প্রেমাকাশের পূর্ণিমা। সেই ছবির উপরে মাটি, ময়লা

আরশোলা পড়িয়াছে—অবলা পাগলিনীর ন্যায় ছবি অধিকার করিবার জন্য, একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য জয় করিবার জন্য বেগে ধাবিতা হইল। ছবির কাছে গিয়াই অবলা থামিল—অবলার বুক গুর গুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—অবলার স্বামীর আজ মহা বিপদ! সেই ছবির পাশে এক প্রকাণ্ড সর্প শুইয়াছিল—এখন নড়িয়া উঠিল। অবলা কাঁপিতে কাঁপিতে সেই ছবির দিকে চাহিয়া আকুল প্রাণে কাঁদিতে থাকিল। কাঁদিতে কাঁদিতে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে সাপের কাছে গিয়া সাপকে প্রণাম করিল। তারপর হস্ত প্রসারিত করিয়া ছবি ধরিল—সাপ একবার ফণা তুলিয়া অবলার দিকে চাহিল—বোধ হয় অবলার সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে শোকের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া, সাপের দয়া হইল—সাপ অমনি ফণা নত করিয়া চলিয়া গেল। অবলা আনন্দিত প্রাণে হৃদয়াকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ধরিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। তখন সেই শোকপূর্ণ গ্রাম, শোকপূর্ণ প্রকৃতি অবলার আনন্দে ভরিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মানুষ যখন দুঃখে পড়ে, তখন সে দুঃখে পরিণত হয়, তখন তাহাতে সব দুঃখের লক্ষণ প্রকাশিত হয়; তখন তার চাহনি দুঃখের চাহনি; তার স্বর দুঃখের স্বর; তার ভাব ভঙ্গি সবই দুঃখের। আবার যখন আনন্দে পড়ে তখন আবার তাই। অবলা যখন প্রেমের হুকুমে, ভীষণ সর্পকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার হারাণ সাম্রাজ্য—সেই "ছবি" খানি অধিকার করিয়াছিল; তখন অবলার প্রকৃতিকে কাঁপাইয়া, মুখে চখে প্রেমের রাঙা রঙ ফুটাইয়া, উপর্য্যুপরি কয়েকটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িয়াছিল। অবলা তখন আপনাকে নূতন ভাবে নূতন উদ্দীপনায় পরিণত করিয়াছিল। সে মুহুর্ত্তের উপর দিয়া জগতে যে একটা প্রেমের তুফান ছুটিয়াছিল, রূপের ঢেউ উঠিয়াছিল, তাহাতে মহা প্রকৃতির বুকে অমৃত-স্পর্শ-জনিত রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। সেই মুহুর্ত্তের পর অবলা আপনাকে ছবিতে হারাইয়া ফেলিল। ছবিময়ী অবলা ছবিখানি বুকে ধরিয়া রোমাঞ্চে বসিল। সেই শ্মশানতুল্য গ্রাম তখন প্রেমিকার কাছে স্বর্গবৎ প্রতীয়মান হইল। অবলা ছবি দেখিতে দেখিতে সে ছবিতে যেন আপনাকে মিশাইবার জন্য একদৃষ্টে ছবির অনন্ত সৌন্দর্য্যতলে ডুবিতে থাকিল।

গ্রাম জনশূন্য; নীরবতায় গঠিত; ভীষণতায় রক্ষিত। এমন স্থলে আহরায়া প্রকৃতিতে প্রেমের তুফান উঠিল।

অবলা রোয়াকে বসিয়া ছবিখানি কোলে রাখিল। ছবি দেখিতে দেখিতে ভাবিল যেন প্রকৃতই স্বামীর সঙ্গে আছে। সেই ছবি যেন বস্তুতঃ রক্ত-মাংস-গঠিত। অবলা ছবি দেখিতে দেখিতে হর্ষোৎফুল্ল মনে আপনাকে ভুলিয়া প্রেমভরে কাঁপিতে কাঁপিতে সে স্বামীর মুখে একটী চুম্বন করিল—সেই চুম্বনের সঙ্গে যেন আপনাকে সেই মূর্ত্তিতে বিসর্জ্জন করিল। তখন অবলা কাঁদিয়া ফেলিল। তখন কত কোমল ভাব অবলার প্রাণে আসিয়া জমিল, কত আশা, কত আবদার, কত আকিঞ্চন, অবলার প্রাণে বল দিতে লাগিল। অবলার সুখের অশ্রুবিন্দু ছবির উপরে পড়িল। অবলা আঁচলে মুছে; আবার কাঁদে—আবার ছবির উপরে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়। অবলার মহাসুখের সময়ে, একটা বিষাদের ছায়া তাহার সুখের ছবিতে পতিত হইল। অবলার মা সেই ছবি কত যত্নে রাখিয়াছিল, আজ অবলার মা নাই। মার কথা ভাবিবা মাত্র অবলার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। অবলা দুঃখের স্মৃতিতে বিভোর হইল।

সম্মুখে ছবি, পশ্চাতে অবলার দুঃখ-পূর্ণ পূর্ব্বজীবন, একত্রে মিলিয়া বালিকার কোমল প্রাণে চাপ দিতে লাগিল। অবলা তাহাতে অভিভূতা হইল। শোকাভিভূতা বালিকা অশ্রুভরা নয়নে আকাশের দিকে তাকাইল—সেই আকাশ ও গাছপালা সকলের অতীত স্থলে কি এক দেশ আছে; সেই দেশে অবলার মা বাপ ভাই সব যেন স্নেহ-পূর্ণ স্বরে রোদন করিতেছে অবলার কান্না শুনিয়া তাহারা আকাশের ভিতরে যেন গোপনে নীরবে কাঁদিতেছে। অবলা ভাবে অভিভূত হইতে হইতে

যেন তাহাদের কান্না শুনিতে পাইল। অস্ফুট ভাবে প্রাণের নীরবতার অন্তরালে অবলার মা, অবলার মত প্রাণ ফাটাইয়া কাঁদিতেছে; আর চারিদিকের আকাশে, চারিদিকের গাছ পালায় যেন সেই কান্নার সুর জড়ান রহিয়াছে। সেই জড়ীভূত ক্রন্দনের সুর যেন ক্রমশঃ ঘনীভূত হইল; অবলার মার স্নেহ যেন মাতৃরূপে অবলাকে স্পর্শ করিল; অবলার সম্মুখে যেন অবলার মা আসিয়া দাঁড়াইল। অবলা প্রাণে তাহা বুঝিল; হৃদয়ে স্পর্শ করিল; চোখে দেখিল না।

অবলা সেইভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে অভিভূতা হইল। মুখে আর কথা সরে না; গলার ভিতর টন্ টন্ করিতেছে; কপালের ভিতর যাতনার ঘায় ঘায় হইয়াছে; বুকখানা ফাটিয়া যাইতেছে। কিয়ৎক্ষণ সে সব সহ্য করিয়া অবলা অর্দ্ধস্ফুট শোকস্বরে ডাকিল; "মা"! অমনি সেই মাতৃস্নেহপূর্ণ আকাশে কে যেন ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল, "কেন মা"। তখনি অবলার শোক দুঃখ বিক্ষোভিত প্রাণের ভিতরে কে যেন উত্তর করিল, "কেন মা"! আবার পল্লাবলীর মাতৃস্নেহভরা সৌন্দর্য্যের ভিতর হইতে কে উত্তর দিল "কেন মা"! সেই প্রত্যুত্তরের ভিতর হইতে একটা স্নেহ-ধারা অবলার প্রকৃতিকে স্পর্শ করিল; অবলা তাহাতে নীরব থাকিল; অবলার চক্ষু ভাবভরে মুদিয়া আসিল; প্রাণ মোহস্পর্শে অশান্ত হইল; অবলা মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে বালের শুশ্রূষায় অবলার জ্ঞানসঞ্চার হইল। অবলা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। একটা চমক অবলার মন প্রাণকে জড়াইয়াছিল; সেই চমকের যেন একটা কাল ছায়া প্রকৃতিতে ছড়ান ছিল। সেই চমকে অভিভূতা হইয়া

দিশেহারার মত অবলা স্পষ্ট শুনিল; কে যেন বাটীর বাহির হইতে তার নাম ধরিয়া স্নেহস্বরে ডাকিল, "অবলা"!

শুনিবামাত্র অবলা চমকিয়া উঠিল—অবলার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল—অবলা উঠিয়া সেই দিকে ধাবিতা হইল—সেই শব্দ অবলার মার মত। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীর বাহিরে গেল। মহাভয় মহাবিপদ সম্ভাবনা থাকিলেও মরা মাকে দেখিতে কার প্রাণের সাধ উথলিয়া না উঠে!

অবলা বাটির বাহিরে গেল। সেখানে কাহাকেও দেখিলনা কথা শুনিবার জন্ত কান পাতিয়া থাকিল—প্রাণ পাতিয়া থাকিল—

আবার কে ডাকিল "অবলা"! অবলা পাগলিনীর মত সেই দিকে ধাবিতা হইল। কিন্তু কাহাকেও দেখিল না—কিছুই শুনিলনা। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবাবেশে গ্রামের মধ্যে এদিক ওদিক বিচরণ করিতে লাগিল। একবার বড় পুকুরের ধারে গেল। সে পুকুরের বাঁধা ঘাটে গিয়া—ঘাটের দুর্দ্দশা দেখিয়া অবলা কাঁদিল। ঘাট ধাসে ভরিয়াছে, স্থানে স্থানে আগাছা জন্মিয়াছে; পুকুরের জল সেহলায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। অবলা ঘাটে বসিয়া পুকুরের চারিদিকে একবার নয়ন ভরিয়া দেখিল; তারপর যখন ভাব গাঢ় হইল তখন চক্ষু বুদিয়া অবনত মুখে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কাঁদিতে কাঁদিতে আস্তে আস্তে সে স্থান, সে গ্রাম পরিত্যাগ করিল। গ্রাম ছাড়িয়া মাঠে পড়িল; মাঠে গিয়া পিছনে ফিরিয়া শ্যামল বৃক্ষলতাপূর্ণ জন্মভূমির দিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল। মাঠে কিয়দ্দূর গিয়া আবার সেই শ্মশানে উপস্থিত

হইল। শ্মশানে পিতৃ চুল্লীরধারে বসিল। কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুর অন্তরালে পিতৃ চুল্লিপানে নিরীক্ষণ করিয়া পিতৃশোকে অবলা অস্থির হইল। চুল্লীর কাছে জড়বত্বার গিয়া করযোড়ে বলিল, "বাবা! তোমার অবলা—তোমার আদরের মেয়ে, আজ তোমার জনমের মত প্রণাম করি-তেছে"।

অবলা গভীর ভক্তির সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে পিতৃচুল্লীকে—পিতার সেই শ্মশান শয্যাকে প্রণাম করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, কালের আকর্ষণে অনিচ্ছায় সেই স্থান পরিত্যাগ করিল।

অবলা ছবি খানিকে বুকে ধরিয়া শ্মশানের উপর দিয়া ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ একটা মড়ার কাঁটা অবলার পায়ে ফুটিল। অবলা টের পায় নাই। অবলার দুর্ভাগ্য।



ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অবলা দুঃখের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যখন মাঠ অতিক্রম করিতেছিল, তখন গাছপালায় একটু একটু সোনালী রঙের রৌদ্র ছিল। অবলা যখন মাঠ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব গ্রামের নিকট পঁহুছিল, তখন ধরা-পৃষ্ঠ হইতে রৌদ্র মুছিয়া গিয়াছে; শৃগাল সকল গভীর স্বরে প্রকৃতিকে তোলপাড় করিতেছে; ঝিঁঝিঁ চিঙ্গড়া বাজখাঁইস্বরে পাঁচালী আরম্ভ করিয়াছে, পাখী সকল গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছে।

মেয়ে লোকটি অবলাকে বিদায় করিয়া দিয়া, পথের ধারে এক দোকানীর দাওয়ায় গিয়া বসিল। বসিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে একটা সম্পর্ক বাহির করিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিল। দোকানী বাধ্য হইয়া একটা ছেঁড়া মাদুর বসিতে দিল। মাগী মাদুরে বসিয়া গল্প করিতে করিতে শুইয়া এক ঘুম ঘুমাইল। তারপর সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া, অবলার জন্য একটু ভাবিত হইয়া ধীরে ধীরে মাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মাঠের অনেক দূর পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিল—কাহা-কেও দেখিতে পাইলনা। খানিক পরে দেখিল—কে একজন নীক্ নীক্ করিতেছে—ক্রমশঃ একটু স্পষ্ট—তারপর একটি বালিকার মত—তারপর অবলার মত—তারপর অবলা। বুড়ির বড় আনন্দ। অবলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিগো! কাঁদু কাঁদু

কেন?" অবলা কোন উত্তর দিলনা, মুখ হেঁট করিয়া থাকিল।

বুড়ি আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি আন্‌তে গেছলে পাওনি বুঝি? তাই মনটা খারাপ"। অবলা বলিল, "পেয়েছি—এখন শীঘ্র শীঘ্র চল। রাত্ত হবে"।

বু। বলি কি জিনিস গা? টাকা কড়ি বুঝি। তা আমায় দু আনা স্যেরানা দিও। আমি এতক্ষণ তোমার জন্য ছট্ কট্ করছি মা—আমার কি মনে স্বস্তি আছে—মনে করেছিনু একটু ঘুমাব—ঘুম কি হয় মা! তা—কি গয়না পত্র আন্‌লে আমায় দেখাতে আর দোষ কি মা!

অবলা পেট-কাপড় হইতে "ছবি" দেখাইল।

বু। ওমা। ঐ একখানা ছবির জন্য কি ভূতের পুরীতে গেছলে। আমার সঙ্গে ন্যাকামো কর কেন মা। আমি কি কেড়ে লব। আমায় তেমন ভেবনা মা! গরীব দুঃখী বটে, কখনও কা'রো এক কড়ার দিকে চেয়ে দেখিনি। রামের মা আমায় জানে।

অবলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "বুড়ি। টাকা কি গহনা এই দেখ কোথায়।" বলিয়া বুড়িকে কাপড় ঝাড়িয়া দেখাইল।

বুড়ি তখন গালে হাত দিয়া বলিল, 'ওমা! তা ওই ছবি খানার জন্য তোমার এত হাঙ্গামা। ওতো বাজারে অনেক বিক্রি হয়।

অবলা কিছু বলিল না। ব্যস্ততার সহিত পথ চলিতে লাগিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অবলা রাত্রি ৯টার সময়, মেয়ে লোকটির সঙ্গে, হরিদাসের বাটিতে পঁহুছিল। পথে মেয়ে লোকটি যে অবলাকে একলা ছাড়িয়া গিয়া দোকানে ছিল, সে কথা অবলা কাহাকেও বলিল না। অনেক কষ্টে স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি পাইয়াছে ইহাতে যে কত আনন্দ, কত শান্তি তাহা কি বর্ণনা করা যায়। রাত্রে আহার করিয়া গোলাপের কাছে শয়ন করিলে গোলাপ বলিল, "ভাই কি ছবি দেখি ?"

অবলা ছবি দেখাইল।

"এ্যাঃ—এই ছবি—এর জন্ত এত—ও বাবা আমার ওসব ছবি পসন্দ হয় না—আরে দূর দূর—ছবি খানা ফেলে দে"।

কথাটা শুনিয়া অবলার বড় ক্লেশ হইল—মনের কষ্টে বলিল, "সব ছবির চেয়ে আমার এই খানাই ভাল লাগে"।

গো। আচ্ছা সে আসুক্। খুব সরেস ছবি একখানা আন্‌তে ব'লবো। দেখি সে দেখে, তুই এখানা ছুড়ে ফেলে দিস্ কি না। ওর সাহেবের ঘরে নাকি একশত টাকা দামের এক খানা ছবি আছে, সেখানা একবার আন্‌তে ব'লবো।

অবলা আপনার ছবি খানির গোড়ামির জন্ত রাগিয়া বলিল সে আমি ছুড়ে ফেলে দেব—এর চেয়ে ভাল ছবি আর নাই।

গো। এ কার চেহারা বল দেখি ? এযে ফটোগ্রাফের মত!

অ। যাঁরই চেহারা হ'ক না।

গো। ব'লবিনা? আমি এতক্ষণে বুঝেছি—হো হো হো বুঝেছি—তোর ডাক্তারের চেহারা বুঝি।" অবলা লজ্জাভিভূতা হইল—চোখ দুটী ছল ছল করিতে লাগিল—সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়া উঠিল।

গো। তা লজ্জা কি? ওমা! ডাক্তারের চেহারা খানা আনবার জন্ম এত কাণ্ড! এক রত্তি ছুঁড়ী বাবা! লজ্জায় যে মরে যেতে হয়! আমাদের ডাক্তারকে তো গ্রাহ্যই করি না। যা হ'ক ভাই তুই বড় বেহায়া। দেখি দেখি কেমন চেহারা তোর ডাক্তারের।

বলিয়া চেহারা খানি প্রদীপের নিকট ধরিয়া দেখিতে লাগিল।

অবলা আনন্দের সহিত বলিল 'দেখ দেখি ভাল ক'রে দেখ দেখি,; এমন কি কখন দেখেছ—সত্য কথা বল ভাই'—

গোলাপ নাক সিটকাইয়া বলিল 'আ রাম আ রাম— ওমা ওই চেহারা অত ভাল—ওযে গুলিখোরের চেহারা'।

অবলা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল—ইচ্ছা গোলাপকে কেহ আসিয়া কাটিয়া ফেলে। অবলা এমন একদিনও রাগে নাই। রাগের উপরে অবলা দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল। অবলা ছবি খানি লইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। অবলা ভাবিতেছে আর এ বাড়িতে থাকিব না—এই রাত্রেই চলিয়া যাইব'।

ছবি খানির নিন্দা শুনিয়া অবলা একটি অস্থিভেদী যাতনায় ছট ফট করিতেছিল। যাতনায় পড়িয়া কত কি ভাবিতেছে

এমন সময়ে অবলার পা কট্ কট্ করিয়া উঠিল। পায়ে যন্ত্রণার সঞ্চার একটু পূর্ব্বেই হইয়াছিল, ছবি দেখিতে দেখিতে অবলা জানিতে পারে নাই। এখন পাটি ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ করিতে লাগিল।

গোলাপ বাহিরে আসিয়া বলিল, ওমা! মাথায়ট্টি ক'রে নে বেড়াবি দেখছি যে।

অবলার রাগ তাল পাতার আগুণের মত ধূ ধূ করিয়া জলিয়াই নিবিয়া গিয়াছে। অবলা আর কিছু না বলিয়া কেবল বলিল, ভাই! কিছু মনে করিসনে, আমার পা কন্ কন্ ক'রছে বড়।

গো। কেন বল দেখি?

অ। কি জানি বাসকা।

"রো'স মাকে ডাকি," বলিয়াই গোলাপ শাশুড়ির ঘরের দ্বারে ধাক্কা মারিতে লাগিল। শাশুড়ি শুনিতে পাইয়া বলিল "কে গো!"

গো। আমি—একবার বেরিয়ে এস।

শা। কেন?

গো। অবলার পায়ে কি হয়েছে।

শ্যামা বাহিরে আসিল। আসিয়া অবলার পা দেখিয়া বলিল, "পায়ে কি ফুটেছে, তা সকাল হ'ক, ভাল করে দেখা যাবে. এখন সব শুগে যা।"

শ্যামা ঘরে খিল দিয়া শুইয়া ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িল। অবলা গোলাপের সঙ্গে ঘরে গিয়া শয়ন করিল। গোলাপ ঘুমাইয়া পড়িল। অবলার ঘুম হইতেছে না, যন্ত্রণায় কাঁদিতে লাগিল।

রামচন্দ্র অবলার কান্না শুনিতে পাইয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিল। কান খাড়া করিয়া, এক মনে শুনিতে লাগিল, কান্না লক্ষ্য করিয়া হরিদাসের বাটির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বাটির দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল, "দরজা খোল দরজা খোল," গোলাপ অমনি আসিয়া দ্বার খুলিয়াই দেখিল তার সখের সামগ্রী রামচন্দ্র। চারিদিকে চাঁদের আলো, দুপুর রাত্রি; মাঝে মাঝে কোকিল ডাকিতেছে; শাশুড়ি মড়ার মত ঘুমাইতেছে; অবলা নিজের যন্ত্রণায় অস্থির; স্বামী কলিকাতায় প্রা'য় নিশ্চয়; এইসব সুবিধায় কুলটা স্ত্রী প্রাণের রামচন্দ্রকে দেখিয়া কামাসক্ত হইল। মস্তকের কাপড় আপনি খুলিয়া পড়িল ক্রমে বক্ষ হইতে কাপড় নামিয়া ভূতলে পড়িল, গোলাপ সেই অর্দ্ধ উলঙ্গাবস্থায় কামোন্মত্ত শরীরে রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিবা মাত্র রামচন্দ্র রাক্ষসীকে দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিল, খবরদার তোমার স্বামী আসুক সব বলিয়া দেব।"

গোলাপ আবার আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে দেখিয়া রামচন্দ্র দূরে চলিয়া গেল। গোলাপ আর কিছু না বলিয়া, অভিমানে রাগিতে রাগিতে অবলার কাছে গিয়া বসিল। অবলা বড় কাঁদিতেছে।

রামচন্দ্র ঘরে ফিরিয়া যাইতেছিল কিন্তু অবলার কাতরতা শুনিয়া আবার ফিরিল। ফিরিয়া দেখিল হরির বাড়ির দ্বার খোলা। বাড়িতে প্রবেশ করিয়া গোলাপের দ্বারে আঘাত করিল। গোলাপ দ্বার খুলিয়া, বাহিরে একটু দূরে গিয়া ভূমে শুইয়া পড়িল। গোলাপ ভাবিল, রামচন্দ্র অভিমান ভাঙ্গিবার জন্য আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। রামচন্দ্র গোলাপকে

অগ্রসর করিয়া অবলার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ঘরে মিট মিট করিয়া প্রদীপ জলিতেছে। প্রদীপ উস্কাইয়া দিয়া রাম বাহিরে আসিয়া হরির মাকে ডাকিতে লাগিল। গোলাপ রামকে বাহিরে দেখিয়া, রামের কাছে আসিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "বলি! অবলাকে পেয়ে আজ আমায় তাচ্ছল্য করলে।" রামচন্দ্র ক্রুদ্ধস্বরে, "আলাতন ক'রনা—সরে যাও," বলিয়া হরির মার ঘরের দ্বারের কাছে গিয়া হরির মাকে ডাকিল, কিন্তু কেহ সাড়া দিল না। রাম আবার অবলার ঘরে গিয়া একটু করুণস্বরে বলিল, 'কেন দিদি কাঁদছ কেন? কি হয়েছে আমায় বল? তুমি আমার ছোট ভগিনী—আমি তোমার বড় ভাই।' বলিয়া রাম কাঁদিয়া ফেলিল। কান্না সম্বরণ করিয়া আবার বলিল, "কেন বোন কাঁদছ কেন?" এই করুণ কথা শুনিয়া অবলা সতীশকে মনে ভাবিল। সতীশ যে দিন মরিয়াছে—সে দিন হইতে আর কেহ এরূপ ভাবে অবলাকে ডাকে নাই।

অবলা চাহিল—দেখিয়া চিনিতে পারিল—সেই যে আমার মুখ দেখিয়াছিল। দেখিয়াই অবলা লজ্জায় মুখ অবনত করিল, মাথায় কাপড় দিল।

রাম আবার বলিল, "তুমি আমার ভগিনী সহোদরা আমি তোমার বড় ভাই, আমার কাছে দিদি তোমার কিসের লজ্জা।

অবলা একটু চক্ষু চাহিয়া দেখিল অশ্রু বিসর্জন করিতেছে। দেখিয়া অবলা উঠিয়া বসিল। রাম অনেক কষ্টে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া বলিল, দিদি আর তোমার ভয় নাই" কি হয়েছে আমাকে বল?

অবলা অবনত মুখে বলিল, "দাদা"। এই বলিয়া অবলা কাঁদিতে লাগিল। অবলা অনেক দিন কাহাকেও "দাদা" বলে নাই। সতীশ অবলাকে কত আদরের সহিত "বোন" বলিয়া ডাকিত। আজ এই যাতনার সময়, কে সেই মধুর স্নেহপূর্ণ স্বরে ডাকিয়া বালিকার প্রাণ স্নেহে মাতাইয়া দিল। অবলা নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল।

রামের হৃদয়ে সেই কাতর স্বর যেন বিষাক্ত তীরের ন্যায় —প্রচণ্ড সংহারক বজ্রের ন্যায় আঘাত করিল। ভাবাবেশে রামের দু চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। রাম অশ্রুপূর্ণ লোচনে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল জননী। তখন রামের চক্ষু ভাসাইয়া অশ্রুধারা বহিল, দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত রাম মাকে বলিল মা। অবলাকে আমাদের বাড়িতে কাল লয়ে যা'ব। অবলা চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে ঠিক তার মায়ের মত কে রামের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। তখন অবলার মায়েব শোক অধিকতর বর্দ্ধিত হইল, স্থির নয়নে সেই রামের জননীকে দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে কাঁদিতে থাকিল। ·ার বি"

রাম ধীরে ধীরে বলিল মা, তোর মেয়ের কাছে ব'স।

রামের মা বলিল 'এদের গিন্নিই কোথা আর বউই কোথায়। অমনি গোলাপ আসিয়া বলিল, ঠাকুরপো এলো ব'লে আমি বাহিরে গিয়ে ব'সে ছিনু।

রামের মা অঞ্চল দিয়া অবলার অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে "আমি তোমার মা, আর ওই আমার ছেলে তোমার দাদা! তুমি কাল আমাদের বাড়ি গিয়ে থাকবে। তোমার কিছু ভয় নাই আমার যেমন রাম তেমনি তুমি। কেঁদনা, লক্ষ্মীমা আমার

কেঁদন:—তোমার কি হয়েছে মা কি হয়েছে।

অ। আমার, পা বড় কন্ কন্ ক'রছে।

'পায়ে কি ফুটেছে,—বোস—আমি একটা ঔষধ আনছি, বলিয়া রামের মা বামা, বাহিরে গোলাপকে সঙ্গে লইয়া যাইল। কিসের পাতা আনিয়া তার রস পায়ে লাগাইয়া দেওয়ার পর যাতনা কমিল। অবলা ঘুমাইতে লাগিল।

রামের মা, অবলাকে ঘুমাইতে দেখিয়া, রামকে বলিল, চল আমরা ঘরে যাই, আর ভয় নাই—ওলো বউ, তুই ঘরে এসে শো।" রাম বলিল, 'না মা—আমি আমাদের বাড়িতে চাবি দিয়ে আসি, তুমি থাক, আজ আর ঘুমান হবে না।

রাম বাটিতে চাবি দিয়া আসিলে রামের মা বলিল, বউ তুই অবলার কাছে শুগে যা। আমরা মায়ে পোয়ে বাহিরে শুইগে, একটা মাদুর আর বালিস দে।

গোলাপ একটা মাদুর আর বালিস দিল। রাম মার সঙ্গে শুইয়া পড়িল। জীবনেরাইয়া পড়িল, রামের ঘুম হইল না। পর দিবস "আর নয়" কাঁটাটা আপনি পা হইতে বাহির হইল। অবলা সুস্থ হইল। রামের মা ঘরে চলিয়া গেল। রামও কিছুক্ষণ পরে ঘরে গেল। ঘরে গিয়া রাম মাকে বলিল 'মা তুমি অবলাকে ল'য়ে এস। 'মা বলিল, হরিকে না ব'লে কি আনা ভাল দেখায়। হরি আসুক তাকে ব'লে আনা যাবে। তাহলে ওরাও বাঁচে—এদের খরচ ক'মে যাবে'।

রাম তাহাতেই স্বীকৃত হইল। কালই রামের কলেজ খুলিবে; রাম আর থাকিতে পারে না। পরদিন কাপড়

চোপড় পরিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিবার কালে 'মাকে বলিল 'মা তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্য কর যে অবলাকে তুমি মেয়ের মত ভাববে, আর হরি এলেই ব'লে আমাদের বাড়িতে আনবে'।

মা ছেলের মাথায় হাত দিয়া তিন বার দিব্য করিল। রাম কাপড় চোপড় পরিয়া ব্যাগ হাতে করিয়া অবলার সহিত দেখা করিতে গেল।

বাড়িতে যাইবামাত্র অবলা দাদাকে বসিতে আসন দিল। রাম বলিল, "না দিদি—আমি আর ব'সবো না আমি আজ চ'ললাম; তুমি রোজ আমাদের বাড়িতে মার কাছে যাবে, যখন যা দরকার হবে, মার কাছে চাবে—তোমার কিছু ভাবনা নাই—আর আমার মাকে মা ব'লে ডা'কবে'।

অবলা ধীরে ধীরে বলিল 'দাদা কবে আবার আসবে গা'।

রাম বলিল 'আমি রবিবারে আসবো'। বলিয়া রাম বিষণ্ণ মনে কলিকাতায় যাত্রা করিল।

এর

এে আসিতেছিল,

'বার বি—

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

আষাঢ় মাস, শনিবার, বিকাল বেলা, খুব বৃষ্টি হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর আকাশে একটু একটু ছেঁড়া মেঘ রহিল। তাহা ক্রমশঃ পরিষ্কার হইল। নীল আকাশে তারা ফুটিল। কিয়ৎক্ষণ পরে চাঁদ উঠিয়া আষাঢ়ের আকাশে সোণার লাবণ্য প্রকাশ করিল। গাছের পাতায় পাতায়, ঘাসের ডগায় ডগায়, জলের ফোঁটায় ফোঁটায় যেন হীরা জ্বলিতে লাগিল। পৃথিবী-পৃষ্ঠে চন্দ্রকরের একটা আশ্চর্য্য শোভায় প্রত্যেক [illegible] ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল! আকাশে মেঘের ভিত [illegible] য়া যেন ছাঁকিয়া পড়িতে লাগিল। ভূতলে [illegible] ডাক্তার অ[illegible] উইচিংড়া প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য গীতি গাইল। জীবনের অ[illegible] নিশাচর পশু ঘাসের উপরে পদশব্দে [illegible] "আর নয়—[illegible]রিতেছে। আকাশে বাদুড়েরা উড়িয়া [illegible]ড়িতে ল'রে যান।" [illegible] শ্মশানের নিকটস্থ বড় রাস্তায় এক [illegible] হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল [illegible]রিতেছে।

[illegible] মাথায় চাদর [illegible] ফেলিল। বাম [illegible] হাতে সাদা ব্যাগ। বাম বগলে একটা ছাতা। বাঁম হাতে এক জোড়া জুতা লইয়া পায় কাপড় হাঁটুর উপরে তুলিয়া, ভদ্র লোক গ্রামের দিকে যাইতে যাইতে থামিল। পথের উপরে ব্যাগ, ছাতি, জুতা রাখিয়া কিঞ্চিৎ শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইল। শ্মশানে উঠিয়া চকিতভাবে দাঁড়াইল। আবার দ্রুতবেগে ধাবিত

হইল। যুবা দেখিল চুল্লি সাজান।—তাহার উপরে মৃতদেহ! একি! যুবা অবাক হইল। প্রস্তর মূর্ত্তির ম ঃ ড়াইয়া একটী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল। তারপর চমকিত ভাবে সেই দিকে ছুটিল। গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে যুবার আপাদ মস্তক কম্পিত হইল—বুকে রক্ত যেন জমিয়া গেল। যুবা কাঁপিতে কাঁপিতে চুল্লির নিকটে দাঁড়াইল—দাঁড়াইয়া সমস্ত জগতকে আহুতি দিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল—হৃদয় ফাটিবার মত হইল। যুবা একদৃষ্টে সেই শবের সুন্দর মুখে, সেই মৃতের মর্ম্মভেদী জীবন চরিত পাঠ করিতে করিতে, গভীর শোক-বেগ ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া, সেই খানে বসিয়া পড়িল। অধোমুখে থাকিয়া মর্ম্মগত যাতনাকে চাপিতে চাপিতে যে একটা প্রলয়ের স্রোতে ভাসিতে থাকিল। তারপর ব' ' নক কষ্টে মুখ তুলিল। শবের আরও কাছে স[রিয়া] আ'ার মৃতের মৃত হাত খানি একবার আপনার অশ্রু[সিক্ত ?]। বক্ষে ধারণ করিল—সে অশ্রুজল উত্তপ্ত— ...ে আসিতেছিল, শীতল—প্রাণহীন। যুবা আবার সেই মৃত ...ার বি... উপরে রাখিয়া তাহাতে মৃত্যুকে ... পড়িল। শোকে কাঁদিতে কাঁদি[তে] ...লিল "হা ভগবান"! যুব... ...ক্ষা-পূর্ণ আকাশ ফাড়িয়া একবার বিধাতাকে দেখিবার জন্য—বিধাতার নিকট হইতে আপনার ভগিনীকে কাড়িয়া আনিবার জন্য উন্মত্ত হইল কিন্তু তাহাতে প্রাণ ক্লান্ত হইয়া আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিল; চোখের উপরে সেই মৃত হস্ত স্পর্শ করিয়া, অশ্রুজলে তাহাকে ধৌত করিতে করিতে অধোমুখে যুবা—"হা অবলা" বলিয়া

কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব থাকিল। তখন সমস্ত প্রকৃতি যেন শোকের ঘন আবরণে আচ্ছন্ন হইল। যুবা জগতের অসাড়-তায় ডুবিয়া থাকিল। তারপর ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিয়া, এক প্রাণে সেই মৃতদেহের পানে তাকাইতে তাকাইতে, মৃতহস্ত খানি আপনার বুকে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "অবলা"! বোন আমার। তোমার কপালে এই ছিল!

তারপর আকাশের দিকে চাহিয়া "ভগবান! আর কেন? আকাশের চন্দ্রতারা সব মুছিয়া ফেল! অবলার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সৃষ্টি লীলার অবসান হওয়াই ভাল। অবলা যেখানে আমিও সেখানে যাই"। যুবা শোকে বড় অধীর হইল। যুবা ভাবিল, যখন অ পাওয়লার এমন দশা, তখন আর এজীবনের প্রয়োজন কি বলিল "দুষ্ট ভাবিতে আপনার ব্যাগের ভিতর হইতে কি অ' ভ হইল। ব্যাগ খুলিল। একখানা ছুরি বাহিরঃ ডাক্তার অই ছুরির সাহায্যে অবলার পথানুসরণ করিতে গেল। জীবনের অ। সবার জীবন অবলম্বন শূন্য—আশা শূন্য। এলিল "আর নয়—মূর্ত্তি কল্পনায় দেখিল—অমনি যেন চমকিয়াপড়িতে ল'য়ে যান।" উচ্চই লাবণ্যময়ী অবলার সে দশা দেখিয়া হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল না! যুবা ভাবিল "সোণার পুড়িয়া এক দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। রাম আখ্য, কিছু অধিক ,— "তাই আমি কোলে ক'রে লয়ে যাই"। দিল-

কথাটা শুনিয়া, সেই শ্মশানস্থ হরিদাসের ভিতরে খল সর্পটা ফোঁস করিয়া উঠিল। হরিদাস শ্মশানে মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার দেখিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; এবং জানিনা কেন, তেমন দুঃখের সময়েও রামের উপর মনে মনে

ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ছুরিখানি লইয়া শবের নিকট বসিল। বসিয়া অবলাকে নয়ন ভরিয়া জন্মের মত দেখিতে দেখিতে বলিল "ভগিনি। তোমার দাদা তোমার নিকট চলিল" বলিয়া ছুরিখানি গলায় দিতে যাইবে, এমন সময়ে রাম দেখিল অবলার কাউটী নড়িতেছে। তখন রাম ছুরিখানি ভূতলে রাখিয়া একদৃষ্টে অবলাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিল। রাম অবলার নাড়ি ধরিয়া দেখিল, নাড়ি একটু একটু চলিতেছে।

রামের একটু আশা হইল—আপনার বুকটি গুর গুর করিয়া কাঁপিল, একটি দীর্ঘশ্বাস প'ড়ল। জ.

ক্রমে নাকের কাছে হাত দিয়া দে' ' একটু একটু নিশ্বাস বহিতেছে—বুকে হাত দি'র ব' ' 'ল, মৃদু মৃদু নড়িতেছে। ৎব আ্যার জ

এমন সময়ে বড় রাস্তা দিয়া এ' াসবে' । বা হিমপল্লা হিমপল্লা শব্দ করিতে করিতে যাট' 'ৎে আসিতেছিল, ' ডাক্তা- রের পালকি মনে করিয়া সেইদিকে ' ার কি— রা বলিল "পালকি থামাও থামাও"। সহিত রাম' পালকি থামাইতে ে রার উদ্রেক হইল।. ুদা— ——— ,।ংখা-পূর্ণ আকাশ তাকিয়া একবার বিধাতাকে দেখিবার জন্য—বিধাতার নিকট হইতে আপনার ভগিনীকে কাড়িয়া আনিবার জন্ম উন্মত্ত হইল কিন্তু তাহাতে প্রাণ ক্লান্ত হইয়া আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিল; চোখের উপরে সেই মৃত হস্ত স্পর্শ করিয়া, অশ্রুজলে তাহাকে ধৌত করিতে করিতে অধোমুখে বুলা--"হা অবলা" বলিয়া

রা। আমার একটি ভগিনী শ্মশানে আছে একবার দেখবেন চলুন। আমার আজ বড় বিপদ।

ডা। মারা গেছে আর কি দেখব?

রা। মরে নাই—একটু একটু নড়ছে—আপনি রক্ষা করুন, আপনার পায়ে ধরি"। বলিয়া রাম ডাক্তারের পা ধরিতে উদ্যত। ডাক্তার বলিল 'পায়ে ধরবেন না—চলুন—চলুন—কোথায় মড়া চলুন'।

রামচন্দ্র ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া মড়ার নিকট উপস্থিত হইল। ডাক্তার বলিল 'অ নি কি একলা মড়া এনেছেন নাকি?

রাম কাঁপিতেয়া কঁপিতে বলিল, আপনি এখন দেখুন, পরে সব কথা ব'লবস পাওয়

ডাক্তার বলিল "দূর—বলিল 'ভয় নাই—চিকিৎসা ক'রলে বাঁচতে পারে পালকি হ'তে আমার ঔষধের বাক্সটি আনতে বঃ ডাক্তার অনিয়েই ছুটিয়া গিয়া পালকি হইতে ঔষধের নল। জীবনের অ।

ডাক্তলিল "আর নয়—এ বুকে মালিস করিতে বলিল। মালিসোড়িতে ক'রে যান।" ডা.চক্ষ চাকিয়া আবার মুদিল।

র্ত্ত হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল।হতে আপনি কোলে র্যেয়া এক দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। রাম আখ..

"তাই আমি কোলে ক'রে লয়ে যাই"। -আল

কথাটা শুনিয়া, সেই শ্মশানস্থ হরিদাসের ভিতরে খল সর্পটা ফোঁস করিয়া উঠিল। হরি দাস শ্মশানে মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার দেখিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; এবং জানিনা কেন, তেমন দুঃখের সময়েও রামের উপর মনে মনে

করুণার অমৃত সঞ্চারে বিগলিত প্রাণ হইয়া যুবার হৃদয়ে আপনার হৃদয় মিশাইল।

রাম ডাক্তারের ব্যবস্থানুসারে অবলার বুকে মালিশ করিতে লাগিল। মালিস করিতে করিতে রাম অবলার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া ডাক্তার আর্দ্রস্বরে বলিল "কাঁদ্‌বেন না! ভাল হবে"।

রাম ছুরিখানি অমনি একহাতে ধরিয়া ডাক্তারের দিকে পাগলের ন্যায় তাকাইয়া বলিল "আর যদি ভাল না হয়, এই ছুরি এই গলায় দেব"।

ডাক্তার সমস্ত রহস্য বিশেষরূপে জানি[illegible] জন্য ব্যগ্র ছিল কিন্তু এ অবস্থায় চুপ করিয়া থাকিল। [illegible]

অবলা আবার চক্ষু চাহিল। চাহি[illegible] করিয়া কি বলিল। [illegible]

ডাক্তার বলিল 'ভয় নাই, [illegible]সবে'।

রাম আবার কাঁদিল। [illegible]

অবলা বিড় বিড় করিয়া কি [illegible] র দিকে একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া [illegible] মুদিল। রাম অবলাকে চক্ষু [illegible] স্বরে কাঁদিতে লাগিল। [illegible]-পূর্ণ আকাশ অবলা[illegible] একবার বিধাতাকে দেখিবার জন্য—বিধাতার নিকট হইতে আপনার ভগিনীকে কাড়িয়া আনিবার জন্য উন্মত্ত হইল কিন্তু তাহাতে প্রাণ ক্লান্ত হইয়া আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিল; চোখের উপরে সেই মৃত হস্ত স্পর্শ করিয়া, অশ্রুজলে তাহাকে ধৌত করিতে করিতে অধোমুখে যুবা—"হা অবলা" বলিয়া

আসিয়া জড় হইয়াছে, এমন সময়ে রাস্তা হইতে একজন যুবা পুরুষ, "শ্মশানে কিসের গোল হে," বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইল। রাম চাহিয়া দেখিল হরিদাস। হরিদাসকে দেখিয়া রামচন্দ্র চকিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল ;—ব্যাপারটা কি ?

হ। ব্যারাম হয়েছিল, তারপর ম'রে গেছে ভেবে আমরা পাঁচ জন সৎকার ক'রতে এনেছিলাম।—তার পর শ্মরে চ'ড়রে দেখি না নড়ছে, তাই "দানব পেয়েছে" ভেবে ভয়ে দৌড়ে সব পালিয়ে গেলাম।

একজন বেহারা অমনি বলিল "ডাক্তার মশাই! আপনি চলুন! এ দান পাওয়া মড়া,—মেরে ক্যাদাবে পালাই চলুন।

ডাক্তার বলিল "দূর ব্যাটা, চুপ কর, তোদের দান পেয়েছে"।

তারপর ডাক্তার অবলার হাত দেখিয়া বুঝিল, নাড়ির অবস্থা ভাল। জীবনের আশা আছে। ডাক্তার তখন করুণ ভাষায় বলিল "আর নয়—রোগীকে এখানে রাখা আর ভাল নয়—বাড়িতে ল'য়ে যান।" ডাক্তারের এই কথা শুনিবামাত্র রামের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। রাম আশায় বিহ্বল হইয়া এক দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। রাম আশ্বাসিত প্রাণে বলিল "তাই আমি কোলে ক'রে লয়ে যাই"।

কথাটা শুনিয়া, সেই শ্মশানস্থ হরিদাসের ভিতরে খল সর্পটা ফোঁস করিয়া উঠিল। হরিদাস শ্মশানে মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার দেখিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ; এবং জানিনা কেন, যেমন দুঃখের সময়েও রামের উপর মনে মনে

চটিয়েছিল! রাম অবলাকে কোলে করিয়া আপন বাটিতে লইয়া যাইতে চাহে, শুনিবামাত্র হরিদাসের রক্তস্রোত উষ্ণতর হইল—নিশ্বাস গরম হইল—হুঙ্কার দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল। হরিদাস রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিল "রামচন্দ্র! উড়ে এসে জুড়ে বসেছ নাকি? কে তুমি? বলি কে তুমি যে অবলাকে ঘরে ল'য়ে যেতে চাও? আমার অবলাকে আমায় দাও—আমি মানুষ, পশু নহি। অবলার সেবা শুশ্রূষা করিতে তুমি কে? পাপিষ্ঠ!" বলিয়াই হরিদাস রাগে ফুলিতে ফুলিতে রামকে মারিতে উদ্যত। বেগতিক দেখিয়া ডাক্তার হরিদাসের হাত ধরিল। হাত ধরিয়া ডাক্তার বলিল "এমন সময়ে রাগারাগি কি ভাল। আপনাদের মধ্যে যিনি হন একজন আমার পালকি ক'রে রোগীকে ঘরে ল'য়ে যান।"

রামচন্দ্র বিপদে ধৈর্য্য ধরিয়া নম্রস্বরে বলিল, "হরি বাবু! রাগ করছেন কেন? অবলার বড় দুরদৃষ্ট! এখন আপনি আপনার বাড়িতে ল'য়ে যেতে চান ভালই। চলুন আমিও সঙ্গে যাই।"

তখন রামচন্দ্র ও হরিদাস ধরাধরি করিয়া অবলাকে ডাক্তারের পালকিতে শায়িতা করিল। বেহারারা পালকি ঘাড়ে করিয়া তুলিল। গ্রামের দিকে চলিল। ডাক্তার সেই মাঠের রাস্তার উপরে পাইচারি করিতে থাকিলেন।

বেহারারা যখন পালকি ঘাড়ে করিয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল তখন রামচন্দ্র ভাবিল, হরিদাসের বাড়িতে পাঠানটা ভাল নয়! ওখানে সেবা শুশ্রূষা আদতে হবেনা।" একরূপে ভাবিতে ভাবিতে রামচন্দ্র পালকির পিছনে পিছনে যাইতেছিল। পালকি যখন রামের বাড়ির সম্মুখে আসিল, তখন অবলাকে অপরের

বাড়িতে পাঠান রামের পক্ষে বড় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল— রাম কাতর প্রাণে হরিদাসকে বলিল "হরি বাবু! আপনার বাড়িও যা, আমার বাড়িও তা। কাছে এসেছে যখন আমার বাড়িতেই চলুক"। হরিদাস কথার কোন উত্তর দিল না; চুপ করিয়া রাগে ফুলিতে থাকিল। হরিদাসের মৌন সম্মতি লক্ষণ, ভাবিয়া রাম বেহারাদিগকে বলিল" পালকি এই বাড়িতে ল'য়ে আয়"। কথা শুনিবা—মাত্র হরিদাসের রাগ বাক্যে প্রকাশিত হইল, উড়ে এসে জুড়ে বসেছ নয়? একদিন আমি মানুষ করিলাম আর আজ তুমি একটু বুকে মালিস্ ক'রে কিনে ব'সলে নয়? সুন্দরী দেখে পাগল হয়েছ বটে।— পাপিষ্ঠ"! হরিদাসের শেষ কথাটা শুনিবা-মাত্র রামের শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহ উষ্ণতর হইল, রাম ক্রোধে ফুলিতে লাগিল, হাতে ঘুসি বাগাইয়া বলিল "হরিদাস বাবু! মুখ সামলে কথা কবেন। অবলা আমার ভগিনী"।

হরিদাস রামের কথায় কোন উত্তর না দিয়া বেহারাদিগকে বলিল "পালকি বরাবর আমার সঙ্গে ল'য়ে আয়"। বলিয়াই হরিদাস দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। কিন্তু পিছনদিকে চাহিয়া দেখিল, বেহারারা রামের বাড়ির সম্মুখে পালকি লইয়া দাঁড়াইয়াছে। হরি থমকিয়া দাঁড়াইল। বেহারারা পালকি ঘাড়ে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। "কি বক্মারি! কি দায়!! এত সের ঘটাতেও আমাদের ডাক্তার বাবু পারেন। এত জানলে কোন্ সালারা আসতো।" বেহারাদের মধ্যে কেহ এই কথা বলিল। তাহারা রামকে ভাল করিয়া জানিত; সুতরাং রামের বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল। দেখিয়া হরিদাস বেহারা-

দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "পালকি ও বাড়িতে ল'য়ে গেলে এই লাথিতে পালকি ভাঙ্গিয়া ফেলিব"। বলিতে বলিতে হরিদাসকে উন্মত্তের ন্যায় অগ্রসর দেখিয়া, রাম ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল "আচ্ছা তোরা উঁহই বাড়িতে পালকি ল'য়ে যা"। বেহারারা তাহাই করিল। রাম সেইখানে দাঁড়াইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে পালকির দিকে যতক্ষণ পারিল চাহিয়া থাকিল। রাম সেইখানে দাঁড়াইয়া অবলার দুরবস্থার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কিয়ৎক্ষণ কাঁদিল। তারপর বাটির ভিতরে ক্ষিপ্ত প্রায়ে চলিয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

হরির সঙ্গে অবলাকে বিদায় দিয়া অবধি, রামচন্দ্রের প্রাণে মহাক্লেশ। বাটিতে গিয়া নিদ্রিতা জননীকে উঠাইয়া বিষাদিত প্রাণে সমুদয় খুলিয়া বলিল। রাত্রে জননী অনেক অনুরোধ করিলেও রাম কিছু খাইলনা। চুপ করিয়া আপনার শুইবার ঘরে গিয়া খিল দিল। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতে ছিল। রামচন্দ্র প্রদীপের আলোকে দাঁড়াইয়া, হৃদয়ের যাতনার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। ক্রোধের নানা ভাব শরীরের নানাবিধ অঙ্গ ভঙ্গিমায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। কখনও রাগে কখনও প্রতি হিংসায় ফুলিল। হরিদাসকে শাস্তি দিয়া কোন প্রকারে অবলাকে তখনি গিয়া আনিবার জন্য মনে সাহস বল একত্র করিল,—অবলার শারীরিক দুর্ব্বলতা ও দুরদৃষ্টের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মাথায় দুই হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ঘর ভাল লাগিল না,—প্রদীপের আলো ভাল লাগিলনা। রাম প্রদীপ নিবাইল। ঘরের বাহিরে আসিল। ঘরে শীকল দিল। চালের বাতায় একগাছা ছড়ি ছিল, সেই গাছা লইয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে বাটির বাহিরে গেল। তখন বেশ জ্যোৎস্না। রামচন্দ্র জ্যোৎস্নার আলোকে কর্দ্দমিত পথে অবলার জন্য ভাবিতে ভাবিতে পদচারণা করিতে লাগিল! রাম ভাবিল ওদের বাড়ীর অযত্নে অবলার ভাল হবে না। গোলাপ যেরূপ দুষ্টা মুখরা; হরির মা যেরূপ গণ্ডগুলে, তাহাতে অবলার বাঁচা

তায়। ভাবিতে ভাবিতে হরির বাটীর দিকে অগ্রসর হইল। বাটির বারের কাছে দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া কোন কথা শুনিবার প্রয়াস পাইল; কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝিলনা। হরির মার দুএকটা কথা গোলমেলে স্বরে শুনিল, বিশেষ কিছু বুঝিলনা,—তবে হরির মা, অবলাকে আনার জন্ত বড় চটিয়াছে—বাড়ির অমঙ্গলের সম্ভাবনা। এই প্রকার ভাবের একটা বকুনি উচ্চস্বরে হরির উপর বর্ষিত হইতেছে। শুনিতে শুনিতে দুঃখে রামের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল, শোকবেগে প্রাণটা বড় কাতর হইল। রামচন্দ্র নিরুপায়। অবলাকে সে বাড়ি হইতে আনিতে অসমর্থ, তাই, আপনার যাতনায় আপনি অস্থির। রামচন্দ্র সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাটীতে ফিরিল। ঘরের ভিতরে গিয়া অন্ধকারেই আপনার বিছানায় শয়ন করিল। ঘুম আর আসে না। অবলার ভাবনাটা মাথার ভিতরে এমনি যাতনা দিতে লাগিল যে রামের ঘুম আর হয় না।—অনেক রাত্রে অনেক চিন্তার পর একটু সামান্ত নিদ্রা হইল—তাহাও স্বপ্নময়ী—কেবল অবলার দুঃখে পূর্ণা! পর দিন প্রাতে রামচন্দ্র শয্যা হইতে উঠিল। মুখ হাত না ধুইয়া প্রাতঃক্রিয়া না করিয়া শিশুভাবে হরিদাসের বাটীতে যাইল। তখন হরিদাস বাটির বাহিরে দাঁড়াইয়া বাঁধা হুকায় তামাকু খাইতে খাইতে পাইচারি করিতেছিল। একটী যুবা একটি দাঁতন কাটি লইয়া তাহার কাছে বসিয়া দাঁতন করিতে করিতে নানাবিধ মুখভঙ্গি ও রঙ্গকেলি করিতেছিল। হরিদাস রামকে তাহার কাছে আসিতে দেখিয়া ক্রোধিত হইল। হরিদাস চক্ষু অবনত করিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র হরির কাছে গিয়া ধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "অবলা—ভাল আছে তো"? হরি কোন উত্তর দিল না।

রাম আবার জিজ্ঞাসিল "হরি বাবু! রাণের খবর কি? অবলা ভাল তো"? হরি তখন রাগে-ভারি কুঞ্চিত-ভ্রু মুখ খানা তুলিয়া বলিল "অবলা বাঁচুক আর মরুক, তাতে তোমার কি? অবলা যুবতী, তুমি যুবা, এসব কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হয়না"? হরির ক্রোধ ও শ্লেষপূর্ণ কথার তেজে রামের রক্ত গরম হইয়া উঠিল; দাঁতের উপরে দাঁত বসিল; শীরা সকল স্ফীত হইল। সেই ভাবে রামচন্দ্র তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর করিল 'তোমার বাড়ি ভাল নয় সেই জন্ম আমার এত টান'!!

হরি আরও রাগিয়া বলিল "তুমি আমার সীমানা হইতে দূর হও" পাপিষ্ঠ!" রাম ক্রুদ্ধস্বরে বলিল "তুমি থাক, একদিন দেখিব"। বলিয়া ছড়িটা ভূমে ঠুকিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

হরি "তোমার যত ক্ষমতা বুঝা যাবে" বলিয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে বাটির ভিতরে প্রবেশ করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

হরিদাসের বাটিতে গিয়া অবলা আরাম হইল। এক মাসের মধ্যে অবলা বেশ সারিয়া উঠিল। রোগা গায়ে মাংস গজাইল। রূপ দিন দিন ফুটিতে থাকিল। অবলা চৌদ্দ বৎসরে পড়িল। যৌবন তুলি দিয়া অবলার গায়ে রং ফলাইতে লাগিল। প্রকৃতি যে রং চাঁপা ফুলে মাখায়, যৌবন তাহা অবলার গায়ে মাখাইল। প্রকৃতি যে রং গোলাপ ফুলে মাখায়, যৌবন সে রং অবলার ঠোঁটে মাখাইল। প্রকৃতি যে রং মেঘে মাখাইয়া মেঘকে কাল করে—দিনের গায়ে মাখাইয়া দিনকে রাত্রি করে, যৌবন সে রং লইয়া অবলার চুলে মাখাইল, জ্রতে মাখাইল, চোখের পাতায় মাখাইল। প্রকৃতি যে রং মুক্তার গায় মাখায়, যৌবন সে রং অবলার দাঁতে মাখাইল। প্রকৃতি যে রং ভ্রমরের গায় মাখায়, যৌবন তাহা আরও পরিষ্কার করিয়া অবলার চোখের দুই তারায় মাখাইল। যৌবন সমাগমে অবলার বক্ষদেশ ক্রমে ক্রমে ভারি—ঘন উন্নত হইতে লাগিল। নিতম্ব আরও ঘন হইল, আরও গোল হইল। অবলার রূপের ভিতর রূপ ফুটিতে থাকিল।

পাপিষ্ঠ হরিদাস, সে রূপ যখনি দেখিত তখনি রিপু-দংশনে জ্বালাতন হইত,—হরির প্রকৃতি অগ্নিময়ী হইয়া উঠিত; বুকের রক্ত জ্বলিয়া উঠিত। হরির উপাদানে কোন সদ্ভাব আসিত না কু বাসনার ঝড় উঠিত।

হরিদাস কলিকাতায় যাইতে বিলম্ব করিতে থাকিল। আজ যাই, কাল যাই করিয়া মাস অতিবাহিত করিল। তার পর মনিবের কড়া চিঠি পাইয়া চাকুরি যাইবার ভয়ে ত্বরায় কলিকাতায় যাত্রা করিল।

কলিকাতায় যাইয়া হরিদাসের প্রকৃতিতে একটা বিষম বিপর্য্যয় ঘটিল। হরিবাবুর মনে ভ্রমের বড় বৃদ্ধি হইল। হরিবাবু বাসায় গিয়া, বাসায় দাসীকে তার প্রকৃত নামে না ডাকিয়া মাঝে মাঝে 'অবলা' নামে ডাকিতে লাগিল। হরি বাবুর বাসাড়েরা হরি বাবুকে অজস্র ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিল। হরি বাবুর ভ্রম ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। হরি বাবু ভাত খাইবার পর পান খাইতে ভুলেন। কোন দিন আফিসে বিনা চাদরে শুধু জামা গায়েই উপস্থিত হন। আফিসে কাগজে ভুল। আত্মীয়ের নিকট পত্র লেখায় ভুল। হরিবাবু পত্র লিখিয়া নীচে নাম স্বাক্ষর করিতে ভুলেন; কখনও বা পত্র লিখিয়া উপরের ঠীকানা না দিয়া ডাকে দেন; কখনও বা কার্ডের উপরে ঠীকানা মাত্র লিখিয়া অপর পৃষ্ঠা সাদা রাখিয়াই পত্র ডাক বাক্সে ফেলেন। ছাতা ভুলিয়া আসেন; কখনও বা বিনা ছাতায় কোন স্থানে গিয়া আসিবার সময় ছাতা খোঁজেন। পাইখানায় গাড়ু ভুলিয়া আসেন, গঙ্গা স্নানে গিয়া গামছা হারাইয়া ফেলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

হরি বাবুর প্রকৃতিতে আর একটা বিপর্য্যয় ঘটিল। হরি বাবু বড়ই বাবু হইয়াছেন। মাথায় সর্ব্বদা আঁচড়ান—তেড়িটী সর্ব্বদা টাটকা। গোঁপে আতর দেন, পমেটম, অডিকলোন ব্যবহার করেন। ফিন্ ফিনে কাপড় পরেন, আর্শিতে মাঝে

মাকে মুখ দেখেন। হরি বাবুর বন্ধু বান্ধব হরিবাবুকে বিশেষ রূপেই সন্দেহ করিতে লাগিলেন। হরি বাবু কলিকাতায় আসিয়া ১৫।১৬ দিন পরে মনিবের তহবিল ভাঙ্গিল। এক হাজার টাকা হস্তগত করিল। সেই দিনই পোদ্দারের দোকানে গিয়া কয়খানি সোণার গহনা খরিদ করিল। কাপড়ের দোকান হইতে অবলার জন্ত ভাল ভাল কাপড় ক্রয় করিল। গোলাপের জন্ত কিছু কাপড় কেনাও হইল।

পরদিন শনিবার হরিদাস কাপড়-গহনা লইয়া বাড়িতে উপস্থিত হইল। বাড়িতে গিয়া মাকে বলিল—'মা! তোমার বউকে বাপের বাড়ি এখনি পাঠাও আমার শশুরের বড় ব্যারাম। গোলাপকে তৎক্ষণাৎ পালকি করিয়া তার বাপের বাড়ি পাঠান হইল। পাঠাইবার পর হরিদাস মাকে চুপে চুপে ডাকিয়া বলিল, 'মা একটা কথা তোমায় এতদিন বলি নাই, এখন বলি;—বল, গোলমাল ক'রবে না।'

মা। কি?

হ। আমার কটা বে বল দেখি?

মা। সেকিরে! পাগল হলি নাকি! ১টা বিয়ে।

হ। না মা। তুমি তা জান না।

মা। কি বলিস বাপু বুঝতে পারিনা!!

হ। তোমায় ব'লবোনা।

মা। কি বল—আমায় বলবি তার ভয় কি?

হ। ব'লে, যা ব'লবো তাই ক'রবে?

মা। তুই আমার একটী ছেলে, তুই যা ব'লবি তা করবো না? কত তপস্তা ক'রে তোকে পেয়েছি।

হ। আচ্ছা—অবলা তোমার কে বল দেখি?

অবলা ঘরে, ঘুমাইতেছে কিছু জানে না।

মা। আমিও তা ভেবেছিনু—আহা এমন সুন্দর সুধীর বউ কি আর আমার কপালে হবে।

হ। হ্যাঁ মা। আমি বে ক'রে এনেছি।

মার বড় আনন্দ হইল। গোলাপ বড় ছুটা, তাহাকে লইয়া ঘর করা বড় দায়—গোলাপের চরিত্র খারাপ। শাশুড়ি বলিল, 'বাঁচ্‌লাম আর সে আবাগীর মুখ দেখবো না। তা বাবা তুই এতদিন আমায় বলিসনি কেন? পাঁক বাজাই রোস; পাঁচ বাড়ির লোক ডাকি—বরণ করি।'

হরিদাস বলিল, এই না দিব্য ক'রলে কাকেও বলব না—আবার এ কি? যদি বল তো বিষ খেয়ে ম'রবো।

মা। সে কিরে? এমন বউ নিয়ে পাঁচ জনের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ক'রবো না।

হ। সে এখন থাক, ৫।৬ দিন বাদে হবে। তোমার বউ সে দিন রোগথেকে উঠেছে—একটু সুস্থ হ'ক তার পর হবে। আর একটা কথা আছে তোমার এ বউকে কোন কথা ব'ল না। কেবল তোমায় দেখে মাথায় কাপড় দিতে বলবে।

মা। হাঁরে মাথায় কাপড় দেয় না কেন বল দেখি?

হ। আমি বারণ ক'রে দেছিনু। অনেক সহরে অনেক দিন ছিল কিনা। তা এবার আমি মাথায় কাপড় দিতে ব'লে দেব।

হরি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল অবলা অঘোরে ঘুমাইতেছে, অবলার সে শোভা দেখিয়া হরি মনে মনে ভাবিল, যে কাঁদ

কেঁদেছি এ আর এড়াবার যো নাই।' পরে অবলার হাত ধরিয়া টানিবা মাত্র, অবলা দেখিল সামনে হরি; অবলা মহা লজ্জায় জড়িতা হইল। 'মাথায় কাপড় দাও লজ্জা যে নাই' আমরা তোমার শ্বশুরের কুটুম তা কি মা তোমায় বলে নাই।" হরি এই কথা বলিবামাত্র অবলা আরও লজ্জায় জড় সড় হইয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল। হরির মা ঘরে আসিয়া বলিল 'এই তো চাই—বউ মানুষ ঘোমটা না দিলে লোকে নিন্দা করবে যে।'

অবলা কিন্তু সর্ব্বদাই মাথায় কাপড় দিয়া থাকিত তবে ঘোমটা দিত না বটে। অবলা ভাবিল, এরা তবে সত্যিই শ্বশুরের কুটুম;—ভাবিয়া বড় লজ্জিতা হইল।

অবলা দুর্ভাগ্যবশতঃই হউক, আর অধিক লজ্জার দরুণই হউক, সে দিন হইতে ঘোমটায় মুখ ঢাকিতে লাগিল। ইহাতে হরির একটী অসুবিধা এই যে অবলার সে মুখ আর দেখিতে পায় না, সে কবরীর শোভা দেখিয়া উন্মত্ত হইতে আর পারে না। যাহা হউক হরি ভাবিল, আজ রাত্রে মা নিজে এখন আমার কাছে শুইয়ে দেবাবে। এই আশায় পুলকে পড়িয়া হরি কখন মাথায় পমেটম মাখিতেছে, কখন গোঁপে আতর লাগাইতেছে, কখন রুমালে ঘাম মুছিতেছে, কখন দর্পণে মুখ দেখিতেছে—কখন গুণ গুণ স্বরে গান গাহিতেছে—কখন আপনি বিছানাটী ঝাড়িতেছে, তাহাতে ফুল সাজাইতেছে—কখন ফুলের মালা গাঁথিয়া গলায় পরিয়া অবলার কাছে পাইচারি করিতেছে।

অবলা ঘুম হইতে উঠিয়া সোনাপকে দেখিতে পাইল না।

গোলাপ কোথা গেল এই ভাবিতে লাগিল। শ্যামার সহিত আর কথা কহিতে লজ্জা হইতেছে।

সন্ধ্যা আগত প্রায়। হরিদাস মাকে ডাকিয়া বলিল 'মা দেখে যাও কি এনেছি।' বলিয়া গহনাগুলি দেখাইয়া বলিল "এগুলি সব পরিয়ে দাও।"

শ্যামা বলিল 'আহা যেমন বউ তেমনি গহনা'। অবলা শুনিতে পাইল।

শ্যামা গহনাগুলি লইয়া গিয়া অবলাকে বলিল 'মা এস-মা এস—দেখ দেখি কেমন তোমার গহনা হ'য়েছে এস প'রবে এস।'

অবলা আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা একে একে গহনাগুলি অবলাকে পরাইয়া দিল। অবলা ভাবিল 'এরা আমায় আপনার মেয়ের মত স্নেহ করে আমি এদের ঋণ শুধতে পারবোনা। অবলা গহনা পরিল বটে কিন্তু সেজন্য মনে আনন্দ হইল না।

হরি সন্ধ্যা বেলা মাকে বলিল 'মা আমি এখন এক জায়গায় যাই; আসিতে রাত্রি হবে, তা যতক্ষণ না আসি তোমরা দুজনে আমার বিছানায় শুয়ে থেক। আমি অবলার জন্য এক জোড়া ভাল কাপড়ও আনিব। অবলা ভাবিল 'আমায় এরা এত ভাল বাসে। পরের বাড়িতে এত যত্ন তো দেখি নাই।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

তুমি যাহাকে প্রাণের মত ভালবাস তাহার যদি দূরে কোন বিপদ হয়, তোমার অন্তরাত্মা তাহা জানিতে পারিবে। তখন তোমার কাজ ভাল লাগিবে না, কাজে ভুল হইবে। আহার ভাল লাগিবে না—মনের চঞ্চলতা বশতঃ হয়তো হাতের আঙ্গুল কামড়াইয়া ফেলিবে, অথবা জীবটাকে দাঁতে নিষ্পেষিত করিয়া আলাতন হইবে। যদি পথ হাঁটিতে থাক হোঁচট খাইবে। যদি কিছু লিখিতে থাক, অনেক ভুল হইবে, লেখার মাঝে মাঝে অনেক হরপ তোমায় কাটিতে হইবে। তখন অন্তরাত্মা যেন তারে খবর পাইয়া পাগলের মত হইবে—দাঁড়াইয়া বসিয়া খাইয়া সুখ হইবে না—মনটা সর্ব্বদা উদাস হইয়া থাকিবে—কখন বা বিনা কারণে দুই একটা দুঃখের ঘন নিশ্বাস পড়িতে থাকিবে, ভাল বাসার ইহা নিশ্চিত পরীক্ষা।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে রামচন্দ্র বাটির সম্মুখের মেটে রাস্তায় বেড়াইতেছিল—অবলার কথা ভাবিতেছিল; হরির বাড়িতে হয়তো কত তার ক্লেশ হইতেছে, ভাবিয়া মনে মনে যাতনা অনুভব করিতেছিল। হঠাৎ মনের যাতনা বাড়িয়া উঠিল—মন অতি চঞ্চল হইল। আর পথে বেড়ান ভাল লাগিল না—অন্যমনা হইয়া বাটির ভিতরে প্রবেশ করিল। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল—রামের মা দাওয়ায় বসিয়া হরি নামের মালা

জপিতেছিল, বাড়ির বিড়াল দাওয়ার ধারে বসিয়া হাই তুলিতেছিল।

রামচন্দ্র ঘরে গিয়া প্রদীপের আলোকে বসিয়া একখানা বই প'ড়তে লাগিল। পড়িতে পড়িতে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিল—কিন্তু তাহা আর ভাল লাগিল না। খোলা বইএর উপরে হেঁট মাথায় চোখ বুজিয়া আবার অবলার বিষয় ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে মনটা বড়ই চঞ্চল হইল—বিরক্তির সহিত রামচন্দ্র বইখানা মুড়িয়া ফেলিল। পায় উপরে পা রাখিয়া আঁটুটা নাড়িতে নাড়িতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল—ভাবিতে ভাবিতে মাঝে মাঝে ছোট খাট দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকিল। তাহাও ভাল লাগিল না—উঠিয়া দাঁড়াইল—বিছানায় গিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া আরও ভাবিতে লাগিল। অবলার জন্ত প্রাণটা কেমন করিতে লাগিল—হৃদয় স্নেহে গলিয়া গেল—রামের চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইল। রাম ভাবিল, আজ মন এত খারাপ হইল কেন? এক দিনও তো এরূপ হয় নাই—আবার ভাবিল—না এসব ভাবিব না—ভাবিয়া মিছা কষ্ট পাওয়া—মন স্থির করিয়া অধ্যয়ন করি। রাম আবার ম্লান মুখে পুস্তকের কাছে গেল, একখানা বই খুলিল। খুলিয়া খানিকটা পড়িল। তাহা ভাল লাগিলনা—পাতা উলটাইয়া এক যায়গায় দুই পংক্তি পড়িল;—ভাল লাগিল না, বই মুড়িল। প্রাণের ভিতর চড়াৎ করিয়া একটা ভাবনা বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল, রাম ঘরের বাহিরে আসিল—দাওয়ার ধারে আসিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিল—অনন্ত আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র চক্‌মক্‌ করিতেছে, তাহা দেখিয়া রামের মনে

অবলা-স্নেহ প্রবলতর হইল, অবলাকে দেখিবার জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হইল। রাম চক্ষু বুজিয়া ভাবিতেছে, হঠাৎ প্রাণ মন অবলাকে দেখিবার জন্ত চঞ্চল হইল।

রাম মনের চঞ্চলতা দমন করিবার জন্ত যত্ন করিল। রাম মনকে বুঝাইল, হরির সঙ্গে আমার ঝগড়া—আমি তার বাড়িতে কি প্রকারে যাব?—যাবনা। মন বুঝিল না, মন অবলার জন্ত ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল—একটা আকর্ষণে রামের প্রকৃতি হরির বাড়ির দিকে যেন চলিতে থাকিল। মনের সেই ঝোঁকে পড়িয়া রাম চমকিত হইয়া ভাবিল, অবলার আর কোন বিপদ হবে নাকি? রামের সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল—শিরার রক্তস্রোত দ্রুত বহিল—চক্ষু আরক্ত ও সজল হইল—হৃদয়ে আকস্মিক সাহসের সঞ্চার হইল। রাম আবার ভাবিল—এ কি? সত্যই কি অবলার বিপদ হবে? রামের হৃদয়ে দুঃখের উচ্ছ্বাস উঠিল। রাম ভাবিল—তা হতে পারে। পাপিষ্ঠ হরি যেখানে—রাম—আর ভাবিতে পারিল না—রামের হৃদয়ে ভয়ানক যাতনা হইল—রাম চক্ষু মুদিয়া থাকিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অস্থির হইয়া বাটির বাহিরে গেল—মনের যাতনায় এদিক ওদিক পদচারণা করিল, দুঃখে ফুলিতে ফুলিতে ভাবিল 'আমি পাগল হলাম নাকি'? হরির বাড়িতে যাব নাকি? না যাবনা—গিয়া কাজ নাই—মনে ওরকম বোধ হয় অনেকেরই হয়—ওসব মনের খেয়াল। ভাবিয়া রাম আবার বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিল। মার অনেক অনুরোধে ভাত খাইতে বসিল। ভাবিতে ভাবিতে দুই এক গ্রাস উদরস্থ করিয়া—হঠাৎ একটা আঙ্গুল কামড়াইয়া ফেলিল—ভাল খাওয়া

হইল না। আচাঁইয়া শয়ন করিল। শয়ন করিয়া ভাবিতে থাকিল—ভাবিতে ভাবিতে একটু তন্দ্রার মত আসিল; অমনি কে যেন, অবলার সতীত্ব নষ্ট করিতে যাইতেছে, দেখিয়া চমকিত ভাবে ক্ষিপ্তের ন্যায় রামচন্দ্র উঠিয়া বসিল। রাম কাঁদিয়া ফেলিল; রামের হৃদয় রাগে ফুলিতে লাগিল—দুঃখে ফাটিতে থাকিল; রামের গলদঘর্ম্ম হইল; দুঃখে রাগে ভয়ে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে থাকিল। রাম স্তিমিত সজলনেত্রে দেওয়ালের দিকে চাহিল—একখানা পুরাতন তরবার দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাম তাহা বেগে গিয়া ধরিল—এই তরবার লইয়া আজ একবার হরির বাড়িতে যাই; অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে—আমি অবলার জন্য মরিতে প্রস্তুত—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দ্রুতবেগে পাগলের মত রাম মাকে কিছু না বলিয়া হরির বাটীর দিকে যাত্রা করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন সন্ধ্যার পর হরি বাহিরে গিয়া মদ্যপান করিল। অবলা ভাত খাইল। শ্যামা জল খাইয়া অবলাকে লইয়া সেই হরির বিছানায় শয়ন করিল। অবলা ঘুমে অচেতন। শ্যামা ছেলের জন্য জাগিয়া আছে। ছেলে আসিয়া ডাকিল 'মা'! ছেলে নেশায় টলিতেছে। মা ঘর খুলিয়া দিল।

মা। ভাত এনে দি—খা।

হ। না মা, মা না মা মা ভাত খাব না।

মা অনেক জেদ করিল, হরি ভাত খাইতে স্বীকার করিল না। মা বলিল, তবে ঘরে গে শো। বলিয়া শ্যামা নিজের ঘরে গিয়া খিল দিল। সুন্দরী বউ হইয়াছে, শ্যামার মহা আনন্দ।

সরলা অবলা সংসারের কুচক্র বুঝিত না। হরিদাস যে তাহার সর্ব্বনাশের যোগাড়ে আছে তাহা আদতে অনুভব করিতে পারে নাই। পূর্ব্বে যে হরিদাস গণ্ড চুম্বন করিয়াছিল; অবলা তাহা ভুলিয়াছিল—।

হরি ঘরের দ্বার খুলিয়া রাখিল, ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া দিল। ঘরের ভিতরে মন্দ মন্দ বাতাস বহিতেছে—বিছানার আতরের গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে, হরিদাস নেশায় উন্মত্ত হইয়াছে—আর সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া যুবতী শয্যার শায়িতা। সেই মনোমোহিনী রমণী মূর্ত্তিতে সেই সব অলঙ্কার, অবলার হাত পা মুখ সবই পৃথিবীতে অপূর্ব্ব অলঙ্কার; তাহাতে সেই

অলঙ্কারের উপরে অলঙ্কার। হরিদাস দেখিল অবলা অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে, মাথার কাপড় খুলিয়া পড়িয়াছে, বক্ষের কাপড় চ্যুত হওয়ায় নবীন কুচযুগল নিশ্বাসে আন্দোলিত হইতেছে। হরিদাস নেশায় উন্মত্ত হইয়া কাছে দাঁড়াইয়া কামান্ধ হইয়া একদৃষ্টে অবলার নিশ্বাস কম্পিত উন্নত বক্ষে আপনাকে হারাইতে হারাইতে, উন্মত্তের ন্যায় সেই গোলাপী ঠোঁটে চুম্বন করিতে উদ্যত, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কাহার প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত তাহার পৃষ্ঠে বজ্রের আঘাতের ন্যায় পতিত হইল। অমনি হরিদাস, "বাবা গো" বলিয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইল। সেই গোলমালে অবলা জাগ্রত হইল—শিহরিয়া উঠিল;—সম্মুখে ভীষণ কৃপাণ, তরবার হস্তে ভীম মূর্তিতে রামচন্দ্র দণ্ডায়মান। অবলা ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। রামচন্দ্র তখন বীরের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিল "অবলা! আজ তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য এই তরবার আনিয়াছি। আমার সঙ্গে এস। সমস্ত পরিচ্ছদ খুলিয়া এই খানে রাখ। এ নরকে আর থাকিও না। হরি তোমার সতীত্ব নাশে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু কার সাধ্য ভাই থাকিতে ভাইএর সম্মুখে ভগিনীকে স্পর্শ করে। ভগিনি! কিছু ভয় নাই। যদি বল—এই তরবারে পাপিষ্ঠের মস্তক ছেদন করি অথবা নিজের মাথা এই তরবারে কাটিয়া ফেলি।"

রামের শব্দ শুনিয়া হরির মা শ্যামা ঝিওয়ার ন্যায় "[illegible]", "কিও" বলিতে বলিতে সেই ঘরে উপস্থিত হইল। শ্যামা—কাণ্ড—দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিল "কে কোথায় থাক্ এসগো। সর্বনাশ হ'ল। দেখো আমার ছেলেকে [illegible] ফেলে।" বাটীর পিছনে চৌকিদার যাইতেছিল, খুনের [illegible]

শুনিয়াই সরিয়া পড়িল। আর কেহ শুনিলনা—আসিলনা। রাম অবলার গা হইতে গহনা খুলিয়া দিয়া বলিল, "চল বোন আমাদের বাড়ি চল"। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে দাদার সঙ্গে চলিল। অবলা রামের সঙ্গে যায় দেখিয়া, শ্যামা আবার একবার চীৎকার করিল, "ওগো তোমরা কে কোথা আছ শীঘ্র এস। যেমো আমার বউ বার ক'রে নিয়ে গেল।" অবশেষে ভূতলগত হরির হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—"হরি ও হরি। ওঠনা। বউ যে কুলে কালি দিলে। হরিদাস নেশার ঘোরে উত্তর দিল—"কালি—কালি—তা—তা দোয়াতে ধ'রে রাখনা বা বা—গো বেটী।"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

অবলার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল—যে ভীষণ নরপশু গলিত কুষ্ঠময় হস্ত প্রসারণ করিয়া যুবতীকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছিল; যে ঘটনা যদিও অবলাকে প্রকৃতপক্ষে কলঙ্কিত করিতে পারে নাই,—সেই রাক্ষসের কলুষময় নিঃশ্বাস যদিও অবলাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই, তথাপি হিন্দু সতীর হৃদয় এরূপ স্বর্গীয় উপাদানে বিরচিত, যে, অবলা সে বিষয়ের স্মরণে—আপনার সম্মুখে সেই দৃশ্যের উপস্থিতিতে; আপনারই পাপের ফল বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। রামচন্দ্রের সহিত কাঁপিতে ২ কাঁদিতে কাঁদিতে অবলা যাইতেছে। অবলা যেন কি এক নরকে পা ফেলিতে ফেলিতে যাইতেছে। অবলার হৃদয়ে নরকের ভীষণ যন্ত্রণা উপস্থিত—সমস্ত হৃদয় যেন কিসের চাপে ভারি মাথার উপরে যেন পাপের পর্ব্বত চাপান—পথের চারিদিকে গাছপালা সব যেন দুঃখ—শোক ও কলঙ্কে আবৃত। মাথার উপরের আকাশ যেন অবলাকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এত বিষম ভাব, তার উপর তদ্রূপ ভয়—তদ্রূপ লজ্জা। ভয়ে লজ্জায় অবলা থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রামের বাড়ীর ভিতরের উঠানে পঁহুছিল। রামের মাকে কি প্রকারে মুখ দেখাইবে, ভাবিয়া, ভয়ে লজ্জায় কাঁপিতে, কাঁপিতে সেইখানে পাথরের মত বসিয়া পড়িল। রাম দেখিয়া বড় ভয় পাইল। রাম

চীৎকার করিয়া মাকে ডাকিল। রামের মা ঘুমাইতেছিল, হঠাৎ জাগ্রত হইয়া, আলোক সহিত ব্যাস্তভাবে সেইখানে আসিল। আসিয়া মুখ শুনিতে শুনিতে অবলার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। শুশ্রূষার গুণে অবলার মন একটু প্রকৃতিস্থ হইল। অবলা রামের মার মুখের দিকে চাহিল—অমনি দুটি স্রোতের ন্যায় দু চক্ষু বাহিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। কাছে আলো জ্বলিতেছে। অবলার কাছে রাম ও তার জননী। অবলার কান্না দেখিয়া রামচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "দিদি! তুমি কাঁদ কেন? আর কাঁদিওনা, তোমার কিছু ভয় নাই! ইহা শুনিতে শুনিতে অবলা আরোও কাঁদিতে লাগিল। রামের মাও অঁাচলে আপনার চক্ষু মুছিল।

যখন মা মরিয়াছিল, যখন সেই ভীষণ দুরবস্থায় পড়িয়াছিল তখন অবলা এরূপ কাঁদে নাই। কাঁদিয়াছিল বটে কিন্তু সে কান্নার ভিতরে এত তীব্র জ্বালা ছিল না। এখন অবলার অস্থিরের ভিত্তিকে কম্পিত করিয়া যেন যন্ত্রণা বহির্গত হইতে লাগিল। অবলা—কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতেছে, 'আর এ জীবন রাখিবনা'—হায়! আমার কপালে বিধাতা এত লিখিয়া-ছিলেন!! স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল!!"

অবলা আবার ভাবিতেছে, "আমি আর সে নাম করিবার উপযুক্ত নই, সে ছবি কই, সে ছবি কই! অবলার মাথায় বাজ পড়িল—অবলা উন্মাদিনী হইল। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিল "আর ছবি পাইব না—যদি পাই তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কলুষিত করিব না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অবলা যাতনায় অস্থির হইল। রামের মা অবলাকে আপনার [illegible]

কত সান্ত্বনার কথা বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়িল। অবলা সে রাত্রে ঘুমায় নাই, কেবল কাঁদিতে লাগিল। অবলা— কখনও শুইয়া কাঁদিল কখনও বসিয়া কাঁদিল! অবলা অন্ধকারে আপনার দুঃখ চিন্তায় অধীরা হইতে থাকিল। যাতনার ঐকান্তি-কতায় কখন বালিশের কাছে মাথা রাখিয়া অন্ধকার ভিতরে ভীষণতর অন্ধকারে ডুবিতে থাকিল। এইরূপে বিছানায় বসিয়া শুইয়া এপাশ ওপাশ করিয়া রাত্রি অতিবা-[illegible] করিল।

রামচন্দ্র অবলাকে আপন বাটীতে আনিয়া কৃতার্থ হইল। রামের মা অবলাকে মেয়ের মত যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিল। কিন্তু অবলার আর মনে সুখ নাই। রাম, রামের মা, অবলার ব্যথা বুঝিয়া কত বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু অবলার মন ক্রমশঃ দুর্বল হইতে লাগিল। মানুষ নরহত্যা করিলে যে প্রকার [illegible] বিষপান করিলে যে প্রকার হয়; অবলার সেই প্রকার হইল।

ক্রমে বেলা হইল। রাম কোথায় গেল। রামের মা রাঁধিতে বসিল। অবলা রামের মার কাছে বসিয়া বসিয়া কুটনা কুটিতে কুটিতে ভাবিতেছে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে আর মধ্যে মধ্যে কাঁদিতেছে। অশ্রুবিন্দু ঝরিতে ঝরিতে হাত হইতে হঠাৎ শোণিত ধারা ঝরিল। আহা! বালিকা অন্য মনে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে—কিন্তু অবলার চেতনা নাই—মন কোথায় গিয়াছে। রামের মা সহসা দেখিতে পাইয়া বলিল, "ওমা কি করলে—হাত গেছে যে"। বলিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া অবলার হাত [illegible] ফেলিল। অবলার কাছে আজ সে [illegible]-হই নাহে। হাতে জলের পটি বাঁধিয়া দেওয়ায় রক্ত [illegible]

হারের মা অবলার সহিত কথা কহিতে লাগিল :—

আমাদের বাড়িতে থাকিতে কি তোমার লজ্জা করে?

'না' বলিয়া অবলা কাঁদিতে লাগিল।

কেন? ওকি? অত কান্না কি ভাল। আমি তোমার মা নই কি?

অবলা কান্নার বেগ একটু কমাইয়া কম্পিতস্বরে বলিল, 'আমার কিছু ভাল লাগে না, আমার মা বাপের জন্য বড় প্রাণ কেমন করে; আমার স্বামী কোথা আমি তাঁর কাছে যাব।

অবলা গভীর যাতনার প্রাণের আবেগে এই কথা বলিয়াই অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। তা আমই তো, তোমার স্বামীর অনুসন্ধান রাম কলিকাতায় গিয়া লইবে, তার জন্য ভাবনা কি?

এসব শুনলে তিনি আমায় হয়তো কেটে ফেলবেন—তা কাটেন ভালই তাহাতে আমার ভাল হবে,' বলিয়াই অবলা আপনার জীবনে এক নির্জ্জিবতায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল— অবলা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। অবলার স্বামির জন্য যে ভালবাসা ছিল তাহার কিছু মানসিক আবেগের বশবর্ত্তিনী হইয়া অবলা প্রকাশ করিল।

তোমায় কাটবেন কেন? এমন লক্ষী তুমি মা, তোমার ব্রত-দেবে কি আর আছে?

অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘাড় নাড়িয়া বুঝি কি মনের ভাব প্রকাশ করিল এবং চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া কয় বিন্দু অশ্রুজল ফেলিল।

এমন সময়ে রামচন্দ্র আসিয়া বলিল 'মা [illegible] এখনি আমার বাড়ি যেতে হবে। আমার জ্যাঠা ক ব্যারাম।"

রামের মা চমকিত হইয়া বলিল 'মামার ব্যারাম! কি ব্যারাম রাম! রাম বলিল 'শুনিলাম নাকি বিকার'।

রামের আর থাকা হইল না। তাড়াতাড়ি দুটি খাইয়া 'মা! অবলা রহিল দেখিবে' এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

রাম চলিয়া যাইলে রামের মা অবলাকে বলিল 'মা আমার যোগাড় করেছি দুটো রেঁধে নও"।

অবলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল 'না'।

রামের মা বলিল 'সে কি'! না খেয়ে থাকা যাবে যে মা!

কি করিবে অনেক অনুরোধে পড়িয়া অনিচ্ছায় অবলা দুটি চাল আধসিদ্ধ করিয়া খাইল।

খাওয়া দাওয়ার পর একপার্শ্বে বসিয়া অবলা ভাবিতেছে: আমি এখানে থাকিব না। লোকের কাছে মুখ দেখাইতে লোকের সহিত কথা কহিতে লজ্জা হয়। হঠাৎ সেই ছবি মনে পড়িল অমনি এক স্বর্গীয় তেজ অবলার প্রকৃতিতে [illegible] উঠিল। অবলা একটা যাতনায় অধীর হইয়া কিয়ৎকাল [illegible]হীন হইয়া থাকিল। তারপর আবার ভাবিল, "ওদের বাড়িতে সেই ছবি আছে। ওদের বাড়ী তো নরক। নরকে সে ছবি যখন ফেলিয়া আসিয়াছি তখন আমা অপেক্ষা পাপিয়সী আর কে আছে? আমার স্বামীর প্রতিমূর্তির সমক্ষে আমায় যে অপমান করিয়া আমার স্বামীর অপমান করিয়াছে—তাহাকে আগুনে জীবন্ত পুড়াইলেও আমার রাগ আমার দুঃখ যাবে না"। ভাবিতে ভাবিতে অবলা প্রবলবেগে অশ্রুপাত করিল। আবার ভাবিল, "পাপিষ্ঠকে আমি বড় ভাল ভাবিতাম, দেবতার ন্যায় মনে করিতাম;"—অমনি যেন একটা আগুনের

শোক অবস্থার হৃদয়, প্রাণ পুড়াইতে থাকিল ;—নিশ্বাস ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। ভাবিতে ভাবিতে অবলা কখনও ক্রোধে কাঁপিতেছে, দুঃখে কাঁদিতেছে। অবলা বরাবর বড় ভীরু ছিল ; কিন্তু আজ ভয়ানক সাহস, ক্রোধ নারীহৃদয়কে বলীয়ান করিতেছে। অবলা রাগে, শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ভাবিতেছে, "হরিদাসিকে—আমার প্রাণটিকে ওদের নরক হইতে আনিব। যাই এখনি আনিতে যাই। যদি গিয়া না পাই। যদি পাপিষ্ঠ আমাকে দেখিয়া আবার উন্মত্ত হয়। যদি ছবি না দেয় তাহা হইলে কি করিব ? সেই পাপিষ্ঠের সম্মুখে হয় নিজে প্রাণত্যাগ করিব, নতুবা যে কোন প্রকারে পারি তাহার মুণ্ডপাত করিব"। এই ভাব হৃদয়ের ভিতরে বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়া বালিকার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎস্রোত প্রবাহিত করিল, রমণীর হৃদয়ে বীর পুরুষের উৎসাহ ও সাহস ঢালিয়া ঢালিয়া দিল। অবলা বসিয়াছিল, সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল ; এদিক ওদিক চাহিল ; চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ক্ষত্রিয়াণীর তেজ চারিদিকে ছড়াইতে লাগিল। অবলা কাহারও অপেক্ষা না করিয়া বাড়ির বাহিরে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন সন্ধ্যার তরল অন্ধকার চারিদিক পূর্ণ করিতেছে। রাস্তায় একটি কুকুর শুইয়া আছে। রাস্তার ধারের একটি জোবায় একটি বৃদ্ধ ছিপ লইয়া মাছ ধরিতেছে। অবলা দ্রুতবেগে অগ্নিময়ী মূর্ত্তিতে হরিদাসের বাটির দিকে ধাবিত হইল। বাটির দ্বারে পঁহুছিল—একবার দাঁড়াইয়া কি ভাবিল—ভিতরে প্রবেশ করিল,—হরিদাস বাটীতে ছিল না ; হরিদাসের মা রোয়াকের একপার্শ্বে বসিয়া আপনমনে কি করিতেছিল ; কেবল একটি বিড়াল নিকটে

দাসের ঘরের দ্বারের নিকটে বসিয়া দু চক্ষু মুদিয়া বোধ হয় কি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। ঘরের দ্বার খোলা থাকায় অবলা দ্রুতবেগে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই দেখিল সিন্দুকের উপরে সেই ছবি! অবলার হৃদয়ে আশার উচ্ছ্বাস উঠিল। অবলা ছবি দেখিয়া যেন স্বর্গ হাতে পাইল— যেন স্বর্গের রাণী হইল। আনন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে দ্রুতবেগে গিয়া ছবি খানিকে জোরে ধারণ করিল। দু হাতে ধরিয়া বুকে রাখিয়া রক্তিম মূর্তিতে দ্রুতবেগে ঘরের বাহিরে উপস্থিত হইল। একি! সম্মুখে ভীষণ ব্যাঘ্র উপস্থিত!! অবলা দেখিবা মাত্র ক্রোধিতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল,—তার পর দ্রুতবেগে বাটীর বাহিরে চলিল। হরিদাস ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় পিছনে পিছনে ধাবিত হইল। রাস্তায় পঁহুছিয়া অবলা একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। অবলা দুই চক্ষু অগ্নির আগুনে পূর্ণ করিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে পাপিষ্ঠের মুখের দিকে স্থির নয়নে চাহিয়া থাকিল। অবলার দুই চক্ষু দিয়া স্রোত বহিতে দেখিয়া পাপিষ্ঠ আর সেখানে থাকিল না— চলিয়া গেল।

একেই বলে সতীত্বের তেজ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাস ঘরে আসিয়া ভাবিতেছে 'অবলা কেন আমার ঘরে আবার আসিয়াছিল ; বোধ হয় আমায় ভালবাসে তাই। কিন্তু রাস্তায় আমার দিকে যখন চাহিয়াছিল তখন চক্ষে জল দেখিলাম। যেন আগুণের মত তেজ দেখিলাম। কেন? আমায় দেখিয়া কি অবলা কাঁদিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য? সে চক্ষুতে কোন কুভাব নাই। আমি সে চক্ষু দেখিয়া ভয় পাইলাম আমার বুক গুর গুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অনেক স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, কিন্তু এমন তো কখন দেখি নাই। আমায় ও কখনই ভালবাসে না। তা হলে পালাবে কেন? যদি ভালবাসিত; তাহা হইলে কাঁদিতে কাঁদিতে নিশ্চয় আমার গলা ধরিত ; 'আমার বক্ষে তাহার প্রফুল্ল শতদল তুল্য মস্তক স্থাপন করিয়া আমার বক্ষের জ্বালা দূর করিত। যদি আমায় ভালবাসিত, তাহা হইলে এতদিনে আমার অভিষ্ট সিদ্ধ হইত। সে দিনে যে ফাঁদ পেতেছিলাম, সে ফাঁদে নিশ্চয়ই পড়িত। আমাকে ও নিশ্চয় ভালবাসে না—আমাকে ঘৃণা করে—অশ্রদ্ধা করে। রামচন্দ্র শালাকে ভাল বাসে! উঃ একি সহ্য হয়। রেমো শালা এমন গোলাপ ফুল সম্ভোগ করিবে! ও পদ্মের মধু স্বর্গের দেবতার উপযুক্ত এমন মধু রেমো শালা ভোগ করিবে? তা কখনই হবে না। এই সময়ে একটা ভয়ানক হিংসা বৃত্তি হরির ভাঙিতে লাগিল। হরি আবার ভাবিল

কি করিব? কোন উপায়ে অবলাকে মারিয়া ফেলিতে পারিলেই রেমোর আঁতে ঘা পড়িবে, তার দফা রফা হইবে। কি করিব? এক কাজ করি। আজ রাত্রে ওরা যে ঘরে শুইয়া থাকিবে সেই ঘরে আগুণ ধরাইয়া দি। মেটে ঘরে আগুণ দিলেই ঠিক্ হইবে। অবলা কোন ঘরে ঘুমায়, আগে তার সন্ধান লইতে হইবে। ভাবিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। তার পর আস্তে আস্তে মাকে ডাকিল। মা আসিয়া বলিল 'কেন'? হরিদাস বলিল 'দেখিতেছ তো ওদের রেমো শালা কি কাজ করেছে—লজ্জায় কাকেও বলি নাই; যদি লুকিয়ে বিবাহ না [illegible]াম, তা হ'লে এসব কাণ্ড দেখতে হ'ত না।' হরির মা বলিল 'তাইতো বাবা। এমন বিবাহ কেন করিল বল দেখি? হারে। তা বলে কি বউ ওদের বাড়ীতেই থাকবে? ও বউটাও পাজি—ও খানকী, ওকে আর এনে কাজ নাই। এমনি অদৃষ্ট যে একটা বউ আমার ভাল হ'ল না। হরির মা কাঁদিয়া ফেলিল—কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিল 'যাক ও সব, কেউ তো আর জানে না যে তুই বিয়ে করেছিস। ও শুখেকোর বেটি যা করে করুক। তোর আমি আবার বিয়ে দেব'।

হরি বলিল। মা! তুমি আস্তে আস্তে ওদের বাড়ি গিয়ে চুপে চুপে জেনে এস দেখি অবলা কোন ঘরে শোবে।

হরির মা বলিল। 'না বাবা। আমি পারবো না'?

হরি। কেন? পারবে না কেন? খেতে পারবে?

হরির মা। 'কি হবে জেনে? বাপ, ও বউ চাই না। তোর আমি আবার একটা বে দেব।'

হরি রাগিয়া বলিল 'যেতে হবে, না গেলে আমি সব ঘর দোর ঘটি বাটী ভেঙ্গে একাকার ক'রবো। যা বেটি এখনি যা বলছি'। বলিয়াই হরিদাস মাকে যেন মারিতে উদ্যত হইল।

কি করিবে, হরির ভয়ে, মা, আস্তে আস্তে ঘোষেদের বাটিতে গিয়া জানিয়া আসিল। আসিয়া বলিল, "রাম তার মাথার ব্যাধি পেয়েছে—অবাগী ওদের বড় ঘরে শোবে। মুখে আগুন। আমি গেলাম—রামের মা ব'লতে বল্লে, দু একটা কথা কইলে, সে বেটী একবার ঘরের বাহিরেও এলো না।

হরি। তুমি রামের মার সঙ্গে কি কথা কইলে?

হরির মা। আমি বল্লাম হ্যাঁ গা [illegible] মা! তোর সঙ্গে আমার এত ভাব, তুই যে, আমার ছেলে বেলার সই,—তা তোরই বা কি কাণ্ড। তোর ছেলে আজ আমার বউ বার ক'রে নিয়ে এল,—তা তুই কিছু বল্লিনা। বলা চুলোর যাগ, তুই আবার ঐ মেয়েকে ঘরে জায়গা দিয়েছিস। আজ না হয় কাল গাঁয়ের দশজনের যখন কানাকানি হবে তখন—আমার তো মুখে কালি পড়েছে না পড়তে আছে—তোর মুখটো কোথায় থাকবে?

হরি। রামের মা কি বল্লে?

হরির মা। ওমা! তার রাগ দ্যাখে কে?

হরি। আমরণ কি ব'লে বলনা।

হরির মা। বল্লে—অবলাকে তোমার হরি রাস্তায় কুড়য়ে পেয়েছে বলে কি অবলা তোমার বউ হ'ল। অবলার যে তিন বছরের সময় বে হয়েছে। অবলার স্বামী আছে। ওমা কি কথা! হরি কি একেবারে গোল্লায় গেছে। পরের মেয়ে

নিয়ে এত অত্যাচার। এখনও চন্দ্র—সূর্য্য উঠছে! কথা শুনলে যে প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হয়। এসব ব'লে আমায় লজ্জায় ফেলে দিলে। আমি শুনতে শুনতে অবাক হ'য়ে রইছু।

হরি। তোমার মুখে আগুণ। ছুঁড়িকে টেনে আনতে পারলে না।

হরির মা। আ মরণ! তাকে নিয়ে আবার কোন লজ্জায় ঘর ক'রবি? সে যে খানকী! আবাগীর ব্যাটা। এক খানকীর জ্বালায় পুড়ে মরছি আবার এক খানকি কোথা হ'তে আনলি। বলিয়াই হরির মা রাগে ফুলিতে ফুলিতে একটা খ্যাংরা লইয়া রান্না ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

হরিদাস রাগে, দুঃখে, হিংসায় পুড়িতে পুড়িতে ঘরে গিয়া শয়ন করিল। শয়ন করিয়া অবলাকে প্রাণে মারিবার জন্ত চিন্তা করিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্ন। সূর্য্য পশ্চিমাকাশে বৃক্ষ শ্রেণীর মাথার উপরে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। গোলাকারের চারিদিকে রশ্মির ছটা সকল প্রখর ভাবে বহির্গত হইতেছে। গ্রীষ্মকালের মাঠে বাতাস একটু গরম—একটু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। মাঠের মধ্যে একটি দীঘি। দীঘির ঘাটে নিকটবর্ত্তী পল্লী হইতে দুইটী স্ত্রীলোক কলসী কাঁকে লইয়া, জল লইতে আসিল। কাঁকাল হইতে কলসী নামাইয়া জলে নামিল। নামিয়া ঝামা দিয়া পা মাজিতেছে আর কে কি দিয়া ভাত খাইয়াছে তাহারই কথা হইতেছে। একথা হইতে সে কথা; সের কথা হইতে হইতে একেবারে ওদের বুড়ির কথা; বুড়ির কথা হইতে হইতে শ্রাদ্ধের কথা; এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের প্রাণের কথা উপস্থিত হইল! একজন বলিল আচ্ছা ভাই! তোর স্বামী তোকে কেমন ভাল বাসে'? সত্যি কথা ক'স ভাই। অন্য জন বলিল 'সে ভাই বলে রাত্র দিন তোমার মুখ খানি দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়—রাত দিন তোমায় বুকে রাখতে ইচ্ছা হয়।' এই কথা বলিয়াই বলিল 'এখন আমি তো বল্লাম। তোমার তিনি এখন তোমায় কেমন ভাল বাসেন বল ভাই'। অন্য জন বলিল 'সে ভাই চিরকালই বিদেশে থাকে—তা কেমন ক'রে' জান্‌বো বল'। অপর বলিল 'তা ভাই তুই তার কাছে যানা কেন? এ বয়সে স্বামী ভোগ যদি না ক'রলি তবে

আর কবে ক'রবি? মুখে আগুন স্বামী এখনও চিনলিনা। বলিয়াই পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'ভাই পাড় দিয়ে কে আসছে দেখ'।

অপর জনা মুখ ফিরাইয়া দেখিয়াই চিনিতে পারিল—বলিল 'ওলো যাদের ঘর কাল রাত্রে পুড়ে গেছে।

অন্ত জনা বলিল 'ওলো—সেই একটা মেয়ে যাদের বাড়িতে ছিল বুঝি—ওর নাম না রাম; এমন সময়ে 'রামচন্দ্র সেই ঘাটের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাম ঘর পোড়ার কথাটি স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিল। শুনিয়া রামের সমুদয় শরীর কম্পিত হইতে ছিল। রাম কাঁপিতে কাঁপিতে সেই ঘাটের কাছে দাঁড়াইয়া ভাবিল 'ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। কাঁপিতে কাঁপিতে রামের মুখ শুকাইল—চক্ষু দুটী তেজোহীন হইল, রামচন্দ্র পাগলের ন্যায় দ্রুতবেগে বাড়ির দিকে যাইতে লাগিল। পথ আর ফুরায় না—বাড়ি যেন দূরে পলাইতেছে।

রামচন্দ্র গ্রামে প্রবেশ করিল। কাহারও সহিত কথা কহিল না;—কহিতে ভয় হইল। অন্য কেহও রামের কাছে তার সর্ব্বনাশের কথা কহিতে সাহস পাইলনা। রাম খানিক গিয়া দূর হইতে দেখিল, বড় ঘরের চাল নাই; ঘরের দেওয়াল সব লাল হইয়াছে; বাটির কাছের গাছপালা সব ঝলসাইয়াছে। চারি দিকে পাঁশ পড়িয়া আছে—পোড়া বাঁখারি ছড়ান রহিয়াছে। দেখিবা মাত্র রামের কাঁপুনি বাড়িল, প্রবল অশ্রুবেগ উপস্থিত হইল—দুচক্ষু মুদিয়া সেইখানে পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। উপস্থিত বিপদে প্রাণিত হইয়া

ধীরে ধীরে বাটির ভিতরে প্রবেশ করিল। বাটীর ভিতরে গিয়া একবার দাঁড়াইল—চারিদিকে পাগলের মত তাকাইল—কই? কেহ নাই। মা নাই—অবলা নাই—তাহার পক্ষে এ জগৎ যেন আর নাই। সেদিন রান্নাঘরের দাওয়ায় মার সহিত কথা কহিয়াছিল—মা সেদিন ভাত খাওয়াইয়া ছিল; সে মাকে দেখিতে পাইল না। সেদিনে সোণার প্রতিমা অবলাকে রান্নাঘরের দ্বারে দেখিয়া গিয়াছিল—সে অবলাকে রাম দেখিতে পাইল না। বড় ঘর পুড়িয়াছে—ছোট ঘর পুড়িয়াছে—রান্না ঘর, গোয়াল ঘর সব পুড়িয়াছে। প্রাচীরের চালের খানিক খানিক পুড়িয়াছে। বাড়ির ভিতরে একটি আম গাছ ছিল তার পাতা ঝলসাইয়া গিয়াছে। রামের একটি টিয়া পাখী ছিল—খাঁচা পড়িয়া আছে—পাখী নাই।

রাম আর বাড়ির ভিতরে দাঁড়াইতে পারিল না। মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ির বাহিরে গিয়া নিচুদিকে তাকাইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে বসিয়া পড়িল।

'আর কি আছে—সর্ব্বনাশ হইয়াছে—মা নাই—আর মাকে দেখিতে পাইব না; আর অবলা? আমার ভগিনী অবলা? আহা বালিকা অবলা—আর কি আছে? গালে হাত দিয়া এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে রাম দশ দিক শূন্য দেখিতে লাগিল—রামের অস্তিত্বের চারিদিকে যেন কোয়াসা—যেন নিবিড় অরণ্য—যেন দুর্গন্ধময় শ্মশান;—রাম যেন চারিদিকে নরককালে পরিপূর্ণ—রামের হৃদয়ে যেন মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপ উপস্থিত। সে উত্তাপে রাম ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে। রাম এই প্রকারে বসিয়া আছে—বসিয়া অন্তরস্থ শ্মশানাগ্নিতে

পুড়িতেছে—এমন সময়ে একটী বৃদ্ধা একটি যুবা, পরে একজন বালক, ক্রমে ১০।১২ জন লোক সেখানে উপস্থিত হইল। রাম রক্তিম সজল নেত্রে তাহাদের পানে চাহিয়া মুখ নামাইল। রামের অশ্রুবেগ বাড়িল রাম কাঁদিতে লাগিল।

বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা! আর ভাবলে কি হবে বল। যা হবার তা হয়েছে।" আর একজনা স্ত্রীলোক বলিল, "এসব শত্রুতা ক'রে করা বাছা! বাছা আমার কিছু জানেনা গো। পোড়া কপালে মেয়েটার জন্ত বাছার আমার এত লাঞ্ছনা"! পুরুষদের মধ্যে রামকে কেহ কেহ মোকর্দ্দমার কথা কহিল।

এমন সময়ে পুলিশের দুই জন লোক আসিল! তারা একটা রিপোর্ট লিখিয়া লইয়া গেল। রামের মা ও অবলার মৃত্যুর কথা সকলে গোপন করিল। পুলিশের লোক সরিয়া গেলে, রাম কাঁদিতে কাঁদিতে মার মৃতদেহ, অবলার মৃতদেহ, খুঁজিতে লাগিল। রাশি রাশি পাঁশ সরাইয়া ফেলিল। মার অস্থি কঙ্কাল পাইল—কিন্তু অবলার কোন চিহ্ন পাইল না। রাম কাঁদিতে কাঁদিতে সেইদিন রাত্রে মার সৎকারাদি সমাপন করিল।

মার দেহ কঙ্কাল ভস্মীভূত হইলে শ্মশানের আগুণ নির্বাণ হইল। কিন্তু রামের প্রাণে শোকের চুল্লী ধু ধু করিয়া জ্বলিতে থাকিল। স্মৃতি সেই শর আগুণ জ্বালিতে থাকিল।

রাম আত্মীয়দের অনুরোধে একবার তাহাদের সঙ্গে ফিরিয়া-ছিল—বটে, কিন্তু দেশাচারের নিয়মাদি সম্পন্ন করিয়া আবার শ্মশানে ফিরিয়া, মার নির্বাণ শয্যা কাছে বসিয়া, পাগলের মত

কাঁদিতে লাগিল। আকাশে তারা মিট্ মিট্ জ্বলিতেছে, দূরে—চাঁদ ডুবিতেছে। আকাশের তারার মত মানুষের প্রাণ মিট মিট্ করিতেছে। তারা সকল আবার জ্বলিবে—চাঁদ আবার উঠিবে, কিন্তু মানুষের প্রাণ আবার জ্বলিবে কি? সেই শ্মশানে গাছে কত ফুল ফুটিতেছে—গাছে আবার ফুল ফুটিবে; কিন্তু রামের জীবনে আর মাকে ফুটিতে দেখিবে না, অবলাকে ফুটিতে দেখিবেনা। নদীর জলে আকাশের তারা সকলের প্রতিবিম্ব ধক্ ধক্ করিতেছে—আর রামের হৃদয়ে তার মার, তার অবলার প্রতিবিম্ব তদ্রূপ ধক্ ধক্ করিতেছে—আকাশ হইতে যখন তারা ঘুচিবে জলে আর তারা থাকিবে না, আজ সংসার হইতে রামের মা, রামের অবলা ঘুচিয়াছে কিন্তু রামের স্মৃতিতে আগের অপেক্ষা অধিক দীপ্তিতে রামের মা রামের অবলা ধক্ ধক্ করিতেছে। স্মৃতি যদি নিবে তো স্মৃতির সে আগুণ নিবিবে—স্মৃতি যদি শুকায় তো স্মৃতির সে প্রতিবিম্ব শুকাইবে। রাম কত কি ভাবিল—যেন ভাবনার জোরে মাকে অবলাকে পরলোক হইতে ফিরাইবার প্রয়াস পাইল! কতলোক এইরূপ প্রয়াস করে কিন্তু সে প্রয়াসে মানুষের বৈরাগ্য উদ্দীপ্ত হয়—মানুষ আর ফেরে না।

রাম আবার ভাবিল:—পুড়িয়ে মারবে জানলে আমি কখনই অবলাকে আমার বাড়িতে আনতাম না। কি? কি? পাপিষ্ঠ আমার ভগিনীকে স্পর্শ করে কলঙ্কিত ক'রত যে—না—না—এনে ভালই করেছি—ভগবান আছেন—অত্যাচারের প্রতিফল ভুগতে হবেই হবে। পাপের শাস্তিদাতা যে এক জন আছেন তা আমি বেশ বোধ কর'ছি। তবে আর ভয় কি? দুঃখই বা

কেন ক'রবো। যাই—যেখানে ইচ্ছা চ'লে যাই। রামচন্দ্র সেই রাত্রে—দুঃখে শোকে বৈরাগ্যে সেই শ্মশান ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করিল—সংসারের নিকট হইতে বিদায় লইল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কাট ফাটা রৌদ্র পৃথিবীকে ক্লান্ত করিয়েছে। গাছ পালা সব সে রৌদ্রের তেজে পুড়িয়া যাইতেছে। তেজে পাতা গুলি সব নুইয়া পড়িয়াছে। দারুণ গ্রীষ্ম। বাতাসের স্তরে স্তরে আগুণ ছুটিতেছে—গোরু মানুষের গা দিয়া ঘাম বাহির হইতেছে। পল্লীর মধ্যে সব নিস্তব্ধ। পশু পক্ষী যে যাহার আড্ডায় চুপ করিয়া আছে। মানুষের মধ্যে কেহ ঘরে, কেহ বাহিরে গাছ তলায় মাদুর পাতিয়া শুইয়া ছট ফট করিতেছে। ছেলেরা জল জল করিয়া মাকে ব্যস্ত করিয়েছে। কাহারও বা ভেদ, কাহারও বা বমি—কাহারও বা সর্দ্দি গর্ম্মি হইতেছে। বাতাস নড়েনা—গাছ পালা নড়েনা—জলাশয় গ্রীষ্মের উত্তাপে নড়েনা। পুকুরে মাছ আর ঘাই দিতেছে না—সব গ্রীষ্মের উত্তাপে চুপ করিয়া জলের ভিতরে রহিয়াছে। বনের ভিতরে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া দুই একটি সাপ ফণা ধরিয়া গাছতলায় গর্জ্জন করিতেছে। মাঠে রাখালেরা গোরু গুলিকে লইয়া গাছতলায় দাঁড়াইয়া আছে। পুকুরের পাড়ে—কোথাও একটী

গরু, কোথাও একটা ছাগল চরিতে চরিতে শুইয়া ধুঁকিতেছে। এইরূপ সময়ে একটি বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে, একটা প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষ তলে, একটি স্ত্রীলোকের একটি কুঁড়ে ঘরের বাহিরে একটী স্ত্রীলোক বসিয়া তামাক খাইতেছে। তার ঘরের ভিতরে ভিক্ষার ঝুলি, একটি বেহালা আর রান্নার হাঁড়ি ও একখানা ছেঁড়া কাঁথা ভিন্ন আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোকের বয়স ৩০।৩২ বৎসর হইবে। নাকে উলকি—কপালে উলকি। দেখিতে শ্যামবর্ণ, মাথা ভরা চুল পৃষ্ঠের উপরে লুটিতেছে আর রমণী সেই অবস্থায় পা ছড়াইয়া বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে গাহিতেছে:—

রাগিণী জয়জয়ন্তী তাল আড়া।

ভালবাসা কিবা ধন বুঝিবে তা কেমনে।
যে ভাল বেসেছে কভু সেই জানে জীবনে ॥

দারুণ গ্রীষ্মে সেই নিস্তব্ধতাকে পূর্ণ করিয়া সঙ্গীতামৃত মাঠ পূর্ণ করিতে লাগিল। অদূরে আর একটি বৃক্ষতলে একটী রূপের প্রতিমা বসিয়াছিল। তার কানে এই সঙ্গীত প্রবেশ করিবামাত্র সে একবারে স্বর্গে প্রবেশ করিল। সেই দারুণ গ্রীষ্মের কষ্ট অপহৃত হইল। বালিকা কান পাতিয়া গান শুনিতে লাগিল। আবার গান হইতেছে।

ভাল বেসে যে যাতনা, সে যে রে অমৃত কণা,

রমণীর হৃদয়তন্ত্রী এভাব-স্পর্শে বাজিয়া উঠিল। রমণী দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া কোন্ দিকে গান হইতেছে, তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সঙ্গীত চলিতেছে;—

"যদি ভাল বেসে থাক এ মানব জীবনে।
ভালবাসা আছে ব'লে, এখনও শোণিত চলে;
এখনও নিশ্বাস আমি লইতেছি ভুবনে।"

রমণী সেই গীত লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল।

যে রমণী গান গাইতেছিল, সে দেখিল তাহার দিকে একটি পরমাসুন্দরী যুবতী একলা মাঠ হাঁটিয়া আসিতেছে। সে এরূপ রূপ কখন দেখে নাই।

রমণী তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সে স্থান যেন রূপে আলোকিত হইল। সেই রূপের আভায় ভিখারিণীর শ্যামবর্ণ বিভাসিত হইল। ভিখারিণী বালাকে বসিতে বলিল। বালা বসিল। পরে দুইজনে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

ভি। হাঁ মা তুমি যে এখানে?

বা। কোথায় যাইব?

ভি। তোমার ঘর কোথা?

বালা। 'ঘর থাকলে আর হেথা আসি' বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। এই নিশ্বাসে ভিখারিণীর মন যেন একটু ভিজিয়া উঠিল।

ভি। হা মা—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে কেন?

বা। ফেলিয়া ফেলিয়া অভ্যাস হইয়াছে মা।

শুনিয়া ভিখারিণী যেন স্তম্ভিত হইল। একদৃষ্টে সেই বিদ্যুন্ময়ী মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিল।

বা। আপনি এখানে একলা থাকেন?

ভি। হা মা একলাই থাকি।

বা। আপনার কি আর কেহ নাই?

ভি। আছেন বই কি?

বা। কে?

ভি। অনেক আছে।

বা। তা আপনি এখানে থাকেন কেন? আপনার কি প্রকারে চলে?

ভি। ভিক্ষা করি।

বা। এই বল্লেন আপনার অনেক আছে, আবার বলিতেছেন, ভিক্ষা করি?

ভি। পৃথিবীতে এ এক মজা।

বালা তখন আপনার অবস্থার সহিত ভিখারিণীর অবস্থার সাদৃশ্য দেখিয়া ভাবিল, 'ভগবান্ শুধু আমাকেই এমন করেন নাই। ভাবিয়া আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বালা কাঁদু কাঁদু হইল।

ভি। মা! আমার স্বামী আছেন। নানা দুঃখে পড়িয়া এবং আমার জালায় জ্বালাতন হ'য়ে কোথায় বিরাগী হ'য়ে চলে গেছেন। তিনি আমায় পথের ভিখারিণী ক'রে গেছেন, তাই ভিখারিণী হ'য়েছি।

এই সময়ে দু চক্ষু বহিয়া স্রোতের স্থায় কপটি অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

ভি। মা তুই কে মা! তোর অমন রূপ, অমনি কচি বয়স, তুই মা একলা এখানে কেন এলি?

বা। আপনার যে দশা আমারও সেই দশা। মা আমি তোমার কাছে থাকিব। তোমার সঙ্গে ভিক্ষা করিব।

ভি। হাঁ মা! তোর কি আর কেহ নাই? স্বামী আছে তো?

আছে বই কি—মাথায় সিঁদুর, হাতে লোহা—আছে বৈকি। তোমার পেটকাপড়ে ও কি মা!

বা। "ছবি," বলিবামাত্র বালার দুই চক্ষু জলে ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

ভি। দেখি মা দেখি—এই তোমার স্বামীর ছবি। মা! ঠিক এই প্রকার চেহারার একটি লোক আমি কলিকাতায় দেখেছি।

কথাটি শুনিয়াই অবলার হৃদয় আকস্মিক আশায় নাচিয়া উঠিল—অবলা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। অবলা ভাবিল, বিধি বুঝি এইবার সদয় হইলেন। ভাবিয়াই, বলিলেন 'হাঁ মা। তাঁকে কোথায় দেখেছ? তাঁর নাম কি? এই সময়ে অবলার অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

ভি। নাম মা জানি না। কিন্তু ঠিক এইরূপ চেহারার একটি লোক আমি কলিকাতায় দেখেছি। কলেজে সে পড়ে মা।

অ। তাঁর পরিচয় আর কি কি জানেন বলুন।

ভি। আর অধিক জানি না মা; ব্রাহ্মণের ছেলে—কুলীন, বিয়ে নাকি ছেলে বেলায় হয়েছিল, আর অধিক জানি না মা।

অবলার শরীরে রোমাঞ্চ হইল—গদ গদ ভাবে জিজ্ঞাসিল কবে আপনি দেখেছিলেন?

ভি। মা! তবে, এসে ব'স। ওখানে যে ছায়া নাই—রোদ যে মাথার উপরে পড়েছে মা। গা থেকে যে গল্ গল্ করে ঘাম বেরুচ্ছে। চোখের জলে বুকের কাপড় ভিজিয়াছে।

ভি। আস্পরিয়া হাঁয়াই বলিল। বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল
বা। আপনি দেখেছিলেন ?'

ভি। মা! আমি—মাঝে মাঝে প্রায়ই কলিকাতায় যাই। এই প্রায় পাঁচ মাস হইল গিয়াছিলাম। এবারে কিন্তু গিয়া দেখি নাই, তার পূর্ব্বে অনেক বার দেখেছিলাম, তাঁদের বাসায় প্রায় রোজই ভিক্ষা করিতে যাইতাম।

অ। তবু কত দিন হইল আপনি তাঁকে দেখেছেন ?

ভি। প্রায় এক বৎসর হইবে।

অ। আপনি আবার কবে যাইবেন ?

ভি। দুই এক দিনের মধ্যে যাইতে পারি, কেন মা ?

অ। আমি আপনার সঙ্গে যাইব। কাল যাইতে পারিবেন না ? বলিয়া অবলা অঞ্চলে চোখের জল মুছিতে লাগিল—চোখের জল আর ফুরায় না।

ভি। তার আর কি গেলেই হ'ল। এখনি চল না কেন ? আমরা ভিক্ষা করি মা—যেখানে হ'ক একটা আড্ডা ক'রে নিয়ে রাতটা কাটান মাত্র। কলিকাতায় গঙ্গের ঘাটে গঙ্গার ধারে একটি বট গাছ আছে। যখনই যাই, তখনই সেই গাছতলায় আড্ডা করি। তা আজ আর নয় কালকেই যাব। এখন তোমার পরিচয় শুনতে বড় ইচ্ছা হ'চ্ছে—বল মা শুনি।

ভিখারিণী বালিকার মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া ভাবিল, 'যে প্রকার রূপ দেখিতেছি, যদি বশীভূত করিতে পারি তো দুই মাসে দোতালা বানাতে পারবো'।

তাহার পর ছলে বলে ভিখারিণী নানা কথা পাড়িয়া বালিকার মন বুঝিতে লাগিল। বুঝিয়া মনে মনে ভাবিল

"বাবা। যেন আগুণ—বড় শক্ত মেয়ে—একে বশ করিতে যদি তিনি পারেন, তবেই তাঁর বাহাদুরী—আমি তো দুই এক দিনে পারিব না। আসুন তিনি—দেখি তাঁর চক্ষের কত তেজ—অনেককে তো ম'জায়েছেন, একে যদি মজাতে পারেন তবেই তাঁর বাহাদুরী।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিল। আকাশে চাঁদ উঠিল। ভিখারিণী বলিল, "মা। এ মাঠে বড় লেঠেলের ভয়, আর বাহিরে থাকা ভাল নয়,—কুঁড়ের ভিতরে গিয়া বস"। বালিকা কুঁড়ের ভিতরে গিয়া বসিল।

সেই কুঁড়ের ভিতরে বালিকার রূপের শোভা দেখিলে—সে পবিত্রতা ও প্রেমময়ী মূর্ত্তি দেখিলে মহাপাপীরও মনে অনুতাপাগ্নি জ্বলিয়া উঠে।

একটু রাত্রি হইল। ভিখারিণী কুঁড়ে হইতে একটু দূরে চলিল। গিয়া দেখিল, তিনি নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য মাখিয়া সুন্দর বেশে সজ্জিত হইয়া ছড়ি হাতে গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছেন।

ভিখারিণীকে দেখিয়া আরও দ্রুতবেগে কাছে আসিয়া বলিল, "খুব শীকার করেছি!" ভিখারিণী বলিল, "আমার চেয়ে আর নয়।"

তি। মাইরি!

ভি। যাহা কখন দেখ নাই, তাহা দেখাইব।

তি। আমি কি প্রকার দেখেছি, আগে শোন।

ভি। কি প্রকার?

তি। "দেখিয়া সেরূপ, ভয়ে তড়িৎকম্পিত"—

ভি। আমি ভাই অত কবিতা জানি না। দেখাই গিয়ে চল—দেখে বুঝো।

তি। অত তামাসা কেন? কালীর দিব্য?

ভি। মিথ্যা হয় গালে চড় মেরো।

তি। তা হ'লে ছুটো হয়েছে।

ভি। আমি যা গেঁথেছি, তা যদি বশীভূত করিতে পার তো মাসে ১০০০৲। কিন্তু বশীভূত করা তোমার কর্ম্ম নহে। সে রূপের কাছে দাঁড়াইলে তোমার চোকে ধাঁধা লাগিবে।

তি। কি প্রকার বল দেখি? সত্য বলিয়া বোধ হয় না।

ভি। দুপুর বেলা বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে গান গাহিতেছিলাম, এবার সেই তোমার সখের গানটি গাহিতে-ছিলাম—সেই গান শুনিয়া তাঁর প্রাণ চমকিয়া উঠায় তিনি আমার কাছে আসিয়াছেন।

তি। "গান শুনে প্রাণ চমকে উঠেছে" বারুদঘরে আগুণ পড়েছে; তবে আর পায় কে?

ভি। সে আমার ঘরের ভিতরে আছে—কিন্তু বড় শক্ত—তার বড় স্বামীভক্তি।

তি। আচ্ছা তা দেখা যাবে, কত বড় স্বামিভক্তি! চল চল—এখনি তাকে মজাব।

পাপিষ্ঠ সেই ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। পাপিয়সী বলিল "শুন শুন"

তি। কি? কি?

ভি। একবারে ঘরে প্রবেশ করিলে কার্য্য সফল হইবে না।

তি। আমি তত বোকা নহি। পকেটে ১০০্ টাকা আছে—আর এই এক শিশি আতর আছে।

ভি। তবে তুমি যাও। আমি এইখানে বসিয়া থাকি। ওই যে দুঃখিনী বালা—ও আমাদের অবলা; পাঠক পাঠিকা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। গৃহে অগ্নি লাগিবার পূর্ব্বেই রামের বাটি অতি অদ্ভুত ঘটনায় পড়িয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল। সেই ঘটনাটি পর পরিচ্ছেদে দিলাম।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাস অবলাকে পৃথিবী হইতে দূর করিবে—সে ঘনীভূত জ্যোৎস্নাময়ী মূর্ত্তি তাহার সম্ভোগে যদি না আসিল, তবে সে মূর্ত্তি পৃথিবীতে না থাকাই ভাল। হরিদাস সেইদিন সন্ধ্যাকালে মাঠে গেল—মাঠে গিয়া এদিক ওদিক করিতে লাগিল। মাঠে রাত্রি ক্রমশঃ ঘন হইতেছে—ভীষণ হইতেছে। অন্ধকারে মাঠের আইল, গাছ, ঝোঁপ সব ডুবিয়া গেল। হরিদাস অন্ধকারে ডুবিয়া হৃদয়ের আলো নিবাইয়া ফেলিল—মাথার উপরে আকাশ যদি নক্ষত্রহীন হইত তো—হরিদাসের মনের আঁধার বাহিরের আঁধারের সমতুল্য হইতে পারিত। হরিদাসের বুদ্ধিজ্যোতিঃ নিবিয়াছে, হৃদয়জ্যোতিঃ নিবিয়াছে;—হরিদাস ভীষণমূর্ত্তিতে নক্ষত্রবিহীন রাত্রি আপনার হৃদয়ে পুরিয়া বিচরণ করিতেছে। সেই অন্ধকারে হরিদাসের দুই চক্ষু ক্রোধে, হিংসায়, অভিমানে জ্বলিতে লাগিল। দন্তে দন্ত ঘসিতে লাগিল, শিরা সকল—কুঞ্চিত—ক্রমশ কুঞ্চিত হইতে লাগিল। হরিদাস ভাবিতেছে, বধ করিব স্বহস্তেই বধ করিব। এত দিনের আশা বিফল হইল। বেশ্যো শালা আমার কাঁধে ঘা দিল।" ভাবিতে ভাবিতে দ্রুত মাঠের এক দিকে ধাবিত হইল। থামিয়া আকাশের দিকে চাহিল—এক দৃষ্টে পাগলের মত কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া হৃদয়ের ক্ষোভে ব্যাকুল হইয়া অশ্রু-

মোচন করিল "অমন রূপ—অমন রূপ—আহা। চোখের কি গঠন! কি তেজ! কি মাধুরি! আর সেই মুখ? নিখুঁত—নিটোল—লাবণ্যময়—বিধাতা অতি যত্নে চন্দ্র হইতে খুদিয়া বাহির করিয়াছেন—উঃ প্রাণ ফেটে যায়" বলিয়া দ্রুত অন্য দিকে ধাবিত হইল। বুকের ভিতরে নরকের আগুণ ধূ ধূ করিয়া জলিল—হরিদাস তাহাতে অস্থির হইল। হরিদাস সেই মাঠে অন্ধকার মধ্যে একটী উচ্চ ঢিপির উপর বসিল—অস্থিরের ভিতর সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিল—হরিদাস উঠিয়া পড়িল—দ্রুত গ্রামের দিকে ধাবিত হইল। তখন রাত্রি ঝি ঝি করিয়া ডাকিতেছে—সেই শব্দ যেন হরিদাসকে পাগল করিয়া ফেলিল—হরিদাসের অতৃপ্ত আশার জন্য যে ক্ষোভ—আপশোষ, অভিমান সব সেই রাত্রির শব্দে উত্তেজিত হইল—হরিদাসের প্রকৃতি কাটিবার মত বোধ হইল—"উঃ গেলুম। গেলুম।" বলিয়া হরিদাস দ্রুত গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। রাত্রি তখন খুব গভীর হইয়াছে—গ্রামে সমুদয় গৃহ নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে; কেবল দুই একটা কুকুরের "খেউ খেউ" শব্দ হইতেছে; কেবল কোন গৃহে কচিছেলে কাঁদিতেছে, শয্যায় শুইয়া কেহ বা কাশিতেছে। হরিদাস রামের ঘরে অগ্নি দিবার জন্য যাইতেছে; ঐ সব শব্দ শুনিয়া বড় ভয় হইল—হরিদাস গ্রামের ভিতরে একস্থানে দাঁড়াইয়া ভীষণ চিন্তায় ডুবিয়া থাকিল। কুকুরের খেউ খেউ শব্দ থামিল, কচিছেলের কান্না থামিল, কাশির আওয়াজ বন্ধ হইল, হরিদাস সর্ব্বনাশের জন্য যমমূর্ত্তিতে অগ্রসর হইল।

এমনি সময়ে হত ভাগিনী অবলা ঘরের মধ্যে রামের বাম

কাছে শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে—অবলা সেনপুরে ঘরের দাওয়ার বসিয়া আছে। এমন সময়ে আকাশে একটি প্রকাণ্ড আলোক জ্বলিতে লাগিল। হঠাৎ সেই আলোকের ভিতর হইতে অবলার মা বাহির হইয়া বলিল "তোর আজ বড় বিপদ, তাই পরলোকের বাতাস ছাড়িয়া তোর উদ্ধারের জন্য আসিয়াছি।" অবলা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, দুই বাহু ছড়াইয়া, মাকে জাপটা-ইতে গেল, কিন্তু প্রতিবিম্বের ন্যায় বোধ হইল—স্পর্শ করিতে পারিলনা। সে প্রতিবিম্ব আকাশে বিলীন হইল—আকাশে অমনি নক্ষত্র সকল নিবিয়া গেল—অবলা ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। অবলা মার জন্য কাঁদিতে লাগিল। অবলা জাগ্রত হইল—ঘরের ভিতরে এক আলোর মানুষ—অবলার মার মত দাঁড়াইয়া হাত ছানি দিয়া অবলাকে ডাকিল। অবলা চমকিত ভাবে উঠিল। অবলা দেখিল সম্মুখে অদ্ভুত মূর্ত্তি। প্রদীপের শিখা প্রকাণ্ড হইয়া রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিলে যেরূপ হয়, এ সেইরূপ মূর্ত্তি—পৃথিবীতে অবলার মার মুখ, চোখ, গঠন, আকৃতি যেরূপ ছিল—এ আকৃতি সেইরূপ। প্রভেদ এই যে অগ্নি শিখায় আলোক হয় ইহাতে আলোক হয় নাই। ঘরের চারিদিকে অন্ধকার যেমন নিবিড় সেইরূপ নিবিড় আছে; অথচ মধ্যস্থলে শিখাময়ী মূর্ত্তি অবলার দিকে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া আছে—মাথায় চুল নাই—ভ্রূতে চুল নাই। সেই মূর্ত্তি দেখিবামাত্র অবলা প্রথমে ভয়ে কাঁপিয়া দুচক্ষু মুদিল। সেই মূর্ত্তি তখন স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিল "অবলা! আমায় চিনিতে পারছনা'।

কথার আওয়াজ অবলার মার মত। অবলা ভয়ের উপর বিস্ময়ে অভিভূত হইল।

মূর্ত্তি আবার বলিল, অবলা! মা আমার! তোমার মা! আমি যে তোমার মা!

অবলা সে মাতৃস্বর স্পর্শে কাঁদিয়া ফেলিল—চক্ষু চাহিল—চাহিয়া দেখিল, মার মূর্ত্তিই বটে। তখন অবলা, মা! ও মা! বলিয়া মাকে ধরিতে গেল, কিন্তু প্রতিবিম্বের ন্যায় স্পর্শ করিতে পারিল না। তখন অবলার মা বলিল "অবলা! কান্না কাটনা রাখ মা! এজীবনে কাঁদিলে নরম হয় না—কান্নার জলে সংসারের কঠিন মাটি নরম হয় না। তোমার ও যোগীনের বড় বিপদ; সেই বিপদ হইতে রক্ষার জন্য উপরের বাতাস হইতে নিচের বাতাসে আসিয়াছি—আমি যা বলি শুন—আর সময় নাই; আমাকে শীঘ্রই যাইতে হইবে। মা! তোমার ছবি লইয়া শীঘ্র আমার সঙ্গে এস। এ বাটি, এ গ্রাম এই রাত্রে পরিত্যাগ কর—নহিলে যোগীনের আমার প্রাণ যাবার সম্ভাবনা। অতি গোপনে আমার সঙ্গে সঙ্গে এস, কাহাকেও কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই—আর সময় নাই শীঘ্র এস।"

যোগীনের প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা, অবলার অস্থির বুঝিতে লাগিল, শীঘ্র ছবি লইয়া মার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। গ্রামের অন্ধকারের মধ্য দিয়া সেই মূর্ত্তি দ্রুত চলিল, অবলা পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। অবলা থামিতে থামিতে কাঁপিতে কাঁপিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে চলিয়াছে। যোগীনের প্রাণ যাইবে—যেন ব্রহ্মাণ্ডের অন্তিমদশা উপস্থিত; অবলা সেইরূপ ভাবে প্রেতাত্মার পিছনে পিছনে চলিয়াছে। গ্রাম পার হইয়া সেই মূর্ত্তি মাঠে গেল, মাঠে দাঁড়াইল। অবলা কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসিল, মা! আমায় তোর সঙ্গে লয়ে চনা মা! তোর সঙ্গে

কাছে, দাদার কাছে লয়ে চল মা!" বলিয়া অবলা বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন সেই মূর্ত্তি সান্ত্বনা দিল, 'তুমি যে আমার লক্ষ্মী মেয়ে মা! মহানরক হইতে আমরা তোমার পুণ্যে যে স্বর্গে গিয়াছি মা! মা! অবলা! তোমার স্বামী ভক্তির জোরে চৌদ্দপুরুষ যে উদ্ধার পেয়েছে মা! মা আমার কাছে সরে এস! দুটো আদরের কথা বলি।" অবলা সরিয়া যাইল। দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিয়া একদৃষ্টে মার দিকে চাহিয়া থাকিল।

অবলার মা বলিল "মা! ভগবতী তোমার সহায় হইয়াছেন, তোমার কিছু ভয় নাই। তোমার জনক ও আমি সর্ব্বদা ভগবতীর পূজা তোমার ও যোগীনের মঙ্গলের জন্য করিয়া থাকি। যে ছবি পাইয়াছ, ঐ ছবিই, তোমাকে আমাদের স্বর্গে আনিবে। যোগীনকে তুমি পাবে—তবে সংসার নাকি স্বামী-ভক্তি বিহীন হয়েছে মা! তাই তোমায় ধুনার মত আগুনে পুড়িয়ে সংসারের দুর্গন্ধ ভগবান দূর করিবেন।" অবলার মা অবলার স্বামীভক্তি পরীক্ষার জন্য আবার বলিল, "তা তোর যদি বড় কষ্ট বোধ হ'য়ে থাকে, তো, আমার সঙ্গে চলিয়া আয়। এখন তো কষ্টের সন্ধ্যা কাল,ঘোর রজনী সম্মুখে—অনেক যাতনা জ্বালা—তোমার সহিতে হবে—পৃথিবীর সুখ তোমার কপালে আদতে নাই। তাই বলি, যদি কষ্ট বোধ হয়, আমার সঙ্গে আয়,তোর পিতাকে, দাদাকে দেখে—তোর সব যাতনা দূর হবে।

অবলা বলিল "মা! আর এখানে থাকবোনা মা! তোমার দেখা পেয়েছি যখন, আর তোমায় ছাড়বোনা মা! আমায় একবার খানি কোলে করমা।" বলিয়াই অবলা ব্যাকুল

শ পরিচ্ছেদ।

প্রাণে তখন সুখাহ র আনন্দের সীমা থাকিবে না। কলিয়া
অবলার মা বলিল শাস আস্বাদন করিবে। মা! আজ
করিয়া যাইতে র দেশে মহা কষ্টের সুখে তোমায় কেলিতে
সঙ্গে এস মা!" ীর মুখে তোমার যোগীনের মঙ্গল হবে—
বুকের হাড় যেন বজ্রপাত হবে। মা! আর নয়! হত-
পড়িতে লাগি ন্ধ অনলের মত জ্বলিল—প্রাতঃ কালের
মার কথায় ল বাতাস বহিতেছে—খদ্যোতের জ্যোতিঃ
থাকিল। নয় মা! আশীর্ব্বাদ করি মা। যেন এক
কল্পনা কে পরে যোগীনের কোলে পতিব্রতার গতি লাভ
দিয়া আম এমন সময়ে বৃক্ষ শাখা হইতে পাখীরা কলরব
অবলা ছা স্ফূর্ত্তি আকাশে মিশিয়া গেল মুহূর্ত্তে অবলা সেইখানে
কাঁদিতে ভা লাগিল। —মা তোমায় ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে
পারিবনা—তোমার জন্য যদি অনন্ত নরকে যাইতে হয় যাইব
নরকে যদি তুমি থাক, তো সে নরক আমার বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা
মহা সুখের স্থল—আর তুমি যদি না থাক তো—বৈকুণ্ঠ আমা
ঘোর নরক।" অবলা ভাবিতে ভাবিতে অসাড় প্রাণে, অসা
দেহে সেইখানে বসিয়া পড়িল—একটী ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বা
পরিত্যাগ করিল। অবলার মা অবলার মনের ভাব বুঝিতে
পারিয়া ফিরিয়া আসিল—ফিরিয়া আসিয়া অবনতমুখী অবলা
মস্তকের উপরে আপনার হাত রাখিল—অবলার দেহ প্রাণে
অসাড়তা দূর হইল। অবলা মুখ তুলিয়া দেখিল, সম্মুখে মা
দেখিয়া কাতরস্বরে বলিল "না মা! আমার অদৃষ্টের কা
কিছুতে যাবে না। আমি এমন সুবিধা পাইয়াও আপনার
পায়ে আপনি কুড়ুল মারিলাম"।—

কাং— কাছে, কাদায় কাছে লয়ে চল। মা আমি অনেকক্ষণ বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন সেই মূর্ত্তি তোমারশান্তি 'তুমি যে আমার লক্ষ্মী মেয়ে মা! মহানন্দকেথর, ঔষধ; ঐ তোমার পুণ্যে যে স্বর্গে গিয়াছি মা! মা! অবলা ঐ ছবি তোমার ভক্তির জোরে চৌদ্দপুরুষ যে উদ্ধার পেয়েছে দিন তুমি মরিবে। কাছে সরে এস! দুটো আদরের কথা বলি।" অন্তরীক্ষ হইতে যাইল। দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিয়া একদৃষ্টে মার রি হইয়াছে, থাকিল। 'ইয়া অতি

অবলার মা বলিল "মা! ভগবতী তোমার সহায়। আমার তোমার কিছু চ...। তোমার জনক ও আমী কথা ভগবতীর পূ বাতাসে মি আশীষের মঙ্গলের

সেই শিখাময়ীমূর্ত্তি দ্রুত চলিল; অবলা পিছনে পিছনে লিল। রাত্রি অন্ধকারে ভীষণ হইয়া খাঁ খাঁ ার করিতেছে ার অবলা প্রেতাত্মার পিছনে পিছনে যাইতেছে। মূর্ত্তিরিশেষে কস্থানে যাইয়া ভোর হইল। প্রেতাত্মা দাঁড়াইল। অবলার াকে ফিরিয়া বলিল, "এইখানে বসিয়া থাক—বেলা দুপুরের ময় একটী গান শুনিবে, সেই গান ধরিয়া গাহিকার কাছে ইবে। তার কাছে গিয়া যা হয় হবে। হাঁ গা মা। দুষ্টের জন্য কি ভয় পাও?

অ। না মা আমি আর কিছু ভয় পাই না, কেবল ঐছবি বং যাঁর ছবি তাঁর জন্যই ভয়, ভাবনা, যাতনা হয়।

প্রে। তা মা! আমি জানি। এজীবনে অনেক কষ্টই ামার আছে। কিন্তু যত কষ্টেই পড়, যেমন কাঁটা বনে পদ্ম ফোটে, গোলাপ ফোটে—মহাকষ্টের বনে তোমার স্বপদ্ম ফুল

ফুটিবে—সে গন্ধে তোমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। কস্তুরী কঠিন আবরণে সুখের শাঁস আবাদন করিবে। মা! আজ মা হইয়া ভগবতীর আদেশে মহা কষ্টের মুখে তোমার কোলে আসিয়াছি—এই কষ্টের মুখে তোমার যোগীনের মঙ্গল হবে—যোগীনকে পাবার সূত্রপাত হবে। মা! আর নয়। হত-ভাগিনী মা তোমার জন্মের মত চলিল—প্রাতঃ কালের সুগন্ধপূর্ণ শীতল বাতাস বহিতেছে—খদ্যোতের জ্যোতিঃ নিবিতেছে, আর নয় মা! আশীর্ব্বাদ করি মা। যেন এক মাথা সিঁদুর পরে যোগীনের কোলে পতিব্রতার গতি লাভ করতে পার।" এমন সময়ে বৃক্ষ শাখা হইতে পাখীরা কলরব করিলে প্রেতমূর্ত্তি আকাশে মিশিয়া গেল। অবলা সেইখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অবলা কুঁড়ের ভিতর বসিয়া ভাবিতেছে, "রামচন্দ্র দাদাকে বলিয়া আসিলাম না—উঁার মাকেও বলিয়া আসিলাম না। কাজটা ভাল করি নাই।' আবার ভাবিতেছে, 'কিন্তু কি বা, বলিয়া আসিব? আমি উঁাদের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছি।" পাপিষ্ঠ হরিদাস যেরূপ দুর্বৃত্ত, তাহাতে সে দেশে কখনই থাকা উচিত নহে; আসিয়া ভালই করিয়াছি। আমি থাকিলে রাম দাদাকে আমার জন্ত হয়তো নানা বিপদে পড়িত হইত। আমার নামে মিথ্যা দুর্ণাম উঠিয়াছে। যদি মিথ্যা, কিন্তু স্ত্রীলোকের নামে দুর্ণাম উঠাও স্ত্রীলোকেরই পাপের ফল বলিতে হইবে।' ভাবিতে ভাবিতে অবলা কাঁদিয়া ফেলিল।

অবলা কাঁদিতেছে, এমন সময়ে ঘরের ভিতরে বাহির হইতে দরজা দিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে কতকগুলি টাকা আসিয়া পড়িল। অবলা অবাক্ হইল—ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বারের দিকে চাহিল। অবলা ভাবিতেছে, ভিখারিণী কোথায় গেল'। আবার ঝন্ ঝন্ শব্দে কতকগুলি টাকা আসিয়া পড়িল। অবলা ডাকাত আসিয়াছে ভাবিয়া স্বামীর ছবিখানি পেট কাপড়ে বাঁধিল। আবার একখানি আতর মাখান রুমাল আসিয়া অবলার বক্ষদেশে পতিত হইল। অবলার মনে এবার অন্য প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইল,—ভাবিল, 'কোন

দুষ্ট লোক ; দেখিতে দেখিতে কুঁড়ের ভিতরে এক যুবা আসিয়া উপস্থিত।

অবলার-শিরায় শিরায় সাহসের বহিয়া প্রবাহিত হইল—রমণী হৃদয়ে সতীত্ব-সমুদ্র গর্জ্জন করিল—চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া পবিত্রতার জল পড়িতে লাগিল। সেই চক্ষু দ্বয়ের অন্ধকারের ভিতরে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পাপিষ্ঠ সে মূর্ত্তির সে ভাব দেখিয়া ভীত হইল—কম্পিত কলেবর হইল। সেই প্রেমের আকাশে সতীত্বের বজ্র কড় কড় করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল—সেই পবিত্রতার উচ্ছ্বাস মহাবেগে উচ্ছসিত হইয়া পাপীর দুষ্প্রবৃত্তির মস্তক অবনত করিয়া দিল—পাপীর মস্তিকের ভিতরে যেন পাপ যন্ত্রণার আগুন জ্বালিয়া দিল—পাপীর হাড়ে হাড়ে, মজ্জার স্তরে স্তরে আত্মগ্লানির বিষজ্বালা ছড়াইয়া দিল। সেই বিস্তীর্ণ জনশূন্য মাঠে—সেই কুটীরের ভিতরে যে স্বর্গের দেবী বাস করিতেছেন। যে ভগবতী সতী সাধ্বী সাবিত্রী বাস করিতেছেন—তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত করিতে স্বয়ং পাপাত্মর সয়তানও সক্ষম নহে।—নরক যে পদরেণু স্পর্শে স্বর্গে পরিণত হয়, সে স্বর্গকে সে সতীকে কলঙ্কিত করা কি দুশ্চরিত্র মানবের সাধ্য? স্বয়ং মা ভগবতী যাঁর হৃদয়ের ভিতরে সতী রূপে সর্ব্বদা বাস করিতেছেন, সে সতীকে কুভাবে স্পর্শ করিলে কি পৃথিবী থাকিবে—না চন্দ্র সূর্য্য আর আকাশে উঠিবে? কার সাধ্য অবলাকে স্পর্শ করে—কার ক্ষমতা অবলার নিকটে দাঁড়াইয়া হৃদয়ে কুভাব পোষণ করে? ঐ দেখ পাপিষ্ঠের চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুপাত হইতেছে—পাপিষ্ঠ আপনার লজ্জায়

আপনি লজ্জিত। পাপিষ্ঠ অবলা সতীকে-দেখিবামাত্র প্রথমে ভয়ে ভীত কম্পিত—পরে লজ্জায় মলিন—এবং আত্ম-পাপ-স্মরণে-যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিল। অবলাকে মনে মনে প্রণাম করিয়া সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

'এ ঘরে আর থাকা কর্ত্তব্য নহে' এই স্থির করিয়া অবলা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া মাঠ বাহিয়া অন্যত্র যাত্রা করিল।

অবলা বরাবর চলিল। কোথায় একলা যাইবে জানে না। যাইতে যাইতে ভাবিল, 'এ রাত্রে আর কোথায় যাইব? বরাবর কলিকাতায় যাই'। কলিকাতা যেন স্বর্গ। কলিকাতার কথা মনে আসিবামাত্র হৃদয়ে যেন কে বলিল 'ভয় কি? চল কলিকাতায় চল'। অবলা ভাবিতেছে, কলিকাতায় যাইবার পথ কোথা'? ভাবিতে ভাবিতে দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া গভীর ভাবনায় ডুবিতেছে, এমন সময়ে কে একজন পশ্চাতে আসিয়া অবলার হাত ধরিল। অবলা চিনিল—এ সেই ভিখারিণী। ভিখারিণীকে দেখিয়া অবলার ভয় হইল। ভয়বিহ্বলা হইয়া অবলা তার মুখের দিকে এক দৃষ্টে পাগলিনীর মত চাহিয়া আছে—দেখিয়া ভিখারিণী বলিল;—

কেন মা! অমন ক'রে চেয়ে আছ?

অবলা কাঁদিয়া ফেলিল।

কেন মা! অমন ক'রে কাঁদছ?

অবলা কিছু বলিল না—আপনার অঞ্চল দিয়া আপনার চক্ষের জল মুছিল।

ভি। মা! আমায় দেখে ভয় পেয়েছ।

অ। যদি পেয়ে থাকি তো আর কি হবে!—

অবলা আবার কাঁদিতে লাগিল।

ভি। মা! তুমি কলিকাতা যেতে চেয়েছিলে না?

অ। তোমায় বলিয়া কি হইবে?

ভি। কেন? আমায় তো আগে বলেছিলে।

অ। আগে আপনাকে বুঝিতে পারি নাই।

ভি। এখন বুঝিয়াছ?

অ। বুঝিয়াছি।

ভি। কি বুঝিয়াছ?

অ। ভাল লোক আপনি নন।

কথা শুনিয়া ভিখারিণীর বড় রাগ হইল। রাগের ভরে বলিল:—এখন এই রাত্রে মাঠে কেহ নাই। তুমি একলা কোথা যাবে?

অ। কলিকাতা যাব।

ভি। তোমার অতি অল্প বয়স। এ বয়সে একলা রাত্রে কোথা যাবে? আমার তোমার প্রতি সন্দেহ হয়েছে।

অ। কি সন্দেহ?

ভি। তুমি কোন গৃহস্থের বউ—পালিয়ে এসেছ—তোমার চরিত্র ভাল নয়।

"পাপিষ্ঠা দূর হ. তোর সহিত কথা কহিলেও পাপ"—অতি রুক্ষস্বরে এই কথা বলিয়া অবলা নিজ পথে অগ্রসর হইল।

ভিখারিণী তখন রাগে জলিয়া উঠিল, এলো চুলে দুচক্ষু লাল করিয়া, একখানা চকচকে ছুরি লইয়া তীব্র মূর্ত্তিতে ক্রত অবলার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁতে দাত চাপিয়া ক্র দুটা

ঊর্দ্ধে তুলিয়া কর্কস্বরে গর্জ্জন করিল "বলিল হ্যালো হারামজাদি! এখন তোর কোন বাবা রাখে? যদি মেরে ফেলি তো কি হয়?

অবলা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। অবলা ভাবিল "আমি মরিলে এ ছবির দশা কি হবে"। ভাবিতে ভাবিতে উন্মাদিনীবৎ রোদন করিতে লাগিল। অবলা ছবিখানিকে দৃঢ়রূপে ধরিল। রাক্ষসী আবার বলিল "আমার সঙ্গে যদি ভাল চাস তো আয়, নহিলে খুন করে রেখে যাব"।

অবলা কোন উত্তর করিলনা। সেই ছবিখানিকে বক্ষে স্পর্শ করিয়া—একবার আকুল প্রেমে ছবির মুখের দিকে চাহিল, সেই ছবির মুখে কত ভাব কত ভাষা লুকান ছিল, অবলাকে সেই ভাব সেই ভাষা বলিল, আমার জন্য মরিতে ভয় কি? যেন বারুদে আগুণ পড়িল—কোমল মেঘে বিদ্যুৎ চকমক্ করিল। অবলা আকাশের পানে তেজস্বিনী দৃষ্টিতে চাহিল, আকাশে সেইভাব, সেই ভাষা—স্বামীর জন্য মরিতে ভয় কি? অবলার মাথার উপরে আকাশে সেই ভাব সেই ভাষা—অবলার নীচে মাটীতে সেই ভাব সেই ভাষা। তখন চারিদিকের প্রকৃতিস্পর্শে অবলা নির্ভয়প্রাণে আপনার বুকে ছবি জড়াইয়া প্রেম ঘোরে আচ্ছন্ন হইল, অবলা উপস্থিত বিপদ ভুলিয়া চক্ষু মুদিয়া আপনার অন্তরে প্রবেশ করিল—সেখানে এক নবীন জগৎ দেখিল, সে জগতে অসীম আকাশ, আকাশের কুল নাই, সে আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র—নীল পীত সবুজ অসংখ্য নক্ষত্র এবং আকাশের মধ্যে পূর্ণিমার নিষ্কলঙ্ক চাঁদ—আর সেই চাঁদের মধ্যদেশে—অবলার স্বামী মূর্ত্তি জীবন্তভাবে দাঁড়াইয়া আছে। দেখিবামাত্র অবলার শরীর ভক্তিপ্রেমে কাঁপিতে লাগিল,

দুচক্ষু বহিয়া প্রেমাশ্রুপাত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ অবলার শরীর কাঠের ন্যায় হইল, অবলা স্বামী মূর্ত্তি দর্শনে বাহ্য চৈতন্য হারা হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের শক্তির সহিত সেই মূর্ত্তি সম্ভোগে বিভোর থাকিল।

রাক্ষসী অবলাকে স্পর্শ করিল, অবলার দেহ অসাড় কাষ্ঠবৎ অবলার আলিঙ্গন হইতে সেই ছবি রাক্ষসী কাড়িবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু পারিল না, হাত না কাটিয়া ফেলিলে সে ছবি বাহির করা অসাধ্য। মাঠের মধ্যে সেই অন্ধকারময়ী রজনীতে জীবিত মনুষ্যের কাষ্ঠবৎ অবস্থা দেখিয়া রাক্ষসী বড় ভয় পাইল, ভূতগ্রস্থ ভাবিয়া "রাম" "রাম" বলিতে বলিতে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অবলার স্বামীধ্যান ভাঙ্গিল। তখন ভোর। গাছে গাছে পাখীর শব্দ হইতেছে। একটা পাপিয়া সমস্ত রাত্রি গান গাহিয়া তখনও ক্লান্ত হয় নাই—তার কালিদাসী গান তখনও আকাশে মধু বর্ষণ করিতেছে। আকাশে কাক উড়িতেছে।

অবলা তাব ভরে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রেমোন্মাদিনী মূর্ত্তি ভাবিতে লাগিল:—একলা কলিকাতায় যাইব—স্বামীকে খুঁজিব। যাঁর ছবিতে এত সুখ, এত আনন্দ, না জানি তাঁর প্রকৃত মূর্ত্তি কত মধুর। পোড়া কপালীর সে সুখ নাই তা জানি, তথাপি প্রাণ থাকিতে দেখিব, অদৃষ্ট পরীক্ষা করিব। আমি স্ত্রীলোক, ছেলে মানুষ, কলিকাতা কেমন জানিনা। তাতে কি? পথেপথে জিজ্ঞাসা করিব, বাড়িতে বাড়িতে খুঁজিব। সমস্ত জীবন ধরিয়া খুঁজিব। খুঁজিয়া না পাই খুঁজিতে খুঁজিতে মরিব। লজ্জা? কিসের লজ্জা? যাঁর জন্য লজ্জা তাঁরে যদি লজ্জা দিয়া পাই, তো, সে লজ্জা বিসর্জ্জন দেবনা কেন? আমার লজ্জা আগে, না স্বামী আগে? মান? স্বামী যেখানে মান আমার সেখানে—মান দিয়া যদি স্বামী পাই, তো, মান বাড়িবে, কমিবেনা। তাঁর জন্য লজ্জার অধিক যাহা, মানের অধিক যাহা তাহাও বিসর্জ্জন দিব। অবলা আপনার সৌন্দর্য্যের বিষয় ভাবিল;—স্ত্রীলোকের রূপ নানা বিপদের কারণ। স্বামী হারাইয়াছি—

ইহা অপেক্ষা আমার অধিক বিপদ আর কি আছে? পুরুষের অত্যাচার? অবলার মুখ চোখ লাল হইল—শিরায় রক্ত প্রবাহ খরতর বহিল, আকাশের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিল। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিল—যদি খুঁজিয়া দিবার কেহ থাকিত, তো. আমার এদুর্দশা ঘটিতনা; তাহা হইলে এবয়সে সংসার সাগরে ভাসিতে হইত না। যখন ভাসিয়াছি তখন দেখিব সাগরে রত্ন পাই কিনা।" অবলার সাহস জলিয়া উঠিল। অবলা ভাবের তেজে ফুলিতে ফুলিতে মনে মনে বলিল, "আমার ধর্ম যেদিন নষ্ট হবে, সে দিন ধর্মকে পড়িতে হবে।"

অবলা মাঠ অতিক্রম করিয়া, ক্রমে কতার বড় পথে উঠিল। অবলা নিম্নদৃষ্টিতে একমনে স্বামী-চিন্তা করিতে করিতে চলিল। পথে কত লোক সে মূর্ত্তি দেখিল। কেহ চমকিত কেহ বা চিন্তিত হইল। সে মূর্ত্তির প্রভাব দেখিয়া পথিক পাশ ছাড়িয়া সতীকে পথ দিল—যে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল সে হঠাৎ চমকিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অবলা সালিখায় পঁহুছিল। একটী বড় পুষ্করিনী দেখিয়া সেই পুষ্করিণীতে স্নান করিবার জন্য উপস্থিত হইল। পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিল। পুষ্করিণীটী প্রকাণ্ড। দুই ধারে দুই ঘাট। একটী পুরুষদের, একটী স্ত্রীলোকদিগের। অবলা স্ত্রীলোকদিগের ঘাটে গিয়া বসিল। বসিয়া অবনত মুখে শ্রান্তি দূর করিতে লাগিল।

ঘাটের যত স্ত্রীলোক সব সেই দিকে চাহিল। কেহ কেহ জল হইতে ভিজা কাপড়ে অর্দ্ধস্নানেই উঠিয়া আসিল। যুবতী বালিকা, বালক সকল অবলাকে বেষ্টন করিল। একজন বৃদ্ধা

মাথা মুছিতে মুছিতে স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসিল, "তুমি—কাদের মেয়ে বাছা!"

অবলা কিছু বলিল না। কি বলিয়া পরিচয় দিবে তাহা ভাবিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বৃদ্ধা আবার বলিল "ছেলে মানুষ, রূপের কাঁদি দেখছি;—সঙ্গে কি আর কেউ আছে?" অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "না"। অনেকে চমকিত হইল।

একজন স্ত্রীলোক কলসী-কক্ষে ঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল "এবয়সে একলা ভাল কথা তো নয়"।

অবলা নানা লোকের নানাবিধ প্রশ্ন ও নানাবিধ মন্তব্য শুনিতে শুনিতে, আপনার হতভাগ্যতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আকুল প্রাণে অত্যন্ত ক্রন্দনে নিমগ্ন থাকিয়া মাঝে মাঝে "না" "হাঁ" বলিয়া উত্তর দিতে থাকিল। দেখিতে দেখিতে ঘাটে স্ত্রীলোকের গাঁদি লাগিল। এমন সময়ে অবলার পশ্চাতে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া দাঁড়াইল। সে অবলার সম্মুখে আসিয়া বসিল। সেই স্ত্রীলোক বসিয়া অবলার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অবলার সেই অপূর্ব্ব লাবণ্যপূর্ণ মুখ—সেই গোলাপী ঠোঁট—গালে সেই একটি সুন্দর তিল;—দেখিবা মাত্র স্ত্রীলোকটী অত্যন্ত চমকিত ভাবে, "ওমা! আমাদের অবলা নাকি?" অবলা অমনি সেই স্ত্রীলোকের মুখের দিকে সতৃষ্ণ ভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করিল। অবলার চক্ষে জল-ধারা বাড়িল—অবলা দুই বাহু প্রসারিত করিয়া "কায়েত খুড়ি" বলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় সেই স্ত্রীলোকের গলা জড়াইয়া ধরিল। তার পর বুকে মুখ গুঁজিয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে থাকিল তখন ঘাটের স্ত্রীলোকদের ভিতরে একটা কৌতুহল জন্মিল।

সেই বুড়িমাকে অনেকে অনেক প্রশ্ন করিল। বুড়িমা অবলার পরিচয় দিল। অনেকে শুনিতে শুনিতে কাঁদিতে লাগিল। একবৃদ্ধা ব্রাহ্মণী অবলাকে ও বুড়িমাকে আপনাদের বাটিতে লইয়া গেল।

তারপর কায়েত বুড়ির সঙ্গে তার বুড়ার বাড়িতে গেল। পথে যাইতে যাইতে কায়েত বুড়ি অবলার দুঃখের কথা শুনিয়া, নিজের দুঃখের কথা বলিল :—মা। তুই ডাক্তর ডাকিতে গেলে সেই সর্ব্বনেশে দাঁত—কাটা বাড়িতে প্রবেশ করিল। আমি তাহাকে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মৃতদেহের কাছে পি
বসিলাম। পিশাচ বিকট শব্দে আসিয়া মৃতদেহ স্পর্শ পরে
আমি ভয়ে বাটা লইয়া, বটি ল ‍ া, মারিতে গেল কাঁদিতে
আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। আমি দাওয়া খয়া বলিল,
পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে মূ লকের সেই
দেখিলাম, সে মূর্ত্তিও নাই মৃতদেহও নাই। আমি লাগিল।
শূন্য দেখিতে দেখিতে, উন্মাদিনীর মত বাটির তার ঘরে
রাস্তায় নামিয়া দেখিলাম, পিশাচ মৃতদেহ ঘা সহিত অবলার
হেছে। আমি পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলাম। পি কাছে দেহ লইয়া
মাঠে গিয়া পড়িল ; দ্রুতবেগে অসুরের মত চলিল ; আমিও পশ্চাতে চলিলাম। রাত্রি হইল। কত কাঁদিলাম, কাকুতি করিলাম, পিশাচ একবার ফিরিয়া চাহিল না। পরিশেষে অনেক রাত্রে আকাশে ভয়ানক মেঘ হইল—মুষল—ধারে বৃষ্টি আসিল। সেই দুর্য্যোগে পিশাচ মৃতদেহ লইয়া কোথায় গেল, কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। একটা গাছের তলায় অচেতন প্রায় পড়িয়া রহিলাম। পরদিন প্রাতে

কাঁদিতে কাঁদিতে সেনপুরের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া কলিকাতায় আসিলাম।

খুড়ার বাড়ী কলিকাতার আহিরি টোলায় খুড়ার বাটির বাহিরে কাপড়ের দোকান। অবলা খুড়ির সহিত কাপড়ের দোকানের সম্মুখ দিয়া খুড়ার বাটিতে প্রবেশ করিল।

অবলা ধীরে ধীরে বাড়ির ভিতরে গেল। তেমন রূপ তাহারা কখনও দেখে নাই। বাড়ীর ভিতরে এক বৃদ্ধা ছিল, সে কি কাজ করিতে ছিল। দেখিবামাত্র একটু সরিয়া আসিয়া বলিল 'ওমা —য সাক্ষাৎ লক্ষ্মী'। অবলাকে বসিতে জায়গা দিল। অবলা অ— বাড়ির সকল স্ত্রীলোক অবলাকে ঘেরিয়া বসিল। সক-শুনিতে শু— অবলাকে খাবার খাইতে বলিল। অবলা খাবার আকুল প্রাণে —হাদিগের মধ্যে বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। "হাঁ" বলিয়া —শোক. পিতৃশোক, ভ্রাতৃশোক, স্বামীশোক সব স্ত্রীলোকের —চ্ছসিত হইয়া উঠিল। সেই খানে একটি তিন বৎ-একটি স্ত্রীলো— —ল ছিল। সে মাতৃহীন। অবলার রূপ দেখিয়াই বসিল। সেই স্ত্রী— তাহার মা। অবলার কান্না দেখিয়া সেই বালক কাঁদিতে লাগিল— —তে অবলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে উদ্যত হইল। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা বালকের সেই ভাব দর্শনে উচ্চ কান্নার রোল তুলিল। অবলা সেই বালককে কোলে করিয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে আপনার শোকবেগ একটু সম্বরণ করিল। নিজের খাবারের অর্দ্ধাংশ সেই বালককে সস্নেহে খাওয়াইতে লাগিল। অবলার খাবার কিছু খাওয়া হইল না দেখিয়া বৃদ্ধা দোকান হইতে খাবার আনাইয়া অবলাকে খাইতে দিল। অবলা অনিচ্ছায় যৎকিঞ্চিৎ আহার করিল মাত্র, অবশিষ্ট সেই

" ।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভগিন মাটিতে

বালকের হাতে ধরিয়া দিল। অমনি খাবারের রেকাব.. তুলিয়া 'মা খাবা দেছে মা খাবা দেছে,' বলিয়া নৃত্য কা.. লাগিল! অবলা ভাবিতেছে, যদি ইহারা এই ছেলেটিকে দেয় তো লইয়া মানুষ করি। স্ত্রীলোকের স্নেহ এমনি স্বর্গীয় পদার্থই বটে!

পরে সকলে অবলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, কখন স্থির ভাবে কখন কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার পরিচয় অবলা প্রদান করিল। অবলার সেই সব দুঃখের, বিপদের, সাহসের কথা আগা গোড়া শুনিয়া সকলেই কাঁদ কাঁদ হইল। অবলাও শেষে কাঁদিতে লাগিল দেখিয়া, সেই বালকটি আবার কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া অবলার গলা জড়াইয়া মুখের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল, "কাঁদিস কেন ওমা কাঁদিস কেন?" অবলা বালকের সেই অবস্থা দেখিয়া, আরও শোকপীড়িতা হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি হইল। অবলা সেই কায়স্থের কন্যার ঘরে গিয়া বসিল। কন্যার নাম শশীমুখী। শশীমুখীর সহিত অবলার বেশ আলাপ হইল। বালকটি বরাবর অবলার কাছে আছে, সে অবলার কাছ ছাড়িতে চাহে না, কেন না সে স্থির বুঝিয়াছে এই তাহার মা।

শশীমুখীর সহিত অবলার অনেক কথা হইতেছে এমন সময়ে বুড়া আসিয়া বলিল 'মা! তুমি ছেলে মানুষ এ বয়সে এখানে একলা কেন এলে?'

অ। আমি খুঁজিতে আসিয়াছি।

বু। কাকে?

শশীমুখী ইতিপূর্ব্বে সব শুনিয়াছিল, সুতরাং ঠাকুরমাকে

আগা গোড়া সমুদয় বৃত্তান্ত বলিল। বৃদ্ধা শুনিয়া কাঁদ কাঁদ হইল। বলিল "মা! তোমার স্বামী বেঁচে আছেন, আর তোমার এই দশা? হা ভগবান!'

শ। মুখে আগুণ ভগবানের।

বৃ। তা মা তুমি একলা কি সাহসে এলে? আর কখনও এসেছিলে?

অ। না।

বৃ। ধন্য সাহস। তা তুমি কি ক'রে খুঁজে বাহির ক'রবে?

অ। তা কি আর ক'রবে'!

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অশ্রুপ্লাবিত লোচনে অবলা এই কথা বলিল।

বৃ। মা! একলা আসতে একটু ভয় হ'ল না?

অবলা কাঁদিতে লাগিল। বালকটিও কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে অবলার চক্ষের জল মুছিতে লাগিল। বৃদ্ধা আর কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেল।

শশিমুখীর সহিত আবার কথা আরম্ভ হইল।

শ। ভাই তোমার এখন বয়স কত?

অ। প্রায় ১৫ বৎসর হবে।

শ। স্বামীর বয়স কত?

অ। এখন বোধ হয় ২৩।২৪ বৎসর হবে।

শ। কত দিন দেখ নাই।

অ। ৮।৯ বৎসর হবে।

শ। চেহারা মনে পড়ে?

অ। সে চেহারা যদি না পাইতাম, তো, এতদিন মাটিতে মিশিতাম।

শ। চেহারা কোথা পাইলে?

'এই দেখ' বলিয়া অবলা পেট কাপড় হইতে সেই ছবি দেখাইল

সে ছবি যেন দরিদ্রের মাণিক তাই অবলা ভয়ে ভয়ে দেখাইতেছে।

শ। তাই কি চমৎকার চেহারা।

অবলা এই কথা শুনিয়া আনন্দে উন্মাদিনী হইয়া শশীর গলায় সুন্দর হাতখানি রাখিল। শশীর মুখের দিকে চাহিয়া অবলা কাঁদিয়া ফেলিল। অবলার এ বড় সুখের কান্না। সেই ছেলেটি 'আমি অবি দেখি' বলিয়া দুই হাতে ধরিয়া 'মা মা অবি মা মা অবি' এই কথা বলিতে বলিতে ছবিখানি মাথায় লইয়া নাচিতে নাচিতে অবলার হাতে দিল।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—•—

অবলা কায়স্থদিগের বাটিতে ৪ দিন স্থিরভাবে থাকিল। বাহিরে স্থিরতা বটে কিন্তু প্রাণের ভিতরে শোকের আগুণ জলিতেছে। পঞ্চম দিনে বুদ্ধাকে বলিল 'আমি আর এখানে থাকিব না—যে কাযে আসিয়াছি সেই কাযে যাই।

বু। কি কায মা।

অ। আমার স্বামীকে খুঁজিয়া বাহির করিব।

বু। সে কি মা! তুই যে ছুধের মেয়ে।

অ। না আমি তাঁকে খুঁজিব।

বু। এযে বড় সহর মা! কোথায় আছেন ঠিকানাটা যদি বলিতে পার তো আমারা খোঁয তল্লাস করাই।

অ। ঠিকানা জানি না।

বু। আচ্ছা রোস। আমার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করি যদি খুঁজিতে পারে।

বুদ্ধা ছেলেকে ডাকিল 'ও হরি'!

কেন?

একবার শুনে যাও।

যাই।

হরি আসিলে, বুদ্ধা বলিল, ওই বামুনের মেয়েটির বিষয় তো সব শুনেছ।

হাঁ শুনেছি।

উনি এখন ওঁর স্বামীকে নিজে খুঁজতে যাবেন। উনি ছেলে মানুষ কি হবে?

তাঁর নামটি কি, বাড়ি কোথায়, চেহারা কেমন জেনে এস, খবরের কাগজে ছাপায়ে দি। যদি ওঁর অদৃষ্টে থাকে তো দেখা হবে।

হরি খবরের কাগজে চেহারা দেখিয়া চেহারা ছাপিয়া দিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিল। কিন্তু কেহই আসিল না তখন হরি বলিল, মা! কলিকাতায় তিনি নাই, তাহা হইলে তিনি কাগজ দেখিয়া আমার বাড়িতে আসিয়া নিশ্চয়ই তাঁর স্ত্রীর অন্বেষণ করিতেন।

অবলা শুনিয়া পাগলিনীর ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অবলার প্রাণ স্বামীর জন্য এত ব্যাকুল যে কথা কহিতে পারে না, ক্রমে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইল।

সেই ছেলেটীর নাম হাবুল। হাবুল অবলার সে অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। অবলা উঠিয়া বসিল। হাবুল অবলার গলা জড়াইয়া মুখের উপর মুখ দিয়া বলিল 'মা তুমি অমন ক'র না মা"। অবলা হাবুলকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিল অবলা হাবুলকে বড় ভাল বাসিতে লাগিল। হাবুল ও অবলাকে এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।

অবলা যখন নির্জ্জনে স্বামীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিত হাবুল অবলার চখের জল মুছিত।

একদিন অবলা ছাদে উঠিল। একলা বসিয়া স্বামীর জন্য বড় আকুল হইল। প্রাণে আর কিছুই ভাল লাগে না।

লাব যেন বিষের আগুণ। যে দিকে চায় সে দিকটা যেন পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। জগতের শোভা জগৎ ছাঁড়িয়া সেই ছবি খানিতে প্রবেশ করিয়াছে। অবলা সর্ব্বদাই নির্জ্জনে ছবি খানিকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখে। দেখে আর কাঁদে। কাঁদে আর মূর্চ্ছিতা হয়। আগে ছবি দেখিতে দেখিতে অবলা আনন্দে উন্মত্তা হইত, এখন ছবি দেখিতে দেখিতে স্বামীর জন্ত কাঁদিয়া ব্যাকুলা হয়। ব্যাকুলা হইয়া ছবি খানিকে বুকে করে, চুম্বন করে, আর পাগলিনীর মত ছবির সহিত কথা কয়। কথা কহিতে কহিতে আপনি ছবিতে হারা হয়। অবলার প্রেম উন্মত্ত। সে প্রেম স্বামীকে সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, সমুদ্রের জলে জলে, আকাশের তারায় তারায় খুঁজিয়া পায় তো বাহির করে। সে প্রেম চাঁদের কিরণ, রামধনুর সৌন্দর্য্য, সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য, আকাশের গভীরতাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্বামীকে খুঁজিতে ব্যগ্র। সে প্রেম তড়িত্রতার কশাঘাৎ—মরুভূমির প্রচণ্ডতা, বজ্রের ভীষণতাকে বক্ষে ধরিয়া, স্বামীকে খুঁজিবার জন্ত অস্থির। সে প্রেম, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাৎ ভূমি কম্পের প্রক্ষেপ এবং ভূ বিপ্লবের সংহারক মূর্ত্তিকে আপনার ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া, স্বামীকে বক্ষে ধরিবার জন্ত উন্মত্ত।

অবলা সে প্রেমের তেজ কি প্রকারে ধরিয়াছে তা ভগবানই জানেন। সে প্রেম দেখিলে, বোধ হয়, যেন অনন্তকে অতিক্রম করিয়া, অনন্তের মস্তকে সিংহাসন রাখিয়া, সেই সিংহাসনে স্বামীকে বসাইয়া, আকাশের তারা ছিঁড়িয়া স্বামীর পদতলে অর্পণ করিতে পারিলে আপনাকে পরিতৃপ্ত বোধ করে। অবলার দেহ, প্রেমের এই প্রকার তেজ-প্রকাশ সহ

করিতে না পারিয়া একদিন ছাদের উপরে চলিয়া পড়িত হইল। অবলার বাহ্যজ্ঞান নাই।

অবলা বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া মৃতার ন্যায় ছাদে পড়িয়া আছে। হাবুল চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। হাবুলের কান্না শুনিয়া, বাড়ির অপরাপর স্ত্রীলোকেরা ছাদে আসিল। আসিয়া দেখিল অবলা মৃতবৎ পতিতা। বৃদ্ধা, শশী, শশীর মাঁ, কায়েত খুড়ি, মুখে চোখে জল দিতে লাগিল, বাতাস করিতে লাগিল। ক্রমে অবলার সংজ্ঞা হইল।

অবলাকে আস্তে আস্তে ধরিয়া নিয়ে লইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অবলা একটু সুস্থির হইলে, বৃদ্ধা বলিল 'মা! চল কাল আমরা সব তারকেশ্বর যাই।' বৃদ্ধা ভাবিয়াছে একটু স্থানান্তর করিলে অবলার মনটা ভাল হইবে। অবলা কিছুই বলিল না। শশী, শশীর মা তারকেশ্বর যাইবার কথায় বড় আনন্দিত হইয়া স্থির করিল কালই তারকেশ্বরে যাইবে।

অবলাকে সঙ্গে লইয়া সকলে তারকেশ্বর—যাত্রা করিল। ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধা, কায়েতখুড়ি একে একে পূজা করিয়া অবলাকে পূজা করিতে বলিল। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই অবলা উন্মাদিনীর মত তারকেশ্বরের দিকে, ফুল চন্দন বিল্বপত্রের দিকে চাহিতে চাহিতে কাঁদিতেছিল—অবলা ভাবিতেছিল, হতভাগিনী এমনি করিয়া স্বামীকে কবে পূজা করিবে? "বাবা তারকেশ্বর! যদি সত্য হও, তো, আমার এ আশা পূর্ণ করিও"। অবলাকে পূজা করিতে বলিলে, অবলা পূজা করিতে বসিল—অবলা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—দুচক্ষু বন্যার জলে ভাসিয়া যাইতেছে—অবলা ফুল চন্দন লইতে

গিয়া ভীষণ দুঃখে অস্থির মুচড়াইয়া ভাবিতে লাগিল "ভগবান্ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন—এখনও একদিনও স্বামীর পাদপদ্ম পূজা করিতে পারি নাই—স্বামীর পূজা না করায় আমার দেহ মন মহা পাপে মলিন রহিয়াছে, সে মলিন মনে আপনার পূজা করিয়া আপনার শ্রীচরণে কলঙ্কারোপণ করিব না। ঠাকুর! স্বামীকে আগে পূজা না করিয়া আপনার পূজা আমি করিতে পারিলাম না, সেজন্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। ভগবান! আশীর্ব্বাদ করুন আপনাকে যেমন ভক্তির সহিত লোকে পূজা করে, আমার প্রাণেশ্বরকে যেন তেমনি ভক্তির সহিত পূজা করিতে পারি। কাঁদিতে কাঁদিতে এই প্রকারে আত্ম নিবেদন করিতেছে এমন সময়ে অবলার ভিতরে ভাব ঘন হইয়া আসিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থির হইল—অবলা শক্ত হইয়া পড়িয়া গেল।

তখন মন্দিরের ভিতরে "কি ভক্তি! কি ভক্তি"! বলিয়া একটা গোলমাল হইল। অবলাকে কায়েতখুড়ি কোলে করিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিয়া বসিল। মেয়ে পুরুষের একটি প্রাচীর মূর্চ্ছিতা সতীকে বেষ্টন করিল। কত রমণী অবলাকে প্রণাম করিতে লাগিল। অবলার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। অবলার তখন নূতন রূপ নূতন মূর্ত্তি—দেখিলে মনে হয় সতীত্ব ও সৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণে বিধাতা নির্জ্জনে বসিয়া এক নূতন মূর্ত্তির সৃষ্টি করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অবলা উন্মত্তার ন্যায় কলিকাতায় স্বামীকে খুঁজিতে বাহির হইল। কলিকাতায় যে দিকে চায় অট্টালিকার সমুদ্র—অট্টালিকার অরণ্য। তাঁহার হারাণ মাণিক সাগর ছেঁচিয়া বাহির করিবে।—জঙ্গল খুঁজিয়া অঞ্চলে বাঁধিবে। লোক লজ্জা? তাহা অবলা জলাঞ্জলি দিল—বিপদ সম্ভাবনা? দেহে একবিন্দু প্রাণ থাকিতে কার সাধ্য অবলাকে কলঙ্কিত করে;—অবলা বিপদের ঝটিকা, বিপদের সমুদ্র মনে মনে ভাবিল. আবার মনে মনে নিজ বলে তাহা উড়াইয়া দিল যে, স্বামীর জন্ত মৃত্যুর অধিক সহিতে পারে, অনন্ত নরক বহিতে পারে, তার আবার বিপদের ভয়? অবলা ভিখারিণীর বেশে এবাড়ি হইতে ওবাড়ি খুঁজিতে লাগিল। অবলা রাস্তা দিয়া যায় কত লোকে সেই সতী-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠে, ভক্তিতে পূর্ণ হয়—ভীষণ পাষণ্ডও সে মূর্ত্তি দেখিয়া কুভাব ভুলিয়া যায়। অবলা রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অন্বেষণ করে, তার পর ফিরিয়া কায়েত খুড়ির কাছে আসে।

এক দিন অবলা রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিল। সমস্ত দিন কিছু খায় নাই তাহার উপর রাস্তা হাঁটিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। রাস্তায় লোকজনের চলাচল, গাড়ি ঘোড়ার যাতা য়াত, কমিয়া সহর ক্রমশঃ নিস্তব্ধ হইল। ঘড়িতে টং টং করিয়া ২টা বাজিল। অবলা যোড়াসাঁকোর রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া

নিদ্রায় ঢুলিতে ঢুলিতে একটি বাটির দ্বারের কাছে বসিয়া অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়িল। অবলা দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া গভীর নিদ্রায় অচেতন প্রায় পড়িয়া থাকিল। অবলা দ্বারের কাছে ঘুমাইতেছে, কাছে একটি কুকুর শুইয়া আছে—এমন সময়ে বাড়ির দ্বার খুলিয়া একটী স্ত্রীলোক বাহির হইল। বাহির হইয়াই দেখিল, দেখিবামাত্র চিনিল, আবার বাড়ির ভিতরে গিয়া একটী পুরুষকে ডাকিল। পুরুষ দেখিয়া বলিল 'সেই বুঝি?

স্ত্রীলোক বলিল, এমন সুবিধা আর হয় না'।

পুরুষ বলিল "সেই ঔষধটি আন, শুকাইয়া অজ্ঞান করিয়া বাড়ির ভিতরে তুলিয়া লইয়া যাই।"

স্ত্রীলোক সেই ঔষধ আনিল, অবলার নাকের কাছে ধরিল। তার পর বলিল 'নাওনা, বুকে ক'রে ল'রে চল'

পুরুষটি কাঁপিতে কাঁপিতে অবলাকে স্পর্শ করিতে গিয়া পারিল না, সে বলিল, না আমি পারিব না, তুমি লয়ে চল।

স্ত্রীলোক অবলাকে বক্ষে ধরিয়া দ্বিতলের উপরে লইয়া গেল। সুন্দর শয্যায় শয়ন করাইল। অবলার চারিদিকে ফুল ছড়াইল আতর গোলাপ ছড়াইল। পুরুষকে বলিল আর একটি ঔষধ শুকাইয়া দাও নতুবা মরিয়া যাইবে। ঔষধ শুকাইয়া দিল, কিন্তু অবলার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না।

স্ত্রীলোক বলিল 'এইবার আমি ঘরে শিকল দিয়া ও ঘরে যাই তুমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ কর।'

পুরুষ বলিল, 'সাদা চক্ষে পারিব না, ভাল করে মদ খাই।'

স্ত্রীলোক চক্ষু ঘুরাইয়া হাসিয়া বলিল, "ঘরে মদ টদ সবই আছে, আমি যাই—দেখ যেন সব না কেঁসে যায়।"

পুরুষটি মদ খাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে খুব নেশা হইল। উন্মত্ত হইয়া টলিতে টলিতে অবলার সর্ব্বনাশ করিবার জন্ত অগ্রসর হইতেছে। এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতেছে, আর ভয়ে বুক দুড় দুড় করিতেছে। দুর্ব্বৃত্ত পা তুলিতে বড় কষ্ট বোধ করিতেছে, সমুদয় শরীর থর থর কাঁপিতেছে, অবলার দিকে চাহিতেছে, আর ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছে। স্বপ্নে যেমন মানুষ চলিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু পা আর অগ্রসর হয় না; দুর্দ্দান্তের সেই দশা উপস্থিত। অনেক কষ্টে বিছানার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। অমনি সহসা কি স্বপ্ন দেখিয়া অবলা জাগ্রত হইল। অবলা স্বপ্ন দেখিল, যেন কে তাহার সতীত্ব নষ্ট করিতে উদ্যত। অবলা জাগ্রত হইয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিল "পাপিষ্ঠ! ধর্ম্ম কি নাই— ধর্ম্ম কি নাই" সেই চীৎকারে অন্ত ঘটনা সংযুক্ত হওয়ায় পাপিষ্ঠ কম্পিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। সহসা ঘরের দেয়াল, জানালা, চৌকী সব কঁাপিয়া উঠিল। সিন্দুকের উপর হইতে গেলাস আদি সব ভূতলে পড়িল, দেয়ালের গা হইতে একখানা ছবি খসিল। চারিদিকে শাখ ঘণ্টা বাজিল। এ কি! হঠাৎ ভূমিকম্প যে। পাপিষ্ঠ আরও ভীত হইয়া উঠিল। অবলা, ঈশ্বর তাহার সহায় ভাবিয়া উন্মত্তভাবে বিছানা হইতে আসিয়া দ্বার খুলিবার উদ্যোগ করিল কিন্তু দ্বার বন্ধ। সেই ভূমি কম্পের সময় সেই স্ত্রীলোক, সেই দুষ্টা ভিখারিণী দ্বারের শিকল খুলিল। অবলা অমনি দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

অবলা সেই রজনীতেই কলিকাতা পরিত্যাগ করিল। স্বামীকে কলিকাতার বাহিরে খুঁজিয়া বাহির করিবে। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে তা জানে না; বরাবর একমনে উন্মত্তভাবে চলিয়াছে। অবলা এক মাঠে গিয়া পড়িল। রাত্রি শেষ হইল। মাঠে গিয়া একটি বড় রাস্তা পাইল' সেই রাস্তায় উঠিয়া বসিল। বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে[illegible] মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। সেই রাস্তার দুধারে বাবলা গাছ, খেজুর গাছ। দুই একখানা ঘোড়ার গাড়ী. দুই একজন লোক ক্রমশঃ চলিতেছে। দেখিতে দেখিতে আবার একটি ভিখারিণী আসিয়া উপস্থিত হইল।

এ সে দুষ্টা ভিখারিণী নয়। ইহার চক্ষু দেখিলে সদ্ভাবের উদয় হয়। গৈরিক বসন পরিধান। চুল আলুলায়িত—রুক্ষ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। হাতে একটী যষ্টি। বয়স ৪০ বৎসর হইবে। সে আসিয়াই অবলার হাত ধরিল। ধরিয়া বলিল, তুই তোর স্বামীকে খুঁজিবেছিস? বলিয়াই একদৃষ্টে অবলার মুখের উপরে চাহিয়া থাকিল।

অবলা কখনও তাহাকে দেখে নাই, অথচ সে কি প্রকারে অবলার মনের কথা বলিল। অবলা আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, দেখিয়া ভিখারিণী বলিল "তোর মুখ চোখ দেখে, তোকে বড় ভাল বলে বোধ হয়। তুই স্বামীকে খুঁজে তো পাবি না। তোর স্বামী নিজেই দেখা দেবে।"

অবলা কম্পিতস্বরে বলিল "আপনি কে? আপনি আমার

সব কথা কি প্রকারে জানিলেন ?"

ভি। সে কথা জেনে তোর কি হবে? ছেলেবেলায় তোর মা বাপ মারা গেছে নয় ?"

অবলা পিতৃমাতৃ শোকে অধীরা হইয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে ভিখারিণীর, দুই পা জড়াইয়া বলিল "আমি আপনার কাছে থাকিব—আমার আর কেহ নাই। আমি স্বামীকে কি প্রকারে পাইব বলিয়া দেন"।

ভি। তোমার সাধ্য নাই স্বামীকে খুঁজিয়া বাহির কর। যদি খুঁজিতে যাও তো হারাইবে, আর যদি পাইবার আশায় স্থির মনে থাক তো নিশ্চয়ই তাঁর দর্শন পাইবে।

কথা শুনিতে শুনিতে অবলার দুঃখের আঁধার যেন কাটিতেছে সুখের আলো দেখা দিতেছে। অবলা উল্লাসিত প্রাণে বলিল, 'তিনি ভাল আছেন?'

ভিখারিণী একটু হাসিয়া বলিল 'তা আমি কি জানি? আমি তো তাঁকে দেখি নাই।'

অ। আপনি তবে অত কথা কি প্রকারে জানিলেন?

ভি। আমরা যোগবলে সব জানিতে পারি।

অ। আপনি যোগিনী?

ভি। হাঁ আমি যোগিনী।

অ। আমার স্বামীর নাম কি বলিতে পারেন?

ভিখারিণী চক্ষু মুদিয়া ভাবিয়া বলিল 'পারি'।

অ। কি বলুন?

ভি। আমায় পরীক্ষা করিতেছিস?

অ। না! যোগের বল বুঝিতেছি।

ভি। তোমার স্বামীর নাম—যোগেশ্বর।

অবলার শরীর কণ্টকিত হইল। দুচক্ষু দিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িল।

অ। তিনি কেমন আছেন?

ভিখারিণী চক্ষু মুদিল। দেখিতে দেখিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। পরে চক্ষু খুলিয়া বলিল "তিনি ভাল আছেন কিন্তু তোমায় তিনি একেবারে ভুলিয়াছেন।"

শেষোক্ত কথাটি শুনিবামাত্র অবলা "মাগো" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া যোগিনীর পদতলে পতিতা হইল। যোগিনী অনেক যত্নে মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিল।

অবলা মূর্চ্ছা হইতে উঠিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিল।

যোগিনী বলিল, অমন করে থেকনা উঁার সহিত তোমার দেখা হবে।

অ। কবে দেখা হবে?

ভি। আট বৎসর পরে।

অ। তিনি আমায় লবেন তো।

ভি। তোমার অদৃষ্ট বড় ভাল—কিন্তু বড় খারাপ।

অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

ভি। তুমি সতী সাধ্বী, কিন্তু স্বামী তোমায় গ্রাহ্য করিবেন না। তোমার অদৃষ্টে আরও অনেক কথা আছে কিন্তু আমি বলিব না—কখনই বলিব না। কিন্তু তুমি দুর্গ নাম

করিবে—ভগবান তোমার সতীত্বে তুষ্ট হইতেছেন এবং আরও হইবেন ।

এই বলিয়া ভিখারিণী উঠিয়া যায়, অবলা অমনি দ্রুতভাবে গিয়া আঁচল ধরিল । ভিখারিণী বলিল, 'মা আমার সঙ্গে কি তুমি যাবে ?'

অবলা বলিল, 'যাব—আমি স্বামীকে হারাইয়াছি, যা বলিবেন তাই শুনিব ।'

ভিখারিণী বলিল 'তবে আমার মত ঝুলি কাঁধে কর, এক গাছা ছড়ি হাতে লও, রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দাও, আর গেরুয়া বসন পরিধান কর' ।

অবলা বলিল 'আমার কাছে এ সব তো কিছুই নাই ।'

ভিখারিণী আপনার একটি পুঁটুলি হইতে একখানা গেরুয়া বসন বাহির করিয়া দিল । অবলা তাহা পরিধান করিল । পরে ভিখারিণী একটি ছোট ঝুলি অবলার কাঁধে দিল ।

এই জীবন চক্রের গতি কখন কোন্ দিকে যায় কে বলিতে পারে ? আজ মানুষ রাজা, কাল পথের ভিখারী !

সোণার লক্ষ্মী ভিখারিণীর বেশ ধরিয়া জীবন চক্রে ঘুরিতে প্রবৃত্ত হইল । সোণার প্রতিমা যখন গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া স্কন্ধে ঝুলি ঝুলাইয়াছিল, তখন বার কয়েক গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু কাঁদিয়াছিল, কিন্তু সে বড় দুঃখের নিঃশ্বাস বড় দুঃখের কান্না । কারণ সে সব স্বামীকে পাইবার জন্য ।

অবলা ভিখারিণীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল ।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অবলা ভিখারিণীর সহিত ভিক্ষা করিতে করিতে কয়দিন কাটাইল। একদিন তাহারা রহিমপুর গ্রামে ভিক্ষা করিতে যাইল। অবলা দুই বৎসরের বালিকা বয়স, যখন ছিল, সেই গ্রামে মামার বাড়িতে, একবার গিয়াছিল বটে। সে অনেক দিনের কথা। অবলার সে সব মনে নাই।

প্রথমেই একটি বাড়িতে দুই জনে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই বলিল 'জয় রাধাকৃষ্ণ।'—বাটীর দ্বারের নিকটে দুইজনে দাঁড়াইয়া আছে; ভিতরে একটি স্ত্রীলোক রৌদ্রে মাথা শুকাইতেছে; 'জয় রাধাকৃষ্ণ' এই শব্দ শুনিবামাত্র তাহাদিগের দিকে চাহিয়া দেখিল। 'আহা! কি সুন্দর রূপ' বলিয়া স্ত্রীলোকটি তাহাদিগের নিকটে গেল। অবলাকে দেখিবামাত্র একটু কেমন স্নেহ জন্মিল। কে যেন পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া বলিল 'ও তোর আপনার লোক।'

স্ত্রীলোকটী সেই ভিখারিণীকে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল 'হাঁগা এটি বুঝি তোমার মেয়ে'?

ভি। না মা আমার মেয়ে নয়।

স্ত্রী। তবে উটি কে?

ভি। কেউ নয়—তবে কুড়িয়ে পেয়েছি;—মেয়ের মতনই একে ভাবি।

কুড়িয়ে পেয়েছি, এই কথাটি শুনিবামাত্র স্ত্রীলোকের গা শিহরিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছ'?

অবলা কাঁদিয়া ফেলিল। স্ত্রীলোকটি তখন অবলাকে বলিল 'হা মা তুমি কাঁদ কেন' ?

অবলা চুপ করিয়া থাকিল। ভিখারিণী বলিল 'মা ও মেয়েটির পরিচয় জেনে আর কি হবে? ও আমার সহিত ভিক্ষা করে। দুটি ভিক্ষা দিতে ইচ্ছা হয় দাও, আমরা চলিয়া যাই।'

স্ত্রীলোকটি বলিল, "পরিচয় দিতে বাধা কি মা! আমার মেয়েটিকে দেখে প্রাণটা কেমন ক'রে উঠছে।

ভিখারিণী বলিল 'মা ওর বড় দুরদৃষ্ট!—ভগবান যে কেন ও রূপের সৃষ্টি ক'রেছিলেন তাহা জানি না। ওর ছেলে বেলাতেই মা বাপ মরেছে। বিবাহ হয়েছে—স্বামীও আছে,—কিন্তু সে না থাকাই।

অবলা আপনার পরিচয়ের কথা শুনিতে শুনিতে ঘাড় হেঁট্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

স্ত্রীলোকটির অত্যন্ত দয়া হইল—অবলার কান্না দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

স্ত্রীলোকটী অবলার হাত ধরিয়া কাছে আনিয়া অবলার চিবুক ধরিয়া বলিল 'মা তোমার নাম কি' ? বলিয়াই অবলার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল।

অবলা মৃদুস্বরে বলিল 'অবলা বালা'।

স্ত্রীলোকের শরীর কণ্টকিত হইল, লোচনদ্বয় অশ্রুধারা-ক্রান্ত হইল।

তোমার বাপের নাম ?

হরিনাথ।

সেই—স্ত্রীলোকটির বুক গুর গুর করিয়া উঠিল।

তোমাদের বাড়ী ?

সেনপুর।

বিনোদিনী তার দুই বাহু প্রসারিত করিয়া অবলাকে বক্ষে ধরিয়া বলিল 'মা অবলা ! তুই কি এখনও বেঁচে আছিস। আমি যে তোর মাসী !—মা ! তোর এবেশ কেন মা ! আমরা বেঁচে থাকতে তোর এ দশা কেন মা' !

স্নেহের বেগে বিনোদিনী অবলাকে বুকে ধরিয়া বসিয়া পড়িল; কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চৈঃস্বরে গৃহবাসী স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল 'ওগো একবার বেরিয়ে এস গো! আমাদের অবলাকে একবার দেখে যাও'।

রামদাস তীর-বেগে ঘরের বাহিরে আসিয়া সেই ঘটনা দেখিল। বলিল 'কি ? কই অবলা ? অবলা যে নাই। অবলাকে যে অনেক খুঁজে পাই নাই।

কামিনী বলিল 'এই আমার কোলে অবলা'।

রাম বলিল 'ওর যে ভিখারিণীর বেশ'।

বিনোদিনী বলিল, "ওগো না"—এই আমার অবলা—"পরিচয় জিজ্ঞাসা কর না।"।

রামদাস এতক্ষণ ভাল করিয়া দেখে নাই। এখন ভাল করিয়া দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'মা! অবলা! তুই কি আমার সেই অবলা ? বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অবলার হাত ধরিল।

এই অবসরে সুবিধা পাইয়া যোগিনী পলায়ন করিল। যোগবলে সে সব বুঝিয়াছিল—বুঝিতে পারিয়াই সে সেই বাটীতে অবলাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল।

বিনোদিনী অবলাকে ঘরে লইয়া সে সব কাপড় ছাড়াইয়া ভাল কাপড় পরিতে দিল। যোগিনীকে খুঁজিয়া কেহ আর পাইল না।

অনেক দিনের পর ভাগিনীকে পাইয়া রামদাস আনন্দের সাগরে ভাসিতে লাগিল। তাহাদের ত আর কেহ নাই—ভাগিনী অবলাই তাহাদের একমাত্র বান্ধবী।

ভাগিনীর মুখে দুঃখময় বৃত্তান্ত আগা গোড়া শুনিতে শুনিতে রামদাস ও বিনোদিনী কখন অশ্রুবিসর্জ্জন, কখন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মামার বাড়িতে অবলা খুব যত্নে রহিল। অবলাকে পাইয়া তাহারাও যেন প্রাণ পাইল। রামদাস অবলার স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিল। অনেক অন্বেষণ করায় জানিতে পারিল—অবলার কপাল জন্মের মত পুড়িয়াছে।

শুনিয়া অবধি রামদাসের মাথা ঘুরিয়া গেল। অমন রূপের প্রতিমাকে বৈধব্য দশা ভুগিতে হইবে—থান কাপড় পরিতে হইবে—একসন্ধ্যা আহার করিতে হইবে, এইসব ভাবিতে ভাবিতে মামার প্রাণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। অবলাকে দিন কতক

জানিতে দিল না। বিনোদিনীকে চুপে চুপে বলিয়াছিল মাত্র। অবলা এসব কিছুই জানে না।

সতী অবলা স্বামী বই আর কিছুই জানে না। স্বামীই তার ঈশ্বর। "অন্যান্য মেয়েরা" কত "ঠাকুর" পূজা করে; অবলা কেবল স্বামীরই পূজা করিয়া থাকে।

অবলা বাবার বাড়িতে একটি আলাদা ঘর পাইয়াছিল। সে ঘরে কেহ যাইত না। অবলা একলা সেই ঘরে বসিয়া স্বামীর ধ্যান করিত।

একদিন বিনোদিনী দেখিল, অবলা ঘরের খিল বন্ধ করিয়াছে। ভিতরে মেঝেতে বসিয়া হরিনামের মালা লইয়া কি নাম জপ করিতেছে। ভক্ত যেরূপ ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে পাগল হয়, বাহ্যজ্ঞান হারায়, অবলাও সেইরূপ পাগলিনীর মত চক্ষু মুদিয়া কি নাম জপ করিতেছে।

সে ঘরের কপাটের খিলটি কিরূপ আলগা ছিল, একটু জোরে ঠেলিবামাত্র খুলিয়া গেল। অবলা কিছুই জানিতে পারিল না। বিনোদিনী দেখিল বালার দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুজল পড়িতেছে এবং শরীর মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠিতেছে, হাতের মালা হাতে স্থির ভাবেই রহিয়াছে, কিন্তু মুখে বিড় বিড় করিয়া শব্দ হইতেছে—"যোগেন্দ্র—যোগেন্দ্র—যোগেন্দ্র"।

অবলা স্বামীর নাম জপিতে বাহ্যজ্ঞান হারা। সতী অন্তরের মধ্যে স্বামীর রূপ-সাগরে আপনার আত্মাকে ডুবাইয়া দিয়াছে। স্বর্গ হইতে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, বেহুলা অবলার এই স্বামী-ধ্যান দেখিয়া বিমোহিত হইয়া অবলার আত্মাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে। আপাপক্তি

ভগবতী সে মাধুরী দর্শনে প্রেমে পাগলিনী হইয়া অবলার মুখ চুম্বন করিতেছেন। [illegible] সেই [illegible] বিন্দুকে মুক্তোরণে আপনার [illegible] ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছে।

বিনোদিনী অবলার সেই [illegible] ভিতরে স্বর্গের [illegible] দেখিয়া ভাবিল, মা অবলা আমার যোগ্য [illegible] এমন রূপের ভিতরে এমন রূপ কোথা হইতে আসিতেছে? বিনোদিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ভগবান! এমন মেয়েকেও কি বিধবা করিতে হয়"! এই কথা বলিয়াই মনে মনে ভীত হইয়া বলিল "তাই তো কি করিলাম, তিনি যে বারণ করেছেন"।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

মাধবী বাড়িতে গিয়া [illegible] একটী বন্ধু পাইয়াছিল ; তাহার নাম নলিনী। নলিনীর [illegible] ; যে কালতে মানুষ চটিয়া যায়, এ সে কাল নহে। কালতে [illegible] বিশেষ সৌন্দর্য্য ছিল। একটা চল চলে লাবণ্য কালিমা সে কালর উপরে এমনি ভাবে মাখান, যে তাহা দেখিলে অনেকের গৌর বর্ণের উপর, সোণার রঙের উপর বিরক্তি জন্মিত। নলিনীর মুখের এমনি একটা মাধুরি এবং সুগঠন যে তাহা দেখিলে অনেকের হৃদয় যেন একটা সৌন্দর্য্য-নেশায় মাতিয়া উঠীত—প্রাণটা কেমন এলাইয়া পড়িত, হৃদয়ে কুভাব আসতে উঠিতনা। ভাল—গান শুনিলে যেমন প্রাণ গলিয়া যায়, নলিনীর সেই মুখ দেখিলে অনেকের প্রাণ মন গলিয়া যাইত ;—অনেকের স্মৃতিতে তাহা গভীর রূপে অঙ্কিত হইয়া থাকিত। যে মুখ ঘোমটায় লুকাইয়া রাখিবার উপযুক্ত, অধিক খোলা থাকিলে পৃথিবীর দাগ পড়িবার সম্ভাবনা, নলিনীর এ সেই মুখ। সেই মুখের দৃষ্টিতে, চাহনিতে, হাসিতে একটা বড় সরলতা, বড় সতীত্ব স্পষ্ট প্রকাশিত হইত। অন্নদা সে মুখ দেখিয়াই নলিনীকে চিনিয়াছিল, আপনার প্রাণের মধ্যে নলিনীকে পুরিয়া রাখিয়াছিল। নলিনীর নম্রতা স্বামী ভক্তি, গুরুসেবা অন্নদার বড় ভাল লাগিয়াছিল। সময়ে সময়ে নির্জ্জনে নলিনীর সহিত অন্নদার প্রাণের কথা হইত। সতীতে সতীতে কথা।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

একদিন বৈকালে অবলা আপনার ঘরে বসিয়া মাথের মাল, লইয়া স্বামীর [illegible] [illegible] চক্ষু দিয়া পবিত্রতা ও প্রেমের কিরণ ছুটিতেছে। অবলা কখনও কখনও অনুরাগে বিগলিত হইয়া প্রেমাশ্রুপাত করিতেছিল। এমন সময়ে নলিনী ঘরের দ্বারে আসিয়া [illegible] ছিল খুলিয়া গেল। নলিনী গিয়া অবলার কাছে বসিল।

নলিনী বসিবার [illegible] অবলা স্বামীর মালাটী ঘরের দেয়ালের [illegible] ভক্তির সহিত তুলিয়া রাখিল। মনের ভিতরে সে মালার [illegible] নলিনীর কাছে বসিল। বসিয়া মাঝে মাঝে প্রেমের মালার দিকে তাকাইতে থাকিল,—সে মালার আকর্ষণে মুগ্ধ প্রাণ হইয়া, নলিনীর নিকটে স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে থাকিল।

নলিনী ধীরে ধীরে নোলকটি ঈষৎ নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "ভাই! একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা ক'রব ভাবি তা, আমার বড় ভয় করে।"

অ। আমি কি ভাই বাঘ, যে খেয়ে ফেলবো। ভয় করে, এমন কি কথা ভাই!

ন। তোকে আমি ভাই মনে মনে বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করি, এজন্য সব কথা ব'লতে সাহস হয় না।

অ। আমরণ! ভক্তি করবার লোক বুঝি আর খুঁজে পেলিনা। [illegible] সব চুল পেকেছে, দাঁতসব পড়েছে, খুব যে বুড়ি হ'য়েছি,—আমার ভক্তি শ্রদ্ধা না ক'রলে চ'লবে কেন! আমরণ তোমার! যিনি ভক্তির সামগ্রী তাঁকে ভক্তি করিস। এখন তোর কথাটা কি খুলে বল।

না। তাই তোর কাছে এখনই আমার স্বামী-চিন্তা আসে, স্বামি-ভক্তি যেন উথলে উঠে, [illegible] ব'লে মনে কষ্ট দিয়াছি, সে সব ভেবে মনে [illegible] যন্ত্রণা পাই।

এই সময়ে নলিনী দেখিল অবলার মুখ বড় ভারি হইয়াছে—অবলার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিতেছে। দেখিয়াই নলিনী হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইল, তাই [illegible] বলিল, "একি ভাই! তুমি আমার কথা শুনতে [illegible] হ'য়ে গেলে কেন! তোমার চক্ষু ছল ছল করছে, গাল ভেসেছে, দুঃখের রঙে রক্ত ফেটে প'ড়ছে, তোমার চোখে জল এসেছে। এই জন্যই তো আমায় জিজ্ঞাসা ক'রতে ভয় হয়। না ভাই! আর জিজ্ঞাসা করিব না।" বলিয়াই নলিনী অবলার সেই প্রেমলীলাময়ী মুখ-কান্তির দিকে চাহিতে চাহিতে কাঁদ কাঁদ হইল।

অবলা প্রেমবেগ সম্বরণ করিয়া গভীর স্নেহে নলিনীর চিবুকটি ধরিয়া বলিল, "তোদের স্বামীসেবা হয়—আমার হয় না!;—বলিতে বলিতে অবলা কাঁপিতে থাকিল, প্রাণের ভিতরে একটা কোমলতার আবেগে কিয়ৎক্ষণ বদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া নলিনীর মুখের দিকে পাগলিনীর মত তাকাইয়া থাকিল। তার পর আবার ধীরে ধীরে বলিল, "নলিনি! আমি পাষাণী, সে দুঃখে বলিতা [illegible] বোন! এখন তোমার কি কথা সব বল। তোমার কথা শুনে আমার বড় সুখ হয়।" অবলার সেই স্নেহ-স্পর্শে নলিনী কাঁদিয়া [illegible],—অন্তরে বলিল, "ভাই! আজ দিন যে ভগবান ল'য়ে স্বামী গান করে—এর চেয়ে স্বামী ভক্তি [illegible] বেশি নাই। অবলা! [illegible] বান তোমায় [illegible] দেবেন। একদিন তুমি তোমার প্রাণের

দেবতাকে পাবে,—তোমার স্বর্গ লাভ হবে। অথবা চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, [illegible] করবে কর"?

ন। হাঁ ভাই! অনেকে বলে, জপের মালায় তো মানুষে ভগবানের নাম জপে;—স্বামী আমার নাম জপা কি? গুরু কাণে যা মন্ত্র দেন [illegible] জপা আমার কি?—আমি [illegible] পারি নাই।

অবধা [illegible] কথা নলিনীকে খুলিয়া বলিতে লাগিল।

নলিনি। [illegible] স্বামীকে দেখি নাই। অনেকে যেমন ঈশ্বর দেখে নাই। কিন্তু শুনেছে মাত্র—শুনে সেই ধনে পাবার জন্ত লালায়িত হয়, আমিও জানিনা কেন আমার স্বামী ধনকে পাবার জন্ত লালায়িত হইয়াছি। সাধারণ ভাবে তাঁর চিন্তা না ক'রে পবিত্র জপমালা লয়ে তাঁর নাম চিন্তা করি। স্বামী আমার ইষ্ট দেবতা;—আমি স্বামী ভিন্ন দ্বিতীয় দেবতা জানিনা। আমার স্বামীর কাছে আর সব দেবতা ছোট দেবতা,—তাঁরা অপরের পূজার জন্ত—আর আমার স্বামী আমার পূজার জন্ত। অন্যান্য দেবতাকে পূজা করিবার লোক অনেক; আমার স্বামীকে আমি পূজা না করিলে তাঁর পূজা বন্ধ থাকে—আমি তাহা সহিতে পারি না। স্ত্রী যদি স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা না করে, তো স্বামী মানুষের নীচতায় পড়িয়া থাকে,—আমার তাহা ভাবতে সহ্য হয় না। আর স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে অপরের ধ্যান করা, পূজা করা আমার কাছে মহা পাপ ব'লে মনে হয়। স্বামী জীতে থাকবেন এবং আর একজন দেবতা হ'য়ে তাঁর উপরে উঠবেন, এ আমার সহ্য হয়

না ;—তাতে আমার বড় হিংসা হয়। তাই। যিনি স্বামী তিনি তো আমার সব ; তাঁর উপরে আবার কে ? আমার হাড়, রক্ত, মাংস, মন, প্রাণ সবই তাঁর চরণে দিয়েছি, এখন তাঁর চরণ হ'তে কেড়ে ল'য়ে আবার কারে দেব ? নলিনি ! স্বামী অপেক্ষা আর কাকেও কাছে দেখিনে—বড় দেখিনে। স্বামী আমার আশা ভরসা, স্বামী আমার ধন ঐশ্বর্য্য, স্বামী আমার মান অপমান, স্বামী আমার জীবন মরণ, স্বামী আমার ইহকাল পরকাল, স্বামী আমার একমাত্র আরাধ্য ঈশ্বর, পৃথিবীর আর যত কিছু সব তাঁর নীচে। তাই স্বামীকে ইষ্টদেবতা ভেবে তাঁর নাম জপ করি।

অবলা যখন এই সব কথা বলিতেছিল, তখন সে মূর্ত্তির ভিতর হইতে, যেন মা ভগবতী, অবলার জিহ্বার ভিতরে জিহ্বা রাখিয়া, কণ্ঠের ভিতরে কণ্ঠ র'খিয়া, রূপের ভিতরে রূপ ফুটা-ইয়া, সতী-ধর্ম্মের অমৃতময় উপদেশে সে স্থানের আকাশ ও নলিনীর প্রাণকে স্বর্গে পরিণত করিতেছিল। নলিনী ভাবে বিহ্বলা হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "স্বামীর নাম উচ্চারণ করিবার সময় অত অভিভূত হও কেন" ?—আপনাকে ভুলিয়া যাও কেন ?

অ। উহা অপেক্ষা মিষ্ট নাম নাই। উহা অপেক্ষা মিষ্ট গান আর নাই। তোরা বলিস, কোকিলের স্বরে স্বামীর নাম ডাকত হয়, আমার কাছে তাই স্বামীর নামে কোকিল, পাপিয়ার গান যেন চারিদিকে বাজিয়া উঠে। ও নাম জপিতে জপিতে পৃথিবীর দিক সকল ও নামের মিষ্টতায় পূর্ণ হয় ; নামের গন্ধে জগৎ ভোরপুর হয় ; পৃথিবীর তিক্ততা, দুঃখ যন্ত্রণার চিহ্ন পর্য্যন্ত

তখন আর দেখিতে পাই না। আমার কাছে যদি কেহ ও নাম খুলিয়া দেয়, তো, আমার বড়ই তৃপ্তি বোধ হয়। আমি কত ভাবি আকাশের গায়ে, তারকার গায়ে, চন্দ্র সূর্য্যের গায়ে, ও মধুর নাম যদি কেহ লিখিয়া রাখে, তো, আমার প্রাণের সাধ যেন কতকটা মিটে। শত সহস্র লোকের সাধ মিটেনা, প্রাণের পিপাসা মিটেনা। ও নামে সংসার ঢাকিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। তাই নলিনি! কেন অভিভূত হই এখন বুঝতে পারনি।

কথা শুনিতে শুনিতে নলিনী অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল;—নলিনীর কণ্টকিত দেহ, প্রেমের মধুর উচ্ছ্বাসে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। আর অবলা তখন স্বর্গে কি মর্ত্তে কি ভগবানের হৃদয়ের ভিতরে তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না;—অবলা তখন প্রেমরূপিণী ভগবতী।

আর এক দিবস নলিনী, একছড়া বকুলের মালা ও একটী বৃহৎ গোলাপ ফুল লইয়া অবলাকে উপহার দিল। দিয়া বলিল ভাই। তোমার জন্ত কেমন সুন্দর জিনিস আনিয়াছি লও'।

অবলা একটু হাসিয়া বলিল, "ভাই! এগুলি তোমার চাঁদে ডাকে পাঠায়ে দাও। আমার মালার বড় অভাব কি না। তাই সমস্ত দিন ঘাড় হেট ক'রে ব'সে ব'সে, বকুলের মালা গেঁথে এনেছ। তোকে এত কষ্ট করিতে কে ব'লেছিল। ঘাড়ে কত ব্যথা হ'য়েছে, আঙ্গুলে কত লেগেছে।

ন। তাতে আবার কেন লাগতে গেল? তুমি কাহার নাম জপ কর, তাই, তোমার জপের জন্ত ফুলের মালা এনেছি। এই দিন এই মালায় স্বামীর নাম জপ করিস ভাই।

ন। আমরণ ও বুঝি কেবল কাঠের মালা। আমি ওতে যে সব পাই, কেবল [illegible] কি তোমায় বলুন বুঝে আছে। তুই হাট হতে একছড়া কাঠের মালা কিনে আনিয়ে [illegible] তোর "শরৎচন্দ্রের" নাম জপ করিস, তো বুঝিতে পারিস, বকুলের মালার চেয়ে কাঠের মালায় [illegible] সুখ! নলিনি! প্রাণ যার পুড়ে [illegible] হয়েছে, তার কি ওসব মাটির ফুল ভাল [illegible] আকুল [illegible] যে রাত দিন স্বামী ধ্যান ক'রেও নিজের পাপ ক্ষয় ক'রতে পারছেনা, তার কি স্বামীপদ ছাড়া অন্য সব ভাল লাগে! নলিনি! তোর স্বামী আছে, স্বামী-ভক্তি আছে; আচ্ছা আমার মাথা ছুঁয়ে বল দেখি—ভেবে দেখ দেখি স্বামীর শ্রীচরণের শোভার কাছে",—বলিতে বলিতে অবলার ভাবভরে কণ্ঠরোধ হইল;—অবলা প্রেম মদিরা পানে পাগলিনী হইয়া, নলিনীর গলা জড়াইল; বুকে মুখ গুঁজিয়া উষ্ণ নিঃশ্বাসে, উষ্ণ অশ্রুজলে কিয়ৎক্ষণ ডুবিয়া স্বামীর শ্রীচরণ দেখিবার জন্য হৃদয়ের ভিতরে ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অবলা একটু স্থির হইয়া বসিল। নলিনী ভক্তিভরে ব্যাকুল প্রাণে কহিল, "অবলা! তুমি দেবী। বাস্তবিক আজ হ'তে স্বামী-শ্রীচরণের গৌরব বুঝতে পারিলাম! সে চরণ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর কিছু পবিত্র সুন্দর জিনিস জগতে নাই। আমি হতভাগিনী; তোমার সঙ্গে থেকেও বুঝতে পারলাম না।

ন। ভাই! আমার দিদিমা বড় সতী ছিলেন। কেমন

সতী আমাদের দেশে কখনও জন্মে নাই। তিনি ব'লতেন কি শুনবি ?—

[redacted]

ভাই আমাদের [redacted] দুই সমান। কেমন সতী দেখতে তো [illegible] সঙ্গে দেখাই নাই। আমার দিদিমা প্রত্যহ ঠাকুরদাদার পাদোদক খেতেন। মাথার চুল দিয়ে পা মুছে [illegible] রাখিতি। আমার বৃথা জন্ম। আমার মত পাপিষ্ঠা আর নাই। আমার [illegible] ধিক আমার রূপেও ধিক। পূর্বজন্মে কত নারীকে পতিহীনা ক'রে তার ফল ভোগ করছি"। অবলা আবার কাঁদিয়া ফেলিল। নলিনী অবলাকে বার বার কাঁদিতে দেখিয়া বলিল, ভাই তুমি কাঁদ কেন? আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে যদি কাঁদ তো আর তোমায় কাঁদাতে আসবো না।

অ। কাঁদি যখন তখন জানিবি অবলার বড় সুখ। এ কান্নায় যদি সমুদ্র [illegible] বাঁচি। তাঁকে ভাবিতে ভাবিতে [illegible] তাঁর কাছে বসিয়া কাঁদিতেছি এবং তিনি সমুদয় দেখিতেছেন। তবে দুঃখ এই, চোখের জল বুকে বহায়, মাটীতে পড়ে, তাঁর চরণে পড়ে না। যদি কখনও পড়ে, তো, অবলার সুখের আর সীমা থাকিবে না। আর যদি কিছু দুঃখ থাকে, সে তো তাঁর জন্য—এ সুখের দুঃখ"। নলিনী কথা শুনিয়া নির্বাক হইয়া থাকিল।—

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, ভাই! আমি তাঁকে একখানা পত্র লিখবো, পরে ঐ ছড়াটি দিয়ে পাঠাব, ও ছড়াটি তুই আর একবার বল। তোর মুখেই আর একবার শুনি।

অবলা সতীর ভাবে ভরিয়ে,
চাঁদের [illegible]
[illegible]
পতির [illegible]

আরও শোন:—

পদ [illegible] সতীলোকে যা।
পতিরে সতীর হাতে [illegible] হয়।

ন। তুই তো এসব এত দিন বলিস নাই। তোর র ছড়া শুনে তোর দিদিমাকে দেখতে ইচ্ছা ক'রছে। ভাই! সেই ম'রে বুঝি তুই হ'য়েছিস।

অ। তাঁর পোড়া কপাল আর কি?

ন। আর ছড়া জানিস তো বল ভাই।

অ। শোন:—

পতির চরণ পূজি সেরে যোগায় জলে বেলা।
এমন সতীর পা দুখানি পূজি দুটী বেলা।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

অবলা যে দিন [illegible] কপাল ভাঙিয়াছে—সে দিন হইতে তার দেহে সৌন্দর্য্য [illegible] গেল। অবলার মুখের ভাব থাকিল। অবলা স্থির দৃষ্টিতে যেন পৃথিবী ভেদিয়া স্বামী দেখিবার প্রয়াস পাইত—কখনও আকাশের দিকে চাহিয়া যেন স্বামীকে খুঁজিতে থাকিত। জগতে যে খাইতে হয় তাহা ভুলিল। আপনার ঘরে মুদিতনেত্রে শুইয়া থাকিল। স্বামী-চিন্তায় জগৎ হারাইল—ঈশ্বরের সৃষ্টি ছাড়িয়া যেন নিজে এক স্বামী চিন্তাময় জগৎ সৃষ্টি করিতে থাকিল। সে জগতে আর কেহ থাকিল না—থাকিল অবলা এবং তার স্বামী। সে জগতের আকাশ, মাটি, জল, আগুন সবই তার স্বামী, আর অবলা সেই জগতের—সেই মন্দিরের সেবা-দাসী। অবলা কাহারও কথা শুনিল না—কাহাকেও কিছু বলিল না। কত লোক অবলাকে কত ডাকিল সাধিল—অবলা কোন উত্তর করিল না—মড়ার মত পড়িয়া থাকিল। রাত্রি আসিল। অবলা স্বপ্ন দেখিল। "সেন পুরের সেই বাটী"। সেখানে কেহ নাই। অবলার মা আসিয়া অবলাকে বলিল "অবলা একবার আকাশে দেখ"। অবলা দেখিল আকাশে রাত্রি হইয়াছে—আকাশে অন্ধকার, সেই অন্ধকারে তারকা সকল জ্বলিতেছে—চাঁদ উড়িয়া যাইতেছে,—আর ভূতলে সূর্য্য পড়িয়া রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! দেখিতে দেখিতে ভূতলের সূর্য্য নিবিয়া গেল—আকাশের চন্দ্র

কিন্তু
...বয়া গেল—তারকা সকল নিবিয়া গেল;—তখন আকাশে ভূতলে ভীষণ অন্ধকার—অন্ধকারে আকাশ পৃথিবী বিলীন হইয়াছে। অবলার মা বলিল, ঐ অন্ধকারে কে দাঁড়াইয়া দেখ। অবলা দেখিল, সেই আঁধার[illegible] এক মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। স্ত্রীলোক—পরিধান, লাল [illegible]। মাথার চুল আলুলায়িত। সিঁথায় সিঁদুর [illegible] মাথার চুল অন্ধকারে বিলীন। সেই মূর্ত্তি [illegible] উর্দ্ধদিকে চাহিল। চক্ষে অমনি আগুন জ্বলিল—অন্ধকারে আলো প্রকাশ পাইল—দুই চক্ষু দুই বড় বড় তারকার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। আঙ্গুলের দশ নখে আলো ফুটিল—পায়ের দশ নখে আলো ফুটিল—মুখের ভিতর হইতে আলো ফুটিল—সিঁথায় সিন্দুর-স্থল হইতে জ্যোতিঃ বাহির হইল। মাথার উপরে আলোর অক্ষরে কে লিখিল "হিন্দুর বিধবা"!

সেই মূর্ত্তি অবলাকে ডাকিল। অবলাকে কোলে করিল। অবলাকে অন্ধকারের ভিতর দিয়া কোথায় লইয়া গেল। এক দুর্গা মন্দিরে লইয়া গেল। অবলাকে মন্দিরে দাঁড়করাইয়া বলিল, "মা! একবার দাঁড়াও তোমায় পদ্ম ফুলে পূজা করি"। কথা শুনিয়া অবলা ভয় পাইল। সে মূর্ত্তি বলিল "মা! তুমি সাক্ষাৎ সতী ভগবতী। তোমায় বিধবা করে কার সাধ্য। আমি তোমায় পূজা ক'রে পর জন্মে যেন স্বামীর কোলে যেতে পারি এই আশীর্বাদ কর"। তারপর অবলা দাঁড়াইল। সেই মূর্ত্তি অবলাকে পূজা করিল। পূজা করিতে করিতে অবলার ভিতর হইতে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি বাহির হইল। মূর্ত্তি আবার অবলার মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দির মধ্যে শব্দ হইল "অবলা—

তোমার স্বামী আছেন—তুমি হাতের লোহা খুলিও না—মাথার সিঁদুর মুছিও না। তোমার স্বামীর অমঙ্গল হইবে"। হঠাৎ অবলার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সুবলা চাহিয়া দেখিল অবলার স্বামী হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে।

অবলা কাহারও কথায় বিশ্বাস করিত না—সেই স্বপ্ন দেখিবার পর অবলার দেহে সৌন্দর্য্য ফিরিল। যেমন অবলা তেমনি হইল। লোকে আশ্চর্য্য হইল—অবলার সিঁথার সিন্দুরের উজ্জলতা সে দিন হইতে বাড়িতে থাকিল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রামদাস একদিন কলিকাতায় যাইল। অনেক বৎসরের পর, কলিকাতায় যাওয়ায়, রামদাসের বন্ধু বান্ধবেরা তাহাকে একটু বেশি করিয়া চিনিতে লাগিল।

পুরাতন বন্ধু বঙ্কি বাবুর সহিত দেখা হইল। বঙ্কি বাবু ভারত-উদ্ধারের দলে একজন প্রধান নেতা।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছেন "Child is the father of man অর্থাৎ সন্তান মানুষের বাপ। বঙ্কিম ছেলেবেলায় [illegible]

তার theory of evolution এর (ক্রমবিকাশের) নিয়মানুসারে খুব উন্নত হইয়াছে। অর্থাৎ এক কথায় বলিতে হইলে এই বলিতে হয় যে মতির সেকটি বাঙ্গালীর, আত্মা, প্রাণ, মন, কথাবার্ত্তা, চলা, খাওয়া, শোওয়া, স্বপন দেখা, প্রণয় করা সবই সাহেবের।

মতি বাবুর বৈঠকখানায় রাধিকা বাবু মতি সাহেবের সহিত কথা কহিতেছেন:—

ম। রাধভাল। ওটাতেও পাড়াগাঁয়ে ছেলে কি করে তাই বোলটো?

রা। পাড়াগাঁ তো ভাল

ম। ড্যাম ড্যামটি প্লেস। আচ্ছা তাহার উদ্ধারের কি করিলে?

রা। তুমি কি করিলে?

ম। চর্ম্মের দারা হইবে না।

রা। কিসে হইবে?

ম। দেশের লোকেরা উন্নত না হইলে কিছু হইতে পারে না।

রা। তার যোগাড় করুন।

ম। বাঙ্গালীর ঘর হইতে সবগুলিকে তাড়াইতে হইবে—তাহাদের স্থলে বিবি ডিগকে আনাইয়া বসাইতে হইবে।

রা। মা—খুড়ি—জেঠাই—ভগিনী—স্ত্রী সকলকে তাড়াইতে হইবে? এ আপনার কেমন কথা?

ম। তাহা না করিলে কিছুই হইবে না।

সেইকালে একখানি মুখ বাঁধিয়া সব শুনিতেছিল। সে রাধিকা

বলিল, 'আজ্ঞা বাবাকে বাড়ী থেকে তাড়া-
সাহেবকে বলালে তো হয়'।

মতি বাবু রাগিয়া বলিলেন 'আমার ডিভান পেঁ-
তুর হও'।

বৃদ্ধ পলায়ন করিল।

আবার দুজনে কথা চলিতে লাগিল।

ম। বিধবা বিবাহটা বড় দরকার হয়েছে।

রা। ও বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ মত। আমার একটি ভগিনী অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে। তার বিবাহ আমি দিতে ইচ্ছা করি। মতি বাবু অমনি রামলালের হস্ত মর্দন করিয়া বলিলেন 'একে বলে মরাল কারেজ্।' আজই বিবাহ দেওয়া উচিট্।

রা। আমার দেখাদেখি আর কেউ যদি অগ্রসর হয় তো খুব সাহস হয়।

ম। আমি আমার খুড়ির আবার বিবাহ দেব।

রা। বয়স কত?

ম। ৩৫ বট্সর হইবে। দুইটি পুত্র আছে তাহারা এ বিষয়ে খুব অগ্রসর।

রা। ওটা আমার ভাল লাগে না।

ম। তুমি স্বাধীনটার মর্ম বুঝ নাই।

রা। পরলোকের বিষয় ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়।

ম। পরলোক তুমি মান! কি ভয় টোমার!

রা। আপনি কি মানেন না?

ম। এখন নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি। বিজ্ঞানের তেজে সব

তার theory of evolu। এখন দূরবীক্ষণ তারা কত দূরের খুব উন্নত হইয়াছে। যদি পরলোক থাকিত তো দূরবীক্ষণ বলিতে হয় যে দূর[illegible]া পরলোকের কিছু টাড়াই· কথাবার্তা, যি বি, এ পাশ করে এসব বলে। ছ্যা ছ্যা। বি, এ পাসের, পাশ করে যে পরলোক মানে—পড় মানে, সে মূর্খ সে ইংরাজি শিক্ষার অপমান করে, সে ইউনিভার্সিটির উপাধির উপযুক্ত নহে।

মা। যাহা হউক আমার ভাগিনীর বিবাহ নিশ্চয়ই দেব। আপনি পাত্রের অনুসন্ধান করুন।

মতি বাবুর বড় আনন্দ। ইচ্ছা বাঙ্গালী না মেলে ফিরিঙ্গির সহিত বিবাহ দিবেন।

তিন চারিদিন পরে পাত্রের সন্ধান হইল। পাত্রটি এম, এ। একজন প্রসিদ্ধ জমিদার। দশ বার হাজার টাকার গহনা এবং পাত্রীর নামে সমুদয় বিষয় লেখা পড়া করিয়া দিতে প্রস্তুত।

বিবাহের দিন স্থির করিয়া রামদাস বাড়ি চলিয়া গেল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—•⁂(•)⁂•—

রামলাল বাবু বাড়িতে গিয়া স্ত্রীকে সব বলিল। স্ত্রী প্রথমে অস্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু বিদ্যের কথা শুনিয়া বলিল 'যদি শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের মত থাকে তবে তো ভালই। আর অবলার অদৃষ্টে যদি ভগবান সুখ লিখে থাকেন তো কে খণ্ডাবে।

অবলা লোক-পরম্পরায় শুনিয়াছিল—স্বামী নাই, কিন্তু অবলা তাহাতে বিশ্বাস করে নাই। অবলার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যোগিনীর কথা মিথ্যা নয়। আমার স্বামী আছেন—নিশ্চয়ই আছেন।

ক্রমে অবলা মামীর কাছে সব শুনিল যে, তাহার বিবাহ স্থির হইবে। শুনিয়া অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল মামী তুমি আমায় এমন ঠাট্টা কর তো বিষ খাব'।

মামী বলিল 'না গো তাতে কোন দোষ নাই। বিদ্যাসাগরের মতে কত বিধবার বিয়ে হ'য়েছে এখনও হচ্ছে'।

অবলা তামাসা মনে করিয়া চুপ করিল।

কিন্তু অবলা দেখিতেছে বাড়িতে বিবাহের বাস্তবিক যোগাড় হইতেছে। পাড়াতেও একটি গোল উঠিয়াছে যে 'ওদের অবলার আবার বিয়ে হবে'।

অবলা মামার বাড়িটিকে নরকের ন্যায় বোধ করিতে লাগিল। সে সব কথা শুনিয়া অবধি অবলা আর কিছু খায়

না, কাহারও সহিত কথা কহে না। কেবল নির্জনে বসিয়া সেই ছবিখানিকে দেখে আর কাঁদে। অবলা মনে মনে স্থির করিল, এবাড়িতে আর থাকিব না, পূর্বের মত ভিক্ষা করিতে করিতে দেশে দেশে তাঁকে খুঁজিব।

এই রূপ ভাবিয়া ভাবিয়ে অবলা কাঁদিতে থাকিত। এক দিন সন্ধ্যা আগত প্রায়। কলিকাতা হইতে পালকি করিয়া বর আসিল। দশ বারো জন ভদ্রলোক ও রামদাস কলিকাতা হইতে উপস্থিত।

বিনোদিনী শাঁক বাজাইল।

অবলা সেই সব ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে থর থর কাঁপিতেছে। গভীর শোকাবহ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে আর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে 'পৃথিবী! আমার তোমার গর্ভে স্থান দাও। বাতাস! আমায় এখান হইতে উড়াইয়া লইয়া চল। মৃত্যু! আমায় পৃথিবী হইতে দূর কর'।

রাত্রি হইল। বিবাহের সমুদয় আয়োজন ঠিক হইল। রামদাস স্ত্রীকে বলিল, অবলাকে কাপড় পরায়ে কোলে করে ও ঘরে নিয়ে চল।

অবলা যে ইতিমধ্যেই সে বাড়ি কখন পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। বিনোদিনী ঘর খুঁজিল, অবলাকে পাইল না। ঘাটে গিয়া খুঁজিল, অবলাকে পাইল না। রামকে হাঁকাইতে হাঁকাইতে আসিয়া বলিল 'ওগো অবলা কোথা গেল। ঘাট থেকে আসি বলে যে গেল আর যে দেখতে পাই না। বোধ হয় বা সর্বনাশ হল। গ্রাম গ্রামের ঘরে ঘরে খুঁজিল কোথাও পাইল না। পরে ভাবিল 'সর্বনাশ'।

বিনোদিনী বলিল 'যেমন বুদ্ধি তোমার! সে এসব দেখে ঘৃণায় হয় তো জলে ডুবেছে'। এই কথা বলিয়া বিনোদিনী 'মা অবলা গো' বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রামদাস স্তম্ভিত হইল। রামদাস ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতেছে। এদিকে ভদ্র লোকদিগকে কি বলিবে স্থির করিতে পারিতেছে না. আবার সেই সোণার প্রতিমা অবলা কোথায় গেল ভাবিয়া আকুল হইতেছে।

রামদাস স্ত্রীকে ঘাটে লইয়া গেল। আরও দুই একজন লোক ডাকিয়া জল খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু জলে পাইল না।

সেই সময়ে গ্রামের ভয়ানক বনে একটি নেকড়ে বাঘ আসিয়াছিল। সকলে ভাবিল নিশ্চয়ই নেকড়ে বাঘে সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে! রামদাসের বাড়ির পেছনের বাগান খুঁজিতে খুঁজিতে দেখা গেল এক স্থলে ২টি আঙুল পড়িয়া আছে রক্তের ঢেউ খেলিতেছে। রামদাস দেখিয়া মাথা চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল; বিনোদিনী গভীর আর্ত্তস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বর, বরযাত্রীগণ দেখিল রাত্রি প্রায় ১২টা বাজে। আর বাড়িতে সেই সব কান্না কাটনা। রামদাস কাঁদিতে কাঁদিতে ভদ্রলোকদিগের কাছে গিয়া বলিল, 'সর্ব্বনাশ! আমার ভগিনীকে বাঘে খাইয়াছে'।

ভদ্রলোকগণ অবশেষে সে বাড়ি সেই রাত্রেই পরিত্যাগ করিল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাণীগঞ্জের ষ্টেশন হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে বিষ্ণুপুর নামে এক গ্রাম আছে, সেই গ্রামের মধ্য দিয়া বড় রাস্তা চলিয়াছে। বাঁকুড়ার রাস্তার দুই ধারে দোকান।

একদিন চৈত্রমাসের অপরাহ্নে, সেই বাজারে একখানি ঘোড়ার গাড়ি আসিল। গাড়ির ভিতর হইতে একজন যুবা ও একটি যুবতী বাহির হইল। দুজনে দোকানে অনুসন্ধান করিয়া একটি ঘর ভাড়া লইল।

যুবার বয়স আনুমানিক ৩০ বৎসর হইবে। দেখিতে গৌরাঙ্গ। বুকের উপরে দাড়ি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ললাট প্রশস্ত। দেখিলেই একজন বিদ্বান্ লোক বলিয়া মনে হয়, আকৃতি গম্ভীর।

যুবতীর বয়স বোধ হয় আঠার উনিশ বৎসর হইবে। বিধাতার গড়া একটী অপূর্ব্ব গঠন। যেমনি ডাগর ডাগর চক্ষু, তেমনি পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় বদন, তেমনি নাক, কাণ, বক্ষ, কক্ষ, হাত, পা। যুবতী মন্থর গতিতে পা ফেলিতে ফেলিতে একটি গহনার বাক্স হাতে লইয়া যুবার সঙ্গে একটী ঘরে প্রবেশ করিল।

দোকানী একটী মাদুর ও একটি বালিশ আনিয়া দিল।

একটু ধীর প্রভাবে যুবতীর ললাট দেশ হইতে মুক্তা ফলের ন্যায় ঘর্ম বিন্দু পতিত হইতেছে দেখিয়া রুমাল দিয়া যুবা যুবতীর মুখে বাতাস করিতেছিলেন।

যুবতী একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিল 'এরকমে তো আর চলে না, এক যায়গায় স্থির হ'য়ে থাকা চাই।'

যুবা বলিল 'তা সে তোমার ইচ্ছা। হিন্দুশাস্ত্রের মতে বিবাহ তো হ'য়ে গেছে, এখন তো আর কোন ভয় নাই'।

যুবতী। দেশে কি প্রকারে যাওয়া যাবে?

যুবা। তুমি তোমার মাকে একখানা পত্র লেখ যে, আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। এখন যদি তোমাদের মত হয় তো দেশে আবার যাই।

যুবতী। মা আমার মত ছুট কষ্ট ক'রছেন। কিন্তু বাবা খুব রেগেছেন।

যুবা। তোমার বাবা, যদি আমায় পান তো বোধ হয় কেটে ফেলেন।

যুবতী। তাঁর তো মত ছিল। আমি বেশ জানি, আমি বিধবা হবার তিন চার দিন পরে তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে আমার আবার বিবাহের জন্য গিয়াছিলেন।

যুবা। তা আমিও জানি। কেন, তিনি আমায় একদিন পরেই কোন বন্ধু দ্বারা বলাইয়াছিলেন, আমার বিধবা বিবাহে মত আছে কি না। যাই হ'ক, ভয় নাই। আমি যখন এমন, এ পাপ করেছি, তখন আর ভয় নাই। এক রকমে চালাইব।

যুবতী। সে যা হয় হবে, এখন খাওয়া দাওয়ার চেষ্টা দেখ।

যুবা। কি খাবে?

যুবতী। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর না।

যুবা। খিচুড়িই তবে করা যাক।

পরে দুজনে মহা-আনন্দে খিচুড়ি রাঁধিয়া খাইল। খাইয়া শয়ন করিয়া দুজনে কথোপকথন করিতেছে :—

যুবতী। আচ্ছা, তোমার কি আর বিবাহ হয় নাই?

যুবা। ছেলে বেলায় হয়েছিল।

যুবতী। সে স্ত্রী তোমার কোথা?

যুবা। আমি তো কিছুই জানি না। আমার বয়স যখন দশ বৎসর, আর আমার সে স্ত্রীর বয়স যখন তিন বৎসর, তখন বিবাহ হয়। মেয়েটি খুব সুন্দরী ছিল। আমার শ্বশুরদের তো আর কেউ নাই। তাঁদের দেশে মাঝে বড় মড়ক হয়েছিল, সেই মড়কেই সব মারা গেছে।

যুবতী। বিবাহের পর তুমি আর গেছলে?

যুবা। না, যাই নাই।

যুবতী। ম'রে যদি না গিয়ে থাকে।

যুবা। তা হ'লে তোমার একটি সতীন আছে।

যুবতী। ওতে তোমাকে বিশ্বাস নাই।

যুবা। কেন?

যুবতী। স্ত্রীর খবর যে লয় না তাকে আবার কিসের বিশ্বাস। আমাকেও তো তুমি ওই রকম ভুলে যেতে পার?

যুবা। তা নয়। তুমি এক—আর সে-এক। কবে ছেলে বেলায় মা বাপ ধরে যে দিয়েছিল, সে কি আর বিবাহ?

এই বিবাহই বিবাহ। এই বলিয়া স্ত্রীকে আপন [illegible] ধীরে তাহার মুখচুম্বন করিল।

দোকানের ঘরে জানালা নাই। কবাট বন্ধ করিলেই ঘরটী একটী প্রকাণ্ড সিন্দুক প্রায়। ঘরের ভিতরে দুজনের অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হওয়াতে, দুজনে বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া শয়ন করিল।

যুবতী বলিল 'ভয় কিছু নাই, আমি মা বাপের সবে একটী মেয়ে। বিষয় সবই আমার।'

যুবা। তুমিতো তাঁদের ঘরে ফেলে আমার সঙ্গে চ'লে এসেছ। দেশের সকলেই খারাপ ভাবে আমাদিগকে লয়েছে। তোমার বাপ জেনেছেন, মেয়ে আমার কুলে কালি দিয়েছে। এ অবস্থায় তোমার বাপ কি আর তোমার প্রত্যাশায় বিষয় রাখবেন? হয় তিনি পোষ্য পুত্র লবেন, না হয় আর কাকেও বিষয় দেবেন।

যুবতী। তিনি যাই করুন, তুমি বেঁচে থাক আমার ভাবনা কি?

এইরূপে কথা কহিতে কহিতে দুজনে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। বাজারে কুকুর গুলা মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করিতেছে। বাজারের রাস্তা দিয়া দুই এক খানা গোরুর গাড়ি কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ শব্দ করিতে করিতে যাইতেছে। দুই এক জন গাড়োয়ান অশ্লীল গান গাহিতে গাহিতে গোরুর লেজ মলিতেছে। এমন সময়ে যুবতীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। যুবার গায়ে হাত দিতে গেল—হাত ভূমের উপরে পড়িল। কই যুবা কোথায় গেল? যুবতী উঠিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া

বুধা। বুঝি কো আই। যুবতীর প্রাণ চমকিত হইল। ভাবিল বোধ হয় বাহে গিয়া থাকিবে। এই ভাবিয়া একটু অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। চারিদিকে কাক কোকিল ডাকিল। আকাশে সূর্য্য উঠিল। দোকানদারেরা দোকান খুলিল। সূর্য্যের আলোক ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। কিন্তু বুধার তথাপি দেখা নাই। যুবতীর মাথায় বাজ পড়িল! ভাবিল একি! কোথায় গেল। দোকানদারকে সে কথা বলিল। দোকানদার বলিল, তাইতো কোথায় গেলেন। দোকানদার একবার এদিক ওদিক খুঁজিল, কিন্তু দেখা পাইল না। যুবতী গহনার বাক্সটী লইয়া বিপদে পড়িল। অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া যুবতী কাঁদিতে লাগিল। দুই একজন দুষ্টলোক যুবতীর কাছে মন্দভাবে যাতায়াত করিতেছে দেখিয়া, যুবতীর আরও ভয় হইল। যুবতী ঘরের ভিতরে গিয়া বসিল। ঘরের একটী ধারে পাগলিনীর মত বসিয়া অশ্রুমোচন করিতেছে, এমন সময়ে একটী অসামান্য-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না রমণী একটি ঝাঁটা হস্তে সেই ঘরের কাছে উপস্থিত হইল।

এই রমণী প্রাতঃকালে মধুপুর বাজারের দোকান ঘর ঝাঁট দিয়া থাকে। প্রত্যেক দোকানী ঐ স্ত্রীলোকটীকে ঝাঁট দেবার দরুণ মাসিক চারি আনা করিয়া দিয়া থাকে। ইহাতে স্ত্রীলোকটির মাসে প্রায় ৫।৬ টাকা উপার্জ্জন হয়। ঐ ৫।৬ টাকা লইয়া রমণী পেটে খায় না, গরিব দুঃখিদিগকে দান করে। রমণীর সেই চরিত্রবলে, সুন্দর বন্দোবস্ত ভগবান করিয়া দিয়াছেন। সেই বাজারের একপার্শ্বে রমণীর একটি কুটীর আছে। সেই

ঢুকে পড়ে, রমণী সর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে। এই পল্লীতে একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্য আছেন, তিনি প্রত্যহ একটি করিয়া বড়ি পাঠাইয়া দেন, তাহাতেই রমণীর জীবন রক্ষা হয়। বাবাজির আশ্রম দূর বলিয়া সকলেই রমণীকে আদরের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা করে। গ্রামের মধ্যে যে ঘোরতর দুশ্চরিত্র, সেও ঐ রমণীকে আপনার সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করে।

রমণীর একখানি লালপেড়ে শাড়ী পরিধান। মাথায় দীর্ঘ সিঁদুরের রেখা। হাতে শাঁখা। দেখিলেই বোধ হয় স্বর্গের সমুদয় সৌন্দর্য্য—সমুদয় পুণ্য, সেই মূর্ত্তির ভিতরে বসিয়া অনন্ত আলোকে জ্বলিতেছে। সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির তলে বসিয়া কত দুশ্চরিত্র সচ্চরিত্রতা লাভ করিয়াছে—কত কুলত্যাগিনী যুবতী সেই সতীত্বের প্রভাবে অভিভূত হইয়া কুলে ফিরিয়াছে।

রমণীর বয়ঃক্রম প্রায় ২২ বৎসর হইবে। রমণী ঝাঁটা-হস্তে সেই ঘরের কাছে দাঁড়াইবা মাত্র, ভিতরের যুবতীর মন যেন সরল হইল। যুবতী আপনার চক্ষের জল মুছিয়া রমণীর দিকে চাহিয়া থাকিল।

রমণী ঝাঁটাটি দ্বারের কাছে রাখিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া স্নেহমাখান স্বরে বলিল 'কেন দিদি অমন ক'রে বসে রয়েছ?'

যুবতী কাঁদিয়া ফেলিল দেখিয়া, রমণীর মন একটু বেশী বিচলিত হইল। স্নেহার্দ্র স্বরে রমণী যুবতীর হাত ধরিয়া বলিল 'আমি তোমার বড় ভগিনী। তোমার কিছু ভয় নাই। কি হয়েছে আমায় বল'।

যুবতী কাতর যেন একটু অনুনয় করিয়া বলিল 'আমার স্বামী কোথায় গেছেন দেখতে পাচ্ছি না।'

'না। কখন গেছেন?'

'হু। রাত্রে ঘুমোবার আগে শুয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে তাঁর দেখতে পাই নাই। মনে ক'রলাম বুঝি বাহিরে গিয়া থাক্‌বেন; কিন্তু কই! এত বেলা হ'ল, এখনও দেখা নাই। বলিয়াই যুবতী অবনতবদনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

রমণী যুবতীর উপস্থিত বিপদ অনুভব করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল 'কি ক'রবে দিদি, ভয় নাই স্বামী আপনি আসবেন'।

যুবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'একলা কোথায় যাব? আমার দশা কি হবে? আর তাঁর দশাই বা কি হ'ল। হয়তো ডাকাতে তাঁকে ধরে লয়ে গেছে। কি সর্ব্বনাশ হয়েছে—বুঝতে পারছি না।

রমণী বলিল, কিছু ভয় নাই। তুমি আমার কাছে থাক্‌বে এস। আমি তোমায় ভগিনীর ন্যায় যত্ন করিব। তারপর পরামর্শ ক'রে যা হয় করা যাবে। দিদি! তুমি একটু চুপ ক'রে বস, আমি আমার কাজ সেরে লই'।

রমণী দোকানের কাজ শেষ করিল। শেষ করিয়া যুবতীর কাছে আসিয়া বলিল 'বোন! বেলা অনেক হয়েছে, এখন আমার ওখানে চল।' আমি দোকানের ছোকরাকে বলে যাই যে, যদি তোমার স্বামী আসেন, তো, যেন, আমার ওখানে পাঠিয়ে দেয়। এ ছোকরাটিকে এখানে সকলেই চেনে, সকলেই আদর করে, তোমার কোন ভয় নাই'।

যুবতী অবশেষে অবলার পাছু লইয়া গল্পের মুখে ধীরে ধীরে রমণীর সঙ্গে সঙ্গে আবার কুটীরাভিমুখে যাত্রা করিল।

যাইবার সময় রমণী দোকানীকে বলিল 'দেখ, যদি, আমার স্বামী আসেন, তবে তাঁহাকে এখানে অপেক্ষা করিতে বলিবে। ইনি আমার এখানে চলেন।'

দোকানী বলিল 'আচ্ছা মা তাই করিব'।

যুবতী রমণীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রমণী যুবতীকে নানা কথা বলিয়া মনে প্রবোধ দিতেছিল।

গ্রামের এক পার্শ্বে, মাঠের ধারে, মাটীর একটি সামান্য ঘর। ঘরের চারিদিকে আমের বাগান। দুই পার্শ্বে আবার বাঁশ বন।

গৃহের ভিতরে চারিটী দেয়াল কাহার প্রতিমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। লাল, সাদা প্রভৃতি রঙে চিত্রিত কাহার চেহারা। সেই সব চিত্রিত চেহারার মধ্যদেশে একটী ফ্রেমে একখানি কাহার ফটোগ্রাফ ঝুলিতেছে। যুবতী ফটোগ্রাফ দেখিয়া, অনেকক্ষণ পরে চিনিল এ তার স্বামীর ছেলে বেলার চেহারা। বিশেষতঃ মুখের গঠন হাত পা সমুদায়ই সেইরূপ। দেখিয়া যুবতী চমকিয়া উঠিল—রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল 'আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসিতে ইচ্ছা হইতেছে'।

রমণী বলিল 'কি কথা দিদি'?

যুবতী। আপনার মাথায় সিন্দুর, হাতে লোহা দেখিতেছি, আপনার স্বামী কোথায়?

রমণী। সে সব অনেক কথা। সে সব কথা দিদি তোমার শুনে কাজ নাই। তাহাতে তোমার কষ্ট হইবে।

যুবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল অস্ফুটস্বরে, সবই অদৃষ্ট। আমার কিছুই ভাল লাগে না—তিনি কোথায় গেলেন? এই বলিয়া যুবতী কাঁদিয়া ফেলিল।

অবলা তাহার খোঁপা বাঁধিতে বাঁধিতে যুবতীর সহিত কথা কহিতে লাগিল।

অ। হাঁ দিদি তোমার নাম কি?

সু। সুশীলা।

অ। তোমরা ব্রাহ্মণ?

সু। হাঁ আমরা ব্রাহ্মণ।

অ। তোমাদের ঘর কোথা?

সুশীলা চুপ করিয়া রহিল, আর পরিচয় দিতে সাহস করিলনা।

সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল:—তোমার নাম?

অ। অবলা বালা।

সু। তোমার বাটী?

অ। সেনপুর।

সু। তোমার স্বামী আছেন?

অ। আছেন, নহিলে হাতে লোহা থাকে—মাথায় সিন্দূর থাকে।

সেই সময়ে অবলার মুখে চোখে একটা গভীর ভাবের রং ফুটিয়া উঠিল।

সু। তিনি কোথায়?

সে সব বিষয় কি শুনিবে? যদি শুন, তো, আমি সব আগাগোড়া বলি। কিন্তু সে সব অনেক কথা। তোমার এ দুঃখের সময় কি সে সব ভাল লাগিবে?

হু! আর কি করি, মনটা অন্যদিকে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই ভাল।

অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে, তখন আবার গোড়া সমুদায় খুলে বলিতে লাগিল।

সমস্ত শুনিয়া সুশীলা বেশ বুঝিতে পারিল এ আমার সতীন—নিশ্চয়ই সতীন। আর ঐ সব চেহারা তাঁর। কিন্তু এর যে রকম স্বামীর প্রতি ভালবাসা দেখ্‌ছি, যদি সে এসব টের পায় তো আমারই সর্ব্বনাশ। আর এর যে প্রকার রূপ দেখ্‌ছি, সে দেখে নিশ্চয়ই টল্‌বে।

আবার ভাবিল, আমি কি ভাবছি, তার দশা কি হ'ল তা কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না। হা ভগবান! শেষে কি আমার এই হ'ল। ভাবিতে ভাবিতে সুশীলা কাঁদিতে লাগিল।

তাহার পর দুই জনে আহারাদি শেষ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—•:(০):•—

সেই দিন সন্ধ্যাকালে, রজতশুভ্র অসংখ্য নক্ষত্র সমভিব্যাহারে আকাশে উদিত হইলে, সতী আপনার কুটিরের বাহিরে আসিয়া উপবেশন করিল। সন্ধ্যা-সমীরণ নানা ফুলের গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। দুই পাশে কিঞ্চিৎ দূরে বাঁশ বনের পাতা গুলি কম্পমান হইতেছে; বাঁশের উপরে বাঁশ ঘর্ষিত হওয়ায় ঈষৎ বাঁশি স্বরের মত শব্দ হইতেছে। দুই একটি বাদুড় ঝপ্ ঝপ্ শব্দে অবলার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে।

অবলা ভাবিতেছে,—এই চাঁদের কিরণে সমুদয় পৃথিবী ডুবিয়াছে; ইহাতে সকলেরই আনন্দ। আমার জীবনেশ্বর, আমার ভগবান, যেখানেই থাকুন, এই সন্ধ্যাকালে এই মধুর চন্দ্র-করে নিশ্চয়ই প্লাবিত হইয়াছেন। হয় তো ঐ চাঁদের দিকে চাহিয়া আছেন। আহা, এই চাঁদের আলোতে তিনি যেমন ডুবে আছেন, আমিও তেমনি ডুবে আছি। একখানি কাপড়ের ভিতরে আমরা দুজনে আছি। ঐ যে চাঁদ—ও আমায় যেমন দেখিতেছে, তাঁকেও তেমনি দেখিতেছে। আহা, ইচ্ছা করে উড়ে গিয়া উঠি, উঠে তাঁকে দেখি। আহা! চাঁদটি যদি লিখ্‌তে পারে, তো আমার দুঃখের কথা চাঁদের বুকে লিখে দি—তিনি তা হ'লে সব প'ড়ে ফেলেন—প'ড়ে



আমার জন্য পাগল হন। হা ভগবান্! তাঁর কি আর আমায় মনে আছে—তিনি [illegible] নাই। হা হ'ক চাঁদ! আমি তোকে প্রণাম করি। তুমি আমার জীবিতনাথের দিব্য শরীরে, যেমন স্পর্শ ক'রছ, আমার শরীরেও তেমনি কর চাঁদ। তুই যে চাঁদ; তোকে আমি বরাবরই ভালবাসি, কিন্তু আজ তোকে বুকে ধরতে ইচ্ছা হচ্ছে—তুই আমার প্রাণনাথের মুখ দেখতে পাচ্ছিস? হা চাঁদ! তোর কথা নাই, যদি থাক্‌তো তো তোকে প্রাণ দিয়ে আমার নাথের কথা জিজ্ঞাসা ক'রতাম। আহা, তোর কথা কবার ক্ষমতা থাক্‌লে পৃথিবীতে আর বিরহ জ্বালা, বিরহ ব্যথা থাক্‌তো না, স্বামী স্ত্রী পরস্পরে কোটী কোটি ক্রোশ দূরে থাক্‌লেও তোর সাহায্যে পরস্পর কথা ক'য়ে মহাসুখী হ'ত। চাঁদ! তোর কলঙ্কটা নাথকে দেখাস নি,—হয় তো তোর কলঙ্ক দেখে তাঁর মনে তত আনন্দ হচ্ছে না।

আহা! ঐ যে সাদা মেঘ খানি চাঁদের কাছ দিয়ে চ'লে গেল, ওকে আমার জীবনেশ্বর বোধ হয় দেখতে পেয়েছেন। আহা! আমি যদি মেঘ হ'তাম তো প্রাণনাথকে দেখতাম—যদি চাঁদের কিরণ হ'তাম, তো নাথের শরীরে আলোকিত ক'রে থাক্‌তাম।

আহা! কেমন ঝুর, ঝুর, ক'রে বাতাস বহিছে! এই বাতাস প্রাণনাথের শ্রীচরণ স্পর্শ ক'রে এসে—এখন আমার মাথার উপরে লাগ্‌ছে। বাতাস! তুই কি পবিত্র—তুই কি ভাগ্যবান! হায়! হায়! যদি ভগবান আমায় বাতাস ক'রতেন, তো, সর্ব্বদাই স্বামীর কাছে থাক্‌তাম—জীবনের জ্বালা সুশীতল মলয় শীতল হ'য়ে, মালতী ফুলের গন্ধে আমোদিত ক'রে

মহত্বের জন্যে যতদূর ক'রেছেন। ভগবান যদি, এখন আমার দেহকে আত্মাকে পবিত্র করেন, তো আমার অপেক্ষা সৌভাগ্যবতী আর কে আছে?

আর—এই পৃথিবীও এক পবিত্র মন্দির। আমার ঈশ্বর ইহাতে বাস করিতেছেন। এই পৃথিবী দেবমন্দির, আর আমার স্বামী এই মন্দিরের বিগ্রহ। সে বিগ্রহকে কে পূজা করিবে? আমি—আমি। আমি ভিন্ন সে দেবতাকে পূজা করিবার মন্ত্র কেহ জানে না। আর, এমন কি আছে যাহা দিয়া আমার স্বামীর পূজা করিব? মানুষে, ফুল নৈবিদ্য দিয়া ভগবানের পূজা করে, কিন্তু সে সব তো তুচ্ছ পদার্থ, তাহাতে পূজা করিয়া মন আমার তৃপ্ত হয় না। আমার এই যে জীবন,—এই তাঁর পূজার ফুল, এ ফুল তো তাঁকে দিয়াছি; আমার এই অস্থি মজ্জা—এসব তো তাঁকে অনেক দিন দিয়াছি, কিন্তু কবে তিনি আসিয়া গ্রহণ করিবেন? আহা! হতভাগিনীর সে সব কবে হবে, যে কাঁদিতে কাঁদিতে শাণিত তরবারে আপনার মাথা আপনি কাটিয়া তাঁর পদতলে প্রদান করিব। তিনি আমার এজীবন যে প্রকারে চাহিবেন সেই প্রকারে দেব। যদি বলেন 'আগুনে পুড়ে মর আমি দেখি, তাহা হইলে আমি হাসিতে হাসিতে তাহার পায়ের দিকে চাহিয়া জলন্ত আগুনে দেহ বিসর্জন করিব'।

হায় হতভাগিনী! তোর এসব দুরাশা কেন? যোগিনী বলিয়াছে, স্বামী আমায় গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু তাহাতে কি? যদি একবার তাঁর শ্রীচরণ দর্শন পাই তো আমার সুখের সীমা থাকিবে না। আহা, তাঁর পা দুখানি কেমন। সে পা

যদি একবার মাথায় বসিতে পারি। হতভাগিনীর অদৃষ্টে তা কি হবে? মাথায় বসা দূরে থাক, একটীবার যদি দেখতে পাই তো আমার জন্ম সার্থক হবে।

পৃথিবীতে যত জীব আছে সকলকেই আমার ভাল বাসিতে ইচ্ছা যায়, সকলেরই সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করে, কেননা পৃথিবীতে আমার স্বামী বাস করিতেছেন। বিহগ! ব্যাঘ্র! ভল্লুক! আয় তোরা আমার কাছে একবার আয়! একবার তোদের ধরে দেখি, তোদের ধরে বুকে করি, জানিনা কেন, তোদের জন্য আমার হৃদয়ে স্নেহ জেগে উঠ্‌লো। যে বায়ু আমার স্বামীকে স্পর্শ ক'রে আছে, সেই বায়ুতে তোরা মগ্ন; যে পৃথিবীতে আমার স্বামী, সেই পৃথিবীতে তোরা, যে আকাশের তলে আমার স্বামীর মস্তক, সেই আকাশের তলে তোদেরও মস্তক, বোধ হয় এই জন্য তোদের ধরে স্নেহ ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্ছে।"

অবলার হৃদয় সার্ব্বভৌমিক প্রেমে উন্মত্ত। অবলা এই প্রেমের প্রভাবে ঘৃণা বিদ্বেষ সব ভুলিয়াছে। পৃথিবীর সমুদয় প্রাণী আজ অবলার যেন প্রাণের সামগ্রী। পৃথিবীর চারিদিকে অবলার স্বামীর নাম যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পৃথিবীর যাবতীয় শব্দে যেন যোগেন্দ্র-নামের প্রতিধ্বনি উঠিতেছে! সমুদয় জীবজন্তুর গায়ে যেন সেই নাম লেখা রহিয়াছে। আকাশের তারকায়, তারকায়, বৃক্ষের পত্রে পত্রে, মেঘের স্তরে স্তরে, পৃথিবীর অণুতে অণুতে যেন কে যোগেন্দ্র নাম লিখিয়া রাখিয়াছে। যোগেন্দ্রের রূপে জগত আজ যেন পরিপূর্ণ।

সতী প্রেমাবেগে পাগলিনীর মত উন্মত্ত হইয়া কুটিরে প্রবেশ করিয়া সেই ছবি খানি লইয়া বাহিরে আসিয়া বসিল। বসুন্ধরা জ্যোৎস্না-পরিশোভিতা হইয়া হাসিতেছে; আর অবলা আপনার স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া দেখিতে উন্মাদিনী হইয়াছে। কভু অবলা বয়নে বসিল। হৃদয়ের ভিতরে সেই স্বামী মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইল। অবলা স্বামী ধ্যানে যোগিনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যোগেন্দ্র অবলার কুটিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিয়া সুশীলার মন তো আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

কিন্তু এদিকে দুঃখিনী অবলার দৃষ্টি সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির দিকে নিপতিত হইল। অবলা পৃথিবীতে অনেক জিনিস নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছে। অবলা কাঁচস্বচ্ছ নীলজলে প্রতিবিম্বিত পূর্ণচন্দ্র ও নক্ষত্র-খচিত আকাশের শোভা দেখিয়াছে; অবলা বর্ষাকালীন মেঘের মধ্যদেশে ভুবনমোহন ইন্দ্রধনুর অনুপম শোভা দেখিয়া আনন্দে বিগলিত হইয়াছে; অবলা অন্ধকারময়ী রজনীর আকাশে কাল মেঘের ভিতরে বিদ্যুতের মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়াছে; অবলা বসন্তকালের নবীন পত্র-শোভিতা লতিকায়

থাকুকরে ঈষৎ কম্পন দেখিয়া হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন করিয়াছে। কিন্তু এরূপ প্রাণারাম মূর্ত্তি, মনোমোহন প্রকৃতি, এ জীবনে কখনও দর্শন করে নাই। যেন ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শোভা একত্রী ভূত হইয়া সেই মূর্ত্তির হৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছে।

অবলার হৃদয়-প্রাণের সমুদয় সুখের তার একবারে বাজিয়া উঠিল। অবলার চক্ষু আপাদমুণ্ড সহসা নয়ন হইয়া মুকুলিত হইল। একটা কি স্বর্গের পাখী সেই গাছে বসিয়া যেন অবলার সুখের গান গাহিতে লাগিল।

অবলার হৃদয়ে প্রেমের সমুদ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল; হৃদয় প্রাণ নীরবে মধুর স্বরে বলিল, অবলা! আর তুমি কাঁদিও না, তোমার দুঃখের অমানিশা এত দিন পরে প্রভাত হইল—ঐ দেখ সুখের কোকিল ডাকিতেছে।

অবলার দুই চক্ষু স্থির। যদি সহস্র চক্ষু থাকিত তো, অবলা প্রাণ ভরিয়া সে মূর্ত্তি দেখিয়া তৃপ্ত হইত। অবলার সমুদয় প্রকৃতি স্থির, যেন অবলা আনন্দে—প্রেমোচ্ছ্বাসে প্রস্তরময়ী হইয়া গিয়াছে। অবলার দুটি চক্ষু দিয়া বর্ষার ধারার ন্যায় আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে—অবলার শরীর পুলকে কণ্টকিত।

চারিদিকের বাতাস যেন বলিতেছে, অবলা! আর তোমার শোকের দীর্ঘশ্বাস আমার অঙ্গে ফেলিতে হইবে না; তোমার স্বামীকে ভাল করিয়া দেখ।

মাথার উপরে নক্ষত্র সকল যেন বলিতেছে "ও অবলা! তোমার প্রাণের দেবতাকে ভাল ক'রে ধর।"

চারিদিকের বন ফুল সকল যেন অবলার আনন্দে আনন্দিত হইয়া বায়ুভরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে অঙ্গ দিল

অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ বিস্তার করিয়া বলিতেছে 'ও অবলা আমাদিগকে ল'য়ে মালা গেঁথে স্বামীর গলে আজ পরাও, আমাদের অনেক দিনের আশা আজ পূর্ণ কর'।

স্বর্গের যত আনন্দ, যত শান্তি, মধুর আজ অবলার হৃদয়ে উপস্থিত। আর যেন পৃথিবীতে অর জ্বালা থাকিবে না। আজ যেন পৃথিবী হইতে পাপ বহিষ্কৃত হইয়াছে। আজ যেন শোক দুঃখ ব্যাধি সব পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছে। আজ যেন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রবেশ করিয়াছে। যেন সহস্র বসন্ত ঋতু অবলার চারিদিকে উপস্থিত। চন্দ্রের কিরণ যেন একটু শান্ততর এবং সুরভিময় হইয়াছে। আর যেন কাহাকেও বিধবা হইতে হইবে না—পুত্র শোকে আকুল হইতে হইবে না। পৃথিবীর মলা, দুর্গন্ধ সব যেন অন্তর্হিত হইয়াছে।

সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি যে পৃথিবীতে, সে পৃথিবী স্বর্গ। সে পৃথিবীতে কি আর দুঃখ শোকের লেশ মাত্র থাকিতে পারে?

অবলার কাছে পৃথিবী আজ সম্পূর্ণরূপে নূতন ভাবে উপস্থিত। এবার যেন প্রতি রজনীতে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র উঠিবে। যেন সমুদায় নক্ষত্র ফুটিয়া পূর্ণচন্দ্রের আকার প্রাপ্ত হইবে। আর ফুলে কাঁটা, ফলে আটা থাকিবে না। আর বনে সাপের ভয়, বাঘ ভালুকের ভয় থাকিবে না। সাপ বাঘ মানুষ সব, যেন প্রেমের ডোরে বদ্ধ হইবে। চুরি ডাকাতি আর থাকিবে না, মিথ্যা প্রবঞ্চনা আর থাকিবে না।

সে মূর্ত্তি অবলা যে মুহূর্ত্তে দেখিল সেই মুহূর্ত্তেই যেন পৃথিবী নিরাপদ হইল, নির্ব্যাধি হইল, নিষ্পাপ হইয়া অনন্ত সুখ শান্তি পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অবলা নীরবে—নিস্তব্ধে সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি স্থির দৃষ্টিতে আকুল প্রাণে দেখিতে দেখিতে যেন এক পা এক পা করিয়া স্বর্গের উপরে উঠিতেছে! অবলার অনেক বৎসরের শ্রান্ত ক্লান্ত পীড়িত হৃদয় প্রাণ আজ স্বর্গীয় সুধারসে প্লাবিত হইতেছে! অবলা আজ প্রেমের অনন্তকাল স্থায়ী সঙ্গীতের রাগ রাগিণীর ভিতরে আপনার প্রাণ ঢালিয়া দিয়া যেন আপনি প্রেমের সুখ সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে।

অবলার হৃদয়ে ইচ্ছা আছে কি তা জানি না। যদি থাকে তো—ঐ অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে লাবণ্যরূপে থাকিতে—ঐ দিব্য চরণতলে ধূলিকণা হইয়া থাকিতে—ঐ অস্তিত্বে আপনার অস্তিত্ব মিশাইয়া এক হইতে।

যোগেন্দ্র সুশীলাকে পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল, যোগেন্দ্রের প্রাণ শীতল হইল।

যোগেন্দ্র একবার অবলার দিকে চাহিয়াছিল। অবলাকে দেখিবামাত্র সে রূপরাশি হৃদয়ের স্তরে স্তরে গাঁথিয়া গিয়াছিল; কিন্তু যোগেন্দ্র আর সেদিকে চাহিল না। সুশীলার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, খুব বিপদেই পড়েছিলাম।

অবলার সাক্ষাতে কথা কহিতে সুশীলার একটু লজ্জা হইতেছিল। যোগেন্দ্রের একটু অসুবিধা হইতেছিল। অবলা তাহা বুঝিতে পারিয়া একটু সরিয়া আড়ালে গেল। কথা কহিতে স্বামীর কষ্ট হইতেছে, অবলা তাহা সহ্য করিতে পারিল না।

অবলা একটু আড়ালে গেলে, যোগেন্দ্র চুপে চুপে বলিল, ভগবান রক্ষা করেছেন।

সরোজা একটু কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল আর দুদিন অপেক্ষা করিতাম। তারপর তোমার দেখা না পাইলে হয় বিষ খাইতাম, না হয় জলে ডুবিতাম, না হয় গলায় দড়ি দিতাম। ব্যাপারটা কি?

যো। রাত্রে ঘর থেকে ঘুমঘোরে চ'লে বেরুলাম। ছেলেবেলায় ঐ ব্যারাম ছিল বটে, তার পরে তো ভাল ছিলাম।

স। তা'তো আমি জানি না। কি রকম স্বপ্ন, নিশিতে ডাকা নাকি?

যো। তাই বটে। আমার মনে হ'ল যেন কে ডাকছে। তার ডাক শুনে উঠলাম। উঠে খানিকটা যেতেই যেন রাম বাবুকে দেখতে পেলাম। তার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বরাবর যাচ্ছি।

আট নয় ক্রোশ যাবার পর রাত্রি প্রভাত হ'ল যখন, তখন ঘুমের ঘোর কেটে গেল, বেশ জ্ঞান হ'ল। তখন দেখি না একটা মাঠে একটা জঙ্গলের ধারে গিয়ে উপস্থিত। তখন আমার ভয়ানক ভয় হ'ল। বুক দুড় দুড় ক'রে কাঁপিতে লাগিল। তোমার বিষয় যত মনে পড়ে তত প্রাণটা কাতর হ'য়ে লাগলো। মহা বিপদে পড়ে চুপ করে ব'সে থাকলাম। বেলা যখন নয়টা বাজলো তখন একজন লোককে [illegible] দেখতে পেলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করায় আমায় বলে মশাই! এ রাস্তা হ'তে আপনি একলা কি ক'রে যাবেন? যদি আমায় দুই টাকা দেন তো কোম্পানির রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারি। ভাগ্যে আমার পকেটে টাকা ছিল তাই রক্ষা, নহিলে যে কি হ'ত তা বলতে পারি না। সে আমায় সঙ্গে

করে অপরাহ্নে ৫ টার সময় ফেরোপাকিং রাস্তায় স্কুলে দিয়ে যায়। তার পর আজ চ'লেই আসছি ; পথে হাতিবাগানে ৮টার সময় একখানা গাড়ি পেলাম। আজ দুই একোহাতা আছে। তারপর দোকানে এসে জিজ্ঞাসা করায়, যখন শুনলাম তুমি এখানে আছ, তখন ধড়ে প্রাণ এল, মনটা একটু স্থির হ'ল। তার পরে এই আস্‌ছি আর কি।

অবলার কানে এই সমুদয় কথা লাগিতেছিল। স্বামীর বিপদের কথা শুনিয়া অবলা আকুল প্রাণে কাঁদিতে-ছিল।

যোগেন্দ্র এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল। সুশীলা বলিল, তাইতো কিসে ব'সবে ?

অবলা অমনি তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘর হইতে একখানি মাদুর বাহির করিয়া পাতিয়া দিল। মাদুর পাতিয়া দিবার সময় অবলা একটু কাঁদিয়াছিল, কেন না, স্বামীকে বসাইবার জন্ত আপনার বক্ষ পাতিয়া দিতে পারিল না—আপনার মস্ত-কের চুল দিয়া স্বামীর পা মুছাইয়া দিবার সুবিধা হইল না—অবলা পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিণীর ন্যায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল ; কিন্ত সে মধুর যন্ত্রণাতে অবলার সুখ। মাদুর পাতিয়া দিয়া অবলা আবার আড়ালে সরিয়া গেল।

যোগেন্দ্র মাদুরে বসিল। সেই রমণীর দিকে চাহিয়া অবধিই যোগেন্দ্রের প্রাণটা যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। সেই রমণী যেন যোগেন্দ্রের কেহ হয় ; যোগেন্দ্রের প্রাণটার ভিতরে মাঝে মাঝে একরূপ ভাব উঁকি দিতে লাগিল। যোগেন্দ্র সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল, এটী কে ?

অবলার প্রাণে এ কথাটি বাজিল—অবলার দুচক্ষু দিয়া অমনি জল ধারা পড়িতে লাগিল। একটী গভীর দীর্ঘশ্বাস অবলার বক্ষকে কাঁপাইয়া আকাশের গায়ে পতিত হইল।

সুশীলা বলিল 'ভাল বাবুরেই মেয়ে এই জানিয়াছি।' সুশীলা শব্দ ভাঙ্গিয়া বলিল না।

যোগেন্দ্র বলিল 'এখন খাওয়া দাওয়ার কি হবে?'

অবলা আর আড়ালে থাকিল না। আস্তে আস্তে ঘরে আসিয়া খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করিতে লাগিল। যোগাড় করিতে করিতে ঘোমটার ভিতরে অবলা নীরবে এই ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিল 'আমি দুঃখিনী, এ সামান্য জিনিস কি প্রকারে খাওয়াইব। অবলার ইচ্ছা পৃথিবীতে যত উৎকৃষ্ট খাদ্য আছে তাহা আনিয়া স্বামীকে খাওয়ায়। অবলা অল্প সময়ের মধ্যে সমুদয় প্রস্তুত করিল। সুশীলা কিছুই সাহায্য করিল না। সে যোগেন্দ্রের কাছে বসিয়া নানা বিষয়ের কথাতেই মগ্ন রহিল। প্রথমে একটু লজ্জা হইয়াছিল; ১০।১২ মিনিট পরে সুশীলার আর লজ্জা থাকিল না। অবাধে যোগেন্দ্রের সহিত কথা কহিতে লাগিল।

সমুদয় প্রস্তুত হইল—অবলা স্বামীর খাবার আনিয়া দিল। স্বামীকে আহার করাইতে লাগিল। অবলা একটু দূরে বসিয়া ঘোমটার ভিতর হইতে এক মনে স্বামীর খাওয়া দেখিতে দেখিতে স্বর্গ-সুখ সম্ভোগ করিতেছে। স্বামীকে খাওয়াইয়া আজ অবলার প্রাণে যে কি আনন্দ, তাহা মনে ধারণা করা অসাধ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঠিকা! বহু দিনের পর স্বামী-মত বিদেশ ... করিল। পাত ... করিয়া ফেলিল। আসিয়া, যখন তোমার কাছে বসিয়া আহারাদি করে, ... যা করিল। যে আনন্দ হয় অবলার ... তদপেক্ষা ... আর।

আহারাদি শেষ হইলে অবলা ঘরে, কাতরে বিছানা ... করিয়া দিল। সুশীলাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল 'তোমরা ঘরে গিয়া শোও'।

সুশীলা বলিল 'তুমি কোথা শোবে' ...

অবলা বলিল 'আমার যা হয় হবে এখন, তোমরা ঘরের ভিতরে গিয়ে শোওগে'।

সুশীলা যোগেন্দ্রকে বলিল 'যাও ঘরে শোওগে'।

যোগেন্দ্র বলিল উনি কোথায় শোবেন'?

সুশীলা বলিল 'উনি কাদের বাড়িতে গিয়ে শোবেন'।

যোগেন্দ্র বলিল 'তাইতো বড় তো মুস্কিল, সেটা ভাল দেখায় না, আমি না হয় বাহিরের দাওয়াতে শুয়ে থাকি, তোমরা না হয় ঘরের ভিতরে গিয়ে শোওনা'।

সুশীলা বলিল 'না মা উনি কাদের বাড়ি শোবেন ঠিক ক'রে এসেছেন, আমরা দুজনে ঘরের ভিতরেই শোবো এখন'।

যোগেন্দ্রের বড় ঘুম পাইতেছিল সুতরাং ঘরের ভিতরে গিয়া শয়ন করিল। সুশীলা যোগেন্দ্রের কাছে শয়ন করিল।

রাত্রি তখন প্রায় ১টা বাজিয়াছে। অবলা কোথায় শয়ন করিবে? পাঠকপাঠিকে! হতভাগিনী সতী সাবিত্রী অবলা সে গভীর রাত্রে কোথায় গিয়া শয়ন করিবে?

[illegible] ষ বিষয়ে কিছুই ভাবিল না। কুটীর হইতে অবলার [illegible] একটি বৃহৎ বট-বৃক্ষ তলে গিয়া বসিল। জ্যোৎস্না অমনি অল [illegible] মন্দ মন্দ বাতাস বহিতেছে। দুই একটি [illegible] বট গাছে আসিয়া বসিতেছে।

অবলা [illegible] বসিয়া আপনার কুটীরের দিকে চাহিয়া [illegible] এতদিন পরে ধন্য হইয়াছে, পবিত্র হইয়াছে—কৃপণ যেমন বহু ধন পাইলে, যেমন বাক্সে রাখিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, আনন্দে বিভোর হইয়া সেই বাক্সের দিকে চাহিয়া থাকে, অবলাও আপনার অমূল্য রত্ন স্বামীকে অনেক যন্ত্রণার পর পাইয়া, আপনার সুখে উন্মাদিনী হইয়া সেই ঘরের দিকে চাহিয়া আছে। সেই ঘরের ভিতরে 'কে আছে' অবলা যখন ইহা ভাবে, তখন অবলার প্রাণে স্বর্গের বাজনা বাজিতে থাকে—দুচক্ষু বহিয়া আনন্দাশ্রু পতিত হয়। অবলা ভাবাবেশে আত্মহারা হয়—সেই ঘরের ভিতর আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

অবলা এক এক বার আস্তে আস্তে পাগলিনীর মত ঘরের কাছে আসে—আসিয়া দাঁড়ায়—দাঁড়াইয়া সুখের কান্না কাঁদে আবার ফিরিয়া যায়। অবলা এইরূপ আপনার প্রেমে আপনি উন্মাদিনী আছে, এমন সময়ে আকাশে কাল মেঘ উঠিল। চাঁদের আলো নিবিয়া গেল। নক্ষত্র সকল একে একে অদৃশ্য হইল। কাল মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বহিতে লাগিল। ঝড় ক্রমশঃ প্রবলতর হইল। মড় মড় করিয়া বট গাছের দুটী ডাল ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রমশঃ ঝড় থামিল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। অবলার কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পা

যোগাড় করিল। পাত

জল কত মাথার উপর দিয়া চলিতেছে, অ কত করিয়া ফেলিল। ডুবু খাইতেছে, গায়ে কত কাদা লাগিয়াছে, আক করিতেছে। কিছিদ্ দূরে ভীষণ শব্দে একটী বাজ পড়িল। অবলা কিন্তু আদতে কাতরা হইল না। কাতরা হওয়া দূরে থাকুক, স্বামীর জন্য এসব সহ্য করিতে করিতে অবলার প্রাণের সুখ যেন আরও বাড়িয়া উঠিতেছে।

দেখিতে দেখিতে আকাশ পরিষ্কার হইল, রজনীও প্রভাত হইল। অবলা পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া কুটীরে আসিল। তখন উহারা দুজনে উঠিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।

অবলা সুশীলাকে ডাকিয়া বলিল, তোমরা এইখানে থাক আমি শীঘ্র আমার দোকানের কাজগুলি সেরে আসছি।

অবলার প্রেম গভীর, উহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিচলিত করে না। অবলা একটী ঝাঁটা লইয়া দোকানে ঝাঁট দিতে চলিল।

অবলা ঝাঁটাটী লইয়া চলিয়া গেলে, যোগেন্দ্র সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল 'ঝাঁটা ল'য়ে উনি গেলেন কোথা' ?

সুশীলা বলিল 'উনি দোকানে ঝাঁট দিয়ে থাকেন, তাতে মাসে মাসে কিছু পান, সেই কাজে গেলেন'।

যোগেন্দ্র বলিল 'ওঁর মাথায় সিন্দূর দেখছি, হাতে লোহা দেখছি, ওঁর স্বামী কোথা ?

সুশীলা বলিল 'তা ঠিক জানি না—বোধ হয় ওঁর স্বামী ওঁকে তাড়িয়ে দিয়ে থাকবে, নহিলে অমন দশা কেন' ?

যোগেন্দ্র বলিল 'স্ত্রীলোকটী কিন্তু খুব ভাল'।

সুশীলা বলিল 'তা ভগবান জানেন। যাক্ এখন দেশে যাবার উপায় কি' ?

অবলার বিষয়ে একটা ফিকির ঠাউরেছি।

অমনি অল কি প্রকার?

অবলা। আমি সন্ন্যাসীর বেশ ধ'রে একবার তোমার পর ভাব গতিক দেখে আসি।

স্ব। যদি ধরা পড়?

বো। ধরবার যো নাই। এমন জটা টটা ক'রে গায়ে পাঁশ মেখে যাব, কেউ জানতে পারবে না।

স্ব। পারলে ভাল।

বো। পারলে আবার কি?—নিশ্চয়ই পারবো।

স্ব। তা হ'লে "শুভস্য শীঘ্রং"।

বো। তা হ'লে খাওয়া দাওয়া ক'রে আজই কলিকাতা যাই। সেখানে জটা টটা কিনে বেস ক'রে সেজে চ'লে যাব। দুই তিন দিন লাগিবে। এখন তুমি এখানে থাক। এ ভিন্ন আর উপায় নাই।

স্ব। তাই আজ খাওয়া দাওয়া ক'রে রাণিগঞ্জের ষ্টেসনে চ'লে যাও।

বো। তাই যাব।

এই প্রকার নানাবিধ কথা চলিতেছে, কথা কহিতে কহিতে স্বর্ণলতা ভাবিতেছে যদি বরের ছবি খানা দেখে, তো চিনে ফেলবে। কিন্তু অবলার দুরাদৃষ্টবশতঃ সে সেই বরের ছবির দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। এমন সময়ে অবলা আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামীর পাদপদ্ম লইয়া খাইয়া আপনার জন্ম সার্থক করিল।

বাবু বর বাড়ি হইতে বিদায় আসিয়াও পঁহুছিল।

অবলা তাড়াতাড়ি রন্ধনের যোগাড় করিল। সাত পাঁচ তরকারী অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া ফেলিল

যোগেন্দ্র আহার করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

অবলা সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল 'উনি কোনদিকে গেলেন'।

সুশীলা বলিল 'কলিকাতায় গেলেন দুই তিন দিনের মধ্যে কাজ শেষ করিয়া আবার আসিবেন'।

অবলা সুশীলাকে ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিতে লাগিল।

আহার করিতে করিতে অবলা সুশীলাকে যোগেন্দ্রের বিষয় নানাভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সুশীলা ভাবিয়া চিন্তিয়া দুই একটা সত্য দুই একটা মিথ্যা করিয়া উত্তর দিল। সুশীলা অন্য কথা পাড়িতে চায়, কিন্তু অবলা খালি যোগেন্দ্রের কথা আনিয়া ফেলে।

অমা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অবক
া ।ইড়ু . ভাব

যোগেন্দ্র কলিকাতায় গিয়া জটা কিনিল, রুদ্রাক্ষের মালা কিনিল। পরে মাথায় জটা পরিল—গেরুয়া বসন পরিল—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা জড়াইল—গায়ে ভস্ম মাখিল। যোগেন্দ্রকে আর চিনিবার যো নাই।

যোগেন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশে সুশীলার বাপের দেশে গিয়া উপস্থিত হইল।

সেই বাটির কাছে গিয়া একটী গাছ তলায় বসিয়া আছে। এমন সময় একটি বৃদ্ধা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যোগেন্দ্র বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল 'হাগা মায়ি—একটা 'কোথা শুনে যাও'।

বৃদ্ধা এক মনে কোথায় যাইতেছিল চাহিয়া দেখে না সন্ন্যাসী, অমনি কাছে আসিয়া প্রণাম করিল।

কেন বাবা ডাকলে?

যো। হাঁ মায়ি। এ বাড়ীর কর্ত্তা বাবু কোথা?

বৃ। আর বাবা! আজ দু মাস হ'ল তিনি মারা গেছেন। আহা, বড় ভাল লোক ছিলেন। আমায় বছরে দুখানা ক'রে কাপড় দিতেন। বাবা! এমন লোক আর হবে না।

যো। বাড়িতে এবে কে আছেন?

বৃ। আর বাবা। তাঁর পরিবার আছে, আর আমার মেয়ে তাঁর কাছে থাকে, খোরাক পোষাক আর মাসে এক টাকা ক'রে

পার। একটি মেয়ে ছ্যাল। আহা! যেন দুর্গা ঠাকুর! তা, এমনি অদেষ্ট—যোদিন ব'লে এক ছোড়া ছ্যাল, সে ছো সঙ্গে বের কথা হয়েছ্যাল; অ'াচের যে, কি সাগরের মধ্যে তা বাবা যে হ'ল না জেনে সে মুখপোড়া সে মেয়েটীকে নে পালয়ে গ্যাছে। বাবা! তুমি যেন কাকেও বলো না যে বলেছি। বাবা! সেই একটী মেয়ে, সেই মেয়ের শোক্যায় বা ম'রে গ্যাছে। মা মাগী খালি সেই মেয়ের জন্ত কাঁদছে। বাব অনেক দেশ তল্লাস ক'রে সে মেয়ে পাওয়া যায় না। তা বাবা তোমরা সন্ন্যাসী, গুণে ব'ল্তে পার, সে মেয়ে কোথা; তা যদি পার তো ঠাকরুণ তোমায় খুসী ক'রবেন।

যো। হাঁ আমি ব'লতে পারি। তুমি বাড়িতে বলগে দেখি। তা তুমি বাবা! একটু এইখানে বোস আমি খপর দিয়ে আসি বলিয়া তাড়াতাড়ি গেলেন, বাড়ীর ভিতরে গিয়া সব বলিল। সুশী-লার মা বলিলেন, সে সন্ন্যাসীকে ডেকে আন্‌গে এখনি যা এখনি যা।

বুড়ি তাড়াতাড়ি আসিয়া সন্ন্যাসীকে বলিল 'ও বাবা! মা ঠাকুরুণ তোমায় ডাকছেন, একবার চল।'

সন্ন্যাসী বুড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতরে চলিল। প্রথমে গিয়াই বাহির বাটীতে বসিল। গৃহিণী বাহিরে আসিল।

সন্ন্যাসী কৃত্রিম স্বরে বলিল, মা তোমার বাঁ হাতটা দেখি। গৃহিণী হাত বাহির করিয়া দিল। সন্ন্যাসী হাত দেখিয়াই প্রথমতঃ নাম বলিল। গৃহিণী চমকিত হইল। সন্ন্যাসী গৃহি-ণীর আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছে আগেই সব জানিত, এখন হাত দেখিতে দেখিতে সব বলিয়া দিতে লাগিল। গৃহিণী

ত শুনিতে অবাক্ হইতেছে—ভাবিতেছে এ বড় উচ্চ র সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী তার পর বলিল 'মা তোর একটি অসুখ হয়েছিল আর হয়নি না'?

গৃহিণী বলিল, বাবা তুমি যা যা বল্ছ সব সত্য। যা হ'ল 'র মেয়ে এখন কোথা?

স। মেয়ে তোমার ঘরে নাই—তবে শীঘ্রই আসিবে।

গৃ। ভাল আছে তো?

স। হাঁ ভাল আছে। সে মেয়েটি কি অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল?

গৃ। "হাঁ বাবা" বলিয়াই গৃহিণী কাঁদ কাঁদ হইল।

স। মায়ি! তোর মেয়ের আবার বিবাহ হয়েছে। সে ভালই হয়েছে। তাতে কোন দোষ নাই। আগে যদি বিবাহ দিতে তো এত কিছু বিপদ হ'ত না।

গৃ। বিধবা বিবাহ কি ভাল বাবা, তাতে তো কোন দোষ হবে না?

স। কিছু দোষ নাই। শাস্ত্রে উহার মত আছে, ব্যবস্থা আছে। আর কিছুকাল পরে বিধবা বিবাহ চ'লে যাবে।

গৃ। বাবা মেয়ে আমার কবে আসবে ঠিক ক'রে বল।

স। মায়ি! তোর মেয়ে জামাই দুজনেই আসবে।

গৃ। কার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে বাবা?

স। যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে সে খুব ভাল লোক, খুব বিদ্বান্। সেই এখান হ'তে লয়ে গেছে। তার নামের গোড়ায় "ব" আছে। তা মায়ি! এক কাজ ক'রবে—জামাই এলে খুব যত্ন ক'রবে। আর তারা যে গেছে তা ভাল ভাবেই

গেছে, লোকে যে সব বাব কথা বলছে সে সব মিছে ভয়ানক মীর্থ দুজনে খুব প্রণয় হয়েছিল, তারপর বিবাহের আগা ছা যখন হলনা তখনই তারা পালিয়েছে।

গৃ। বাবা আমি যে দিতে চেয়েছিনু, তবে তিনি অনের ভয়ে সাহস ক'রলেন না। তারা আবার এলে, আমার যেম কিছু বিষয় আছে, সব আমার জামাইএর নামে লেখা পড়া ক'রে দেব। বাবা সেদিন কি হবে। সুশীকে কি আর দেখতে পাব? 'বাবারে! হা ভগবান'! বলিতে বলিতে গৃহিণী কাঁদিয়া ফেলিল।

স। ভয় নাই, আজ হ'তে চার দিনের মধ্যে তোমার মেয়ে জামাই নিশ্চয়ই আসবে।

গৃ। তা হলে আমি তোমায় পাঁচশত টাকা দেব। আর এখানে যদি থাকতে চাও তো ঘর তৈয়ারি ক'রে দেব।

স। আমায় টাকা কড়ি দিতে হবে না, আমি কাহারও দান গ্রহণ করি না। তবে আমি নিশ্চয় বলছি, চারি দিনের মধ্যে তোমার ঝি জামাই নিশ্চয়ই আসবে। একটা টাকা এনে দাও আমি সেটা প'ড়ে দি।

গৃহিণী একটা টাকা আনিয়া দিল। সন্ন্যাসী মিছামিছি বিড় বিড় করিয়া কি বলিয়া টাকাটায় তিনবার ফুঁ দিল। তার পর গৃহিণীকে বলিল, মা। তোমার চুলের ডগায় টাকাটা বেঁধে রাখ, দেখ যেন না প'ড়ে যায়। তারা এলে টাকাটী কোন ব্রাহ্মণকে দান করিও।

গৃহিণী তাহাই করিল।

সন্ন্যাসী প্রস্থান দিল।

ত শুনিতে

র সন্ন্যাসী।

র করেছিস

পৃথিবী

য়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

:(•):

সন্ন্যাসী তারপর তিন চার ক্রোশ দূরে গিয়া সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিল। সেই দিনই কলিকাতায় পঁহুছিল। পরদিন সকালের ট্রেনে রাণিগঞ্জ যাত্রা করিল। ষ্টেসনে নামিয়া গাড়ি করিয়া বিষ্ণুপুরে চলিল।

রাত্রি নয়টার সময় অবলার কুটীরে উপস্থিত হইল। অবলা স্বামীর চিন্তায় বিভোর ছিল, দূর হইতে জুতার শব্দ শুনিয়াই বুঝিল, তাহার জীবনের দেবতা আসিতেছে।

যোগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। অবলা অমনি অতি-ব্যস্তে পা ধুইবার জল প্রদান করিল।

সুশীলা বলিল 'খবর ভাল তো'।

যোগেন্দ্র বলিল, "হাঁ, যে জন্য যাওয়া সে বিষয়ে মঙ্গল।"

সু। বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল।

যোগেন্দ্র শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদটা দিল না। বলিল "হাঁ তিনি ভাল আছেন, তোমাকে দেখিবার জন্য তোমার মা বাপ দুজনে ব্যাকুল।

সু। আমাদের এসব কথা শুনেছেন?

যো। হাঁ, তাতে তাঁহাদের কোন অসুখ নাই। তবে আমরা শীঘ্র না গেলে তাঁরা আর অধিক দিন বাঁচিবেন না।

সু। মাকে দেখলে?

যো। তিনি তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে ভয়ানক শীর্ণ হয়েছেন।

সু। তবে আমরা কালই যাই চল।

যো। তা আর ব'লতে।

কাল যোগেন্দ্র চলিয়া যাইবে শুনিবামাত্র অবলা যেন দশদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিল। অবলা ঘরের ভিতরে দাঁড়াইয়া ছিল, অমনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। অবলার দুই চক্ষু প্রস্তরের ন্যায় স্থির হইল—শুষ্ক হইল। এই ভাবিতেছে, স্বামীর পায়ে জড়ায়ে ধ'রে আমার পরিচয় দি, তারপর আবার ভাবিল, ভয় কি, উনি যেখানে যাবেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাইব। এমন সময়ে সুশীলা ঘরের ভিতরে আসিল। অবলা হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া বলিল "হাঁ দিদি, কাল কি তোমরা যাবে? আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।"

সুশীলা বলিল "তাও কি হয়, তুমি কোথা যাবে, তোমার স্বামী কি মনে করবেন"?

অবলা চুপ করিয়া থাকিল, আর কোন কথা কহিল না। ভাবিল, আমি নিশ্চয়ই ওঁর সঙ্গে যাব।

তারপর অবলা রন্ধনের যোগাড় করিতে লাগিল।

রাঁধিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া, ঘরের ভিতরে সুশীলার সঙ্গে খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে অবলা সুশীলাকে বলিল, 'আমাকে সঙ্গে করে লয়ে যেতে দোষ কি দিদি'?

সুশীলা বলিল 'তোমার স্বামীর অমতে তুমি কি যেতে পার, তোমার যদি কেউ না থাক্‌তো, সে বা তয় হ'ত'।

অবলা আর কিছু বলিল না, দুই এক গ্রাস খাইয়া আর

খাইতে পারিল না। অবলার প্রাণ স্বামীর সঙ্গে যাইবার জন্য ধড় ফড় করিতেছে।

সুশীলার খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে, যোগেন্দ্র বলিল, 'দশ টাকা ওঁকে বাক্স হতে বার ক'রে দাও, কাল সকালেই আমরা যাব'।

সুশীলা দশ টাকা বাহির করিয়া দিতে যাইল; অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'যদি আমায় কষ্ট না দাও তো টাকা কয়টা বাক্সর ভিতরে রাখ। দিদি! তোমরা কাল যাবে আমি আর বাঁচবো না।'

যোগেন্দ্র বাহির হইতে এই কয়টি কথা শুনিবামাত্র দয়ার্দ্র হইল। সুশীলাকে ডাকিয়া বলিল 'উনি কি বলেন।'

সুশীলা বলিল 'উনি আমাদের সঙ্গে যেতে চান, তা কেমন ক'রে হবে। ওঁর স্বামীর অমতে তুমি কি লয়ে যেতে পার?'

যোগেন্দ্র বলিল 'ওঁর যে প্রকার অবস্থা দেখ্‌ছি তাতে স্বামী থাকায় না থাকায় সমান। ওঁকে যখন বাজারের দোকান ঝাঁট দিয়ে খেতে হয়, তখন সে স্বামী থাকাও যা আর না থাকাও তা। তা না হয় চলুন না। আমাদের সংসারে লোকেরও ত দরকার। তাই উনি আমা'দের সঙ্গে যাবেন এখন'।

সুশীলার আদতে ইচ্ছা নাই যে, সতীনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। সুশীলা ঘাড় নাড়িয়া চুপে চুপে বলিল 'তা কখনই হবে না, কখনই হবে না—তা হ'লে আমি যাব না'।

যোগেন্দ্র বলিল 'তোমার যদি অমত হয় তো থাক।' অবলা ঘর হইতে শুনিল। মাথায় যেন সহস্রটা বজ্র পড়িল, পৃথিবী যেন ঈষৎ বেগে ভাঙ্গিয়া গেল!

অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে বাক্স হইতে যে চারিটি রাখিয়া স্বর্ণ বাহির করিয়া পেট কাপড়ে রাখিল। পরে স্বামীর পদ- করিয়া দিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

সুশীলা বলিল 'রাত হয়েছে শোবে চল'।

যোগেন্দ্র বলিল উনি বুঝি সেই খানে গেলেন"।

সুশীলা বলিল হাঁ'! চল শুইগে চল।

যোগেন্দ্র বলিল 'আহা, স্ত্রীলোকটি বড় ভাল—আমাদের যে উপকার করেছে, এ ঋণ শোধা যেতে পারে না। সঙ্গে ক'রে ল'য়ে যাই চল'।

সুশীলা একটু কুপিত ভাবে বলিল 'রূপ দেখে মন ভুলে গেছে নাকি? ও কি, লোকে যে নিন্দা ক'রবে। ওর স্বামী আছে তা জান?

যোগেন্দ্র বলিল। 'তা চল চল শোবে চল'।

দুইজনে গিয়া শয়ন করিল।

অবলা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে আবার সেই বট-বৃক্ষ তলে গিয়া উপবেশন করিল। অবলার প্রাণ ছট্ ফট্ করিতেছে। অবলা ভাবিতেছে "স্বামীকে যখন পাইয়াছি, তখন প্রাণ গেলেও ছাড়িব না। 'সঙ্গে সঙ্গে যাইব। সুশীলা ঘৃণা করে, সহিব—মারে মার খাইব। স্বামী আমায় চিনিতে পারেন নাই। স্বামী যদি একবার বুঝিতে পারেন, আমি ওঁর স্ত্রী, তা হলে আর' আমায় পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। পরিচয় কি দেব? না—পরিচয় দিয়া লাভ কি। আমার সুখ ওঁকে দেখিয়া—ওঁর সেবা করিয়া, ওঁর পায় ধুলা মাথায় ধরিয়া। আমি ওঁদের বাড়িতে

হইয়া থাকিব। যখন সৌভাগ্যবশতঃ পাই-য়াছি তখন আর ছাড়িব না। এতদিন দেখি নাই, ওঁর মূর্ত্তি বড় পাইয়া এক প্রকার ভুলে ছিলাম। এখন তো আর তা পারবো না। যদি আমায় উনি পরিত্যাগ করেন—গ্রহণ না করেন, তো, ওঁরই সম্মুখে প্রাণ বিসর্জন করিব। ওঁর সম্মুখে মরিতে পারিলে আমার বড় সুখ হইবে—আমার মহা আনন্দ হইবে। আর যদি উনি অনুমতি করেন, এই অবস্থাতেই তুমি থাক; আমি মনের আনন্দে এই ভাবে জীবন কাটাইব—তাহাতে আমার সুখ বই অসুখ হইবে না।

কাল উনি রাণিগঞ্জের ষ্টেসনে যাবেন। আমি না হয় এই বেলা ষ্টেসনে গিয়া থাকিগে। আমাকে ল'য়ে যেতে ওঁর একান্ত ইচ্ছা আছে, তবে সতীন আমায় সঙ্গে ল'য়ে যেতে চান না কেন? আমি তো ওঁর সুখের পথে কাঁটা দেব না। আমি ওঁরও না হয় সেবা শুশ্রূষা করিব।

অবলা আবার ভাবিতেছে "এই রাত্রেই ষ্টেসনে যাই। গিয়া বসিয়া থাকিগে। সেখানে আমায় দেখ্‌লে ওঁদের নিশ্চয়ই দয়া হবে, আর আমায় ফেলে যেতে পারবেন না। একান্ত সঙ্গে না লন নিজে টিকিট কিনিয়া উহাদের গাড়িতে কলিকাতায় যাইব। আর স্বামী যদি বিরক্ত হন তো তখন ওঁর দুটী পায়ে জড়ায়ে ধ'রে আমার পরিচয় দেব। তখন নিশ্চয়ই ওঁর দয়া হবে। পরিচয় পেয়েও যদি অগ্রাহ্য করেন, তো, ওঁরই সাক্ষাতে এ পাপ জীবন পরিত্যাগ করিব। আর এ জীবনে প্রয়োজন কি? যাঁর জীবন তিনি যদি না লন তো,

আবার ইহাতে আর প্রয়োজন কি? এ জীবন রাখিয়া সুখ কি?

এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে, অবলা উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কাছে একবার আসিল। কাছে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে রাণিগঞ্জ যাইবে বলিয়া যাত্রা করিল। খানিক দূর গিয়া আর পা উঠে না। পা আবার সেই ঘরের দিকে আসিতে চায়। সে ঘরে অবলার সর্ব্বস্ব ধন রহিয়াছে—সে ঘর ফেলিয়া কি করিয়া অবলা যাইবে?—কিছু দূর গিয়া সে ঘর যে আর দেখিতে পাইবে না। অবলা ফিরিয়া ঘরের কাছে আসিল। আবার অবলা ভাবিল 'না রাণিগঞ্জেই যাই' এই ভাবিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া ঘরের দিকে চাহিতে চাহিতে কয় পা অগ্রসর হইল। কিছু দূরে গিয়া আর ঘর দেখিতে পায় না—অবলার প্রাণ ছট্ ফট্ করে—অবলার দুটী চক্ষু চ'খের জলে ভাসিয়া যায়। অবলা আর যাইতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরের কাছে আবার ফিরিয়া আসিল। আসিয়া ঘরের দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল।

দুঃখিনী অবলা নির্জ্জনে নীরবে কাঁদিতেছে। আকাশে নক্ষত্র সকল ঝিক্ মিক্ করিতে করিতে অবলার দুঃখের অশ্রু-বিন্দু গণিতেছে। চাঁদ আকাশের একপ্রান্ত হইতে অবলাকে দেখিতেছে। রজনী অবলার দুঃখে একটু একটু আর্দ্র হই-তেছে। অবলার কাতরতা দেখিয়া বনের ফুল গুলি ভাল করিয়া ফুটিতে পারিতেছে না।—তারা আর ফুটিতেও চায় না। অবলার দুঃখে কাতর হইয়া ফুলও ফুটিতে চায় না, আকাশে নক্ষত্রও আর জ্বলিতে চায় না—চাঁদও আর থাকিতে চায় না—

পাখীরাও আর কলস্বর গান গাহিতে চায় না—পবনও আর মন্দ মন্দ বহিতে চায় না।

আকাশের চাঁদ পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িল। নক্ষত্র সকল একে একে অদৃশ্য হইল। বিহঙ্গ সকল কলরব করিয়া উঠিল। অবলা পাগলিনীর মত ঘরের দেয়াল ধরিয়াই দাঁড়াইয়া আছে।

সুশীলা উঠিয়া ঘরের কপাট খুলিল। অবলা আস্তে আস্তে সুশীলার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সুশীলার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুশীলা বলিল 'কাঁদছ কেন'?

অবলা বলিল 'আমায় সঙ্গে ক'রে নয়ে চল'।

সু। গিয়া তোমার লাভ কি?

অ। "নহিলে মরিব—বাঁচিব না"। বলিয়া অবলা আকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

যোগেন্দ্র অবলার কান্না, অবলার কথা, ঘরের ভিতর হইতে শুনিতে পাইয়াছিল। শুনিতে শুনিতে কাতর হইয়া ঘরের ভিতর হইতে বলিল 'তাই হবে—আমাদের সঙ্গেই যাবেন।'

অবলার অন্ধকারময় হৃদয়ে আবার আশার বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল।

সুশীলা ভিতরে গিয়া স্বামীর কানে কানে বলিল, 'তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি—তা হবে না। সুন্দরী দেখে কি মন ভুলে গেছে নাকি'।

যোগেন্দ্র কিছু বলিল না, চুপ করিয়া রহিল। সুশীলার উপর মনে মনে একটু কুপিত হইল।

- উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া বাজারে গাড়ি ঠিক করিতে গেল।

অবলা পাষাণময়ী মূর্ত্তির ন্যায় এক পার্শ্বে বসিয়া আপনার দুঃখের অতলস্পর্শ সমুদ্রের তলে ডুবিতে লাগিল।

সুশীলা এদিকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। যোগেন্দ্র গাড়ি ঠিক করিয়া আসিল। অবলা পাগলিনীর মত অনাবৃত মুখে সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। অবলার এখন আর ঘোমটা নাই—লজ্জা নাই, ভয় নাই। যোগেন্দ্র গহনার বাক্সটী হাতে লইল। ইচ্ছা অবলাকে সঙ্গে লইয়া যায়—কিন্তু সুশীলার ভয়ে কিছুই করিতে পারিতেছে না। সুশীলা অবলার কাছে গিয়া বলিল "দিদি! তবে আমরা আসি।" অবলা কি ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল, চাহিয়াই আছে, হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

যোগেন্দ্র 'কি হ'ল কি হ'ল' বলিয়া কাছে আসিয়া বসিল।

সুশীলা এসব দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়াছে। অনিচ্ছায় সুশীলা জল আনিয়া মুখে চ'খে দিতে লাগিল। যোগেন্দ্র পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অবলা চক্ষু চাহিল। দেখিল সম্মুখে যোগেন্দ্র। যোগেন্দ্র বাতাস করিতেছে, কাছে বসিয়া আছে। বাতাস করিতে হয়তো স্বামীর কষ্ট হইতেছে, এই ভাবিয়া অবলা উঠিয়া বসিল। পরে পাগলিনীর মত কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর দুটী পা জড়াইয়া পায়ের উপরে মাথা রাখিয়া

অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিল। উষ্ণ অশ্রুজলে যোগেন্দ্রের পা ভাসিয়া যাইতেছে, যোগেন্দ্রের হৃদয়টা কেমন ভর ভর করিয়া উঠিল। আগেকার স্ত্রীর কথা মনে পড়িল—ভাবিল সেইতো হবে না—ইহারও নাম অবলা। আবার ভাবিল না তাও কি হ'তে পারে—সেকি আর বেঁচে আছে? যাই হ'ক সঙ্গে ক'রে, ল'য়ে যাব।

অবলার সে অবস্থা দেখিয়া যোগেন্দ্রর প্রাণ ব্যাকুল হইল। যোগেন্দ্রর চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রুজল বিগলিত হইল।

অবলা যে সময়ে স্বামীর পদতল জড়াইয়া ধরিল, সে সময়ে সেই দুঃখের মধ্যে যেন প্রাণে একটু সুখের রেখা দেখা দিল। অবলার প্রাণে যেন তৃপ্তি, শান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। ইচ্ছা অনন্ত কাল ঐরূপে পা জড়াইয়া অশ্রুজলে ধৌত করে; সে পদস্পর্শে অবলা আত্মহারা হইল—উপস্থিত বিপদ দুঃখ শোক সব যেন বিস্মৃত হইল। অবলা স্বর্গে কি পৃথিবীতে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। অবলা যেন স্বর্গ জড়াইয়া আছে। সে পদস্পর্শে যেন অবলার সমুদয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল—যেন অবলার পরিত্রাণ হইল।

সে ভাব দেখিয়া যোগেন্দ্রের হৃদয়ে এক মহা ভাবের ঝড় উঠিয়াছে। যোগেন্দ্র ভাবিতেছে 'এ মানবী না স্বর্গের দেবী? ভগবান! এ যদি আমার সেই অবলা হয়, তো, আমার সমুদয় শক্তি আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করিব। ইহাকে সঙ্গে লইয়া গম্ভীর বনে প্রবেশ করিয়া তোমার ধ্যানে জীবনপাত করিব।"

আবার ভাবিতেছে 'কেন আমি আর সে সব ভাবি

আমি আর্ত্তি পাবও। সে কি আর বেঁচে আছে। যাই ইঁক সঙ্গে ক'রে ল'রে যাই, যা হয় পরে হবে।

পরে সুশীলার দিকে চাহিয়া বলিল "তুমি রাগই কর আর যাই কর, আমি এঁকে সঙ্গে ক'রে ল'য়ে যাব'।

সুশীলা কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

অবলা আপনার আনন্দে আপনি বিভোর হইল।

যোগেন্দ্র বলিল 'আপনি উঠুন—আমাদের সঙ্গে চলুন'।

এই কথা শুনিতে শুনিতে অবলার বোধ হইল যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। অবলা উঠিয়া বসিল।

যোগেন্দ্র বলিল 'আপনার সব ঠিক করুন'।

অবলা পূর্ব্বদিনেই বাজারে ঝাঁট দেবার কাজে জবাব দিয়া আসিয়াছে। বাবুদের বাটীতে বলিয়া আসিয়াছে আর আমার সিদা পাঠাইবেন না—আমি কাল এখান হইতে যাইব।

অবলা ঘরের ভিতরে গিয়া সেই ছবিখানি চারিখানি কাপড় ও চারিটী টাকা লইয়া একটি পুঁটুলি বাঁধিল, পুঁটুলি লইয়া বাহিরে আসিয়া ঘরে তালা দিল। চাবিটি একটী স্ত্রীলোকের দ্বারা বাবুদের বাড়ি পাঠাইয়া দিল।

অবলা যোগেন্দ্রের সঙ্গে চলিল। যে একথা শুনিল সেই কাঁদিল। বিষমপুরের দেবী বিষমপুরকে কাঁদাইয়া চলিল।

তিন জনে গাড়িতে গিয়া উঠিল। সুশীলা বড়ই রাগিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তিন জনে সুশীলার বাপের বাটিতে গিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামে যাইবা মাত্র একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তাহাদের গাড়ির পিছনে পিছনে কয়েকজন বালক বালিকা ছুটিতে লাগিল। সুশীলার মা শুনিবামাত্র আনন্দে উন্মত্তা হইল। আনন্দের মধ্যে আবার শোকের তুফান উঠিল। কেমনা, সুশীলার বাপ নাই—কে আর সুশীলাকে আদর করিবে—কে জামাইএর যত্ন করিবে। সুশীলার মা আপন স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুশীলার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। সুশীলা 'বাবা গো কোথায় গেলি গো', বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীর ভিতরে গেল। অবলাও নীরবে কাঁদিতে কাঁদিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বাটির ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র মা আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুশীলারও কান্না বাড়িল। বাটির ঝিও কাঁদিতে লাগিল। ঝি কাঁদিতে কাঁদিতে উহাদের কান্না থামাইতে গেল। সেই বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিতরের কান্নায় যোগেন্দ্রও বাহির বাটিতে একটু নীরবে কাঁদিল।

মা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া সুশীলার গলা ধরিয়া বলিল, মা গো তোর শোকেই তিনি দেহ ত্যাগ করেছেন,—আমি নিতান্ত পাষাণী তাই এখনও বেঁচে আছি"।



এই কথা শুনিয়া সুশীলা প্রাণ ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া 'বাবা গো ও গো বাবা গো' বলিয়া মাকে আরও ব্যাকুলা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের কাতর ক্রন্দন দেখিয়া অবলাও নীরবে কাঁদিতে থাকিল। সেই বৃদ্ধা ও বৃদ্ধার কন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে উহাদের চক্ষের জল মুছাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে শোকের বেগ কমিল। কান্না থামিল। কেবল মাঝে মাঝে এক একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস আপনি উঠিতে লাগিল।

সুশীলার মা একটু স্থির হইয়া বলিল 'জমাইকে বাটীর ভিতর ডেকে আন—তেতালার ঘরে বিছানা করে দাও'। যোগেন্দ্র ঝির সঙ্গে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। আবার একবার কান্নার রোল উঠিয়াই নিবৃত্ত হইল।

যোগেন্দ্র তেতালার ঘরে গিয়া বসিল। সুশীলার মা প্রথমে জামাইকে জল খাবার দিয়া, পরে সুশীলা ও অবলাকে জল খাবার দিল।

মা জিজ্ঞাসা করিল 'সুশী! এ মেয়েটী কে'?

সুশী বলিল 'বামুনের মেয়ে আমাদের সঙ্গে এসেছে'।

এদিকে গ্রামে মহা কলরব পড়িয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ স্ত্রী মহলে যত, পুরুষ মহলে ততটা নহে। কোন মহিলা ঘাটে গালে হাত দিয়া বলিতেছে 'ওমা সে বেহায়া আবার এসেছে, —অবাক্ করলে মা'।

কোন মহিলা স্বামীকে বলিতেছেন 'শুনছ'?

কি?

ওপাড়ার বামুনদের বাড়ির সেই কলঙ্কিনী যে এসেছে।

এইবার একঘরে ভাল ক'রে ক'র্‌তে হবে। সেই যোগে ঐ ছোঁড়াও এসেছে। শুন্‌ছি নাকি বে হ'য়ে গেছে।

বিধবা বিয়ে?

বিধবার আবার বিয়ে—কলিকালের পায়ে গড়।

বিদ্যাসাগরের মত।

মুখে আগুণ সে মুখপোড়ার।

আবার শুন্‌ছি নাকি মাগি জামাইএর নামে সব বিষয় লেখা পড়া ক'রে দেবে।

ভালই তো।

তা মাগিও তো বিধবা হয়েছে—ও একটি বিয়ে করুক না কেন?

এইরূপে নানা স্থানে নানা কথা উঠিতেছে।

সুশীলার মা জামাইকে খুব যত্ন করিতে লাগিল। অবলা বাড়ীতে ঘরের মেয়ের মতই থাকিল। অবলার কত আনন্দ, কত সুখ হইল। অবলা রাত্রে সুশীলার মার কাছেই শুইয়া থাকে।

কিছুদিন পরে সুশীলার মা জামাইয়ের নামে সমুদয় বিষয় লেখা পড়া করিয়া দিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

-•••-

হঠাৎ সুশীলার মার ভয়ানক জ্বর হইল। জ্বরের উপর বিকার। কবিরাজ বলিল 'আর বাঁচিবেন না, এই বেলা গঙ্গা যাত্রা করাও।

যতদিন সুশীলার মা জীবিতা ছিল, তত দিন অবলার বড় কষ্ট হয় নাই। এখন সুশীলা ঘরের গৃহিণী হইলে পর অবলার বড়ই কষ্ট আরম্ভ হইল।

অবলা রাধিত, —তাহাতে কষ্ট নাই, কিন্তু সুশীলা পরিবেশন করিত। সুশীলা অবলাকে আধপেটা খাওয়াইতে থাকিল। অবলা ভাত পাইতো তরকারী পায় না, নুন জোটে তো তরকারী জোটে না। এক এক দিন রাত্রে অবলার আদতে খাওয়া হয় না।

খাইতে না পাইয়া অবলা দিন দিন শীর্ণ হইতেছে, কিন্ত অবলার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। স্বামীকে পাইয়াছে, স্বামীকে দেখিতেছে; ইহাতেই অবলার অনন্ত সুখ অনন্ত তৃপ্তি। এ আনন্দ না থাকিলে অনাহার ক্লেশে অবলা একদিনে মরিত।

দুষ্টা সুশীলা অবলাকে আধপেটা খাওয়াইয়া তৃপ্ত হইল না। ক্রমে আর হাঁড়ির ভাত দেয় না; আপনার পাতের ভাত দিতে লাগিল। সুশীলার পাতে যে ভাত থাকিত, যে তরকারী

থাকিত, সে সব আগে সুশীলা কুকুর বিড়ালকে দিত। এখন তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া সে সব অবলাকে খাইতে দেয়।

অবলা একখানি ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে। একখানি কাপড়েই দিন রাত্রি কাটায়। তাহাতেই স্নান করে। স্নান করিয়া সেই ভিজা কাপড়েই থাকে। সেই ভিজা কাপড় অবলার গায়ে শুকায়। অবলা শীতে অনেক কষ্টে সেই কাপড়েই শীত নিবারণ করে, লজ্জা নিবারণ করে। ইহাতেই অবলার কষ্টের শেষ হয় নাই। এসবের উপর আরও অনেক কষ্টের অলঙ্কার ছিল।

অবলা সুশীলার পাতের ভাত কিছু দিন পরে আর পায় না। বিধাতা তাহাও মাপিতে ভুলিলেন। কোন কোন দিন সুশীলার বিড়াল সব ভাত খাইয়া ফেলিত। অবলার সে দিন আর আদতে জুটিত না। অবলা ক্ষুধার জ্বালায় ভাতের ফ্যান খইতে বাধ্য হইত। অবলা একদিন ফ্যান খাইল, দেখিয়া সুশীলার বড় আনন্দ। সুবিধা দেখিয়া সুশীলা মাঝে মাঝে অবলার জন্ত কেবল ফ্যান রাখিত। অবলা সৌভাগ্য বশতঃ চার পাঁচ দিন ভাল ফ্যানই পাইয়াছিল, কিন্তু এক দিন খোরায় ফ্যান খাইতে গিয়া দেখিল, কে সে ফ্যানে ঘর-নিকান কাল গোলা মিশাইয়াছে। অবলা তাহা দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিল। সুশীলাকে সে কথা না বলিয়া, তাহাকে লুকাইয়া সেই ফেনের খোরা লইয়া খিড়কী পুষ্করিণীতে চলিল। ঘাটে গিয়া পুকুরের জলে ফ্যান ঢালিয়া ফেলিল। সুশীলা হঠাৎ পা টিপিতে টিপিতে ঘাটে গিয়া যখন দেখিল অবলা জলে ফেন ঢালিয়েছে, অমনি বাঘিনীর মত অবলাকে আক্রমণ করিল।

সুশীলা দাঁতে দাঁত চাপিয়া একটু সরু সুরে বলিল, 'বলি ছ্যালো। পোড়ার মুখী! (সুশীলা অবলাকে প্রথম প্রথম "অবলা" বলিয়া ডাকিত, তারপর ঘনিষ্টতা বাড়িলে, "পোড়ারমুখী" বলিয়া ডাকিত)। অবলা যেন বাঘিনীর ডাকে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল,—ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

সু। তোমার মুখে কি কেন রোচে না। এত বড় মানুষ হয়েছ। আমরণ! যদি খাবিনা তো নষ্ট কর্‌লে কেন্‌লো। বাড়িতে একটা কুকুর আছে তার কি খবর রাখিস না! কুকুরের উপর হিংসা ক'রে কেন ফেলদি! আচ্ছা থাক তুই। আজ শুধু পেটেই থাকতে হবে। মনে ক'রেছ হাঁড়িতে মুড়ি আছে—এসে হাঁস হাঁস ক'রে খাবেন।

অবলা ধীরে ধীরে বলিল, "দিদি। কেনে কে ঘর নিকান গোলা ফেলে ছিল তাই খেতে পারি নাই। আমি আজ আর কিছু খাবনা।

সু। আমরণ! ঘর নিকান গোলা আবার কি লো! একটা না একটা বদনাম আমার নামে রটাতে পারলেই তুই বাঁচিস নয়? যানা কোন চুলোয় যায়গা আছে যানা। ঘর নিকানো গোলাই তোর কপালে এখন জুটলে হয়। অবলা চুপ করিয়া রহিল। ম্লান মুখে খোরা মাজিতে মাজিতে, আপনার দুঃখের চাপে আপনার পাঁজরার হাড় যেন ভাঙিতে থাকিল। সুশীলা রাগে ফুলিতে ফুলিতে গর গর করিয়া চলিয়া গেল। এরূপ তিরস্কার ব্যতীত সুশীলা অবলাকে সময়ে সময়ে প্রহার পর্য্যন্ত করিত। কিল, চাপড়, ঠোনা, লাথি এসব তো অবলার নিত্য

আহার ছিল। এ ছাড়া কখন কখন গরম হাতায় ছ্যাঁকা পর্য্যন্ত অবলার অদৃষ্টে জুটিত।

বিড়ালে হাঁড়ির মাছ, কড়ার দুধ খাইলে; কুকুরে হাঁড়ির ভাত খাইলে; সুশীলা পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের কাছে পথে ঘাটে অবলার নামে দোষ দিত। যারা সুশীলার কোন ধার ধারিত না, তাহারা সুশীলার উপর মনে মনে চটিত, কখন বা দুকথা গরম গরম শুনাইয়া দিত। তাহাতে সুশীলার রাগটা অবলার উপরেই অধিকতর জলিয়া উঠিত। আর যাহারা সুশীলার নিকটে নুনটুকু, তেলটুকু, মসলাটুকু চাহিবামাত্র পাইত, তাহারা বাধ্য হইয়া অবলাকে গালি দিতে থাকিত। কুকুর বিড়ালের সৌভাগ্য ছিল, অবলার তাহা ছিল না। এ জগতে যাহারা প্রেমের পথে যায়, তাহারা অবলার মত কুকুর বিড়ালের দশা পাইয়া থাকে।

একদিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ একটা কুকুর আসিয়া, রান্নাঘরের মাছ ভাত খাইয়া পলায়। অবলা তখন সুশীলার বিছানা ভাল করিয়া ঝাড়িতে ছিল, আর সুশীলা তখন ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পাড়ার নিস্তারিণীর কাছে তেজাল ভাষায় অবলার নিন্দা করিতেছিল।

সুশীলা ভাত খাইবার জন্য, রান্নাঘরে গিয়া যখন দেখিল, হাঁড়ি উলটান, ভাত ছড়ান, মাছ ছড়ান; তখন সুশীলার আপাদ মস্তক রাগে জলিয়া উঠিল। সে রাগ অবলাকে আগুনে পুড়াইতে অথবা বঁটিতে কাটিতে সুশীলাকে তাড়া দিতে থাকিল। সেই রাগ তখন উগ্রতর হইয়া সুশীলার চক্ষু দুটী ঘুরাইতে ঘুরাইতে চীৎকার করিয়া অবলাকে ডাকিল "বলি হ্যালো

পোড়ারমুখি! খান্‌কি! এখন তুই বাঁড়ি হ'তে বেরো। এখনি বেরো! এখনি বেরো! তোর যোগীন বাবাকে বড় ভয় করি-কি না। সে কার খায় তা জানিস? তার আবার জোর করিস কি?

রাগ আরও চড়িয়া উঠিল। তখন সুশীলা এক গাছা খাংরা লইয়া, "বেরো বলছি এখনি বেরো," বলিতে বলিতে অবলার সুন্দর ম্লান মুখে, হপ্‌ হপ্‌ করিয়া আঘাত করিল। অবলার মুখ কাটীয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। অবলা তাহাতেও নড়েনা দেখিয়া অবশেষে ঝাঁটা ছুঁড়ে ফেলিয়া, ভূমে চাপিয়া বসিল; তারপর দুই হাত মাটিতে রাখিয়া হাতের অংগুল মুচড়াইতে মুচড়াইতে এলো চুলে, শরীর দুলাইয়া, দাঁত খিঁচাইয়া খুঁতকুড়ি ছড়াইয়া হুঙ্কার করিতে লাগিল, "বাড়ি থেকে না বেরোবি তো তোর যোগীন বাবার মাথা খাবি" মাথা খাবি;—তার মরা মুখ দেখবি তার মরা মুখ দেখবি। অবলা তখন ধীরে ধীরে ম্লান মুখে বাটির বাহিরে গেল। সুশীলা অমনি বাটির দ্বার বন্ধ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—•:(o):•—

অবলা মলিন মুখে বাটীর বাহিরে গেল। কোটার দেওয়ালে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। "কোথায় যাব? সময়ে সময়ে একটু আধটু জ্বালা যন্ত্রণা আসে; তা বলিয়া, স্বর্গ ছাড়িয়া কোথায় যাইব। পিতা মাতা নারায়ণ সমক্ষে যাঁর চরণে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁরে ছাড়িয়া কোথায় যাইব। স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালে ঐ শ্রীচরণ ব্যতীত আমার যে আর কোন আশ্রয় নাই,—আমি সে শ্রীচরণ ছাড়িয়া কোথায় যাইব! যদি তাঁর শ্রীচরণের ছায়ায় পীপিলিকার থাকিবার মত একটুকু মাটি পাই তাহাই আমার অনন্ত স্বর্গ;—আমি সে স্বর্গ ছাড়িয়া কোথায় যাইব। সে স্থানে দাঁড়াইয়া যদি বজ্রাঘাতে মরি, আগুণে পুড়ি তাহাতে আমার যে সুখ যে তৃপ্তি, স্বর্ণ অট্টালিকায় সহস্র দাস দাসী সেবা করিলে সে সুখ সে তৃপ্তি আমার হবে না। ভগবান আমায় যে মাটিতে গড়িয়াছেন তাহাতে ওসব জিনিসে সুখ হবে না—তা বলিয়া কি করিব—আমার সবই বিপরীত। স্বামীর স্থল যাহা, তাহাই আমার ইহকাল পরকাল;—সে স্থলের বাহিরে যাহা সেখানে আমার অধিকার কি যে সেখানে গিয়া হাঁপ ছাড়ি। আমি তাঁকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। এই দেহ তাঁর চরণে পাত করিব—ইহাতে আমার কিছু অধিকার নাই।" অবলা নীরবে এই সব ভাবিতেছে,—যেন হৃদয়—সাগরে তুফান উঠিয়াছে। অবলার পাশে ফুল বাগান—যোগেন্দ্রের বিশ্রাম স্থল।

অবলার মাথার উপরে নক্ষত্র পূর্ণ আকাশ—তাহাতে রাত্রি ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতেছে এবং সেই গাঢ়তার চাপে বনে ফুল ফুটিতেছে, বনে গাম্ভীর্য্য বাড়িতেছে আর প্রাণী জগৎ ক্রমশঃ অচৈতন্যে মিশিয়া যাইতেছে। অবলার চারিদিকে শ্যামলা প্রকৃতি জ্যোৎস্নাপূর্ণ হইয়া চক্ মক্ করিতেছে। সেই আঁধার-মিশ্রিত বৃক্ষ সকলের মাথায় জ্যোৎস্না হাসিতেছে—ঝোপের ভিতরে জ্যোৎস্না কণা বায়ুভরে নাচিতেছে—গাছের তলায় মাটিতে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে—তাহাতে কাণ্ড—শাখা—পত্র সম্বলিত বৃক্ষের ছায়া পড়ায়, যেন সোনালি রঙে, কাল রঙের বৃক্ষ-ছবি চিত্রিত হইয়াছে। ঈষৎ বায়ু প্রবাহে আলোকের সহিত সেই সব বৃক্ষছায়া নড়িতেছে। অবলা একটি গাছের ছায়ায় বসিল,—অবলার বস্ত্রাচ্ছন্ন দেহের উপরে—পিঠে, পায়ে মাথায় বৃক্ষ শাখার ছায়া সকল পড়িয়া অবলাকে চিত্রিতের ন্যায় দেখাইল। সেই সুন্দর চন্দ্রালোকে গাছ পালার ছায়া দেখিবা মাত্র অবলার শোকপূর্ণ প্রেম-সাগরে ভাবের তুফান উঠিল!—"এই জ্যোৎস্নায় যেমন ছায়া, তেমনি আমার স্বামীতে আমি। অবলা যতক্ষণ ছায়াও ততক্ষণ। আলো যায় সঙ্গে সঙ্গে ছায়াও যায়। ছায়া আলোর স্ত্রী। ছায়ার মত সতী কে আছে? আলো আপনার বুকে করিয়া ছায়াকে নাচাইতে নাচাইতে যেই বিলীন হয় ছায়াও সঙ্গে সঙ্গে যায়, ছায়ার মত সতী কে আছে? আমার কপালে কি তা হবে? আমি কি স্বামীর আলোকে থাকিয়া স্বামীর সঙ্গে মিশিতে পারিব!" ভাবিতে ভাবিতে অবলা উঠিল। ফুল বাগানে প্রবেশ করিল। আজ প্রবেশ করিয়াই আপনার হৃদয়ে গাছ পালা লতা পাতা

ফল ফুল সমুদয় আচ্ছন্ন করিল—কেননা সে সবই তার স্বামীর, অবলার হৃদয় ভিন্ন তাহাদের আশ্রয় আর কোথায়? স্বামী কত বার দিনে রেতে সেই বাগানে বেড়াইয়াছেন, বিশ্রাম করিয়াছেন। অবলা বাগানে জ্যোৎস্নালোকে অস্ফুট ভাবে যেন স্বামীকে দেখিতে লাগিল। ঐ একস্থলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; ঐ বসিয়া আকাশের চাঁদ দেখিতেছেন। ঐ কামিনী গাছের তলায়, ঐ ঘাস বনে গাছের আলোক-মিশ্রিত ছায়ায় যেন স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন। ঐ গাছের ঝোঁপের মধ্যে কুসুম-গুচ্ছ-নিপতিত চন্দ্রালোকের শোভা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছেন। হঠাৎ মন্দ মন্দ বায়ু বহিল; অমনি গাছের শাখা পল্লব পাতা ফুল সমুদয় যেন জীবন-সঞ্চারে যুগপৎ নড়িয়া উঠিল; এখানে ওখানে দুই একটা ফুল পাতা টুপ টাপ করিয়া খসিয়া পড়িল। আর প্রকৃতির আনন্দোচ্ছ্বাসবৎ সেই আকস্মিক বায়ু সঞ্চালনে, যেন, স্বামী-অমৃতস্পর্শ-সুখে অভিভূত হইয়া থাকিল। অবলা এইরূপে প্রেম-কল্পনার তুলিকা সঞ্চারে সেই জ্যোৎস্নাপূর্ণ শ্যামলা প্রকৃতির অঙ্গে স্বামীর সুমধুর মূর্ত্তি কত-ভাবে চিত্রিত করিতে করিতে আপন-হারা হইতে লাগিল।

যোগেন্দ্র একদিন সেই কামিনী-তরু-তলে বিশ্রাম করিতেছিল, আর অবলা সেই বাগানের পুষ্করিণী হইতে কলসী-কক্ষে জল আনিবার সময় সেইরূপ দেখিয়া বিভোর হইয়াছিল। আজ সে কথা মনে পড়িল। অমনি মনের সেই প্রতিবিম্ব বাহিরে ফুটিয়া উঠিল;—অবলার সমস্ত প্রকৃতিতে অমৃত-সঞ্চারবৎ অনুভূতি প্রবল হইল। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে সেই কামিনী তলে গিয়া কল্পিত স্বামী মূর্ত্তিকে প্রণাম করিল। তারপর

কাঁদিতে কাঁদিতে মুদিত নয়নে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। অবলা সেই কামিনী তরুর কাছে আপনার দুঃখ প্রকাশ করিল। অনেক সময়ে মানুষ অভাবে গাছের কাছেও দুঃখ প্রকাশ করিয়া যাতনার লাঘব হয়। গভীর দুঃখে মানুষ, অনেক সময়ে, আপনার জন ছাড়িয়া, গাছের গলা জড়াইয়া ধরে। অবলার আজ সেই দশা। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে অবশেষে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রার্থনা করিল "প্রভু! করিয়া যেন কামিনী ফুলের গাছ হই; আর তাঁকে হউক দিনে দণ্ডেক, এক দিনের জন্য কি এক মুহূর্তের জন্যও যেন তোমাকে আমার তলে পাই; এবং যেন এমনি করিয়া আমার রাশি রাশি ফুল তোমার অঙ্গে মৃদু মৃদু ঢালিয়া সুগন্ধ দানে তোমার মনোতৃপ্তি করিতে পারি। তাহাতে আমার সুখ আমার অনুভব না হউক তোমার তো হবে। নারী জীবনে তো তোমার সুখে আসিলামনা প্রভু! যদি কাষ্ঠ-জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও আসি তাহাই আমার সৌভাগ্যের শেষ সীমা।' আমার আর কোনও ইচ্ছা নাই। তুমি তো একবার স্পর্শ করিবে, আমার ফুলে তো আঘ্রাণ করিবে, আমার ছায়ায় তো বসিবে, আমার শাখায় পাখীর গানে তো তৃপ্তি পাইবে,—ইহাই আমার চরম বাসনা। ভগবান অবলার এ বাসনা কি কোন জন্মেও পূর্ণ করিবে না!"

নবম পরিচ্ছেদ।

সুশীলা অবলাকে বিদায় করিবার পর উদরের জ্বালা নিবারণ করিয়া বিছানায় শুইয়া ভাবিল। "তাড়াইয়া ভাল করি নাই। অত লজ্জায় মাথা পাড়ায় যায় না। কাজ কর্ম্মওলাও গতর দিয়ে করে। যদি ফিরে আসে;—আসিবে না তো আবার বাপের কোন চুলায়? কতবার তাড়ালাম কতবার এলো গিয়েছে। তা কাল আসে যদি তাড়াবনা। দুএকটা না হয় ভাল কথাই বলিব। তা এমন কিই বলেছি। কার ঘরে এমনি না হয়? আমি তাই অনেক সহ্য করিয়া আছি; অন্ত কেহ হইলে তার মুখ দর্শন করিত না"।

পর দিন প্রাতে অবলা খিড়কির দরজার কাছে দেওয়ালে ঠেস দিয়া কি ভাবিতেছিল; সুশীলা—হঠাৎ করিয়া খিড়কির দ্বার খুলিল। বাহিরে অবলাকে দেখিয়া মনে মনে বড় খুসী। সুশীলা তখন একটু বাঁকা নরম স্বরে "তা দাড়য়ে কেন? যাওনা ঘরে যাওনা। অবাক করেছে বাবা। সমস্ত রাত যে একবারে দেখাই নাই! আমি তাই এত চেপে চুপে ঘরকন্না করি, বাবা! অন্ত কেউ হ'লে ঢাকে কাটি দিত। আমার মুখ টোই না হয় একটু খারাপ, এক ঘা না হয় মেরেছিই কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে টান আছে, তা তো আর পাড়ার লোকেরা বোঝেনা! যা বা শীঘ্র দুটো ভাত চড়াগে যা। কাল থেকে দুজনেই অনাহারে আছি।"

অবলা গুড় গুড় করিয়া বাটির ভিতরে প্রবেশ করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

কয়দিন পরে অবলার আকৃতি মড়ার মত হইল। নানা ব্যাধি অবলাকে আক্রমণ করিল। একদিন স্বর্ণলতার পীড়নে, তিনবার পচা খিড়কী পুকুরের জলে স্নান করায় মড়াঁর দেহে ভীষণ জ্বর দেখা দিল। তিন দিন পরে, অবলার বিকার হইল; চোখে ঘোলা পড়িল; অবলা শয্যা শায়িতা হইয়া নানাবিধ খেয়াল দেখিতে লাগিল। যে দিন বিকারের বড় বৃদ্ধি, সে দিন অবলা দেখিল, যেন সে সেনপুরের বাটীতে, তার কাছে মা, বাপ, ভাই সব বসিয়া রহিয়াছে। অবলা তাঁহাদের কাছে আপনার দুঃখ-কাহিনী বলিতেছে। হঠাৎ যোগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। অবলা মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল, ঘরের ভিতরে লুকাইল, অবলার বাপ মার জামাই দেখিয়া বড় আনন্দ। দেখিতে দেখিতে অবলার সে সব ভ্রম পরিবর্ত্তিত হইল। অবলা দেখিল যোগেন্দ্র নাই, বাপ মা ভাই কেহ নাই। সেনপুর জনশূন্য। অবলা অন্ধকার রাত্রে এক ভীষণ জঙ্গলের মাঝখানে বসিয়া কাঁদিতেছে। অবলা তখন বাস্তবিক বিছানায় শুইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বালিস আর্দ্র করিতেছিল।

অবলার কাছে একটি যুবতী বসিয়া অবলার গায়ে হাত বুলাইতেছিল, মাঝে মাঝে মাথায় বরফের জল দিতে ছিল; এবং বিকার-প্রলাপ শুনিতে শুনিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। যুবতী অবলাকে কাঁদিতে দেখিয়া, কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল;

"দিদি! ও দিদি"! অবলা সাড়া দিল না। যুবতী অবলার মাথা ঠেলিয়া আবার জোরে ডাকিল, "দিদি! ও দিদি!" অবলা যুবতীর দিকে চাহিল, চুপ করিয়া কিঞ্চিৎক্ষণ চাহিয়াই থাকিল। অবলার মনে হইল যেন যোগেন্দ্র কাছে বসিয়া আছে; সেই জঙ্গলের একটা গাছের ছায়ায় যোগেন্দ্র বসিয়া আছে। অবলা যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া জড়িত স্বরে বলিল, "তা এতক্ষণ আমায় জঙ্গলে ফেলে কোথায় ছিলে? বাপ মা মরা ব'লে কি তোমার দয়া হয় না"? বলিয়াই অবলা কাঁদিয়া ফেলিল। কিয়ৎক্ষণ কাঁদিয়া আবার নীরব হইল। চুপ করিয়া যুবতীর মুখের দিকে পাগলিনীর মত তাকাইয়া রহিল; তার পর বিছানায় কি হাতড়াইতে লাগিল। অবলা বিছানাটাকে একটা ফুল বাগান মনে করিয়া যেন পুষ্পচয়ন করিতে লাগিল;—বিছানায় সেইরূপ অঙ্গভঙ্গি হইতে থাকিল। ফুল লইয়া আবার মালা গাঁথিতে লাগিল;—ঠিক তদ্রূপ হস্ত-ভঙ্গি হইতে থাকিল। অবলা মুচকিয়া হাসিল,—হাসিতে হাসিতে বিড় বিড় করিয়া বলিল; "আমার মাথা খাস, এমালা যেন কেউ বাপু ছুঁওনা, এ তাঁর গলায় পরয়ে দেব। নলিনি আমায় বকুল ফুলের মালা দিয়েছিল। আমি তা লই নাই। নলিনী তাতে কেঁদেছিল। আহা! নলিনী কোথায় গেলি! মাগো! আর তাকে কাঁদাবনা। সেই মালা গাছটিকে কাঁদাবনা মাগো! কেউ ছুঁওনা কেউ ছুঁওনা; আমায় মাথা খাস বাপু! তোমা কেউ ছুঁওনি! কি আপদ! আমি যত বলি তত ছুঁতে যাচ্ছিস কেন লো!

দা। কে ছুঁতে যাচ্ছে?

অ। ওই কে এক ছুঁড়ি, দিদি না খিদি বুঝি! বলিয়াই আবার চুপ করিল। ফুলা গিঁজিবার মত আঙ্গুলের ভঙ্গিমা করিতে লাগিল। আবার যেন আকস্মিক উদ্বেগে উত্তেজিত হইয়া বলিল "নলিনী শ্বশুর বাড়ি যাবে তার মালা তাকে দেব।" পাশের যুবতী বার বার "নলিনী" নাম ও ফুলের মালার কথা শুনিতে শুনিতে একটা অনির্দ্দেশ্য যাতনায় অস্থির হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল;—কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিল, হরি যদি বাঁচান তবেই সব সার্থক হবে।"

অবলা আবার কাঁদিয়া ফেলিল। বালিশ হইতে বার বার মাথা তুলিতে লাগিল। বসিবার প্রয়াস পাইল। যুবতী অবলাকে বিছানায় স্থির রাখিবার জন্য অবলাকে জোরের সহিত ধরিয়া রাখিল;—অবলা প্রবলবেগে উঠিবার জন্য যুবতীকে ঠেলিতে লাগিল। যুবতী বিকারের সে বলে হারিয়া গেল। অবলা মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিল। বসিয়া জোরে যুবতীকে ধাক্কা মারিল। যুবতী পড়িল না, ধাক্কা সামলাইল। অবলা তখন পাগলিনীর বেশে এলে থেলো চুলে রুক্ষ মূর্ত্তিতে কড়ি কাঠের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল; কাঁদিতে কাঁদিতে আবার নলিনীর দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ব্যাকুলস্বরে কহিল, "যোগেন্দ্র বাবুর বড় ব্যারাম; তোদের তো বাপু একটু হুঁস নাই, আমি সিঁদুরের কৌটা লয়ে, হাতে চার গাছা লোহা পরে, এখনি যমের বাড়ি যাব; সেখানে যম মুখ পোড়ার বাড়ির দ্বারে চাবি দিয়ে আসব। তার পর কালি ঘাটে মা কালীর কাছে বুক চিরে রক্ত দিয়ে আসবো; তবে না আমার স্বামী বাঁচবেলো আবাগীর ঝি। বলিয়াই উন্মাদিনীর মত

বিছানা হইতে উঠিয়া যাইবার প্রয়াস পাইতেছে; যুবতী অবলার দুহাত জোরে ধরিয়া আছে। অবলা হাত ছাড়াইবার জন্য বল প্রয়োগ করিতে লাগিল, যুবতী অবলার হাঙ্গামায় বিছানায় পড়িয়া গেল। অবলা তখন উঠিয়া দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া টলিতে লাগিল, ঘুরিয়া পড়িয়া; দেওয়ালে বড় আঘাত লাগিল; কপাল ছেঁচিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। যুবতী একলা বড় ভয় পাইয়া সুশীলাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল। সুশীলা শুনিয়াও শুনিল না; মনে মনে চটিল। একবার বিকৃত মূর্ত্তিতে ঘরে প্রবেশ করিল। ভ্রুকুঞ্চিত দৃষ্টিতে যুবতীর দিকে চাহিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, তোমার যেমন কাণ্ড বাছা! কাজ নাই কর্ম্ম নাই রাত দিন ওর কাছে ব'সে আছ! ওর অনেক দুষ্টামি আছে! তা কিছু বুঝেছ। সাধে আমি ওর কাছে যেসি না।" বলিয়াই সুশীলা ঠর ঠর করিয়া চলিয়া গেল।

যোগেন্দ্র ইতিপূর্ব্বে ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল। ঠিক ঐ সময়ে ডাক্তারের সহিত বাড়িতে প্রবেশ করিল। ডাক্তারকে অল্প-ক্ষণ সদরে রাখিয়া; ঘরের ভিতরে গিয়া অবলার সেই সব কাণ্ড দেখিয়া বড় ভয় পাইল। ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে আনিল। ডাক্তার অবলার হাত দেখিল, সমস্ত বিবরণ শুনিয়া ঔষধের বন্দবস্ত করিল। অবলার মাথায় বুকে বেলেস্তারা দিল।

অনেক দিন এইরূপে যাইল। একচল্লিশ দিনের দিন অবলার একটু জ্ঞান হইল। অবলা যেন একটি গভীর নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইল। তেতাল্লিশ দিনের দিন অবলা একটু প্রকৃতিস্থা হইল বটে কিন্তু দুর্ব্বলতা যৎপরোনাস্তি। অবলা তখন উঠিয়া বসিতে পারে না।

এক দিন ডাক্তার রোগীর অবস্থা বুঝিয়া সেই ঘরে যোগেন্দ্রকে বলিল "ব্যায়ামটী বাড়ির দোষেই হয়েছিল ; পেটভরে বোধ হয় খাওয়া হত না। এখন পথ্যের বন্দবস্ত হ'লেই সব আরাম হবে"।

ডাক্তার ও যোগেন্দ্র চলিয়া গেল। অবলা চক্ষু মুদিল। মুদিয়া মানসপটে যোগেন্দ্রকে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ভাবিল "ডাক্তারের কথা যদি সত্য হয়; যদি বাঁচি তো আরো দেখিয়া সুখী হব" ;—অমনি মুদিত চক্ষু দিয়া জল ধারা বহিল।

পাশের যুবতীটি তাহা দেখিয়া, অবলার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "ও দিদি! দিদি!"

অবলা যুবতীর মুখের দিকে চাহিল। যুবতী আবার বলিল, "তুমিতো ভাল হয়েছ দিদি! আবার কাঁদ কেন"?

অবলার চোখের ধারা বাড়িল। যুবতী আঁচলে চক্ষু মুচাইয়া জিজ্ঞাসিল, "দিদি! আমায় চিনতে পার?

অবলা এতদিন যুবতীকে চিনিতে পারে নাই। এখন শেষ কথাটা শুনিয়াই যুবতীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অবলা যুবতীকে চিনিবার জন্ত অনেক প্রয়াস পাইতে থাকিল। "তাই তো কে? সেনপুরের হরি দাদির মত কে? না সে নয়,—তার তো চুল এত নয়"।

"বিষ্ণপুরের জমিদারদের বাড়ির বুক নাকি?

না—তার তো রং এর চেয়ে অনেক ফরসা"।

এইরূপে অনেক আলোচনা করিতে করিতে, অনেক স্ত্রীলোকের সহিত তুলনা করিতে করিতে পরিশেষে যুবতীর

চিবুকে একটী তিল দেখিবামাত্র যেন অনেকটা চিনিল ;—অবলার প্রাণান্ত সন্দেহ হইল,—তারপর বক্ষ চমকিয়া উঠিল, অবলার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চ হইল, অবলার দুচক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল ;—অবলা কাঁদিয়া ফেলিল ; অবলার কণ্ঠরোধ হইল ; অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে যুবতীর গলা জড়াইল ; যুবতীর বুকে মুখ গুঁজিয়া উন্মাদিনীবৎ চীৎকার করিল "নলিনীরে তুই এত দিন কোথায় ছিলি !" অবলা আর কথা কহিতে পারিল না ; দুর্ব্বল হইয়া যুবতীর কোলে মাথা রাখিয়া স্থির হইয়া থাকিল। তখন যুবতী দুঃখের উৎপীড়নে ব্যাকুলতায় আপন হারা হইয়া অবলাকে জড়াইয়া ধরিল। দেখিল যাহে অবলার গা ভিজিয়া গিয়াছে—কাপড় ভিজিয়া যাইতেছে। যুবতী অবলাকে অঞ্চল বাতাস দিতে দিতে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

অবলার দুঃখ বেগ বড়ই বাড়িয়া উঠিল। অবলা কিয়ৎক্ষণ পরে যুবতীর ক্রোড় হইতে মাথা তুলিল। উঠিয়া বসিল। বসিয়া দুইহাতে নলিনীর গলা জড়াইল। নলিনীও অবলার সে ভাবে উন্মাদিনী প্রায় অবলাকে আলিঙ্গন করিল ;—তখন দুজনের হৃদয় একত্রে স্পন্দিত, অশ্রুধারা মিলিত, এবং ঘন ঘন উষ্ণশ্বাস বিনির্গত হওয়ায় দুজনে যেন এক প্রাণে মিশিয়া থাকিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবের বেগ কমিলে অবলা নলিনীর কোলে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। উর্দ্ধমুখে নলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বড় আরাম পাইল। নলিনি তখন ভাবে গদ্‌গদ হইয়া জিজ্ঞাসিল, "দিদি! মায়া দয়া এতদিনে সার্থক হয়েছে"

কথা শুনিবা মাত্র অবলার প্রকৃতি চমকিয়া উঠিল। সে প্রাণের ভিতরে যেন হৃদাকাশ হইতে চাতকের শব্দের মত কি প্রাণারাম শব্দ অনুভূত হইল। অবলার দুচক্ষু দিয়া জল পড়িল। ভাবভরে অবলা কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া থাকিল।

"তারপর অবলা নলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া উদ্ভ্রান্ত প্রেমে বলিল; "আর একটি সাধ আছে নলিনী"। বলিয়াই অবলা চক্ষু মুদিল;—সেই সাধের মায়ায় আচ্ছন্ন হইল,—মুদিত চক্ষু উপচাইয়া তখন জলধারা বহিতে থাকিল। নলিনী সজলনেত্রে অবলার চখের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "ভগবান তাহাও পূর্ণ করিবেন। কি সাধ?"

অবলা তখন যেন মৃত্যুর কণ্টক-পূর্ণ শয্যায় পুষ্পশয্যা বিছাইয়া তাহাতে আরামে শুইয়া মুদিতনেত্রে জড়িত স্বরে ধীরে ধীরে বলিল "এইরূপে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া, এইরূপে মুখের দিকে চক্ষু স্থির করিয়া মরিবার সাধ নলিনী।"

অবলার এই কথা শুনিবামাত্র চারিদিকের প্রকৃতিতে যেন একটা চমক লাগিল;—নলিনী তখন দেখিল, তার প্রকৃতিতে কি একটা আবেগের ঘোর তাহাকে বিভোর করিতেছে আর যেন সমুদয় জগৎ সেই ঘোরে আচ্ছন্ন হইতেছে;—যেন সে কথার কুহকে জগতে প্রেমের ধাঁধাঁ লাগিতেছে। নলিনী সেই অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিল। তারপর অবলার চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "সে সাধও ভগবান পূর্ণ করবেন; আর কেঁদনা অসুখ বাড়বে।"

কিছুপরে, উভয়ের কোমলভাব করিয়া আসিল। অবলা বালিসে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল,—নলিনীর গলায় একটি হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসিল, "আমার খবর কোথায় পেলি?"

ন। আমার যে এখানে মামার বাড়ি! মামার বাড়িতে এসে সব বৃত্তান্ত শুনলাম। মার সঙ্গে একদিন দেখতে এলাম;

এসেই বুঝলাম আমারই সর্ব্বনাশ।

অ। আমার কপাল তবে বুঝি ফিরেছে ভাই! আমার মামার বাড়ির খবর কি?

ন। সব ভাল। তোমার মামী তোমার জন্য কাঁদে। সকলের বিশ্বাস তোমায় বাঘে খেয়েছে।

অ। ওমা! ও আবার কি কথা?

নলিনী অনেক কথা বলিল। অবলা বিবাহের রাত্রে পলাইয়া আসিবার পর যাহা ঘটিয়াছিল নলিনী সবিস্তার বর্ণনা করিল। তারপর নলিনী বলিল "আমার কর্ত্তা যে এখানে আছেন"।

শুনিবামাত্র অবলার মুখে চোখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। অবলা তারপর নলিনীর চিবুক ধরিয়া "আমাকে কবে দেখাবি?" বলিয়াই অবলা আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিল।

ন। তিনি তোমায় কয়দিন ডাক্তার ও যোগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে যে দেখে গেছেন। তিনি সিমলে গেছেন।

অ। বলিস কি ভাই! আমার কাপড় চোপড় ঠিক ছিল না। আমায় দেখে গেছেন। ভাই! আমার ম'লেই ভাল ছিল। আর এ মুখ দেখাতে হ'ত না"। বলিয়া অবলা কাঁদিতে লাগিল।

ন। দিদি! -আমি কি তখন মরেছিলাম। তোমার কাপড় আমি সর্ব্বদা ঠিক ক'রে রাখতাম। সে জন্য তুমি ভেবনা। আমার সে দিকে খুব হুঁস ছিল। বলিয়া নলিনী অবলার চক্ষু মুছাইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—

অবলার যে দিন হইতে বিকার হইল, সুশীলার সে দিন হইতে আনন্দ বাড়িল। অবলা সুশীলার পথে কণ্টক ছিল না; কিন্তু ভবিষ্যতে কণ্টক হইতে পারে এই আশঙ্কায় সুশীলা অবলাকে দেখিতে পারে না। অবলা আবার সুশীলা অপেক্ষা সুন্দরী। সেটা আরও আশঙ্কার কারণ। অবলার বিকারে সুশীলার তাই আনন্দ বাড়িল। অবলা মরিলে সুশীলা নিষ্কৃতি পায়;—সুশীলার হাড়ে বাতাস লাগে? সুশীলা ঘুম হইতে উঠিয়াই সকালে বিকালে অবলার মৃত্যুর জন্য দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করে। ঘরের কাজ কর্ম্ম করিতে করিতে প্রতিনিশ্বাসে অবলাকে যমালয়ে প্রেরণ করে। পুকুরে স্নান করিতে যাইবার সময়, রাস্তায় দেব মন্দিরের কাছ দিয়া যাইতে যাইতে, দেবতাকে প্রণাম করিয়া মানস করে "অবলা মরিলে চিনির নৈবেদ্য

দিব"। ঘাটের কালীর কাছে সুশীলা মানস করে "অবলা বাঁচিলে জোড়া পাঁঠা দেব, সোণার খাঁড়া দেব"। কিন্তু অবলা বাঁচে না।

একদিন পুকুরের শান বাঁধান ঘাটে; সুশীলা জলের ভিতরের একটি চাতালে পা রাখিয়া, উপরের একটী চাতালে বসিয়া, ডান হাতে ঝামা লইয়া পায় গোড়ালি মাজিতেছে। সুশীলার কাঁকাল পর্য্যন্ত কাপড় ভিজা; ভিজা কাপড় সুগোল নিতম্বে মাঝে মাঝে কুঁকড়াইয়া নিতম্বে জড়িত হইয়াছে। সেই ভিজা কাপড়ের ভিতর দিয়া নিতম্বের শোভা ফুটিয়া পড়িতেছে। পৃষ্ঠদেশের খানিকটা কাপড়ে ঢাকা, খানিকটা খোলা। বুকের উপরে কাপড় আলগা হওয়ায়, আলগা কাপড়ের দুপাশের ফাঁক দিয়া দুটী স্তনের অর্দ্ধ গোলকদ্বয় দেখা যাইতেছে;—যুবতী ঐরূপ ভাবে থাকিয়াই, আলতা-পরা পায় গোড়ালী ঝামা দিয়া মাজিতেছে। মাথার বেণী কালসাপের মত ঘাড়ের পাশ দিয়া ঝুলিতেছে। এমন সময়ে কোন বর্ষিয়সী ঘড়া কাঁকে লইয়া, খুঁটের ছাইএ দাঁত মাজিতে মাজিতে হ্যাঙাইতে হ্যাঙাইতে ঘাটে আসিল। চাতালে ঘড়া নামাইয়া সুশীলাকে জিজ্ঞাসিল "ভাল এক আপদ এনে ঘোরা যে আজা-জন হ'লি লো"। সুশীলা তখন উপর চাতালের পা খানি জলে নামাইয়া, ঊর্দ্ধমস্তকে দাঁড়াইয়া, বর্ষিয়সীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল," খুড়ি মা! আমি আর কি করব বল, আমাদের বাবুটি যত লোকের সর্দ্দার—এখন টের পাচ্ছেন।

খ। তা আপদ ব'লে যে তোরাও রেহাই পাস, তারও হাড় জুড়োয়।

স্ব। হাঁ! মরবে! ওর আবার মরণ আছে—যমের অরুচি—আমার বাড়িতে পদার্পণ করেই তো যাকে আমার খেলে. তত বড়কে মা, বাপ; ভাই, খুড়ো, খুড়ি সবার মাথা খেয়ে এখন বিকারে পড়ে মরেও মরছেনা। কাল রাত্তে ছেড়ে যাবার মত হয়েছিল—আবার রাত ভাল হয়েছে। তাই না হয়, ব্যারাম হয়েছে চুপ করে পড়ে থাক। ওমা! তা থাকবে—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব খেয়ে তবে যমের বাড়ি যাবে।

ব। তা যা বলছিস সবই সত্যি—ওর ছুটোবী আছে বইকি—তা ভগবান জানেন মা! হাঁগা! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি;—তা আমি কাকেও ব'লবোনা।

স্ব। তা বলনা—বোলতে দোষ কি?

বহিরণী তখন মুখখানা স্বর্ণলতার মুখের কাছে লইয়া গিয়া চুপে চুপে বলিল, শুনতে পাই নাকি—কিছু মনে করিওনি মা আমার ও শোনা কথা।

স্ব। তা বলনা বলনা; হক কথায় আর ভয় কি মা!—

ব। শুনতে পাই নাকি যোগীনের সঙ্গে আছে?

স্ব। ওমা! এই কথা? তা খুড়ি মা এ আর নূতন কথা কি? কেবা না জানে? ও যে অনেক দিন থেকে। ও কথা কি চাপা থাকে? ধর্মে ঢাকে কাটি দেয় যে মা। তাইতো আমি হারামজাদীকে দেখতে পারি না। পাড়ার লোক কি তা বোঝে, আমাকেই দোষ দেয়। আবাগীদের কি চোখ আছে—চোখের মাথা যে খেয়ে বসেছে। খেতে পাচ্ছিলিনা—বেঁধে কেটে এদ্দিন ভালই—জেতের মেয়ে কাজকর্ম কর, ঘরের মেয়ের মতন থাক—ওমা! তা নয়! হারামজা-

জাতীয় স্পর্দ্ধার কথা ব'লতে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। মুখ-পুড়ি কিনা তাঁর সঙ্গে চোখ ঠেরা ঠেরি করে রাতদিন তাঁর দিকে চেয়ে থাকে। আর বেয়াদ: বলব না—পা কাঁপছে। মরে ভাগ্যি, আর না মরে তো এবার ঝাঁটার চোটে গাঁ-ছাড়া ক'রবো।

দুজনের কথা হইতেছে, এমন সময়ে এক বৃদ্ধা গামছা-পোরা একটি টুকনি ঘটি বাম হাতে ধরিয়া, একটী ছড়িতে ভর দিয়া আস্তে আস্তে সেই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বুড়ী কাল কুব বাঁকা, উপর চাতালে আস্তে আস্তে ছড়িটী রাখিল, তারপর দুহাতে ভর দিয়া চাতালে আস্তে আস্তে বসিল। তারপর নিতম্ব ও দুহাতের কব্জিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিতে লাগিল। জলের কাছে গিয়া কুঞ্চিত সাদা ভ্রু দুটি ঊর্দ্ধে আকর্ষিত করিয়া, দৃঢ় দৃষ্টিতে সেই দুজনের দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে বিশেষ আগ্রহের সহিত অতি বৃদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসিল;—কেগা? নাত-বউ নাকি?

বুড়ীর আন্দাজে ভুল হইয়াছিল, তাই দুজনে একটু হাসিল। সুশীলা জোরে বলিল "ঠান দিদি! চোখের মাথা কি একবারে খেয়েছ"?

ব। ওমা তুই! আর দিদি! গেলেই হয়, তা আর কে

স। বলনা কে।

বুড়ী তখন বর্ষিসীর মুখের কাছে মুখ খানা লইয়া গিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে একটু বিস্মিত ভাবে বলিল "ওমা! আমাদের মেনোর মা।" তার পর বুড়ী একটু সরিয়া জলের উপরে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিল।

আসিয়া গামছা খানা ঘটি হইতে লইবার জন্য স্থান হাতটা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, হাতড়াতে হাতড়াতে গামছাও পায় না, ঘটিও পায় না, তখন একটু বিস্মিত ও বিকৃতভাবে সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল "ও নাতনী। আমার ঘটি গামছা তাই কোথা গেল?"

বর্ষীয়সী রহস্য করিয়া বলিল "আর বুড় মাগি! ঘটি গামছা ব[illegible] ভুলে এসেছ।"

বু। আলাপনি ভাই। লুকিয়ে রেখেছিস্—তুই ঘাটে এলেই জ্বালাতন করিস, দে ভাই দে। তোর সাত বেটা হ'ক অনেক বেলা হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে বৃদ্ধার সম্পর্কীয়া এক বার বৎসরের নাতিনী আসিয়া বৃদ্ধার [illegible] এক জায়গায় লুকাইয়া ঘটি ও গামছা জলে ডুবাইয়া তামাসা দেখিতেছিল—বৃদ্ধা সে বালিকাকে আসিতে টের পায় নাই। বালিকার নাম বসন্ত। সে ঘাটে বুড়িদের সঙ্গে প্রায়ই রঙ্গভঙ্গ করে। কখনও কখনও উৎপাতও করে। বুড়িদের শুক কাপড়ে জল ঢালিয়া [illegible]—কাদুনি মাখাইয়া দেয়—কখনও যো পাইলে ইট জড়াইয়া কাপড় জলে ফেলে। বৃদ্ধারা জল হইতে উঠিয়া কাপড় খুঁজিয়া পায় না।

বৃদ্ধা ঘড়া খুঁজিয়া পাইতেছে না—বসন্ত মুখ মুচকিয়া হাসিতেছে, দেখিয়া বর্ষীয়সী এক ধমকানি দিল। ধমকানি খাইয়া বসন্ত বুড়ির ঘটী গামছা বাহির করিয়া দিল। বৃদ্ধা তখন তীব্র দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিয়া একটু রুক্ষস্বরে বলিল, "তোদের ভাল! আমার সঙ্গে তোমার এত [illegible]!

আসুক তোর ডাক্তার—তোর নাক কাণ কাটিয়ে তবে ছাড়বো।

বসন্ত বুড়ির দিকে মুখ ভাঙাইয়া—"আহা হা! পোড়ার মুখ তোমার পুড়বে কবে"? বলিয়া ঘাট হইতে চলিয়া গেল।

বুড়া ভিজা গামছায় গা মুছিতে মুছিতে কত কি ভাবিবার পর সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল "হাঁগো! তোদের অবলা কেমন আছে? সুশীলা বিরক্তির সহিত উত্তর ক[illegible]—"তোদের অবলা ও আবার কেমন কথা? আমাদের [illegible] পুরুষের কে?

বুড়া জিজ্ঞাসা করিয়াই আবার কি ভাবিতেছিল, সব কথা ভাল বুঝিতে পারে নাই তাই বলিল "অঁা! কি বল্লি ভাল শুনতে পাই নাই।"

সুশীলা খুব জোরে সেই সব কথা আবার বলিল। পুকুরের ঘাটের উপরে সেই সময়ে নলিনীর মা আসিয়াছিল। সুশীলা তা টের পায় নাই। নলিনীর মা, কথাটা শুনিবার পর আরো শুনিবার জন্য ঘাটের কাছে একটা বকুল গাছের আড়ালে দাঁড়াইল।

বুড়া সুশীলার কথায় উত্তর করিল "তাহা কি একটু বয় টয় করিস। মেয়েটি বড় ভাল। ওর লক্ষণ দেখলে ভাল বলেই তো বোধ হয়—তা ভগবান জানেন 'বলিয়াই বুড়া আপন ভাবে নিমগ্ন হইল। বুড়া বরাবর আপনার বিদেশস্থ নাতিটির বিষয় ভাবিতেছিল।

বুড়ার কথা শুনিয়া রাগে জলিয়া বলিল "আর আর বুড়ি থাক্। ভাল তাল করিসনি—আমার সঙ্গে সে ডাক্তারের

ভাগ বসাতে চায়। ছিলাম বেটি, বাজারের খানকী, দাসী শুনেছি তাকার তাড়িয়ে দিয়েছে, ত্রিকুলে কেউ নাই, অনেক পেত্তনা—সে আবার ভাল, তার আবার সুখ্যাতি!' ভালো রাগে কাঁদিতে কাঁদিতে খুব জোরে কথা গুলা বলিবার মনে মনে ভাবিল "মাগি এবার গহনা বন্ধক রাখতে এলে হয়— ঝাঁটা মারবো।" নলিনীর মা তখন গম্ভীর ভাবে গলার শাড়া দিয়া মুখখানা ভারি করিয়া খাটে দেখা দিল। সিঁড়ির ধাপ [illegible] করিতে করিতে বর্ষিয়সীর দিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসিল "হাঁগা! খানকি আবার কে এলো?

বর্ষিয়সী সুশীলার মন যোগাইবার জন্য বলিল, "তা খানকীকে খানকী বলতে আর দোষ কি?

সুশীলা বর্ষিয়সীর উপর মনে মনে খুসী।

"তা লোকটা কে? শুনতে পাই না," বলিয়াই নলিনীর মা কোমর হইতে ঘড়া নামাইয়া ঘড়াটা ছাই দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মাজিতে মাজিতে, কথার উত্তর শুনিবার জন্য ব্যস্ত থাকিল। বর্ষিয়সী সুশীলার মুখের দিকে চাহিতে, সুশীলা চোখের ইসারায় সুকথা ভাল করিয়া শুনাইতে বলিল। বর্ষিয়সী বলিল, ওই সুশীলাদের বাড়িতে কে একছুঁড়ি এসেছে—সে খানকী তা কি জাননা?"

নলিনীর মা আগেই রাগিয়াছিল এখন রাগিয়া উঠিয়া কহিল "মরিলো মরি! পুরান গু হ'ল মাটি—পুরাণ খানকী হল সতী। কলিতে পড়লোর সব ঢাকা পড়েগো সব ঢাকা পড়ে। যার বাড় বল তার ধন মন লেগে যারে সই। যার স্বামী তার কেউ নয়। আর কোথা থেকে এক নূতন উড়ুগে



আবুক'র গিয়ে বিয়ে না নিকে ক'রে ছলেন সতী"।
যোগীনা কথার সব বুঝিল। মরমে পুড়িতে পুড়িতে জল বুগল' ঠিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যোগেন্দ্রর যত্নে চিকিৎসার গুণে অবলা আরোগ্যলাভ করিল।

অবলার প্রতি যোগেন্দ্রর একটু স্নেহ জন্মিয়াছে। অবলার খাওয়া দাওয়া ভাল হয় কি না যোগেন্দ্র সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে লাগিল। অবলা খাওয়া দাওয়ার গুণে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল।

যোগেন্দ্র কলিকাতায় গমন করিল। যাইবার সময় যোগী-নাকে ডাকিয়া বলিল, ব্যাচারীকে যত্ন ক'র -আমার মাথার দিব্য।

যোগেন্দ্র কলিকাতায় যাইলে যোগীনা দাসীকে ছাড়াইয়া দিল। ঘরে আপনি ও অবলা থাকিল।

অবলাকে ডাকিয়া বলিল, 'এখন তো তুই আরাম হয়েছিস; গেল গতর হয়েছে, আজ থেকেই ব'কির সব কাজ



তোকেই ক'রতে হবে। কাজ তো জেয়াদা নয়। নিজেদের খাওয়া দাওয়ার জন্য রাঁধা; বাসন গুলো মাজা; ঘর গুলো ঝাঁট দেওয়া, গোল পরিষ্কার করা; গোবর দেওয়া; আর রোজ নয় তিন দিন অন্তর হাটে যাওয়া।

অবলা তাহাতেই স্বীকার পাইল। সে বাড়ীতে অবলা স্বামীকে দেখিবার জন্ম হাসিতে হাসিতে পৃথিবীর সমুদয় যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে।

সেই দিন হইতে অবলা সুশীলার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল।

সুশীলা বলিল, 'গরুর ঘাস কাট্‌গে, অবলা কখনও গরুর ঘাস কাটে নাই। খড় লইয়া কাটিতে চলিল। অনেক কষ্টে কার্য্য শেষ করিল। অবলা হাটের কাজ, গোয়ালের কাজ, সকল কাজই করিতে লাগিল।

অবলা নিম্ন তলে যে ঘরটীতে শয়ন করিত, সুশীলা সে ঘরটীতে তাঁহার ঘর করিবে বলিয়া কাড়িয়া লইল। বলিল, 'গোল ঘরের এক পাশে একখানা চৌকী পাতিয়া দেব, একটা মাদুর ও বালিশ দেব, তাতে শুলেই চল্‌বে। আর, ও গোল ঘর মন্দ নয়।'

অবলা সেই দিন হইতে গোল ঘরেই শয়ন করিতে লাগিল। মশারী নাই। গোয়ালের মশায় অবলাকে রাত্রে ছাঁকিয়া ধরে, গোবর ও গোমূত্রের গন্ধে অবলা টিকিতে পারে না। অবলা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বাড়ির রোয়াকে আসিয়া শয়ন করে।

যোগেন্দ্রের কলিকাতা হইতে আসিতে এবারে বিলম্ব হইতেছে। অবলা সমস্ত দিন স্বামী-চিন্তায় মগ্ন থাকে। আবার

কবে স্বামী আসিবে,—আবার কবে স্বামীকে দেখিবে, এই চিন্তায় অবলার প্রাণ মগ্ন।

অবলা স্নানের পর প্রত্যহ স্বামীর ধ্যান করিয়া থাকে। চক্ষু মুদিয়া হৃদয়ে স্বামীর মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে কখন অশ্রুপাত করে, কখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়। স্বামী ধ্যান না করিয়া অবলা জল স্পর্শ করে না।

যে সময়ে পীড়া হইয়াছিল, অবলা স্বামীর ধ্যানে ডুবিয়া যন্ত্রণার হাত এড়াইত; স্বামীর রূপে আপনার অস্তিত্বকে অবলা বিসর্জ্জন করিত।

স্বামীর নাম শুনিলে অবলার চক্ষু দিয়া জল পড়ে,—শরীর কণ্টকিত হয়,—পৃথিবীর জলে স্থলে স্বর্গের আবির্ভাব অনুভূত হইয়া থাকে।

ঈশা, বুদ্ধ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নানক, চৈতন্য আপনাদের হৃদয়ে—আপনাদের অস্তিত্বে ঈশ্বর দর্শন করিয়া যেরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখ সাগরে ডুবিতেন, অবলা যোগেন্দ্রকে দেখিলে সেইরূপ সুখে, সেইরূপ আনন্দে উন্মাদিনী হয়।

অবলার প্রেম প্রশান্ত সাগরের ন্যায় স্থির গম্ভীর—লজ্জাবরণে আবৃত—সরমের কোয়াসায় ঢাকা।

স্বামী ভাল বাসিবে কিনা অবলা তাহা একবারও ভাবিত না। স্বামীকে দেখিতে—স্বামীকে সুখে রাখিতে—স্বামীর পদসেবা করিতে—স্বামীর জন্য হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিতে পারিলেই অবলার প্রেম তৃপ্ত। অবলা স্বামীর জন্য কিনা করিতে পারে? বজ্র বুকে ধরিতে—সাপ, বাঘ, ভালুকের মুখে যাইতে—আগুনের নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে—নরক স্বর্গের

বিদগ্ধ আপনার বক্ষে, মস্তকে ফুটাইতে—গলিত কুষ্ঠ রোগ বহিতে—এবং সমুদয় লোকের নিন্দা, ঘৃণা প্রহার, ভ্রূকুটি, অকাতরে সহ্য করিতে পারে।

সুশীলা যে কষ্ট দিতেছে, অবলার প্রেম সে সবকে আদতে কষ্ট বলিয়াই গ্রাহ্য করিতেছে না। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে যত যন্ত্রণা—যত জ্বালা—যত ভয় আছে, সমুদয়কে অবলা হাসিতে হাসিতে যোগেন্দ্রের জন্য সহ্য করিতে পারে।

কার্য্যগতিকে পড়িয়া যোগেন্দ্রের কলিকাতায় বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সুশীলার চরিত্রে কলঙ্ক পড়িয়াছে। সেই ডাক্তার প্রতিরাত্রে সুশীলার ঘরে আসিতেছে। অবলা কিছুই জানে না।

যোগেন্দ্রের প্রতি সুশীলার যে একটু স্নেহ ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে কমিতেছে। আর যদি যোগেন্দ্র না আসে তো সুশীলার পক্ষে ভাল হয়।

একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় যোগেন্দ্র হঠাৎ বাটীতে আসিল। আসিয়াই দেখিল অবলা গোরুর জাব কাটিতেছে। যোগেন্দ্র দেখিয়াই চমকিত হইয়া সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঝি কোথা?' সুশীলা বলিল, 'সে এখন হবেক্‌—পা হাত ধুয়ে ভাত খাও।'

জাব কাটিতে কাটিতে স্বামীকে দেখিয়া অবলার যে কি আনন্দ, কি সুখ, তার আর বর্ণনার প্রয়োজন নাই।

যোগেন্দ্র সুশীলার উপর অত্যন্ত কুপিত হইল। আহারাদির পর উপর তলে গিয়া বিছানায় শয়ন করিয়া সুশীলাকে বলিল, 'ওঁকে ও রকমে কষ্ট দিয়ে তোমার কি লাভ হচ্ছে'?

সুশীলা বলিল, 'ও নিজে ওসব কাজ ক'রছে। ওই ব'লে ক'য়ে কাকে জবাব দিয়েছে। আমি জবাব দিতে চাই নাই। ও বলে ঝির দরকার কি; আমি সব ক'রবো'। যোগেন্দ্র আর কিছু বলিল না। চুপ করিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মকাল। বাটীর পশ্চাতে বৃহৎ ফুল বাগান। বাগানের মধ্যে মধ্যে বেঞ্চ পাতা আছে। বেঞ্চের পার্শ্বে মাঝে মাঝে ফুলগাছের এমন ঝোপ আছে যে, তাহাতে মানুষ বসিয়া থাকিলে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু ঝোপের ভিতর হইতে সব দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক গ্রীষ্ম হইলে যোগেন্দ্র ফুল বাগানে বেঞ্চে শুইয়া বায়ু সেবন করে।

যোগেন্দ্র যেদিন কলিকাতা হইতে আসিল, সেই দিন অপরাহ্ণ চারিটার সময় অবলা বাহিরে একখানি ছিন্ন মলিন শতছিদ্র বস্ত্র পরিয়া গোবরের কাজ করিতেছে; এমন সময়ে একজন শস্ত্রধারী—জটাজুট-বিভূষিত সন্ন্যাসী সেই বাটীতে প্রবেশ করিল।

প্রবেশ করিয়া চমকিতভাবে অবলার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিল। সন্ন্যাসীর আপাদমস্তক হঠাৎ কণ্টকিত হইল। হৃদয়ের ভিতরে এক মহা ভাবের ঝড় উঠিল। সন্ন্যাসী ভাবিতেছে, অবলার মত যে দেখিতেছি—৮।১০ বৎসরে যে প্রকার পরিবর্তন সম্ভব, তাহাই দেখিতেছি। অবলা তো পুড়িয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ দেখিতে দেখিতে ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিল, 'এ নিশ্চয়ই অবলা।' সন্ন্যাসীর শরীর কণ্টকিত হইল।

কাজ করিতে করিতে অবলা অন্যমনা ছিল। হঠাৎ সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টি পতিত হইল। অবলা দেখিয়াই ভাবিল, 'রামদাদা নাকি? ঠিক্ সেই প্রকার যে। রামের নাকের উপরে একটী তিল, বাম হাতে ছয়টী আঙুল ছিল। অবলা সে সব দেখিয়াই চিনিল। অবলা কাজ করিতে করিতে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। তাকাইতে তাকাইতে অবলার দু চক্ষে অশ্রুজল দেখা দিল, রামচন্দ্র তাহা দেখিয়াই বুঝিল, এ নিশ্চয়ই আমার ভগিনী 'অবলা'। অমনি কাতর ভাবে যেন অজ্ঞাতে বলিল 'অবলা—অবলা নাকি'? বলিয়াই রাম কাঁদিয়া ফেলিল। অবলা সরিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল 'দাদা! দাদা তুমি।' অবলা আর কথা কহিতে পারে না, রামও কথা কহিতে পারে না।

রাম আপনার শোকের বেগ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিল 'দিদি—তোমার আজ এমন দশা'!

অবলা তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া দাদাকে বসিবার আসন পাতিয়া দিল। রাম অবলার সে মলিন বেশ—সেই নিকৃষ্ট কার্য্যের বিষয় ভাবিয়া ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিল।

আবার কাঁদিতে কাঁদিতে যখন ভাবিল, "অবলাকে আবার দেখিতে পাইলাম, আহা! ভগবান আমার যে অবলাকে আবার দেখাইবেন, তাহা এক দিনও ভাবি নাই" তখন রামের একটু আনন্দ, একটু সুখ সম্ভোগ হইতে লাগিল। অবলা হাত, পা ধুইবার জন্য জল আনিয়া দিল। সন্ন্যাসী হাত পা ধুইয়া বসিয়া আছে, অবলা দূরে দাঁড়াইয়া ২।১টা কথা কহিতেছে;- এমন সময়ে যোগেন্দ্রর সাড়া পাওয়া গেল। অবলা সরিয়া গিয়া আবার গোবরের কাজ করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসীর সহিত যোগেন্দ্র ২।১টী কথা কহিয়াই বুঝিল, সন্ন্যাসীটি বিদ্বান্ লোক— বহুদর্শী। যোগেন্দ্র সন্ন্যাসীর খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করিয়া দিল।

রাত্রি হইল। সন্ন্যাসী খাওয়া দাওয়া করিয়া শয়ন করিল। সন্ন্যাসী যোগেন্দ্রকে আগে চিনিত। যোগেন্দ্রের সহিত কথা কহিতে কহিতে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, রাম বেশ বুঝিল, এই অবলার স্বামী। আরও বুঝিল, অবলাকে যোগেন্দ্র চিনিতে পারে নাই। ভাবিল, যাহা হউক পরিচয় দিয়া অবলার সহিত মিলন করিয়া দিতে হইবে। কাল সকালে সর্ব্বাগ্রে এই কাজটি করিব। ভাবিতে ভাবিতে রামচন্দ্র নিদ্রিত হইল।

যোগেন্দ্র সুশীলার কাছে শয়ন করিল। অবলা সেই গোয়াল ঘরটিতে নিদ্রিতা হইল। এ দিকে সুশীলা উপপতির পরামর্শে স্বামীকে কাটিবার চেষ্টায় আছে।

হঠাৎ ভয়ানক গ্রীষ্ম বোধ হইতে লাগিল। যোগেন্দ্র সুশীলাকে বলিল, তুমি থাক আমি ফুলবাগানে যাই।

যোগেন্দ্র আস্তে আস্তে ফুলবাগানে গিয়া একখানি বেঞ্চে শয়ন করিল। এক ঘন্টা পরে সুশীলা উঠিয়া ফুলবাগানে গেল। গিয়া দেখিল, যোগেন্দ্র অকাতরে ঘুমাইতেছে, সুশীলা আনন্দিতা হইয়া মনে মনে ভাবিল, এইবার বেস সুবিধা, এই সময়ে কায সাবাড় করি।

ঘরে আসিয়া তরবারি বাহির করিল। রাক্ষসী তরবারি লইয়া ভয়ে কাঁপিতেছে। ঘর গুলা যেন কাঁদিয়া বলিল, 'সুশীলা! অমন কায করিও না।' সুশীলা এক পা এক পা করিয়া তরবারি হস্তে স্বামীর মাথা কাটিতে চলিল। আকাশের নক্ষত্র সকল বলিল, 'সুশীলা! অমন কাজ কারও না'।

সুশীলার আপন আত্মা বলিতেছে, 'সুশীলা, স্বামীকে কাটিও না'।

সুশীলা ভাবিতেছে, কাটিয়া সেই রক্ত আনিয়া অবলার মুখে হাতে কাপড়ে মাখাইয়া দিব, তারপর সকালে সকলে অবলাকেই ধরিবে। এই ভাবিয়া সুশীলা নিম্নতলে আসিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল।

এদিকে হতভাগিনী অবলা হঠাৎ স্বপ্ন দেখিল, 'স্বামী ফুল বাগানে শুইয়া আছে, কে যেন স্বামীকে কাটিয়া ফেলিয়াছে। অবলা স্বপ্ন দেখিয়াই উন্মাদিনীর মত উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্রুত-বেগে কাতর প্রাণে যেন দৈব শক্তিতে পরিচালিত হইয়া বাগানে গিয়া উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া দেখিল, স্বামী বেঞ্চে ঘুমাইতেছে। অবলা একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া স্বামীকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিল। অবলার হৃদয়ের গভীরতম স্থলে

যেন কে বলিল, 'অবলা। তোমার স্বামীকে আজ রক্ষা কর, এখান হ'তে কোথাও যেও না।'

জ্যোৎস্নার ভিতর হইতে—ফুল গাছ হইতে—আকাশ হইতে কে যেন বলিল, 'অবলা। তোমার যোগেন্দ্রের আজ বড় বিপদ, যোগেন্দ্রকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা কর'।

হঠাৎ অবলার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অবলার ডান চক্ষু নাচিল। চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিল।

অবলার বোধ হইতেছে, যেন আকাশের চন্দ্র, তারা, সব নিবিয়া, পৃথিবী ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে, অবলা সেই অন্ধকারে যোগেন্দ্রকে হারাইবে। অবলার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে, সমুদয় শরীর থর থর কাঁপিতেছে। ভয়ে মুখ দিয়া কথা ফুটিতেছে না। এমন সময়ে কে একজনা ঊর্দ্ধে তরবারি তুলিয়া, রাক্ষসীর বেশে যোগেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তরবারি যেই যোগেন্দ্রের গলার উপরে পতনোন্মুখ, অমনি অবলা বিদ্যুৎ-বেগে উর্দ্ধহস্তে তরবারির নিম্নদেশে আপনার বক্ষদেশ পাতিয়া দিবার জন্য পাগলিনীর মত তরবারির নিম্নে যোগেন্দ্রের ঘাড়ের উপরে পতিতা হইল। তরবারি সতীর দক্ষিণ হস্তের তিনটী অঙ্গুলির অগ্রভাগ কর্ত্তন করিয়া যোগেন্দ্রের স্কন্ধ দেশে পড়িল। অবলা "বাবা গো সর্ব্বনাশ হ'ল গো"। বলিয়া চীৎকার করিল। যোগেন্দ্রও 'বাপরে' বলিয়া চিৎকার করিয়া জাগ্রত হইল। সুশীলা তখন সেইখানে তরবারি ফেলিয়া দ্রুতবেগে পাগলিনীবৎ পলায়ন করিল।

রামচন্দ্র উঁহাদের চীৎকার শুনিয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। সুশীলা রামচন্দ্রের সম্মুখে পড়িল। সুশীলার সে ভাব, রক্ত-

রক্ষিত বস্ত্র দেখিয়াই ধরিয়া ফেলিল।

এদিকে যোগেন্দ্র দেখিল, অবলার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলের অগ্রভাগ একবারে গিয়াছে। অবলার তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই, আপনার হাত দিয়া ভয়ানক রক্ত বহিতেছে সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আপনার আঁচল চিরিয়া যোগেন্দ্রর গলায় জড়াইয়া দিতেছে।

এদিকে রামচন্দ্র সুশীলাকে বাঁধিয়া, হড় হড় করিয়া প্রবল বেগে বাগানে টানিয়া আনিয়াছে। যোগেন্দ্র তাহা দেখিল, একদিন যাহা ফুলের মালা ভাবিয়া গলায় পরিয়াছিল—আজ তাহাকে ভীষণ ভুজঙ্গিনী মূর্ত্তিতে অবলোকন করিয়া মনে মনে ভাবিল কালনাগ বুকে ধরে ছিলাম!

রামচন্দ্র সুশীলাকে একটি গাছে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া আপনার ঝুলি হইতে কিসের গুঁড়া আনিয়া যোগেন্দ্রের কণ্ঠে ও অবলার হাতে দিল। রক্ত বন্ধ হইল। দুজনের রক্ত বন্ধ হইলে রামচন্দ্র সেই উদ্যানে যোগেন্দ্রকে বলিল, "প্রাণ তো গিয়াছিল?"

যো। কাল সাপিনীকে ল'য়ে ঘর করছিলাম। "আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট নহিলে আমার প্রথমা স্ত্রী যাবে কেন?" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রামচন্দ্র চমকিত হইল—অবলার দিকে চাহিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল:—

যোগেন্দ্র বাবু! আপনার প্রথমা স্ত্রী যায় নাই—ঐ তোমার প্রথমা স্ত্রী হতভাগিনী অবলা সম্মুখে দাঁড়াইয়া।—যে আপনার উপর পতনোন্মুখ তরবারির তলে গলা পাতিয়া দিয়া আপনার

প্রাণ বাঁচাইয়াছে, সে আপনার সেই প্রথমা স্ত্রী হতভাগিনী চিরদুঃখিনী অবলা।—ঐ আপনার কাছে শুইয়া বসিয়াছে। হায়! হায়! এখনও কি আপনি চিনিতে পারেন নাই?

যোগেন্দ্র শুনিতে শুনিতে হৃদয় বিপ্লবে অধীর হইয়া, 'অ্যাঁ অ্যাঁ—অবলা আমার, অবলা আমার, অবলা—অবলা' এই কথা বলিতে বলিতে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল।

দুঃখিনী অবলাও সে অবস্থায় হঠাৎ প্রেমোচ্ছ্বাসে উন্মাদিনীর মত মূৰ্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

রামের যত্নে উভয়ের সংজ্ঞা হইল। যোগেন্দ্র, অবলা উভয়েই নির্ব্বাক্—নিস্তব্ধ—দুই হৃদয় যেন প্রেমের ভাবে স্থির হইয়া গেল। যোগেন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিল। অবলা আর উঠিতে পারে না—অবলা আপনাকে বিস্মৃত—আপনি যে কোথায়, তা জানে না—কি ব্যাপার বুঝিতেছে না—হৃদয় প্রাণ যেন স্বর্গের অনন্ত প্রেম-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে।

যোগেন্দ্র পাগলের মত অবলার দিকে চাহিয়া আছে,—চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আবার মূর্চ্ছিত প্রায় হইল। যোগেন্দ্রের বড় ঘৃণা, বড় লজ্জা। যোগেন্দ্র ভাবিতেছে "আমি কি নিষ্ঠুর—অমন স্ত্রীর খোঁজ খবর লই নাই"। উঃ প্রাণ যে ফেটে যায়। এই সকল চিন্তা যোগেন্দ্রের হৃদয়ে সূচ ফুটাইতেছিল। যোগেন্দ্র আপনার পাপ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মূর্চ্ছিত প্রায় হইল।

রামের যত্নে যোগেন্দ্রর সংজ্ঞা লাভ হইল। যোগেন্দ্র বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছে! ভাবিতে ভাবিতে

বিড় বিড় করিয়া বলিল 'প্রিয়ে। প্রিয়তমে! আমায় বাঁচাবার জন্যই বুঝি এতদিন তুমি এত কষ্টে বেঁচে ছিলে?'

অবলা আহ্লাদে বদ্ধকণ্ঠা হইয়া, এক পা এক পা করিয়া যোগেন্দ্রের কাছে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যোগেন্দ্রর দুটী পা জড়াইয়া ধরিল।

যোগেন্দ্রের মন প্রাণ জড় জগতের জড়তার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, হঠাৎ কোমল কর ও উষ্ণ নয়নাশ্রু স্পর্শে চমকিত হইয়া সেই সতীর দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিবামাত্র হৃদয়ে যেন সান্ত্বনা—আদর—স্নেহ—আশা—ভরসা—মান—অভিমান—গৃহ—ভগিনী, বন্ধু, জননী—স্ত্রী—এই সকলের জীবনতোষিণী ছায়া আসিয়া যোগেন্দ্রের হৃদয় প্রাণে পতিত হইল। সে ছায়ার তলে বসিয়া যোগেন্দ্র উত্তপ্ত জীবনের শ্রান্তি দূর করিল। রাম স্থানান্তরে যাইল।

যোগেন্দ্রর দক্ষিণ হস্ত আপনি সেই স্বর্গের পৃষ্ঠদেশে পতিত হইল। অবলার জীবনের সাধ কতকটা মিটিল। সেই কর-স্পর্শে অবলা উঠিয়া বসিল;—এক দৃষ্টে যোগেন্দ্রর মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে কাঁদিতে কাঁদিতে যোগেন্দ্রর বক্ষদেশে আপনার মস্তক স্থাপিত করিল। যোগেন্দ্র আপনার কর্কশ বক্ষে সেই মস্তক ধরিয়া সুখের চরমসীমায় উঠিতে লাগিল।

বায়ুভরে কাঁপিতে কাঁপিতে যেমন একটি শতদল আর একটির উপরে পতিত হয়, যোগেন্দ্রর মুখখানিও প্রেমভরে কাঁপিতে কাঁপিতে অবলার চন্দ্রবদনে সেইরূপে পতিত হইল। যোগেন্দ্র হৃদয় প্রাণের মধুর স্নেহের সহিত অবলার মুখ-

চুম্বন করিল। সেই মধুর চুম্বনে যেন অবলার অস্তিত্ব স্বামীর অস্তিত্বের ভিতরে প্রবেশ করিল।—সে মুখ চুম্বনের ভিতর দিয়া যেন স্বর্গের—ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় স্নেহ, ভালবাসা, শান্তি প্রবাহিত হইয়া অবলার লোমে লোমে অমৃত সিঞ্চন করিল,—অবলার প্রেমসাগরে মহা তুফান তুলিয়া দিল।

বক্ষে মাথা রাখিয়া অবলা মাঝে মাঝে স্বামীর বক্ষে প্রবল বেগে উষ্ণ অশ্রুমোচন করিতেছে; যেন আকস্মিক বায়ুভরে শতদল হইতে সরোবরবক্ষে শিশিরবিন্দু পতিত হইতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে অবলা,যোগেন্দ্র ও রাম বাটীর ভিতরে গমন করিল। অবলার লজ্জা হইয়াছে। মাথায় কাপড় দিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। রাম নীচে উঠানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল। যোগেন্দ্র অবলাকে সাদরে সস্নেহে সাশ্রুনয়নে বক্ষের পার্শ্বে ধরিয়া পাগলের মত পা ফেলিতে ফেলিতে দ্বিতলস্থ নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল। অবলা সেই স্থলপদ্ম বিনিন্দিত পা দুখানি কক্ষের ভিতরে নিক্ষেপ করিবামাত্র, যোগেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে 'প্রিয়ে অপরাধ মার্জ্জনা কর' বলিয়া অবলার পা জড়াইয়া ধরিল। অবলা সর্ব্বনাশ হইল ভাবিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে 'নাথ, আমায় নরকে ডুবালে' বলিয়া দুই চক্ষু উর্দ্ধদিকে তুলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া কাছে পড়িয়া গেল।

অবলার পা ধরিয়া অবলাকে কষ্ট দিলাম-মূর্চ্ছিতা করিলাম, ভাবিয়া যোগেন্দ্র যন্ত্রণায় আরও অধীর হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে অবলা চক্ষু চাহিল, চাহিয়াই বুঝিল, ভাবিল আমি মহা পাপিয়সী, নহিলে স্বামী আমার পাদস্পর্শ করিবেন কেন? অবলা আর চক্ষু চাহিয়া স্বামীকে দেখিতে সাহস করে না। বালা

আপনার পা-পদ-ভরে কুণ্ঠিতা হইয়া সেইখানে পড়িয়া রহিল। ভক্তের বিগ্রহ হঠাৎ পদতলে পড়িলে ভক্তের মানসিক অবস্থা যে প্রকার হয়, অবলার অবস্থাও সেইরূপ হইল।

যোগেন্দ্র বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'তুমি আর অমন ক'রে থেক না, আমার সঙ্গে দুটো কথা কও। তোমার কি অপরাধ থাকিতে পারে? তুমি সতী সাবিত্রী, আমি বেশ বুঝেছি অনেক তপস্যা না করিলে তোমার মত স্ত্রী পাওয়া যায় না। বলিতে বলিতে যোগেন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আবার জড়িতস্বরে বলিল আমি বানর, আমার গলায় ভগবান এ মুক্তার মালা কেন দিলেন তা জানি না—আমি পাষাণ, আমার উপরে এ পুষ্পলতিকা কেন?' প্রিয়ে, প্রিয়ে, । কথা কবে না?

অবলা আর থাকিতে পারিল না—আপনার ভয় সঙ্কোচ দূরে ফেলিয়া উত্থিত হইল। যোগেন্দ্র অবলাকে বক্ষে রাখিয়া মুখ চুম্বন করিল। পৃথিবীতে 'স্বর্গ-সুখ অপেক্ষা অধিক সুখ যাহা, যোগেন্দ্র তাহাই সম্ভোগ করিল। সতী স্ত্রীর মুখ চুম্বন অপেক্ষা সুখের সামগ্রী স্বর্গে—নাই—মর্ত্তে নাই—পাতালে নাই—ঈশ্বরের ভাণ্ডারে নাই'। কিন্তু অবলা—সতীর সেই চুম্বিত বদনে যে লজ্জার মাধুরী ক্রীড়া করিতেছে—সেই কুসুমসম লোচনে যে সৌন্দর্য্যের কিরণ ফুটিতেছে, তাহাদের ভিতরে অবলার অন্তরে যে কি ভাব, কি উচ্ছ্বাস উঠিতেছে, তাহা। সাবিত্রী সত্যবানকে পুনর্জীবিত করিয়া, সীতা রামকে লঙ্কা সমরের পর লাভ করিয়া অনুভব করিয়াছিল। মনে হয়, অবলার ঐ সুখ পৃথিবীর সমুদয় সুখের কেন্দ্র।

অবলার কোমল অঙ্গখানির পাদদেশ ভূমিতলে এবং কোটী-দেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমুদয় অংশ যোগেন্দ্রের ক্রোড় ও বক্ষদেশ অধিকার করিয়া আছে। দুইজনেই প্রেমের নেশায় উন্মত্ত। চুম্বনে, ক্রন্দনে, আলিঙ্গনে দুইজনের জীবনপ্রবাহ প্রবাহিত। যোগেন্দ্র আবার স্ত্রীর মুখ চুম্বন করিয়া বলিল 'অবলা! কি করিব? তুমি কি চাও, তোমায় অনেক কষ্ট দিয়াছি, এখন তোমার জন্য কি করিব? অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'সুশীলার দশা কি হবে'? যোগেন্দ্র বলিল, 'পাপিষ্ঠার নাম করিও না—পাপিষ্ঠার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে।'

এই হতভাগিনী হইতেই ওর সুখের পথে কাঁটা পড়িল, বলিয়া অবলা হাঁউ হাঁউ করিল।

যো। কাঁদ কেন? অনেক কেঁদেছ, আর কাঁদ কেন?

অ। সুশীলার জন্য আমার প্রাণ কেমন করে—সুশীলা যে আমার ছোট ভগিনী।

যো। তোমায় কত ক্লেশ দিয়াছে, আমায় শেষে কাটিতে গিয়াছিল, তবুও তুমি ওকে স্নেহ কর?

অ। ও আমায় একদিনও তো কষ্ট দেয় নাই, বরং বাড়ি হইতে না তাড়াইয়া দিয়া আমার উপকারই করিয়াছে। আর তোমায় কাটিতে কখনই পারিত না, আমি বাঁচিয়া থাকিতে তোমায় কাটে কার সাধ্য? বলিতে বলিতে শরীর রক্তপ্রবাহ প্রবলতর হইল, দুই চক্ষু সজল হইল, ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। মরুভূমির মধ্যে কোকিল ডাকিলে কিম্বা প্রস্রবণের কল কল ধ্বনি শুনিলে কবির হৃদয় যেরূপ কাব্যামৃতে

ডুবিয়া, ভয় ভাবনা, সংসার বাসনা প্রভৃতির নিকট হইতে দূরে গিয়া, পুষ্পের লাবণ্যের ভিতরে জ্যোৎস্নার মধুরতার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, যোগেন্দ্রও আপনার জীবন-মরুভূমিতে সতীর ঐ সমুদয় মধুমাখা কথা শুনিতে শুনিতে পুষ্পের সুরভির ন্যায় আপনার অস্তিত্বাকাশে আপনি পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। যোগেন্দ্রের নিকটে তখন এই জগতের প্রত্যেক পরমাণু অমৃতের কণা, প্রত্যেক শব্দ কোকিলের ঝঙ্কার ব্যতীত আর কিছু নহে। সে সময়ে যদি ভীষণ হিংস্র জন্তু আসিয়া ভীষণনাদে গর্জ্জন করে, তবে যোগেন্দ্র তাহাকে সঙ্গীতের রাগ রাগিণী বলিয়া বিবেচনা করে।

যোগেন্দ্র ধীরে ধীরে অবলার মুখে আপনার মুখ রাখিয়া বলিল, 'প্রাণেশ্বরী। কি চাও, কি দেব? আমার কি আছে যাহা দিয়া তোমার মনের সাধ মিটাই?' অবলা বলিল, সুশীলার অপরাধ যদি মার্জ্জনা কর, যদি ওকে বাগান হইতে আনিয়া আমার কাছে দাও।'

যোগেন্দ্র বলিল, "এখনি আনিয়া দেব"। এই বলিয়া অবলাকে সেইখানে রাখিয়া যোগেন্দ্র নীচে গমন করিল। রামকে বলিল, সুশীলা কোথায়? রাম বলিল, বাগানে একটা গাছে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। দুই জনে বাগানে গিয়া দেখিল হতভাগিনী প্রস্তরের ন্যায় গাছে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুশীলা পাপ-যন্ত্রণায় অধীরা। যদি কেহ কাটিয়া ফেলে বা আগুনে পুড়াইয়া বা জলে ডুবাইয়া মারে তো পাপিয়সী বাঁচে।

যোগেন্দ্র কাছে গিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রামকে

বলিল, 'আপনি ওর বাঁধন খুলিয়া দিন, আমার ওকে স্পর্শ করিতে ভয় হয়'।

রাম। ওকে লইয়া কি করিবেন?

যো। আমার প্রয়োজন নাই, অবলার কি প্রয়োজন আছে। রাম হতভাগিনীর বাঁধন খুলিয়া দিল। আহা, কে যেন মুখে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে, দুই চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসিতেছে। যোগেন্দ্র বলিল. 'বাড়ির ভিতরে এস।'. সুশীলা আস্তে আস্তে বাটীর ভিতরে যোগেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সুশীলা ভাবিতেছে, এই বারে আমায় কাটিয়া ফেলিবে, আমি বাঁচি, আর এ জীবনে প্রয়োজন নাই।

হতভাগিনী ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে উপরে উঠিয়া দেয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া কাঁদিতেছে, অবলা সুশীলার সে অবস্থা দর্শনে আকুলপ্রাণে কাঁদিতে লাগিল। যোগেন্দ্র ঘরের ভিতরে গিয়া বিছানায় শয়ন করিল। অবলা সপত্নীর কাছে আসিয়া গলায় হাত দিয়া বলিল, 'কেন দিদি! অমন ক'রে র'য়েছ, যা হবার হয়েছে, স্বামীর পায়ে ধ'রে আমরা ক্ষমা চাইগে; চল. তিনি ক্ষমা করিবেন এখন। আর অমন ক'র না। ভগিনী! আমরা দুজনে স্বামী সেবা করি এস; স্বামীর সুখ দ্বিগুণ হইবে। আমি একলা স্বামীকে সুখী করিতে কি পারিব? তুমিও সুখী করিবে, আমিও করিব। স্বামী আদর যাহা দিবেন, আমি তাহা তোমায় দেব। আমা হ'তে তোমার সুখের পথে কাঁটা পড়িবে না। সুশীলা কিছুই বলিল না, কেবল ব্যাকুলপ্রাণে কাঁদিতে লাগিল। সুশীলার অন্তিম যেন বিষের আগুন, মৃত্যু আসিলেই

দুর্ভাগিনী পাপ-যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পায়।

অবলা আবার বলিল, 'কি ভাবিতেছ আমায় বল'।

সুশীলা কাতরে বলিল 'আমায় যদি ছাড়িয়া দেও তো বড় ভাল হয়'।

অবলা। এমন স্বামীকে ফেলিয়া কোথায় যাইবে?

সু। যেখানে মা বাপ আছেন, সেখানে যাইব। আত্মহত্যা করিব।

অ। তাহাতে লাভ কি?

সু। পাপের এ জ্বালা হইতে মুক্ত হইব।

অ। পাপের জ্বালা সেখানে সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।

শুনিয়া সুশীলা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

ঘরের ভিতর হইতে যোগেন্দ্র বলিল, 'ও রাক্ষসীর সঙ্গে আর কেন? ওর যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক, তুমি আমার কাছে এস।'

অবলা স্বামীর কথাকে ঈশ্বরাদেশের ন্যায় মান্য ক'রে আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল। স্বামী জিজ্ঞাসিল 'অবলা'। ওর জন্য তুমি অমন ক'রছ কেন? ও যে দুশ্চরিত্রা, ও যে বাঘিনী, ও যে আবার কবে সর্ব্বনাশ করিবে, ওকে দূর করিয়া দাও'।

সুশীলার মূর্চ্ছা আপনিই ভাঙ্গিল। উঠিয়া দেখিল কাছে কেহ নাই! যোগেন্দ্র ঘরের ভিতরে গালাগালি দিতেছে। হতভাগিনী আস্তে আস্তে নিচে গমন করিল। গোলঘরে খড় পাতিয়া তাহারই উপর শয়ন করিল। রামচন্দ্র দেখিল, দেখিয়া

উপরে আসিয়া ডাকিল, 'যোগেন্দ্র বাবু'। যোগেন্দ্র বলিল, 'এখানে আসুন।

রা। আপনার ও স্ত্রীর বিষয় কি করিবেন।

যো। আপনার ভগিনী যাহা বলে, তাহা করুন আমি কিছু জানি না।

অবলা রামকে বারাণ্ডায় ডাকিয়া বলিল, 'দাদা আপনাদের পায়ে ধরি, ওর অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

রা। তোমার যাহা ভাল লাগে কর আমি বাহিরে যাই।

অ। আপনি বাহিরে যান। রাম বাহিরে গিয়া ঘরে খিল আঁটিয়া শয়ন করিল

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—•:(o):•—

ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, যোগেন্দ্র বসিয়া অবলাকে দেখিতেছে। অবলা যোগেন্দ্রের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। সোহাগের কথা দুই একটী চলিতেছে বটে, কিন্তু সুশীলার জন্ত অবলার প্রাণটা মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠিতেছে। যোগেন্দ্র বুঝিতে পারিয়া বলিল,

অবলা! সুশীলা তো রাক্ষসী, কালসাপিনী ওকে তুমি ভাল-বাস কেন? আমি হয় তো বাঁচিতাম, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই মরিতে। এসব সত্বেও তুমি ওকে কি প্রকারে যে ভালবাস তা বুঝিতে পারি না। ও কি কখন তোমার কিছু উপকার করিয়াছে? বরং তোমার ক্ষতিই করিয়াছে—শেষে তোমার এবং তোমার স্বামীর প্রাণ বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল'।

অবলা বলিল, 'আমার ও বিশেষ উপকার করিয়াছে, কিন্তু তোমার কাছে সে সব বলিলে, আমার স্পর্দ্ধা প্রকাশ হয়, যদি আদেশ দাও তো বলি'।

যোগেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিল তোমার প্রাণের কথা খুলিয়া বলিবে, তাহাতে আবার আদেশের প্রয়োজন কি? তুমি আমার জীবন'।

অবলা বলিল, 'আমি যোমা হইতে যখন দূরে ছিলাম, তখন সুশীলা তোমার কত সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে, তোমাকে বাতাস করিয়াছে, তোমার পা টিপিয়াছে, তোমায় রাঁধিয়া দিয়াছে, তোমার বিশ্রামের জন্য বক্ষ পাতিয়া দিয়াছে। সুশীলা যে ভাবেই তোমায় দেখুক, সে যখন আমার ঐ সব করণীয় কর্ম্ম করিয়াছে, তখন আমি যে সুশীলার কাছে সুদৃঢ় কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ;—আমি সুশীলার সে ঋণ কি প্রকারে শুধিব? এই শুধিবার সুযোগ পাইয়াছি, এ বিপদে যদি তোমার কৃপায় ওকে রক্ষা করিতে পারি; ওর ব্যথিত প্রাণে যদি সুখ-সঞ্চার করিতে পারি, ওর পীড়িত মনকে যদি একটু সুস্থ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি সে দুষ্পরিশোধ্য ঋণ হইতে কিয়ৎপরিমাণে

মুক্ত হই। তুমি স্বামী—গুরু—ঈশ্বর তুমি না দয়া করিলে আমি কি প্রকারে মুক্ত হইব?—আমার নিজের ক্ষমতা কিছুই নাই—তুমিই যে আমার বল বুদ্ধি, প্রাণনাথ! আমার যদি কিছু উপকার করিবার থাকে তো সুশীলার অপরাধ মার্জ্জনা কর। সুশীলাকে আমাদের কাছে আন—সুশীলাকে আমার পূর্ব্বের মত ভালবাস, সুশীলা যেমন ছিল, তেমনি থাক—আমি যেমন ছিলাম, তেমনি থাকি সুশীলা আর কুকর্ম্ম করিবে না—যদি করে তো তার শাস্তি আমি ভোগ করিব। আমি যে তোমাকে বাঁচাইয়াছি—ইহা অপেক্ষা আমার সুখ হইবে না। আমি তোমার দাসী হইয়া থাকি, আর সুশীলা যেমন ছিল তেমনি থাক। আমি পূর্ব্বের মত গোয়ালঘরে শুইগে—সুশীলা পূর্ব্বের মত এই ঘরে তোমার কাছে শুক। গোয়ালঘরে আমি ইহা অপেক্ষা কম সুখে থাকি নাই। তোমাকে যে দিন দেখিয়াছি—সে দিন হইতে আমার সুখের জমাট—সে জমাট সমান ভাবেই আছে—বরং দিন দিন শক্ত হইতেছে—সে আর নরম হইবার নহে। আমি তোমার কাছে এ ভাবে থাকিলে সুশীলার ক্লেশ হইবে—তোমার সুখ দেখিয়া যদি কাহারও ক্লেশ হয়, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না—তোমার সুখে অপরকে যদি সুখী দেখিতে পাই, তবে বুঝিব তোমার নিষ্কলঙ্ক সুখ'।

যোগেন্দ্র শুনিতে শুনিতে ভাবিল, 'এ পাপিষ্ঠের কপালে ঈশ্বর এমন স্ত্রী লিখিয়াছিলেন—অবলার আমি অনুপযুক্ত স্বামী—অবলাকে যে পূজা করিতে ইচ্ছা হয়—ও মূর্ত্তির ভিতরে যে স্বর্গের কোন্ দেবী আছেন, তাহা বলিতে পারি

না। আমার কাণে ওসব কথা আঘাত করিয়া কলঙ্কিত হইয়েছে।

এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে অবলার বক্ষে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমার জন্য তো অনেক কষ্ট পেয়েছ আর কেন? এখন আমায় লইয়া সুখী হও'।

অবলা একটু হাসিয়া একটু কাঁদিয়া বলিল, 'তোমাকে আমি স্পর্শ করিয়া বলিতে পারি, এ হতভাগিনী তোমার জন্য এক দিনও কষ্ট অনুভব করে নাই—যদি কিছু কষ্ট পাইয়া থাকি, তাহা অপেক্ষা সুখ যে কি আছে তা তোমার অবলা জানে না। নাথ"—অবলা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। যোগেন্দ্র বক্ষে ধরিয়া বলিল, 'প্রিয়ে। অবলা ধন। কেন? কাঁদ কেন? অবলা পাগলিনীর মত আলু থালু হইয়া যেন কি এক নেশার ঘোরে উন্মাদিনী হইয়া বলিল, 'কষ্ট যে নাথ একদিনও পাই নাই, লোকে বলিত, তোর বড় কষ্ট—কিন্তু আমার সেই কষ্টে যে কি সুখ, তা আমিই জানি। যেন তোমার জন্য জন্ম জন্ম ঐরূপ কষ্ট—দুখে সুখী হই—তোমার জন্য আগুনে পুড়িতে গেলে আগুন যে শীতল হইয়া উঠে—তোমার জন্য সাপের মুখে গাইলে সাপ যেন ফণা নত করিয়া থাকে। প্রাণনাথ। তুমি যে এ জীবনের আমার সব কষ্ট নিবারণ করিয়া দিয়াছ—তোমার জন্য যে কষ্ট সুখে পরিণত হয়।

শুনিতে শুনিতে যোগেন্দ্র যে কি হইতে লাগিল, তা যোগেন্দ্রই বুঝিয়াছে—তাহা বুঝান যায় না। স্বামী স্ত্রীর বক্ষে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া থাকিল।

অনেকক্ষণ পরে বলিল "সুশীলাকে তবে ডেকে আনবে কি ? যাও যাও সুশীলাকে ডেকে আন।"

অবলা আস্তে আস্তে আলো লইয়া নিয়ে সপত্নীকে ডাকিতে গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অবলা আলো লইয়া নিয়ে গেল। রামকে, "দাদা দাদা।" বলিয়া ডাকিল, সাড়া পাইল না। গোয়ালঘরে কে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তুমি মলে তো মুই ও মরি, যাই—যাই—যাই মরি যাই"।

অবলা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। আবার শব্দ হইতেছে, মুই যে তোর তরে পাগল হ'য়ে ছ্যাদাম, ও পরাণ—পরাণ—পরাণ সুইলা। মুই তবে এই দড়িতে ঝুলে মরি।'

অবলা ভয় পাইল। কাঁপিতে কাঁপিতে উপরে চলিয়া গেল। গিয়া বলিল, গোয়ালঘরে কে কেঁদে কেঁদে কথা ক'চ্ছে; পুরুষের গলা, রাম দাদা তো নয়—ও আর কেউ হবে।"

যোগেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া নিয়ে গমন করিল। অবলা

পশ্চাতে পশ্চাতে যাইল। যোগেন্দ্র গোয়ালঘরে প্রবেশ করিবমাত্র দেখিল. এক বিকটমূর্ত্তি গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিতেছে, নিকটে হতভাগিনী সুশীলা গলায় কাপড় জড়াইয়া আড়কাঠা হইতে ঝুলিতেছে।

'অবলা সরে যাও, সরে যাও, সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!

যোগেন্দ্র এই বলিয়া চীৎকার করিবামাত্র অবলা "বাবা-গো কি হলো গো বলিয়া চীৎকার করিল। রামচন্দ্র বাহির হইতে কি কি? ব্যাপার কি? বলিতে বলিতে বাটীর ভিতরে আসিল। পাড়ার দুই একজনের নিদ্রা সেই চীৎকারে ভাঙ্গিয়া-ছিল, কিন্তু তাহারা আসিল না। যোগেন্দ্র রামকে দেখাইয়া বলিল, এ পিশাচ কোথা হইতে আসিয়া মরিল—ও পাপিয়সী মরিয়া ভালই করিয়াছে—কিন্তু এ বিকট পিশাচ কোথা ছিল।"

যোগেন্দ্র অবলাকে উপরে যাইতে বলিল অবলা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উপরে গেল। কিন্তু ব্যাপার কি জানিবার জন্ত পাগলিনী হইল।

যোগেন্দ্র রামকে বলিল, 'তাই তো কি উপায়? এখনি তো আমাদের হাতে পায়ে দড়ি পড়িবে'।

রাম। 'ভয় কি? আমরা তো আর মারি নাই। দুটো মরিয়া বাঁচিয়াছে কিন্তু ঐ পিশাচটা কোথা হইতে আসিল?

যোগেন্দ্র। 'যাহা হউক পুলিসে খবর দেওয়া উচিত'।

রাম। তাই করুন—আপনি এখনি পুলিসে যান।

যো। রাত্রি আর অধিক নাই দেখ্‌ছি।

রাম। আর ঘণ্টাটাক আছে।

যোগেন্দ্র পুলিসে খবর দিতে যাইল। অবলা উপরে, ঘাম নিয়ে থাকিল।

যোগেন্দ্র ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে থানার দারোগার ঘরের নিকট উপস্থিত হইল। পূর্ব্বদিনই পুরাতন দারোগা বদল হইয়াছে, এখন একজন নূতন দারোগা আসিয়াছে।

দারোগা মহাশয় ঘরের ভিতরে অর্দ্ধ নিদ্রিত, যোগেন্দ্র দ্বারদেশ হইতে ডাকিল:—

দারোগা মশাই। দারোগা মশাই।

কোন উত্তর নাই।

দারোগা মশাই একবার উঠুন।

উত্তর নাই।

দারোগা-মহাশয় শুনিতে পাইয়াও সাড়া দিতেছেন না, ভাবিতেছেন, আমি জাগ্রত, কি নিদ্রিত। যদি জাগ্রত হইতো কেহ যে ডাকিতেছে, এটা বাস্তব ঘটনা, কিন্তু যদি নিদ্রিত থাকিতে, এটা মানসিক বিকার, এ অবস্থায় সাড়া দিয়া বাহিরে গেলে somnambulism (স্বপ্ন সঞ্চরণ) হইবার সম্ভাবনা। আবার ভাবিতেছেন, আমি জাগ্রত, কি নিদ্রিত। যদি জাগ্রত হইতো, এটা স্বপ্ন। স্বপ্নে আমি দৌড়িতে পারি। না, অতএব পরীক্ষা করিয়া দেখি। এই ভাবিয়া আস্তে আস্তে উঠিলেন, উঠিয়া ঘরের মেজের উপর ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন। শুইবার সময় জুতা পায়েই ছিল, ভাবিতে ভাবিতে খুলিতে মনে ছিল না; এখন জুতা পায়েই ছুটাছুটী করার ঘরের ভিতরে খট্ খট্ খট্ খট্ শব্দ হইতেছে। যোগেন্দ্র

ক্রমাগতই ডাকিতেছে—সাড়া নাই; কিন্তু ভিতরে দৌড়-দৌড়ের শব্দ শুনিয়া অবাক্ হইতেছে।

যোগেন্দ্রের ডাকাডাকিতে দুই জন কনষ্টেবল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া যোগেন্দ্র বলিল, 'দারোগা মহাশয়কে উঠাও—আমাদের বাড়িতে বড় বিপদ।

ক্যা হুয়া'?

যো। বাড়িতে দুজন গলায় দড়ি দিয়ে ম'রেছে।

কনেষ্টবল দুইজন চমকিত হইয়া দ্বার ঠেলিয়া ডাকিতে লাগিল, 'দারোগা মশাই, দারোগা মশাই'।

দারোগা মশাই ভাবিতেছেন, 'এটা ক্রমশঃ বাস্তব ঘটনা-তেই দাঁড়াচ্ছে দেখ্‌ছি—তবে খিল খুলি।'

আস্তে আস্তে খিল খুলিয়া বাহিরে আসিল। যোগেন্দ্র দেখিল, এ আর একজন। বলিল, আপনি কি নূতন এসেছেন'?

দা। আপনি একটু দাঁড়ান, 'আপনি ভদ্রলোক, একটু ভেবে চিন্তে আপনার কথার উত্তর দেব।

যো। মশাই ভাববার আর সময়নাই—বাড়িতে বড় বিপদ

দা। অ্যাঁ বিপদ—বিপদ— কি রকম বিপদ?

যো। বাড়িতে দুজন গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

দা। একবারে নাই?

যো। না মশাই।

দা। এ যে অসম্ভব! অসম্ভব! সক্রেটিশ তার পর প্লেটো তার পর ক্যাণ্ট প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরা যে প্রমাণ ক'রে ছেন মানুষ অর্থাৎ আত্মা কখন মরে না। একেবারে নাই এ যে অসম্ভব কথা।

যো। মশাই তামাসা করছেন কেন? একি তামাসার সময়।

দা। তামাসা তো নয় বাবু ফিলজফির কথা বলছি। ফিলজফি কি তামাসা?

যো। মশাই এ সময়ে ফিলজফি রেখে দিয়ে আপনার কর্ত্তব্য কাজ ক'রবেন চলুন।

দারোগা মহাশয় দুই জন কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া ভাবিতে ভাবিতে হোঁচট খাইতে খাইতে,—রাস্তা ভুলিয়া এ পথ হইতে সে পথে ও পথ হইতে এ পথে যাইতে যাইতে যোগেন্দ্রের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

পাঠক পাঠিকা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, ইনি আমাদের সেই ডাক্তার। ডাক্তারিতে কৃতকার্য্য না হওয়ায় সুপারিসের জোরে নূতন দারোগাগীরিতে প্রবেশ করিয়াছেন।

দারোগা ও অন্যান্য পুলিসের লোক যোগেন্দ্রের সঙ্গে গমন করিয়া লাস বাহিরে আনয়ন করিল।

বাহিরে লোকে লোকারণ্য। গ্রামে একটা ভয়ানক গোলযোগ উঠিয়াছে। পুলিসের লোক আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—•:(•):•—

ঐ ভীষণ মূর্ত্তি কে? সুশীলার সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়া মরিল কেন? যখন পুলিসের লোক লাস বাহিরে আনয়ন করে, তখন অবলা উপর হইতে দেখিয়াই চিনিয়াছিল। মার মৃত্যু-দিবসে অবলা এই বিকটাকার দাঁতকাটাকে দেখিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল।

সুশীলা রূপসী, দাঁতকাটা কুৎসিৎ কদাকার। সুশীলার মানসিক অবস্থা যাহাই হউক, বাহ্যরূপ দেখিলে বিমোহিত হইতে হয়। এই রূপের কণক-লাবণ্য-সাগরে বিকটমূর্ত্তি দাঁতকাটা কি আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিল? দাঁতকাটার স্ত্রী দিগম্বরী—সতী সাবিত্রী। তার যেমনি রূপ, তেমনি গুণ। তাহাকে ভুলিয়া—তাহাকে বৈধব্য-দশায় নিক্ষেপ করিয়া হতভাগ্য সুশীলার জন্ত প্রাণত্যাগ করিল কেন? পাঠক পাঠিকা এই সমূদয় কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে?

দাঁতকাটা পূর্ব্বে সুশীলাদের বাটিতে চাকর ছিল। সুশীলা যখন বালিকা, তখন ২।১ জন তামাসা করিয়া সুশীলাকে রাগাইত:—'দাঁতকাটা তোর বর, দাঁতকাটা তোর বর'। এই কথা শুনিলেই সুশীলা ক্রোধে অধীরা হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিত।

সুশীলা দাঁতকাটার কাছে থাকিত, দাঁতকাটার চেহারা লইয়া নানা প্রকার রঙ্গ করিত।

একদিন সুশীলা দাঁতকাটাকে ভেঙ্গাইতেছে, সুশীলার সম্পর্কীয়া এক দিদি মা দেখিতে পাইয়া বলিল, 'হ্যালো বরের সঙ্গে তামাসা হ'চ্ছে'?

দাঁতকাটা বরাবরই একটু একটু পাগল। এদিকে বিবাহের বয়সও উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিবাহের বড় সাধ। বিবাহের বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া এক প্রকার 'বিয়ে পাগলা' হইয়াছে। ঐ কথাটী শুনিয়া ভাবিতেছে, 'আমার সঙ্গে সুইলার বিয়ে হয় যদি, হয় তো মুই ওকে কোন কাজ কর্ম্ম কত্তে দিমু না'। এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে সুশীলার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে।

সুশীলার দিদিমা দেখিতে পাইয়া হাসিয়া বলিল, কিরে দাঁতকাটা! ক'নের দিকে চেয়ে আছিস নাকি? দাঁতকাটা একটু মুচকিয়া হাসিল। মনে মনে বড় আনন্দ।

সুশীলার দিদীমার বাড়ী নিকটেই। সে বিধবা। অবস্থা বড় ভাল নয়। সুশীলার মা চাল, নুন, তেল, আলু, বেগুণ ইত্যাদি মাঝে মাঝে দিয়া থাকে, তাহাতেই দিদীমার এক প্রকার চলে।

দাঁতকাটার সহিত সুশীলার বিবাহের কথাটা দিদীমা উপহাসচ্ছলে মধ্যে মধ্যে বলিয়া থাকে। দাঁতকাটা প্রথম প্রথম তামাসা বলিয়াই ভাবিত, কিন্তু শেষে, যখন মাথাটী একটু খারাপ হইল, তখন হইতে ভাবিতে লাগিল, 'দিদীমা কি'আর রোজ রোজ তামাসা করেন'।

দাঁতকাটা বিবাহের লোভে প্রত্যহ দিদীমার বাড়ি যায়। গিয়া দিদীমার সঙ্গে হাস্যোদ্দীপক শারীরিক লীলার সহিত

কত কথা কয়। কথার মধ্যে যখন বিয়ের কথাটা আসে, তখন বড় আনন্দ—তখন সেই বিকট দেহে আনন্দের বিকট ছবি উঠিতে থাকে। দাঁতকাটা দিদীমার বাজার করে, কাঠ কাটে, তেঁতুল পাড়ে, শাকের সময় শাক, আলুর সময় আলু আনিয়া দেয়। একদিন দিদীমা বলিল, হাঁরে তুই বিয়ে ক'রবি ?

দাঁতকাটা মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, 'কাকে' ?

দি। কাকে পসন্দ হয় ?

দাঁ। বাবুদের—

দি। সুশীলাকে।

দাঁ। দিদীমা! তুমি তো জান, তবে কেন—

দি। তবে কেন কি ?

দাঁ। দেরি কর।

দি। সুশীলা সুন্দরী—তুই কাল; সুশীলা বিয়ে করবে কেন ?

দাঁতকাটা একটু কাঁদ্ কাঁদ্ হইল। এই দিন হইতে দাঁতকাটার পাগলামী বাড়িল।

দাঁতকাটার মা আছে। ছেলের বিবাহের জন্য কতকগুলি টাকা রাখিয়াছে। বিবাহের অনেক চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু অমন পিশাচকে কে মেয়ে দিবে ?

দাঁতকাটার পাগলামী ভয়ানক বাড়িয়াছে। একদিন সুশীলাদের বাটিতে যাইল। দেখিল বাহিরের বাটীতে সুশীলা থাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দাঁতকাটা দেখিয়া হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'এ ক'নে গয়না দেব, আমার কাছে এস'। সুশীলা পলায়ন করিল। পাগলও পশ্চাতে

পশ্চাতে যাইল। সুশীলার মা দেখিল, পাগল ছুটিয়া বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, অমনি একটা বাড়ি লইয়া তাড়া করিল। পাগল পলায়ন করিল।

দাঁতকাটাকে কেহ বিবাহ দিতে চায় না। দাঁতকাটার মা ছেলের বিবাহ হইল না—ছেলে পাগল হইল ভাবিয়া রাত্রি দিন কাঁদিয়া বেড়ায়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ছোট লোকের ঘরে সময়ে সময়ে সুন্দরী দেখা যায়। সামান্য বাগানে সময়ে সময়ে ভাল গোলাপ ফুটিয়া বাগানকে আলো করে। দিগম্বরী গ্রামের গোয়ালা পাড়ায় খাঁদা কাল চিরগর্ভবতীদের মধ্যে স্বর্গভ্রষ্টা অপ্সরী কন্যার ন্যায় ফুটিয়াছিল। কাল ছেঁড়া কাপড় খানি পরিয়া না থাকিলে কার সাধ্য ছোট ঘরের মেয়ে বলিয়া জানিতে পারে। বড় ঘরের সুন্দরীদিগের মুখে চোখে অহঙ্কারের ছটা থাকে—চলনে গরব ফুটিয়া পড়ে, কিন্তু দিগম্বরী সে সব পাবে কোথা? এজন্য সে সুন্দরীটির সৌন্দর্য্যে এক স্বর্গের শোভা দেখা যায়। আকাশের চাঁদ সুন্দর কিন্তু ধরা যায় না। বড় লোকের ঘরের সুন্দরীদের সাক্ষাৎ কে কবে পায়—চাঁদ যেমন ধরা যায় না বড় ঘরের সুন্দরী তেমনি ধরা যায় না। দিগম্বরী চাঁদের জ্যোৎস্নার মতন—সুন্দরের

চাঁদের মত পথ ঘাট মাঠ আলোকিত করিত। বড় ঘরের কত যুবতীর সে রূপ দেখিয়া হিংসা হইত।

দিগম্বরীর মা, দিগম্বরীকে ৮ বৎসরের করিয়া মরিয়া যায়, পিতা—তার পূর্ব্বেই মরে। জাতি—কাকার ঘরে খাইত—নিজের রোজগারে।

গ্রামে এক কালী আছেন। সেই কালীর মন্দির পরিষ্কার করিত দিগম্বরী। সেই কালীর পূজা ব্যতীত আর সবই দিগম্বরী করিত। আট বৎসরের বালিকা অতি প্রত্যূষে স্নান করিয়া দেব মন্দির মার্জ্জনা করিত—পুরোহিতের বাটীর কাজ কর্ম্ম করিত। অনেকে দিগম্বরীকে মাহিনা দিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু দিগম্বরী জগজ্জননীর বাটীর দাসীপনা প্রাণান্তেও ছাড়িতে চাহিত না।

দিগম্বরী কালী সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা বলিত। সে বলিত, কালী আমার সঙ্গে কথা বলেন—স্বপ্নে আমায় উপদেশ দেন। একদিন প্রাতে দিগম্বরীর মন্দিরে যাইতে বিলম্ব হইয়াছিল—দিগম্বরী তাড়াতাড়ি মন্দিরে গিয়া দেখিল, কে মন্দির মার্জ্জনা করিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানে জানিল গ্রামের কেহই সে কাজ করে নাই। দিগম্বরী সে কথাটা বড়ই ভাবিতে লাগিল—কে মন্দির মার্জ্জনা করিল? ভাবিতে ভাবিতে রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলে, দিগম্বরী স্বপ্নে দেখিল, সেই কালীমূর্ত্তি আসিয়া বলিতেছেন "তোর বিলম্ব দেখিয়া আমি নিজে মন্দির মার্জ্জনা করিয়াছি।" দিগম্বরী এই সব কথা, আরো অনেক কথা স্ত্রীলোকদিগকে বলিত—কিন্তু লোকে বিশ্বাস করিত না। একজ অনেকে দিগম্বরীকে "পাগলী" বলিত।

দাঁতকাটার মা দাঁতকাটাকে লইয়া সেই গ্রামেই বাস করিতে ছিল। দাঁতকাটা পিশাচের মত নানা স্থানে ফিরিত। দেখিতে পাইলে অনেক ছেলে মেয়ে দাঁত কাটাকে নানা কথায় পাগল করিত—দাঁতকাটার গায়ে ধূলা—ওঁচলা ফেলিয়া দিত—কেহ বা ইট পাটখেল ছুঁড়িয়া মারিত। কোন বালিকা বলিত—

দাঁত কাটার মা নেড়ি।
খায় দশটা ভেড়ি॥

কেহ বলিতঃ—

দাঁতকাটার বাপ দাঁতকাটী।
গিলে খায় দশটা পাটী॥

দিগম্বরী এ সময়ে সময়ে বালক বালিকাদের সঙ্গে মিলিয়া দাঁত কাটার সঙ্গে ঐরূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত। দিগম্বরী জানিত, দাঁতকাটা পিশাচ।

একদিন রাত্রি-শেষে দিগম্বরী স্বপ্নে দেখিল, মা কালী, শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন "দাঁতকাটাকে অবজ্ঞা করিস কেন? সে যে পূর্ব্বজন্মে তোর স্বামী ছিল"।

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে,দিগম্বরী বিছানায় শুইয়া অনেক ভাবিল। বার বৎসরের মেয়ে স্বামী জিনিসটা কতক বুঝিতে পারে। বার বৎসরের দিগম্বরী বিছানায় শুইয়া কালীর কাছে ক্ষমা চাহিতেছিল। সেই স্বপ্ন দিগম্বরীকে নূতন করিয়া গঠিত করিল। সেই সময় হইতে দাঁতকাটাকে দিগম্বরী পিশাচ না ভাবিয়া "স্বামী" বলিয়া ভাবিতে লাগিল। ৪।৫ দিন ভাবিতে ভাবিতে দাঁতকাটা দিগম্বরীর প্রাণের নিকটে দাঁড়াইল।

২।৩ মাস পরে সেই বিকৃত মূর্ত্তিতে আপনার স্বামী মূর্ত্তি—প্রিয়তম মূর্ত্তি দর্শন করিল। পিশাচ দিগম্বরীর প্রিয়তম হইল।

গোয়ালা পাড়ায় দিগম্বরীর একটি মেটে ঘর, একটি গাভী ও কিছু টাকা আছে। বালিকার বিবাহের জন্য কেহ চেষ্টা করিতেছে না।

বালিকা ঘরের ভিতরে একটি মাদুরে শয়ন করিয়া ভাবিতেছে।—কি প্রকারে বিবাহ করিব। যদি ওর মা আমাদের এদিকে আসে তো বিবাহের কথা বলি। আমি যদি বিবাহ করিতে চাই তো ওর মার আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না"।

এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময়ে একটি তের বৎসরের বালিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বালিকাও গোপ কন্যা; সম্পর্কে ভগিনী, নামে কাত্যায়নী বা কাতী। দিগম্বরীর সহিত কাতীর বড় প্রণয়। দিগম্বরীর জন্য কাতী মরিতে পারে, কাতীর জন্য দিগম্বরী মরিতে পারে।

কাতী আসিবামাত্র দিগম্বরী উঠিয়া বসিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'কি ভাই শ্বশুরবাড়ি হ'তে কবে এলে'?

কা। আ মরণ। এই আসছি যে লো। এসে কাপড় ছেড়েই তোকে দেখ্‌তে এলাম।

দি।—ছেড়ে যে এলি?

কা। মুখে আগুন ছেড়ে কি আর এসেছি; সে কাল যে আসবে।

এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে কাতী মুখ অবনত করিল।

দি। ভাই। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।

কা। কি কথা? এত বেলা হ'য়েছে, এখনও যে আজ রাঁধিস নি।

দি। শুয়ে শুয়ে ভাই ভাবছিনু।

কা। আহা! বের কথা বুঝি—তার আর ভাবনা কি? আমি তোর জন্ত যে বর ঠিক ক'রেছি।

দি। মুখে আগুণ তোমার।

বলিয়া দিগম্বরী কাত্তীর গাল টিপিল।

"ওলো ছেড়েদে—ছেড়েদে—তুই জন্ম জন্ম আইবুড় থাক—আমার নাকের ঘায়ে লাগবে ছেড়েদে।"

কাত্তী এই কথা বলিলে, দিগম্বরী বলিল "আমি টিপিছি তাই লাগলো—তিনি যদি টিপতেন তো খুসি করতো লো"।

কা। যা ভাই! কিও! একশবার সে কথা কেন? তোর বের কি হ'ল বল্ শুনি।

দি। আমার বে হবে না। আমি বে ক'রবো না।

কা। ইস্—রেখে দে লো রেখে দে। আজ যদি হয় তো কাল চাস না।

দি। একটা তোকে কথা ব'লবো বলছু, তা তো তুই শুনবি না।

কা। কি কথা?

দি। ব্যাঙের মাথা।

কা। উকি ভাই, বল না। দেখিস্ লো—বের ঠিক্ হ'য়েছে বুঝি।

দি। আমার তো ভাই সম্বন্ধ তোরা একটা করলি না।

কা। ক'রেছি—বিয়ে ক'রবি? যার সঙ্গে সম্বন্ধ ক'রেছি তাকে বে ক'রবি তো বলি।

কার সঙ্গে করেছিস—বলনা আগেশুনি।

কা। সেই পাগলা দাঁতকাটাকে বে করবি? শুনিবামাত্র দিগম্বরীর বাল্য প্রকৃতিতে গাম্ভীর্য্যের সঞ্চার হইল।—দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিল, লাল হইল। প্রেমাবেশে নীরবে মুখ নত করিল।

কা। ওকিলো! কাঁদ্‌ছিস্ নাকি? সত্যি সত্যিই কি পাগ্‌লাকে বিয়ে ক'র্‌তে হবে। তামাসা ক'রে বলেছি ব'লে তাই রাগ কর্‌লি। তাকে কি আর মানুষে বে ক'রে? বাবা। তার সঙ্গে যার বে হবে, সে এক দিনেই ভয়ে মরে যাবে। ঢের ঢের চেহারা দেখেছি অমন বিকট চেহারা ভাই কখনও দেখিনি। ও ভাই বোধ হয় ভূত ও কখনই মানুষ না।

কাত্যায়নী জানে না যে, সেই বিকট নর-পিশাচকেই রূপবতী দিগম্বরী আপনার মন, প্রাণ, ধন, মান সমুদয় সমর্পণ করিয়াছে। কাত্যায়নী জানে না যে প্রেমের অদ্ভুত লীলা কোন পথে কি ভাবে প্রবাহিত হয়। যে প্রেম রাশি-স্রোত পথে মৃদু মৃদু থামিতে থামিতে প্রবাহিত হয়, এ সে প্রেম নহে। গুণ দেখিয়া, রূপ দেখিয়া, ধন দেখিয়া যে প্রেম সে নীচ বিকৃত প্রেম ইহা নহে। এ প্রেম ভবিষ্যৎ বুঝে না মান অপমান মানে না—চরিত্র অচরিত্র দেখে না, মানুষ কি দেবতা গুনিতে চায় না। প্রকৃতির হৃদয় হইতে যে প্রেম আপনি প্রবাহিত হইয়া প্রেমিকের নিকট—স্বর্গের নন্দন-কাননকে আনিয়া দেয়, প্রেমিকের চারিদিকে আনন্দের

ধারা ঢালিয়া দেয়, দিগম্বরীর ইহা সেই প্রেম। সাধারণের চক্ষু এ প্রেমকে দেখিতে পায় না—কবির,হৃদয় ইহাকে অনুভব করিয়া ভাবভরে অবনত হয়। এরূপ প্রেম সচরাচর ঘটেনা বটে, কিন্তু সামাজিক রীতি নীতি ও জল বায়ুর প্রভাবে মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হয়। ইহা সাধারণের চক্ষে পড়ে না; প্রেমিক কবির চক্ষে পড়ে,সাধারণে ইহাকে কল্পনার স্বপ্ন বলিয়া অবহেলা করে; কবি ইহাকে অনন্ত প্রেমের তরঙ্গ বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে গদ গদ হয় এবং লেখনীর মুখে পরিচয় দিয়া মাটীর পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করে।

কাত্তী বলিল, ওকি ভাই। কাঁদছ কেন?'

দিগম্বরী আরও কাঁদিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া চুপ করিয়া থাকিল।

দি। ভাই তোর পায়ে পড়ি কাকেও বল্‌বি না?

কা। ভাই তোর কান্না দেখে আমার কান্না পাচ্ছে। কেন কাঁদলি আমার মাথার দিব্য বল।

দি। ভাই। ভগবান্ যাকে যেমন গ'ড়েছেন। তা ব'লে কি ঘৃণা ক'রতে আছে।

কা। কাকে কি বলেছি ভাই। দাঁতকাটাকে বলেছি তা তুমি কেন কাঁদ ভাই। সে তো তোমার কেউ নয় ভাই।

দেখিস লো এত! ওমা। আমি মনে করি তোর মার কথা বুঝি মনে প'ড়লো তাই কাঁদছিস।

দিগম্বরী প্রেমাবেগে অধীরা হইয়া কাত্যায়নীর দুটী হাত আপনার চক্ষের উপরে রাখিয়া আবার কাঁদিল।

কাত্যায়নী কাঁদ কাঁদ হইয়া বন্ধুর গলা জড়াইয়া বলিল

কাঁদ কেন? আমি তোমার যে ব'লেম চোকের ভাল বাসি। কি হয়েছে বল।

দি। আমার মাথায় হাত দিয়ে তিন বার বল কাকেও বলবিনা।

কাত্তী মাথা ছুঁইয়া বলিল "কাকেও ব'লবোনা, কাকেও ব'লবোনা কাকেও ব'লবোনা।"

দি। আমার মরা মুখ দেখবি, তিনবার মাথা ছুঁয়ে বল।

কা। বালাই! ব'লতে আছে ও কথা। ছাই! আমাকে তোর অবিশ্বাস। তুই আমার কত কি বলেছিস আমি কি কাকেও একবার সে সব বলেছি; স্বামীকে পর্য্যন্ত নয়।

দিগম্বরী ঘরে খিল দিল। বন্ধুর হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলঃ—আমার বে দিবি?

কা। দেব।

দি। বর কোথা?

কা। দাঁড় কাটা।

বলিয়াই কাত্তী হাসিয়া উঠিল।

দি। কেন বর কি মন্দ?

কা। মুখে আগুন কাকে বে ক'রবি লো।

দি। যার নাম করলি।

বলিয়াই দিগম্বরী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় নত করিল।

কা। কিলো মজিস্ মজিস্ নাকি? আর কি বর নাই নাকি? আমরা তোর আগ বর দেখে যে দেব, আর [illegible] কি?

দিগম্বরী গম্ভীর স্বরে বলিল, ভাই! আমি যথার্থই বলছি—যার নাম ক'রলি তাকে ভিন্ন আর কাকেও বিয়ে কর্‌বোনা।

কান্তী চমকিত ভাবে বলিল "দূর পাগলী! মানুষ কি তাকে বে করতে পারে!"

দি। কেন? কি দোষ?

কা। সে কি মানুষ! সে যে ভূত। তুই কি পেত্নি যে তাকে বে কর্‌বি!

দি। পেত্নি না হয় হব। সে যদি ভূত হয় আমি কি পেত্নি হতে পারি না।

কা। তুই কি তামাসা কচ্ছিস্‌।

এই রূপে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে কান্তীর মা আসিয়া ডাকিল:—'ও কান্তী! কোথা গো'!

কান্তীর আর থাকা হইল না।

ভাই! মা ডাকছেন যাই। ঢের বেলা হ'য়েছে। রান্নার যোগাড় কর, না হয় আমাদের ওখানে চল, দুজনে ভাত খাব এখন।

কান্তীর মা আবার ডাকিল!—ও কান্তী।

"কেন? যাই"; বলিয়া কান্তী চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দাঁতকাটার মার সহিত কবে দেখা হইবে দিগম্বরী তাহাই ভাবিতে থাকে। একদিন দিগম্বরী গাভীর দুধ লইয়া দাঁত-কাটার গ্রামে বিক্রয় করিতে যাইল। রাস্তা দিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে বটতলায়, দাঁতকাটার মার সহিত দেখা হইল। দিগম্বরী ডাকিল। দাঁতকাটার মা হরিদাসী কাছে আসিলে, দিগম্বরী অতি নম্রভাবে ধীরে ধীরে বলিল "হাঁগা তুমি যে আর আমাদের ওখানে যাওনা?"

যাব কি মা! ছেলেটির আবার ব্যারাম বেড়েছে আমার পোড়া কপাল মা! নইলে আবার ব্যারাম হবে কেন?

অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া দিগম্বরী অতি কষ্টে জিজ্ঞাসিল "বে হ'য়েছে?"

হরিদাসী। কে মেয়ে দেবে মা! চেষ্টা তো অনেক ক'রলাম; তা জুটলো কই?

দিগম্বরী অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "কেন মেয়ে কি নাই?"

হ। থাকবেনা কেন মা! সোন্দর চেহারা তো আর আমার ছেলের নয়। আমারই না হয় ছেলে; যার মেয়ে, সে তো দেখে শুনে দেবে।

দি। আমার সন্ধানে একটি মেয়ে আছে, তার সঙ্গে বে দেবে?

হ। হাঁ মা! তোমার তো বয়স হ'য়েছে, তোমার বে কবে হবে?

দি। সে যাই হ'ক, তোমার ছেলের যদি বে দাও তো—

হ। কেমন মেয়ে? হরি কি এমন দিন দেবেন?

দি। তুমি একটু চেষ্টা করলেই তোমার ছেলের বে হয়। এক পয়সা খরচা হবে না।

হ। কেন বাছা তামাসা কর।

দি। তামাসা নয়—সত্যি সত্যি।

দিগম্বরী হৃদয়ের বেগ অনেক যত্নে সম্বরণ করিয়া কথা কহিতেছিল! কহিতে কহিতে—কথা আর্দ্র হইল।

হ। মা! তোমার মত সুন্দরী মেয়ে যদি আমার বউ হয়, তো আমার কপালের জোর। মা! তুমি কেন বে কর না?

যে পাথর দিগম্বরীর প্রেমের পথে থাকিয়া প্রবাহকে বাধা দিতেছিল, হরিদাসীর ঐ কথায় সে পাথর সরিয়া গেল;—দিগম্বরী অবনত মুখে কাঁদিয়া ফেলিল।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া দিগম্বরী বলিলঃ—'তা একটা দিন দেখে—

হরিদাসী আনন্দে উন্মত্তা হইয়া দিগম্বরীর চিবুক ধরিয়া হাতে করিয়া মুখের চুম্ খাইয়া বলিল, 'মা! তুই আমার বউ হবি, এ আমার স্বপ্নেও বোধ হয় না। সত্যি না তামাসা ক'রছ?

দিগম্বরী চুপ করিয়া থাকিল।

...র বড় আনন্দ। ভাবী বধুর হাত ধরিয়া বলিল

আয় মা আমরা গাছতলায় বসি। দুধ কোথা নে যাচ্ছ? দিগম্বরী বলিল, "দুধ তুমি নে যাও।"

দিগম্বরী হরিদাসীকে দুধ দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে হরিদাসী বলিল, "মা! তুমি আমাদের ওখানে চল।"

দিগম্বরী বলিল 'না আজ আর যাব না একবারে বের পর যাব। তুমি কাল আমাদের ওখানে যাবে না?

হ। "যাব"।

দি। তবে আমি এখন ঘরে যাই।

হরিদাসী ঘরে যাইল, দিগম্বরীও স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

দিগম্বরীর সহিত শুভ বিবাহ হইবার তিনমাস পরে, দাঁত-কাটার বাকশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। বিবাহের পর কিছুদিন দাঁতকাটার প্রকৃতি সুস্থির হইল। দিগম্বরীর প্রণয়ে দাঁতকাটার স্ফূর্ত্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

দাঁতকাটা কথা কহিতে পারে না—বোবা। দিগম্বরী ইসারা দ্বারা সব বুঝিতে পারে।

দিগম্বরী স্বামীসুখে মগ্ন হইয়া একদিন কথা কহিতেছে:—

স্বা। আঁ আঁ এবি।

স্ত্রী। কি ভয়! আমি কারও বাড়িতে দাসী হয়ে টাকা রোজগার করে তোমায় খাওয়াব।

স্বা। দ্যা দ্যা দ্যা ইমি।

স্ত্রী। তোমার জন্ত আমি কি না করতে পারি।

স্বা। ন্যা ন্যা ন্যা বা বা এ না।

স্ত্রী। কালীর যা ইচ্ছা তা হবে।

স্বা। আ আ কে তা তা তা তা গ।

স্ত্রী। তোমায় ভাল বাসি না তো কাকে বাসি—তুমি যে আমার পরাণ। বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। স্বামী না—না—না—না—বলিয়া স্ত্রীর মুখ চুম্বন করিল।

বিবাহের দুই বৎসর পরে, দাঁতকাটার মা মরিবার পরে, আবার দাঁতকাটার মনটা খারাপ হইল, আর পাগলের মতই থাকিল।

সুশীলাদের বাড়ীতে দাঁতকাটা চাকরি করিয়া থাকে। বিবাহের এক বৎসর পরেই সুশীলা বিধবা হয়। সুশীলার পিতা মাতা সুশীলার আবার বিবাহ দিবার প্রয়াস পাইল।

দাঁতকাটা শুনিল সুশীলার আবার বিবাহ হইবে। শুনিয়া দাঁতকাটার পাগলামি বাড়িল। দাঁতকাটা একদিন ভাবিতেছে—এবার মোর মনে যে হবেই হবে। আঁতকে আর কে যে কয়বে। মোরকপালে সুইলে কোথা যাবে বাবা। মোর সাথে ওর যে জাকা আছে নাকি, তাই ওর সে সোয়ামী মোরা।" দাঁতকাটা এইরূপে ভাবে আর খিল্ খিল করিয়া হাসে।

দাঁতকাটার উন্মত্ততা দিন দিন ভয়ানক বাড়িয়া উঠিয়াছে।

সে আর ঘরে থাকে না, স্ত্রীকে দেখে না। এ গ্রাম ও গ্রাম করিয়া বেড়ায়। অবলাবালা এই অবস্থায় উঁহাকে প্রথম দেখে। পাগলের মড়ার উপর বড় ঝোঁক ছিল। মড়া পাইলেই ঘাড়ে লইয়া পালাইত। উন্মত্ততার দরুণ দাঁতকাটার একটী এই ক্ষমতা ছিল যে, যে ঘরে মড়া পড়িয়া থাকিত, পাগল আপনি তাহা অনুভব করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিত, এবং মড়া লইয়া টানাটানি করিত।

যে দিন যোগেন্দ্র সুশীলাকে লইয়া নিরুদ্দেশ হইল, দাঁতকাটা সে দিন হইতে ভীষণ শব্দে গ্রামকে বিকম্পিত করিতে লাগিল। দাঁতকাটা "সুইলা সুইলা" বলিয়া কাঁদে, হাসে, আর হাততালি দিতে দিতে ধেই ধেই করিয়া নৃত্য করে।

সুশীলা যে রাত্রে গলায় দড়ি দেয়, সেই রাত্রে পাগল কোথায় ছিল কেহ জানিত না। এত দিন নিরুদ্দেশ ছিল; হঠাৎ রজনীতে আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুশীলা গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিতেছে। পাগলের সঙ্গে একটী মোটা দড়ি সর্ব্বদাই থাকিত। সেই দড়িটী লইয়া উন্মত্ত আপনার গলে দিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—•:(০):•—

পতিপ্রাণা দিগম্বরী, স্বামীর উন্মাদ রোগ আরোগ্য করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছিল, কিন্তু দুরদৃষ্ট সমুদয় বিফল করিতেছিল। স্বামী পিশাচের ন্যায় এগ্রাম ওগ্রাম করিয়া বেড়ায়, স্ত্রী পাগলিনীর মত খুঁজিতে থাকে। বিকটাকার মূর্ত্তিকে স্বামীত্বে বরণ করিয়াছিল বলিয়া কত লোক কত কথা বলিত, কত দুষ্ট লোক দিগম্বরীকে কলঙ্কিত করিবার জন্য কত প্রয়াস পাইত। এ পৃথিবীতে মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাট সমুদয় পৃথিবীকে পরাজিত করিতে পারেন, কিন্তু সতীর হৃদয়কে পরাজিত করিতে যাইলে, আপনার বাহুবলকে অগ্নি-নিক্ষিপ্ত তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিতে হয়। যে সমস্ত রূপবান পুরুষ, দিগম্বরীর স্বামীকে নরপিশাচ বোধে মনে ভাবিত, রূপবতী দরিদ্রা দিগম্বরী তাহাদিগের মনোমোহন রূপে বিমোহিত হইয়া তাহাদিগের ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা সম্পাদন করিবে, সতী দিগম্বরী ঐ সমস্ত রূপবান পুরুষদিগকে বাস্তবিকই নরপিশাচ বলিয়া বোধ করিত। লোকে ভাবিত, দাঁতকাটার ন্যায় অমন কদাকার আর নাই, কিন্তু দুশ্চরিত্র রূপবান রাজপুত্র যে প্রকৃত পক্ষে দাঁতকাটার অপেক্ষা অধিকতর কদাকার, তাহা দেবপ্রকৃতি লোকই বুঝিতে পারে। দাঁতকাটার গুণাগুণ দেখিয়া দিগম্বরী বিবাহ করে নাই। সে তার পূর্ব্বজন্মের স্বামী, জেনম্মের এই দুর্ম্মাদ

বিশ্বাস করিয়া, সতী প্রেমপাগলিনী হইয়া বিকট মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিল এবং আপনার জীবন মান অপমান উঁহারই পদতলে অর্পণ করিয়াছিল। কেহ বিবাহের ঘটকালি করে নাই ;—তাহা হইলে কি আর পিশাচের বিবাহ হইত ? দিগম্বরীর হৃদয়ে যে প্রেমময় দেবতা বাস করিতেছেন, তিনি তো আর দাঁতকাটাকে কদাকার দেখেননা;—কেননা দাঁতকাটা তাঁর নিজের হাতে গঠিত। যে হাতে তিনি রাজপুত্রকে গড়িয়াছেন সেইহাতেই দাঁতকাটাকে গড়িয়াছেন। প্রেমময় পিতার চক্ষে সব পুত্রই সমান সুন্দর। রাজপুত্রের জন্য যে ব্যবস্থা দাঁতকাটার জন্যও সেই ব্যবস্থা। উভয়েরই জন্য সূতিকাগৃহ ও শ্মশান, উভয়েরই জন্য পাপ ও পুণ্য এবং উভয়েরই জন্য দণ্ড ও পুরস্কার। অতএব দাঁতকাটা তার পূর্ব্বজন্মের স্বামী,এই বিশ্বাস হইতে ভগবানের প্রেম দিগম্বরীর হৃদয় ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া দিগম্বরীকে দাঁতকাটার মনোমোহন মূর্ত্তি দেখাইল। ভগবান স্বয়ং যে ভাবে দেখিয়া থাকেন, উঁহাকে দিগম্বরীর নিকট সেই ভাবেই উপস্থিত করিলেন। আর কি দিগম্বরী থাকিতে পারে ? ভগবান স্বয়ং ঘটকালি করিয়া যে বিবাহ দেন, সেই বিবাহের রীতিই এই। ইহাই প্রকৃত বিবাহ, ইহাই বিবাহের আদর্শ।

এই বিবাহের চিত্র আঁকিবার জন্যই কবির কল্পনা। এ বিবাহ সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক। ইহাতে শারীরিক সম্পর্ক আদবে নাই। জগতে অধিকাংশ বিবাহই শারীরিক। বিবাহে শরীরের সহিত যত অল্প সম্বন্ধ থাকিবে বিবাহ তত পবিত্র হইবে। অশরীরী শরীরের সহিত যে বিবাহ তাহা স্বর্গীয়

আঘাতে ভাঙিয়া যায়; কিন্তু আত্মার সহিত যে বিবাহ তাহা অনন্ত কাল থাকে। সুতরাং ইহাতে বৈধব্য হয় না—কারণ স্বামী অবলাদীর মত পরলোক-বাসী হয়েন। বিবাহের একটী নাম আত্ম-বলি। বিবাহ ধর্ম্মমন্দিরের প্রথম সোপান। মানুষ একবারে জগতের জন্ম আত্মবলি দিতে পারেনা বলিয়া বিবাহে তাহার আরম্ভ-শিক্ষা।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রামের উত্তর ধারে এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী। তার পাড়ের উপর এক দেবমন্দির। সেই মন্দিরের দাসী দিগম্বরী মন্দিরের কার্য্যাদি সমাপন করিয়া স্নান মুখে কোথায় যাইতেছে—তার স্বামীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চক্ষু মুছিতেছে, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল "ও দিগদি!"

দিগম্বরী মনের দুঃখে সে ডাক অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

আবার ডাকিল "ও খোলো! শোন্‌না-লো।"

দিগম্বরী স্বর বুঝিয়া পিছনে ফিরিয়া "কেলো! বামুন দিদি!"

বামুন দিদি বিদ্রূপস্বরে বলিল "আহা! শুনেও শুনিসনি যে লো!"

দিগম্বরী একটু আস্তে আস্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আর দিদি! মনে কি সুখ আছে!"

বামুন দিদি বলিল "দেখা পেয়েছিস?

"না দিদি! কেন আর কও"—বলিয়া দিগম্বরী কয়বিন্দু চক্ষের জল ফেলিল।

বামুনদিদি দিগম্বরীর দুঃখ একটু বুঝিত। তাই একটু কাতর ভাবে বলিল "তা আর কি ক'রবি বল. তোর যেমন পোড়া কপাল। নইলে তোর যেমন সম্বন্ধ জুটিয়ে দিলাম—তা তুই শুনলি ক'ই. একটা খ্যাপাকে এ'নে, সে মরলি—মর এখন ভুগে মর।"

কথা শুনিয়া দিগম্বরী প্রবলতর বেগে অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিল "দিদি! তুমিও অমন কথা ব'লে মনে কষ্ট দেবে। যদি মা কালীর ইচ্ছায় ওর ব্যারামটা ভাল হয় তো আমার ভাবনা কিসের দিদি।" বলিয়া হতভাগিনী আপনার অঞ্চল দিয়া নয়নের জল মুছিতে লাগিল—যত মুছে তত পড়ে।

বামুনদিদি আবার বলিল, "তা কোথাও সন্ধান-টন্ধান কর্লি।"

দিগম্বরী ঘাড় হেঁট করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। মুখে কথা সরে না। বামুন দিদির মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিবার চেষ্টা করে আর মনের দুঃখে দুচক্ষু জলে ভাসিয়া যায়—বুক থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে।

বামুন দিদি একটু চমকিত ভাবে বলিল "কেন লো! অমন ক'রছিস কেন?

দিগম্বরী অনেক কষ্টে মনের দুঃখ চাপিয়া বলিল, "দিদি! কাল থেকে, আবার রোগটা তার আরও বড় খারাপ হ'য়েছে—

মন হু হু করছে, সব যেন ফাঁক ফাঁক বোধ হচ্ছে—একটা একটা কাক কা কা ক'রে আমার মাথার উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে। দিদি। কোন সর্ব্বনাশ হয় নিতো?" দিগম্বরী আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিল। দিগম্বরী কাঁদিতেছে, বামুন দিদি কত কি বলিয়া দিগম্বরীকে প্রবোধ দিতেছে; এমন সময়ে বামুন দিদির স্বামী কোথা হইতে আসিয়া, দিগম্বরীকে না দেখিয়া ব্রাহ্মণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "ওগো! শুনেছ। দ'াতকাটা গলায় দড়ি দিয়ে ম'রেছে।" শুনিবামাত্র দিগম্বরী ব্রাহ্মণের দিকে উন্মাদিনীর মত স্থির নেত্রে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পতিত হইল। সতী স্বর্গে গমন করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

যোগেন্দ্র কলিকাতায় গিয়া একদিন বিকালে—হেদোর পুকুরে বাঁধা ঘাটে বসিয়া আছে। কাছে এক যুবা আসিয়া বসিল। যোগেন্দ্রের সঙ্গে ঐ যুবা কয়েক বৎসর স্কুলে পড়িয়াছিল। যোগেন্দ্র তাহাকে দেখিয়াই চিনিল, কিহে! হরিদাস বাবু না—বলিবামাত্র হরিদাস বাবু "আরে যোগেন্দ্র বাবু যে অনেক দিন পর দেখা।"

দুইজনে কর মর্দ্দন করিয়া অনেক আলাপ হইল। হরিদাস যোগেন্দ্রের বাসায় আসিল—যোগেন্দ্র হরিদাসের বাসায় যাইল। দুজনে খুব আলাপ জমিয়া গেল। একদিন আলাপ হইতেছে:—

হ। যোগেন্দ্র বাবু! কয় বৎসরের মধ্যে অনেক ঘটনা হইয়াছে। অনেক বদমাইসি করেছি। পাপের যাতনাও অনেক ভুগেছি—এখনও ভুগছি। এত দেখে এত ভুগে একটী পাকা শিক্ষা এই হ'য়েছে—"যে স্ত্রীলোকের সতীত্ব ব'লে যে কথা, ওটার মত মিথ্যা কথা আর নাই।"

যো। কেন বল দেখি?

হ। আবার কেন বল দেখি? তবে বলি শুন।

হরিদাস তখন আপনার স্ত্রী গোলাপের কথা সংক্ষেপে বলিল। তারপর অবলার কথা বলিল। রামচন্দ্রের বাড়িতে পড়িয়া মরা পর্য্যন্ত বলিয়া, রামের চরিত্রে কালি দিয়া বর্ণনা করিতে লাগিল। রামচন্দ্র ভণ্ড সন্ন্যাসী, তাহাও বলিল। রামচন্দ্রকে সে বড় ভয় করে তাহাও বলিল। রামচন্দ্রের সঙ্গে অবলার গুপ্ত প্রণয়ের কথা, মিথ্যা করিয়া, এভাবে বলিল যে যোগেন্দ্র সে কথার বিষ পান করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

একদিন রজনীতে পূর্ণিমার চন্দ্র সুধা বর্ষণে পৃথিবীতে আনন্দস্রোত প্রবাহিত করিতেছে; দুই একখানা খণ্ড সাদা মেঘ চাঁদের কাছ দিয়া উড়িয়া যাইতেছে, মন্দ মন্দ বাতাস বহিতেছে, এমন সময়ে যোগেন্দ্র ছাদের উপরে শায়িত; অবলা পদতলে উপবিষ্টা। অবলা স্বামীর পদসেবা করিতে করিতে সেই জ্যোৎস্না-সাগরে স্বামীর সৌন্দর্য্যদর্শনে স্বর্গসুখের শেষ সীমায় উপনীতা হইয়াছে। স্বামী অর্দ্ধনিদ্রিত। স্বামীর

মুখে চন্দ্র-কর পড়িয়াছে। সুন্দর কপালে, চন্দ্রকর পতিত হওয়ায়, বোধ হইতেছে যেন সে কপাল স্বর্গের পুরোভাগস্বরূপ। সেই কপাল হইতে গাম্ভীর্য্যের দীপ্তি বাহির হইয়া চন্দ্র করে মিশিতেছে। নৈশ-সমীরণ মৃদু মৃদু সেই মস্তকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া মস্তকের পবিত্র কেশরাশিকে অল্প দুলাইয়া যাইতেছে। অবলা অনিমেষ নয়নে স্বামীর বদন-চন্দ্র দেখিতে দেখিতে, কখনও আনন্দে উন্মাদিনী হইয়া ধীরে ধীরে সেই দেবতার মুখে চুম্বন দান করিতেছে; কখন বা সেই দিব্য কান্তির লীলা দেখিয়া ভক্তিভরে অশ্রুমোচন করিতে করিতে পদতলে প্রণাম করিতেছে; আবার কখনও বা আপনার অঞ্চল দিয়া দেবতার অঙ্গে চামর ব্যজন করিতেছে। হঠাৎ অবলা নীচে গমন করিল। যোগেন্দ্র জাগ্রত হইল। হরিদাসের সহিত যে আলোচনা হইয়াছিল তার বিষে জর্জ্জরিত হইতেছিল। মনে, হৃদয়ে, মস্তিষ্কে সেই গরল সহস্র সর্পদংশনের যাতনায় জ্বলিতেছিল। যোগেন্দ্রর হৃদয়, অবলাকে কখনও সতী, কখনও অসতী, বলিয়া স্থির করিতে করিতে পাগল হইতেছিল। সেই ভীষণ নরকের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে যোগেন্দ্রর মস্তিষ্কে বুকে যেন শত বৃশ্চিক দংশন করিল। উঃ গেলুম! গেলুম! বলিয়া চীৎকার করিয়া যোগেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইল। অবলা দ্রুত ছাদে আসিয়া দেখিল, স্বামী মূর্চ্ছিত। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যোগেন্দ্র চাহিল। দেখিল অবলা। মস্তিষ্কে, বুকে আবার যাতনা জ্বলিল। যোগেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে "যাগে" বলিয়া আবার চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইল।

অবলা দ্রুত বেগে গিয়া রাম দাদাকে ডাকিল। রাম আসিয়া দেখিল, যোগেন্দ্র মূর্চ্ছা হইতে উঠিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছে। রামকে দেখিয়া বলিল, তোমার ভগিনীকে আমার নিকট হইতে যাইতে বল, ওর সেবা শুশ্রূষা আর ভাল লাগেনা।

অবলা শুনিবা মাত্র সরিয়ে গেল—আজ অবলার যথার্থ নরক যন্ত্রণা।

রাম শুনিয়া হতবুদ্ধি হইল—ভাবিতেছে হতভাগিনীর অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ।

রাম স্তম্ভিতভাবে জিজ্ঞাসিল, "কি হ'য়েছে বলুন দেখি!

যো। হবে আর কি! আগুণ উত্তাপ হারিয়েছে, জ্যোৎস্না কাল হ'য়েছে—কাল হ'তে সূর্য্য হ'তে আঁধার বেরুবে!—বলিতে বলিতে যোগেন্দ্রের দুচক্ষু লাল হইয়া উঠিতেছে—প্রকৃতি ছিন্নপ্রায় হইতেছে।

রামচন্দ্র অধোবদনে থাকিয়া ভাবিতে লাগিল "একে সব পাগলের প্রলাপ শুনছি—ভীষণ বটিকার শব্দ শুনছি। ভাবিতে ভাবিতে রামচন্দ্র ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "যোগেন্দ্র বাবু! কথার অর্থ বুঝিলামনা—ভাল করিয়া বলুন। যোগেন্দ্র প্রাণের যাতনায় জ্বলিতে জ্বলিতে বলিল "প্রাণ আমার কেমন ক'রছে! বোধ হ'চ্ছে আমি পাগল হ'ব—হব কি! বোধ হয় হ'য়েছি। উঃ গেলুম গেলুম!" বলিয়া যোগেন্দ্র আবার মুর্চ্ছিত হইল। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে যোগেন্দ্র নিদ্রে গেল। সেই দিন হইতে অবলার ঘর পরিত্যাগ করিল। যোগেন্দ্র আর একটা ঘরে খিল দিয়া ভূমি শয্যায় শয়ন করিল। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে কত ডাকিল—

অনুরোধ করিল, মিনতি করিল, মাথা খুঁড়িল—পায়ে গড়াগড়ি দিল ;কিন্তু স্বামীর হৃদয় ক্রমে কঠিনতর হইল। যোগেন্দ্র পদাঘাতে অবলাকে দূরে নিক্ষেপ করিল। অবলা সেই ঘরের এক পাশে বসিয়া কাঁদিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিল।

সমস্ত রাত্রি যোগেন্দ্র ঘুমায় নাই। সন্দেহ-সর্প নিদ্রাকে দংশন করিয়া মরিয়াছে।

পরদিন প্রাতে যোগেন্দ্র উঠিয়া পাগলের মত বাহিরে গেল। পায়ে জুতা নাই, হাতে ছড়ি নাই, গায়ে জামা নাই। প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে যাইল। অন্যদিন ভ্রমণ করিতে করিতে কত আনন্দ সম্ভোগ করিত আজ যেন সে সব বিষ, যেন সব কি, যেন সব ঐ সন্দেহ। যে দিকে চায় সে দিক্‌টা ঐ সন্দেহ তুলিয়া দেয় ; জলে স্থলে চারি দিকে ঐ সন্দেহ যেন লুকাইয়া রহিয়াছে।

মনে ক্রমাগতই সন্দেহ। সে আর যায় না, দিন দিন প্রবলতর হইতেছে। যোগেন্দ্র অবলার ঘরে শয়ন করে না ; আর অবলার দিকে দৃষ্টিপাত করে না। যোগেন্দ্র ক্রমে প্রকৃত উন্মাদ হইয়া উঠিল।

যোগেন্দ্র উপরের একটী ঘরে দিনরাত্রি শুইয়া শুইয়া কি ভাবে! যোগেন্দ্র ভাবে আর কাঁদে, কাঁদে আর হাসে, হাসে আর বকে—বকে আর করতালি দেয়। যোগেন্দ্রের সে দেহের আর শ্রী ছাঁদ নাই। যোগেন্দ্র দিন দিন শীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ হইতেছে।

অবলার প্রাণে আর প্রাণ নাই। অবলাও আর খায়না ঘুমায় না। সমস্তদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া সময় পাত করে। স্বামীর দুর্দ্দশায় অবলায় শরীর এরূপ জীর্ণ যে, অবলাকে আর চেনা কঠিন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

একদিন অপরাহ্নে, যোগেন্দ্র আপনার ঘরে চেয়ারে বসিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে চীৎকার করিয়া বলিল, "পাপিষ্ঠাকে খুন কর্‌বো, খুন করবো।" বলিয়াই হো হো হো হো করিয়া হাসিয়া পট্‌ পট্‌ করিয়া হাততালি দিল। অন্যান্য দিন ঘরের দ্বার বন্ধ থাকিত, সুতরাং হতভাগিনী অবলা চেষ্টা করিয়াও প্রবেশ করিতে পারিত না। আজ ঘরের দ্বার খোলা। অবলা এই সুযোগে কাঁদিতে কাঁদিতে, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর কাছে গিয়া উপস্থিত। স্বামী অবলাকে দেখিয়াই কাঁদিল।

অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে হাত ধরিয়া বলিল, 'জীবন আমার! কেন? কেন তুমি অত কাঁদ? আমায় সব খুলে বলনা।'

যোগেন্দ্র চক্ষু আরক্ত করিয়া অবলার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিল।

অবলা পাগলিনীর মত বলিল 'নাথ। আমার জীবন! তোমার চক্ষু অমন কেন? আমার যে ভয় ক'রছে'। বলিয়াই হতভাগিনী স্বামীর পদতলে লুণ্ঠিতা হইল। যোগেন্দ্র অবলার পৃষ্ঠে প্রবল বেগে পদাঘাত করিয়া বলিল·—

"তুইই আমার পীড়ার কারণ, তুইই আমার পীড়ার কারণ। তুই না ম'লে আমার ব্যারাম ভাল হবে না।"

হতভাগিনী তখন স্বামীকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিল, প্রাণনাথ। আমি এখনি মরিতে প্রস্তুত—এজন্য আর ভাবনা কি নাথ! আমি তো তোমারি।—সে যে অনেক দিন হ'তে'।

অবলার কথা শুনিয়া যোগেন্দ্রের প্রাণটা কেমন বিগলিত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে স্ত্রীর মুখ চুম্বন করিল। অবলা তখন স্বামীকে আপনার কাছে বসাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'তুমি আর অমন ক'রনা। কেন? কি তোমার হয় আমায় বল। আমি ডাক্তার আনিয়ে চিকিৎসা করাই।"

বলিয়াই অবলা স্বামীর গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর মুখচুম্বন করিল।

যোগেন্দ্র আবার ক্রোধে উন্মত্ত হইল। মাথায় আবার যন্ত্রণা বোধ হইল—বুক কিসে ভাঙ্গিতে লাগিল। "গেলাম গেলাম, মাথা গেল, বুক গেল" বলিয়া চীৎকার করিল।

অবলার প্রাণের ভিতরটা কেমন করিতেছে। হতভাগিনী স্বামীর মুখের দিকে আবার সাশ্রুনয়নে চাহিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, বলিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসিল 'কি হ'লে তুমি আমার ভাল হবে, আমায় বল না?'

যোগেন্দ্র উঠিয়া তরবার বাহির করিয়া অবলার গলার কাছে আনিল।

অবলার তাহাতে ভয় নাই। অবলা বলিল "আমি ম'লে যদি তোমার ব্যারাম ভাল হয় তো আমায় এখনি কাট। তার জন্য তুমি ভেবনা—আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে যে, তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমার হাতে ম'র্‌বো'।

যোগেন্দ্র হঠাৎ তরবার হস্তে আপনার শয্যায় উঠিয়া বসিল। বসিয়া বলিল, 'তোর চরিত্রে সন্দেহ হ'য়েছে, সন্দেহ হ'য়েছে, ওরে ওরে সাপ। ওরে সন্দেহ! ওরে সাপ! তুই এই বার জায়

—ওরে পিশাচী তোকে আমি কেটে ফেল্‌বো উঃ গেলুম গেলুম—বুক গেল!

যোগেন্দ্র ক্রোধে উন্মত্ত হইল। অবলা ঐ কথা শুনিতে শুনিতে বজ্রাহত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। যোগেন্দ্র তরবার হস্তে আসিয়া অবলার বুকে বসিল। অবলার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। দেখিল বক্ষে তরবার হস্তে স্বামী, আপনার আসন্ন কাল উপস্থিত দেখিয়া অবলা অশ্রুপূর্ণনয়নে গদগদস্বরে বলিল, 'নাথ! আজ আমার বড় সুখের দিন যে তোমার হস্তে মরিব! যমের হাতে প্রাণ না যাইয়া যদি তোমার হাতে প্রাণ যায় তো ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? নাথ! আমায় এ অন্তিমকালে আশীর্ব্বাদ কর'।

যোগেন্দ্র তরবার উর্দ্ধে তুলিয়া বলিল, 'কি আশীর্ব্বাদ চাও, এই তরবারে তোমার আশীর্ব্বাদ হবে! পিশাচী! রাক্ষসী!—আশীর্ব্বাদ! র'স পাপিষ্ঠা র'স্! এখন ঈশ্বরের নাম কর!'

অবলার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমার ঈশ্বর এই যে তুমি আমার বুকে'। বলিবামাত্র অবলার গাম্ভীর্য্য বাড়িল, ভক্তি উথলিয়া উঠিল। ভগবান! আমায় এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন পরজন্মে তুমিই আমার পতি হও।'

যোগেন্দ্র হঠাৎ তরবার ছুড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। অবলা! অবলা! প্রাণ যায়! ওরে অবলা! তোর বুকে একবার শোব, বলিতে বলিতে অবলার বুকে মাথা রাখিয়া যোগেন্দ্র প্রবলবেগে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। অবলা স্বামীকে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া বলিল, 'নাথ কেন তুমি এমন হ'লে—আমি যে তোমার অবলা—ও সন্দেহ তুমি ক'রনা। ও কথা মনে

এননা। ওঠ! রামদাদা বৈদ্যের ব্যবস্থা ক'রেছেন। বৈদ্য আসুক—চিকিৎসা ক'রে তোমার আরাম করুণ। নাথ! নাথ!' অবলা আর কথা কহিতে পারে না,—অবলার অস্তিত্ব যেন জড়ীভূত হইয়া আসিল।

যোগেন্দ্র কিছু কথা কহিল না, চুপ করিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে সে ঘর পরিত্যাগ করিয়া অবলার ঘরে প্রবেশ করিল। অবলার বিছানায় বসিয়া বকিতেছেঃ—

দূর হ দূর হ, সন্দেহ তুই দূর হ। অবলা যে সতী, অবলা যে সাবিত্রী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! বেরোও শালা বেরোও! ওগো বাবা গো! গেলুম গেলুম! বুক গেল, মাথা গেল, অবলা গেল! অবলা গেল'! উঃ উঃ বাবা! উঃ উঃ!

অবলা ঘরে প্রবেশ করিয়া স্বামীর দুর্দশা দেখিতে দেখিতে স্বামীকে আপনার আলিঙ্গনে বাঁধিল। বাঁধিয়া বলিল, "সন্দেহ গিয়াছে. আর নাই, তুমি আমার বুকে শুয়ে থাক; কিসের সন্দেহ? সন্দেহ আমি দূর ক'রে দেব। কেন? অত কাঁদ কেন? আমার সঙ্গে দুটো কথা কও। প্রাণ যে যায়। স্থির হও, প্রাণ আমার! একটু স্থির হও"।

যোগেন্দ্র বলিল,' না—না—সন্দেহকে কাটি,সন্দেহকে কাটি" বলিয়াই অবলার বাক্সে তরবারের আঘাত করিল। পদাঘাতে অবলার ঘরের জিনিস পত্র ভাঙ্গিল। পরিশেষে অবলার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া বলিল, "আমি তোকে যমের বাড়ী পাঠাব। তুই নিজের গলায় নিজে তরবার মার। আমি তোকে মেরে পাপের দায়ী হব না। সন্দেহ ব্যাটা তোর ভিতরে, তোকে কাটলেই সে কাটা প'ড়বে। ওরে বাবা! গেলুম গেলুম!

অবলার হৃদয়ে কিসের উচ্ছ্বাস উঠিল। স্বামীর নিকট আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার জন্ত প্রবল ইচ্ছা উপস্থিত হইল। অবলা আর স্বামীর কষ্ট দেখিতে পারে না! অবলা প্রফুল্লমুখে প্রফুল্ল ভাবায় একটু কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, 'নাথ! তুমি চৌকীর উপর উপবেশন কর, আমি স্নান করিয়া জবাফুল আনিয়া একবার মনের সাধ মিটাইয়া তোমার পূজা করি।' পূজা ক'রে আমাকে তোমার নিকট বলিদান দি।

বলিতে বলিতে অবলা উন্মাদিনীর মত হাসিল। চারিদিকে যেন স্বর্গের বাজনা বাজিতেছে। প্রেমোচ্ছ্বাস যেন অবলাকে ইহলোক হইতে পরলোকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার জন্ত উপস্থিত।

অবলা বলিল, "প্রাণনাথ! আমার জীবনের দেবতা! তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি স্নান করিয়া জবাফুল তুলিয়া আনি। আজ আমার শুভ দিন। এই দিনে একবার জনমের মত তোমার চরণ পূজা করি। তার পর তোমার নিকটে আমার জীবনকে সার্থক করি।

যোগেন্দ্র চৌকির উপর বসিল। অবলা হাসিতে হাসিতে কাঁদিতে কাঁদিতে স্নান করিতে গেল। অবলা হাসিতে হাসিতে কাঁদে কেন? না—মরিলে যদি স্বামীর পীড়া আরাম না হয়; স্বামীর আর কেহ নাই;—অবলা মরিলে কে যত্ন করিবে?

অবলা স্নান করিল—ফুল তুলিল—চন্দন ঘসিল। সমুদায়ের আয়োজন করিয়া লাল পেড়ে শাটী পরিল, মাথায় দীর্ঘ সিন্দুরের ফোঁটা দিল। ধূপ ধুনা জ্বালিল।

স্বামীর বুঝি তো কষ্ট হইতেছে এই ভাবিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে গৃহে প্রবেশ করিল।

অবলার সম্মুখে অবলার দেবতা। সেই দেবতার নিকটে সতী আপনাকে বলি দিবার জন্ত দেবতার পূজায় বসিল। যোগেন্দ্র একদৃষ্টে অবলার সমুদয় ব্যাপার দেখিতেছে। যোগেন্দ্র স্থির—যেন মহাদেব যোগে মগ্ন।

অবলা আনন্দে উন্মাদিনী—ভক্তিভরে অবনত হইয়া পুষ্প চন্দন দ্বারা স্বামীর পদপূজা করিল। ইচ্ছা, অনন্তকাল এইরূপে পূজা করে—ইচ্ছা, সহস্রবার স্বামীর সম্মুখে আপনার মস্তক কাটে।

পা পূজা করিয়া স্বামীর পদধূলা লইয়া মাথার সিঁদুরে রাখিল। পাদুকা একবার আপনার মস্তকে রাখিয়া ভক্তিভরে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। অবশেষে পদতলে প্রণাম করিয়া অবলা [illegible]নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। স্বামীর মুখ বিষণ্ণ দেখিয়া অবলা দুঃখে জর্জ্জরিতা হইল। কি আর করিবে আর যে কোন উপায় নাই। অবলার হৃদয়ে সমুদয় সুখে এই দুঃখ রহিল যে, স্বামীকে আনন্দময় দেখিয়া—নির্ব্বাধি দেখিয়া মরিতে পারিল না। অবলা ভাবিতেছে, যদি আমি মরিতে মরিতে স্বামীর পীড়া আরোগ্য হয়, আহা! তা কি হবে! অবলা অশ্রুপূর্ণনয়নে গম্ভীরভাবে করযোড়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। স্বামী সে ভাব দেখিয়া একটু কাঁদিল। অবলার মুখের দিকে আর চাহিল না। অন্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিল।

অবলা ভক্তি[illegible] উন্মাদিনী হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে বলিল, "প্রাণনাথ! ভগবান! এ সময়ে একবার আমার দিকে চাও, নহিলে যে [illegible]মার মরিবার সুখ যাচ্ছে না। এক বার আমার দিকে চাও—আমি পাপিয়সী, ভাল করিয়া

তোমার সেবা করিতে পারি নাই, তোমার কাছে কত অপরাধ করিয়াছি, আমার দিকে একবার চাও—তোমার কৃপাদৃষ্টিতে আমার পাপক্ষয় হ'ক। নাথ! এ অন্তিমকালে আমায় আশীর্ব্বাদ কর। আর কিছু আশীর্ব্বাদ চাইনা, কেবল এই আশীর্ব্বাদ চাই, যেন পরজন্মে তুমি আমার স্বামী হও; আর তোমারি সম্মুখে এইরূপে পূজা করিয়া যেন এইরূপে মরিতে পারি। "ওরে বাবারে! ওরে বাবারে! আমি যে এ দেখতে পারি না! তোর মরতে হয় এই ঘরে একলা মর; আমি ও ঘরে যাই।" এই কথা বলিয়া যোগেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে অন্যঘরে গেল।

অবলা ধ্যানে বসিল। হৃদয়ে স্বামী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে চক্ষু মুদিয়া তরবার হস্তে লইয়া বলিল 'তরবার! তুমি আমার পরমবন্ধু। তুমি আমায় এ পৃথিবী হ'তে দূর কর। আমি মরিলে আমার স্বামী ভাল হবে। আমার চরিত্রে সন্দেহ হওয়া তো সম্ভব।

তারপর পিতা মাতা ভ্রাতাকে স্মরণ করিয়া বলিল, "মা! বাবা! দাদা! তোমাদের অবলার আজ বড় সুখের দিন। বিবাহের দিনে এত আনন্দ হয়না। মা! আজ তোমার অবলার যে প্রকৃত বিবাহের দিন। এ সুখের দিনে একবার অবলাকে দেখ।

রাম দাদা! আমার জন্য কত কষ্ট পেয়েছ! সে কষ্ট এতদিনে সার্থক হ'ল! দাদা! তুমি এদশা দেখে কেঁদনা, আনন্দিত হ'য়ো।

পরিশেষে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "প্রাণনাথ! জীবনা তোমার অবলা আজ পরলোকে যাইতেছে বটে কিন্তু সেখানেও অবলা তোমারই!—তোমার বলিয়া না ভাবিলেও অনন্ত কালের

মত তোমার ;—নরকেই যাই,স্বর্গেই যাই অবলার যা কিছু সবই তোমার!" ক্রমশঃ মুখের ভাষা ভাবে ডুবিল—ভীষণ নীরবতার মধ্যে এক নূতন প্রেমজগতের প্রকাশ পাইল ; সেই জগতে ইহ-জগৎ বিসর্জনদিবারজন্ত স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া তিনবার প্রণাম করিয়া তীক্ষ্ণতরবার গলদেশে প্রবল বেগে আঘাত করিল—রক্ত পিচকারি দিয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইল—অবলা চক্ষু উর্দ্ধে তুলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রক্তমণ্ডিত হইয়া পতিত হইল।

যোগেন্দ্র ঘরের ভিতর হইতে দেখিল—পাগলের মত ছুটিয়া আসিল ;—চীৎকার করিল "সর্ব্বনাশ। সর্ব্বনাশ! ও অবলা! প্রাণেশ্বরী! সন্দেহ নাই—আর সন্দেহ নাই। তুমি যে সতী সাবিত্রী। ও আমার সাবিত্রী! ও আমার সাবিত্রী। আমি যে তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাব।" এই কথা বলিতে বলিতে সেই তরবার ধারণ করিল—তার পর অবলার মুখে একবার চুম্বন করিয়া "অবলা! দাঁড়াও সঙ্গে যাই" এই কথা বলিয়া তীক্ষ্ণ তরবার আপনার গলায়, বিকট হাসি হাসিয়া প্রবলবেগে বসাইয়া দিল। যোগেন্দ্রের দেহ ঘুরিয়া অবলার দেহের উপরে পড়িল। সতীর সহমরণে স্বামী চলিল।

ইতিমধ্যে পাড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। হৈঃহৈঃ রৈঃরৈঃ পড়িয়া গেল।

সম্পূর্ণ।